

বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও মুক্তিযুদ্ধের অজানা কথা



অধ্যাপক ডাঃ মোহাম্মদ জোবায়ের
তপন কুমার দে

বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও মুক্তিযুদ্ধের অজানা কথা

অধ্যাপক ডাঃ মোহাম্মদ জোবায়ের
তপন কুমার দে

ISBN 984-70000-0179-5

বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি
ও
মুক্তিযুদ্ধের অজানা কথা

অধ্যাপক ডা: মোহাম্মদ জোবায়ের
তপন কুমার দে

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ

NUB LIBRARY

ACCESSION NO.	৭৫৭৯৪
ACCESSION DATE	
PROGRAM, CAMPUS	

বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও মুক্তিযুদ্ধের অজানা কথা

অধ্যাপক ডাঃ মোহাম্মদ জোবায়ের
তপন কুমার দে

প্রকাশক : কমলকান্তি দাস, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, বেজমেন্ট ৫৫, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কম্প্লেক্স, ২৫৩-৫৪ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫। প্রচ্ছদ : চারু প্রিন্টু। বর্ণবিন্যাস: কম্পিউটা ল্যান্ড। মুদ্রণ : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ মুদ্রণ বিভাগ। গ্রন্থস্বত্ব : সম্পাদকদ্বয়। প্রকাশকাল : জুলাই ২০১৬।

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা মাত্র।

Bangladesher Prothom Rastopati O Muktijiddar Ojana Kotha : Edited by Prof. Dr. Mohammad Zubayer, Tapan Kumar Dey, Published by : Kamolkanti Das, Jatiya Sahitya Prakash, Basement Room: 55, Concord Emporium Shoping Complex, 253-54 Elephant Road, Kantabon, Dhaka-1205, Cover design : Charu Pintu, Copyright : Editor, Date of Publication : July, 2016.

Price : Tk. 500.000 US $ 10.00

ISBN : 984-70000-0179-5

উৎসর্গ

মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদ
অধ্যাপক ডা. শামসুদ্দীন আহমেদ-এর
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে।



বাংলাদেশের আর একজন অমর শহীদ ডাক্তার শামসুদ্দীন আহমেদ। 'মানুষের চেয়ে নহে কিছু বড়, নহে কিছু মহীয়ান'-এই নীতি যাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, মানবতার সেবাই যাঁর জীবনের ব্রত ছিল, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে মানুষকে যিনি সবার উপরে স্থান দিয়েছিলেন, সেই মানুষকেই যে বিনা অপরাধে কেউ হত্যা করবে একথা কল্পনা করা যায় না। কিন্তু বিচিত্র এই পৃথিবীতে অনেক কিছুই ঘটে, তেমনি করে ঘটেছিল মানবতার সেবায় নিবেদিতপ্রাণ ডা. শামসুদ্দীন আহমেদ-এর নির্মম মৃত্যু। সিলেটের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী তাঁকে গুলি করে হত্যা করে ১৯৭১ সালের ৯ এপ্রিল।





সূচিপত্র

অবতরণিকা		১৩
বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ		২৫
স্বাধীনতার ঘোষণা		২৮
স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র		২৯
তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণ		৩১
১৯৭১-এর ৬ জুলাই সংসদ সদস্যদের প্রথম অধিবেশনে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের উদ্বোধনী ভাষণ		৩৯
স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কীয় প্রস্তাব		৪৬
আগেই সিদ্ধান্ত নিই সরকার গঠনের	তাজউদ্দীন আহমদ	৫১
স্মৃতিতে মুজিবনগর সরকার	ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম	৫৩
ইতিহাসের অনন্য দিন	সিরাজ উদ্দীন আহমেদ	৫৯
মুক্তিসংগ্রামের অনন্য দলিল	ড. হাসিবুল আলম প্রধান	৬৩
জেনারেল জিয়া দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি : একটি হাস্যকর বক্তব্য	সৈয়দ মাহবুবুর রশিদ	৬৭
'ঘোষক' এবং 'প্রথম রাষ্ট্রপতি' সমাচার	আবুল খায়ের	৭১
তারেক রহমানের অভিনব 'রাষ্ট্রপতিতত্ত্ব'	সোহরাব হাসান	৭৫
'জিয়া প্রথম প্রেসিডেন্ট' তত্ত্ব ও নান্টু পাগল	এ কে এম শাহনাওয়াজ	৭৯
জিয়া প্রথম বিশ্বাসঘাতক মুক্তিযোদ্ধা ॥ পরিবারটি অশীলিত ভয়ঙ্কর	মুহাম্মদ শফিকুর রহমান	৮৩
২৬ মার্চ কালুরঘাট ট্রান্সমিটার সেন্টার হতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করি	এম এ হান্নান	৮৮
একটি জাতির জন্ম	মে. জে. জিয়াউর রহমান	৯২
জাতীয় শোক দিবসে নিন্দনীয় জন্মোৎসব এবং আমার কিছু অনুতাপ	হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	১০৩
নিরস্ত্র বাঙালির সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তর	তোফায়েল আহমেদ	১০৭
মুক্তিযুদ্ধের সেন্টার অব গ্রাভিটি	আবুল হাসান চৌধুরী	১১২
স্বাধীনতা ও মুক্তির মশাল হাতে বঙ্গবন্ধু এগিয়ে গিয়েছিলেন	ড. আবু সাইয়িদ	১১৬
বেগম জিয়া ও তারেক রহমানের মিথ্যাচার	মোহাম্মদ শাহজাহান	১২০
মা-সন্তানের ইতিহাস জ্ঞানের বহর	ফকীর আবদুর রাজ্জাক	১২৬
মুক্তিযুদ্ধের 'নূতন' তত্ত্ব	ড. গাজী সালেহ উদ্দিন	১৩১
ইতিহাস দখলের অপচেষ্টা	ড. হারুন-অর-রশিদ	১৩৪

জাতীয়তাবাদীদের অভিনব ইতিহাস তত্ত্ব	মো. মইনুল ইসলাম	১৩৮
ইতিহাসের খলনায়ককে নায়ক বানানোর অপচেষ্টা	মাহমুদুল বাসার	১৪২
লন্ডন ষড়যন্ত্র ও চোরের মায়ের বড় গলা	অজয় দাশগুপ্ত	১৪৭
বিদেশের মাটিতে ষড়যন্ত্র ও সাবধানতা	অজয় দাশগুপ্ত	১৫০
বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা ভাটিয়াপাড়া ওয়্যারলেস স্টেশনে পৌঁছায় ২৬ মার্চ ভোর রাতেই	গোপাল গাঙ্গুলী	১৫৪
বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ধানমণ্ডি থেকে চট্টগ্রাম	জামাল উদ্দিন	১৫৬
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস দখলে বিএনপির অব্যাহত অভিযান	মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী	১৬২
বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে এবং বাবার অনুপ্রেরণায় মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করি	ডা. জিয়াউদ্দীন আহমেদ	১৬৯
জাতির জনকের ঘোষণায় ও আহ্বানে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম	দেবেশ চন্দ্র সান্যাল	১৭৬
স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গে কিছু কথা	অধ্যাপক ডাঃ মোঃ জোবায়ের	১৯১
স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে অবাঞ্ছিত বিতর্ক	ডা. এম সুলতান উল আলম	২১৭
স্বাধীনতার ঘোষণা এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র	ড. এম এ শাহ্ নওয়াজ আলী	২২১
বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ	মাহজাবিন খালেদ এম.পি	২২৬
৭, ১৭ ও ২৬ মার্চ সময়ের প্রয়োজনে	ডা. এস এ মালেক	২৩৪
৭ মার্চের ভাষণ ও স্বাধীনতার ঘোষণা	নুরুর রহমান সেলিম	২৩৮
ইতিহাসের ইতিহাস	মুহাম্মদ জাফর ইকবাল	২৪৪
'১৯৭১ : ভেতরে বাইরে' এক অনৈতিক উপাখ্যান	মেজর জেনারেল এটিএম আব্দুল ওয়াহাব (অব.)	২৫০
'১৯৭১ ॥ ভেতরে বাইরে' এবং কিছু কথা	অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী	২৫৩
এ কে খন্দকারের ১৯৭১ : ভেতরে বাইরে এবং কিছু প্রশ্ন	এম. শাহ আলম	২৬০
ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ স্বাধীনতার আহ্বান	কামরুজ্জামান ননী	২৬৩
বঙ্গবন্ধু 'জয় বাংলা' বলেই ভাষণটি শেষ করেছিলেন	শিবলী নোমান	২৬৬
'১৯৭১ : ভেতরে বাইরে' নিয়ে তিন প্রশ্ন	ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ	২৬৮
মুরুব্বী বৈমানিকের ইতিহাস-অ্যাম্বুশ!	হিলাল ফয়েজী	২৭১
'সব শালা কবি হতে চায়'	মুহাম্মদ শফিকুর রহমান	২৭৫
এ কে খন্দকারের 'ভেতরে বাইরে' কেবল বিভ্রান্তি	শামসুদ্দিন পেয়ারা	২৭৯
তিনি বাঙালির বিজয় দেখেননি, পাকিস্তানের পরাজয় দেখেছেন	সরদার সিরাজুল ইসলাম	২৮৫
বঙ্গবন্ধু নিয়ে কোনো বির্তক নয়	মেজর (অব) সুধীর সাহা	২৮৯
'১৯৭১ : ভেতরে বাইরে' মুক্তিযুদ্ধের আজন্ম শত্রুদের জন্য মোক্ষম অস্ত্র	শাহরিয়ার কবির	২৯২
ইতিহাস নিয়ে মিথ্যাচার	নাসির উদ্দিন সিকদার	২৯৯
ইতিহাস লেখক ও প্রকাশকের দায় প্রসঙ্গ : এ কে খন্দকার ও প্রথমা প্রকাশনী	মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী	৩০২
তারেক রহমান সুস্থ হবেন কবে?	আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী	৩০৬
বঙ্গবন্ধু শক্তির উৎস	প্রফেসর ড. মুহম্মদ মাহবুব আলী	৩১০
রাজনীতির দার্শনিক	অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত	৩১৩
এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে	আবেদ খান	৩১৬
বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা এবং জনৈক খলনায়ক	সুজাত মনসুর	৩২১
বিশ্বাসের দৃঢ়তার অভাব না স্মৃতিলোপ?	মোজাম্মেল খান	৩২৫
বাঙালি জাতি-ইতিহাসে নতুন মতিউর রহমান রেন্টুর সংযোজন	মাসুদা ভাট্টি	৩২৮
স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে বিএনপির কয়েকজন নেতার বক্তব্য	তপন কুমার দে	৩৩২
পোর্ট্রেইট অব এ্যা 'ফ্রিডম ফাইটার'	রাখাল চন্দ্র মিত্র	৩৩৮
মহান মুক্তিযুদ্ধের অমর শহীদ অধ্যাপক ডাঃ শামসুদ্দীন আহমেদ ও কিছু কথা	ডাঃ জিয়াউদ্দীন আহমেদ	৩৪১
যুক্তিকে অবশ্যই যুক্তিসংগত হতে হবে	ওয়াহিদ নবী	৩৪৭
জাতির জনক ও ত্রিশ লাখ মানুষের রক্তের ঋণ	নিতাই চন্দ্র রায়	৩৫০
স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ও কলাকৌশলীদের বক্তব্য	তপন কুমার দে	৩৫৪
যুক্তরাষ্ট্রের গোপন নথি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন শেখ মুজিব	কাগজ ডেস্ক	৩৬৩
জিয়া প্রথম রাষ্ট্রপতি তারেকের মন্তব্যে ব্রিটিশ মন্ত্রীর বিস্ময়	স্টাফ রিপোর্টার	৩৬৫

অবতরণিকা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একটি নাম নয় একটি ইতিহাস, একটি দর্শন। যে মহানায়কের জন্ম না হলে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামের এই স্বাধীন সার্বভৌম দেশের সৃষ্টি কোনদিন হতো না এবং বাঙালিরা একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্বসভায় কোনদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারত না। তিনিই শেখ মুজিবুর রহমান। বঙালিরা তাকে ভালবেসে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধীতে ভূষিত করে ধন্য হয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তি সংগ্রাম হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা নয়। হাজার বছরের বাঙালির ইতিহাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তি সংগ্রাম ছিল দীর্ঘ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার এক সোনালী ফসল। আর এই সোনালী ফসলের রূপকার ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রূপ ও সফল পরিণতি দান করে বাংলার হাজার বৎসরের শ্রেষ্ঠ বাঙালিতে পরিণত হন।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের ভেদনীতির ফলে, উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির হীন চক্রান্তে ১৯৪৭ সালের মধ্য আগস্ট ভারত বিভক্তির দ্বারা পাকিস্তান নামক এক কৃত্রিম রাষ্ট্রের জন্ম হয়। উপমহাদেশের শোষক বেনিয়া শ্রেণীর সাহায্যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির দ্বারা বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করলে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বিধৌত নাদেয় অববাহিকার পূর্ব বাংলা নামের এই শস্য শ্যামল সুন্দর দেশটির উপর পাকিস্তানি উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের জগদ্দল পাথর চোপে বসে। তারপর থেকে শুরু হয় পূর্ব বাংলার উপর পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসকদের নির্মম শাসন ও শোষণের দীর্ঘ ইতিহাস। শোষণ ও শাসনকে চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানি শাসক ও শোষকরা পবিত্র ইসলামের নামে ধোকা দিয়ে এদেশের সরলপ্রাণ সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। তারা বাঙালির মুখের ভাষাকে ধ্বংস করে তাদের উপর উর্দু চাপিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করে। আবহমান বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর শুরু করে পৈশাচিক হামলা। বাংলার ছাত্রজনতা সে হামলা রুখে দাঁড়ায়। তারা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে প্রতিহত করে পাক শাসক ও শোষকদের হীনষড়যন্ত্রকে।

ভাষার দাবিকে কেন্দ্র করে বাংলার বুকে শুরু হয় পাকিস্তানি শাসক ও শোষকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন। এই আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে

বিধাতার আর্শীবাদ হিসেবে এদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে আবির্ভাব হয় বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের। বাঙালি রাজনীতিবিদদের মধ্যে শেখ মুজিই প্রথম বুঝতে পারেন যে, পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসক ও শোষকদের শৃংখল ভেঙে বেরিয়ে এসে বাংলার স্বাধীনতা অর্জন ব্যতীত বাঙালির দীর্ঘ দুইশত বৎসরের পরাধীনতার গ্লানি কোন দিন ঘুচবে না। তিনি প্রথমে ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচী দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে রাজনৈতিকভাবে সংহত করে আন্দোলনের পর আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই ৬ দফা দাবির ভিত্তিতেই সৃষ্টি হয় ১৯৬৯ সালের ছাত্র-গণআন্দোলন। যার ফলে বিদায়ঘন্টা বেজে উঠে জেনারেল আইয়ুবের। আইয়ুবের বিদায়ের পর পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করে জঙ্গী জেনারেল ইয়াহিয়া। তার শাসনামলেই ১৯৭০ সালের হিসেম্বর মাসে সারা পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বাংলার আপামর সাধারণ মানুষ ৬ দফা দাবির ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ব্যাপক রায় দেয়।

বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বিজয়ী আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা নিয়ে পাকিস্তানি সামরিক শাসকরা গড়িমসি শুরু করে। এ গড়িমড়ি দেখে শেখ মুজিব টের পান পাকিস্তানিদের কুমতলব। তিনি ডাক দেন ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের প্রথম থেকেই অসহযোগ আন্দোলনের। অসহযোগ আন্দোলনের এক পর্যায়ে ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসমূদ্রে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ভাষণে সমবেত মুক্তিপাগল জনতাকে লক্ষ্য করে বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন : "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" যার যা আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়। ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তুল। এই ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা।

৭ মার্চ (১৯৭১) তিনি পাকিস্তানি সামরিক শাসক ও শোষকগোষ্ঠীর শাসন ও শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করে স্বাধীন বাংলাদেশ অজর্নের জন্য "যার যা আছে তাই নিয়ে" যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, পাকিস্তানি সেনাদল যে কোন দিন বাংলার মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে তা হলে মুক্তিযুদ্ধ সশস্ত্র আকার ধারণ করবে। তখন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলা করতে হবে। তাদের রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হবে। তাই বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে একথাও বলেছিলেন, "আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে পারবো"। অর্থাৎ বাংলাদেশে অবস্থানকারী পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর যাবতীয় রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে তাদেরকে বেকায়দায় ফেলতে হবে। হয়েছিলও তাই। বাংলার মানুষ পাকিস্তানি সেনাদের ক্যান্টনমেন্টগুলিতে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিল। তাদের খাদ্য সরবরাহ পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করলে সুদূর রাওয়ালপিন্ডি ও লাহোর থেকে বিমানযোগে খাদ্য সরবরাহ করা হয়। এতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে,

দখলদার সৈন্যদের রসদ সরবরাহ বন্ধের নির্দেশ দিয়ে বঙ্গবন্ধু একটি সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত হবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে সর্বাত্মক অসহযোগের ডাক দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন "অফিস, আদালত, বন্ধ করে দিতে হবে। তবে আমার গরীবের যাতে কষ্ট না হয় সেজন্য রিকসা চলবে, ঠেলাগাড়ী চলবে, যানবাহন চলবে।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সর্বাত্মক অসগহযোগ আন্দোলন শুরু হলে বাংলাদেশে পাকিস্তানি শাসনযন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে। এমন কি বেতার ও টেলিভিশনের কর্মচারীরাও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেন। সর্বাত্মক অসহযোগ শুরু হলে বাংলাদেশে পাকিস্তানি প্রশাসন অচল হয়ে পড়ে। সবাই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চলছে ইসলামাবাদের নির্দেশের প্রতি কেউ তোয়াক্কা করছে না। পরিস্থিতি সঙ্গীন হয়ে উঠলে পাকিস্তানি সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান আলাপ-আলোচনার জন্য ঢাকায় আসে। ভুট্টোও এসে আলোচনায় শরীক হয়। তারা বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে বঙ্গবন্ধু দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন : "আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমি আমার জনগণকে মুক্ত করতে চাই।" বঙ্গবন্ধু ইয়পাহিয়া খানকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, জনগণের ম্যান্ডেট ৬ দফার একটি দাঁড়ি, কমাও বাদ দেয়া চলবে না। বাঙালির মুক্তিসনদ ৬ দফার প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর অনড় মনোভাব দেখে ইয়াহিয়া-ভুট্টেচক্র বাঙালিদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে গণহত্যার পরিকল্পনা করে। গণহত্যা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ সকল আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বন্দী করার নির্দেশ দিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় গোপনে বিমানযোগে ঢাকা ত্যাগ করে।

২৫ মার্চ রাত বারটার পর অর্থাৎ ২৬ মার্চ গভীর রাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বাংলার বুকে গণহত্যা শুরু করে। পাকবাহিনীর গণহত্যা শুরু করা মাত্রই বঙ্গবন্ধু তার ধানমন্ডি ৩২ নং রোডের বাসভবন থেকে ওয়্যারলেসযোগে স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা বাণী প্রচার করেন। স্বাধীনতার ঘোষণা বাণীতে বঙ্গবন্ধু যে সব কথা বলেছিলেন তা আজ বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। স্বাধীনতার ঘোষণায় তিনি দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীকে বাংলাদেশের মাটি থেকে চিরতরে উৎখাত এবং স্বাধীনতার সুরক্ষার জন্য সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে জনগণসহ বাঙালি সৈনিক, ই.পি.আর, পুলিশ, আনসার প্রভৃতি দেশপ্রেমিক বাহিনীসমূহ ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের প্রতি নির্দেশ দেন।

ওয়্যারলেসযোগে স্বাধীনতার এ চূড়ান্ত ঘোষণা বাণীটি ২৫ মার্চ দিবাগত রাত ১২টার পর প্রেরিত হয় বলে ইংরেজি ক্যালেন্ডার মতে ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে।

স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণাবাণী ওয়্যারলেসযোগে প্রচারের অল্প কিছু সময় পর পাকিস্তানি সৈন্যদের একটি কমান্ডো বাহিনী গভীর রাতে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় এবং পরের দিন পশ্চিম

পাকিস্তান নিয়ে দীর্ঘ নয়মাস বন্দী করে রাখে। আওয়ামী লীগ, যুব লীগ, ছাত্র লীগ ও শ্রমিক লীগের সকল নেতা কর্মীরা ২৫ মার্চ দিনগত রাতে আত্মগোপন করে।

২৬ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব এম.এ.হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি পুনঃ প্রচার করেন। পরদিন ২৭ মার্চ চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে কয়েকজন বেতার কর্মীর সাহায্যে মেজর জিয়া বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পুনঃ প্রচার করেন। মেজর জিয়া প্রথমে বাংলায় পরে ইংরেজিতে বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতার ঘোষণা বেতারে প্রচার করেন। এবাবেই ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকার কথা আজ বিশেষভাবে স্মরণ করতেই হবে।

আওয়ামী লীগ নেতারা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করতে ও পরিচালনার জন্য ১৯৭৮১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে সমবেত হয়ে ৭০-এর নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমর্থনে গঠিত সরকারের সদস্যদের আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেন। এই প্রবাসী অস্থায়ী সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম অনুসারে মুজিবনগর সরকার নাম করা হয়। বঙ্গবন্ধু অনুপস্থিতিতে তাঁকে প্রবাসী সরকারের রাষ্ট্রপতি করা হয়। এই সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তারা ছিলেন–উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, অর্থমন্ত্রী এম মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী আবু হেনা মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ, প্রধান সেনাপতি কর্নেল এম.এ.জি ওসমানী, চীফ অব স্টাফ কর্নেল আবদুর রব, বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার কমান্ডার এ.কে খন্দকার।

এভাবেই সেদিন প্রথম স্বাধীন বাংলা সরকার গঠন করে এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠ ও অনুমোদন করে। অতঃপর মুজিবনগর সরকার ৭১-এর নয়মাস পাকিস্তানি হানাদার সেনাদের বাংলার মাটি থেকে চিরতরে উৎখাতের জন্য সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রপ্রধাপন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে তাঁর নামে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও বিপ্লবী নিষ্ঠা ও অপূর্ব প্রজ্ঞার সাথে বাংলাদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় করেন। ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়া সহ মিত্রদেশগুলি মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ সাহায্য দান করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধকে চূড়ান্তভাবে সফল করার জন্য মুজিবনগর সরকার যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন এবং যে অপূর্ব রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে তা সোনালী অক্ষরে লেখা থাকবে। সেই সঙ্গে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবিস্মরণীয় অবদান ও আত্মত্যাগের কথা বিশ্ব ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এখানে আরো স্মরণ করতে হবে যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামেই ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। তার নামের যাদুকরী প্রভাব মুক্তিযুদ্ধকে অজেয় করে তুলেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম অবচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের সময় থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট-এর মধ্যরাতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার সময়ের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস এবং আনুষঙ্গিক বিভিন্ন প্রক্রিয়া নিয়ে কোন দিন কোন প্রশ্ন উঠেনি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে এ নিয়ে পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়। বিতর্কের পেছনে মূল কারসাজি করতে থাকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারীরা, কিন্তু এই কাজে তারা সামনে রাখে মুক্তিযোদ্ধা নামধারী কিছু ব্যক্তিদেরকেই। প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরাই তার বিশাল ব্যক্তিত্ব ও সাংগঠনিক দক্ষতার প্রতি ছিল হিংসাপরায়ণ এবং তাঁর প্রতিভার কাছে ছিল পরাজিত। সেই সব ব্যক্তিই আড়াল থেকে ৭১-এর পরাজিত শক্তির সাহায্যে এই সময় কলকাঠি নাড়তে থাকে।

খন্দকার মোশতাক আহমদ এই রকম একজন অভিশপ্ত ব্যক্তি যিনি নিজে প্রথম থেকে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। কিন্তু ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব ৬ দফা ঘোষণা করলে তিনি তা মেনে নিতে অস্বীকার করে মূল আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে আওয়ামী লীগ [পি.জি.এম] নামে একটি নতুন উপদল গঠন করে দীর্ঘদিন তার নেতৃত্ব দেন। কিন্তু মোশতাক ১৯৭০ সালে টের পান যে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হতে যাচ্ছে এবং তাড়াতাড়ি তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে পুনরায় আবার আওয়ামী লীগে ফিরে আসেন। আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে নেতৃত্বের লড়াইয়ে পরাজিত খন্দকার মোশতাক এবাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কাছে হেরে গেলেও ভিতরে ভিতরে তিনি সব সময়ই তার অপতৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়ও তিনি পাকিস্তান ও আমেরিকার সাথে এক গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন বাংলাদেশের মুকিযুদ্ধকে বানচাল করার জন্য। এই গোপন ষড়যন্ত্র ধরা পড়ার পর খন্দকার মোশতাক অস্থায়ী মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদ হারান। কিন্তু তিন হেরে যাবার পাত্র ছিলেন না, তাই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করেন এবং সুযোগমত বঙ্গবন্ধুকে গোটা পরিবারসহ নির্মমভাবে হত্যা করে এই ঘৃণ্য লোকটি তাঁর দীর্ঘদিনের লালিত ঈর্ষার প্রতিশোধ নেয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালের পরেও বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে খন্দকার মোশতাকের কোন ভাবমূর্তি গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় লাভ করেও ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর মুক্তিযোদ্ধারা পরাজিত হয় রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিকভাবে। কি অবাক কান্ড যে, এই পরাজয়কে সম্ভব করে তোলা হয় মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারাই। মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তিরা সফল এইভাবে যে, তারা মুক্তিযোদ্ধাদের বিভক্ত করতে সমর্থ হয়। স্বাধীনতার পার আওয়ামী লীগ শাসনামলে চড়ম স্বেচ্ছাচারিতা ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং একদল মুক্তিযোদ্ধার প্রতি তৎকালীন সরকার চরম অবহেলা প্রদর্শন করেছিল, শুধু তাই নয়, এক দল মুক্তিযোদ্ধা মনে করেছিল তারাই সব, মুক্তিযুদ্ধ

তারা একাই করেছিল এবং ভোগ করবে তারা শুধু একাই। তাই ১৯৭২ সালের পরেই মুক্তিযোদ্ধারা কার্যতঃ বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে সময়ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত হয়নি। বঙ্গবন্ধুর প্রতি চরম ক্ষোভ ও অভিমান থাকলেও দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা, স্বাধীনতার ডাক, প্রস্তুতি নেয়া ও চেতনার বিকাশে তাঁর ভূমিকার কথা ছিল প্রশ্নাতীত। এই সময়ই আওয়ামী লীগের অতি উৎসাহী একদল এবং একনেতা একদেশ-বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ, শ্লোগানধারী চাটুকারীর দল খন্দকার মোশতাক, শাহ মোয়াজ্জেম, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর প্রমুখরা মিলে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সবাইকে অবাক করে দিয়ে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে নির্মমবাবে হত্যা করে বসে। অথচ আওয়ামী লীগ আমলে বঙ্গবন্ধুর নামে এরাই সরাদেশে অত্যাচার ও নির্যাতনের স্টিমরোলার চালিয়ে দেশকে জাহান্নাম বানিয়ে ছেড়েছিল। একমাত্র শাহ মোয়াজ্জেম তার নিজ এলাকায় নিজস্ব বাহিনী দিয়ে যে নির্যাতন নিপীড়ন চালায় তাতে সারা বিক্রমপুর এলাকায় দ্রুত বিরোধীদল বিস্তার লাভ করে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর এই শাহ মোয়াজ্জেমই আওয়ামী লীগের সমালোচনা করে আওয়ামী বিরোধী 'বীর' হবার চেষ্টা করে।

বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর ক্ষমতা দখল করে মোশতাক-মোয়াজ্জেম চক্র। কিন্তু তারা বেশীদিন থাকতে পারেনি ক্ষমতায়। তাদের হঠিয়ে ক্ষমতায় আসেন মেজর জিয়া ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর। মেজর জিয়া ক্ষমতা দখল করেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করার এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে মুছে ফেলে জাতিকে ভিন্ন পথে পরিচালনার অপচেষ্টা চালায়। যে নেতার জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হত না, সেই মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম কায়েমী স্বার্থবাদীরা মুছে ফেলার চেষ্টা চালায়। মক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে বাংলার মানুষের আড়ালে রাকার অপচেষ্টা চালায়। পাশাপাশি স্বাধীনতার শত্রু ৭১-এর পরাজিত শক্তি রাজাকার আলবদরদের ক্ষমতার ভাগ দিয়ে দেশে পাকিস্তানি চিন্তা-চেতনার দিকে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালায়। ত্রিশ লাখ শহীদের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত বিজয়ের ফসল যাতে বাঙালির ঘরে তুলতে না পারে সেজন্য চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কোন অন্ত নেই। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যার পর পরই সংবিধান পরিবর্তন করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে গৃহীত ১৯৭২ সালের সংবিধানের রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতিকে কলমের এক খোঁচায় বাতিল করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুছে ফেলার লক্ষ্যে ইতিহাস বিকৃত করার পাশাপাশি রাজাকার আলবদরদের পুনর্বাসন করা হয়। এতে ৭১-এর পরাজিত ও স্বাধীনতার শত্রু রাজাকার-আলবদররা আবার আসমানের চাঁদ হাতে পেয়ে যায়।

৭১-এর পরাজিত শক্তি ও স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার আলবদরদের পুনর্বাসন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ইতিহাসে বিকৃত করার ক্ষেত্রে মেজর জিয়ার অবদান সবচেয়ে বেশি। তিনি ক্ষমতা দখলের পর ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসে শাহ আজিজুর রহমানকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। এই সেই

আজিজুর রহমান যিনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন। সেই সময় তিনি পাকিস্তানের প্রতিনিধি হয়ে জাতিসংঘে যান এবং পাকিস্তানের পক্ষে ওকালতি করেন। জাতিসংঘের বিভিন্ন ফোরামে বলেন ঃ পাকিস্তানি সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানে হামলা চালিয়ে অন্যায় কিছু করেনি। মুক্তিযুদ্ধের বা স্বাধীনতা সংগ্রামের নামে সেখানে যা চলছে, তা হলো ভারতের মদদপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের উচিত সেটাকে পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার হিসেবে গ্রহণ করা। শাহ আজিজ ছাড়াও মেজর জিয়ার মন্ত্রিসভায় আরো বেশ কয়েকজন রাজাকার ও আলবদর ছিলেন। জিয়ার মন্ত্রী সভার অন্যান্য রাজাকার-আলবদরা হলেন–মশিউর রহমান যাদু মিয়া, মির্জা গোলাম হাফিজ, শামসুল হুদা চৌধুরী, শফিউল আযম, আব্দুল আলিম ও আবদুর রহমান বিশ্বাস। জিয়ার মন্ত্রীসভায় প্রভাবশালী ও সিনিয়র মন্ত্রী ছিলেন মশিউর রহমান যাদু মিয়া। এই মশিউর রহমান যাদু মিয়া মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকারের ঠিকাদারি করে মোটা অংকের টাকা রোজগার করেছেন। তার দায়িত্ব ছিঃল চট্টগ্রাম বন্দর থেকে জাহাজের সিমেন্ট নামানো ও তা দেশের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দেয়া। এসব সিমেন্ট আসতো চীন থেকে। পাকিস্তানের পক্ষে দালালি করার অপরাধে মশিউর রহমান যাদু মিয়া স্বাধীনতার পরে জেলে বন্দী থাকেন।

শামসুল হুদা চৌধুরী ছিলেন ১৯৭১ সালে পাকিস্তানে বেতারের একজন প্রযোজক। সে সময় তিনি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে পাকিস্তান বেতার থেকে বহু অনুষ্ঠান প্রচার করেন। মির্জা গোলাম হাফিজ সে সময়ে ছিলেন পাকিস্তান-চীন-মৈত্রী সমিতির সভাপতি। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তিনি স্বাধীনতা বিরোধী প্রচার চালাতেন। এ সম্পর্কে তিনি বিকৃতিও দিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছেন বাংলাদেশের এই তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধা একটি ভারতীয় ষড়যন্ত্র।

আব্দুল আলিম ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিদের পক্ষে দালালী করেন। এ অপরাধে তিনি স্বাধীনতার পর গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যান। পরবর্তীতে বিচারে তার শাস্তি হয়। আবদুর রহমান বিশ্বাস শান্তি কমিটির কর্মকর্তা ছিলেন।

মেজর জিয়ার অপর অবদান হচ্ছে তাঁর শাসনামলে একাত্তরের বড় দালাল গোলাম আযমকে দেশে আনা। ১৯৭৮ সালের ১১ জুলাই গোলাম আযম পাকিস্তানের পাসপোর্ট নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন। জিয়া-চক্র তাঁর জন্য তিন মাসের ভিসা মঞ্জুর করেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে গোলাম আযম একটি কলংকিত নাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি শুধু যে পাকিস্তানি সেনাদের সহযোগিতা করেন তা নয়- স্বাধীনতা প্রাককালে ঢাকায় যেসব বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয় তাদের নামের তালিকা নাকি গোলাম আযম তৈরি করে দেন। স্বাধীনতার কয়েক দিন আগে তিনি পাকিস্তানের সেনাদের সাথে পালিয়ে পাকিস্তান যান। মুজিব সরকার তাঁর কৃত দালালীর জন্য তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করেন। কিন্তু মেজর জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশের পালে সাম্প্রদায়িকতার হাওয়া লাগলে তিনি আবার দেশে ফিরে আসেন! তাঁর ভিসা ছিল মাত্র তিন মাসের। কিন্তু তাঁর মেয়াদ

শেষ হলেও জিয়া সরকার তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বরং বহু দিন আড়ালে থেকে তিনি তাঁর দল জামাত-ই-ইসলামির কাজ চালিয়ে যান। একসময় জামাত-ই ইসলাম তাকে দলের আমীর ঘোষণা করে। সম্প্রতি গোলাম আযম হাইকোর্টের মামলার রায়ে তাঁর হারানো বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ফিরে পান। পরবর্তীতে স্বাধীনতা বিরোধী হিসেবে বিচারে আজীবন শাস্তি হয়।

মেজর জিয়া শুধু পাকিস্তানী দালালদের মন্ত্রী সভায় স্থান দেয়া এবং তাদের পুনর্বাসন করেই ক্ষান্ত হয়নি, তিনি ক্রমশ: পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দাবি ছিল, অখন্ড পাকিস্তানের টাকা পয়সা ও অন্যান্য সম্পত্তির অর্ধেক প্রাপ্য বাংলাদেশের। পাকিস্তানকে সে সব টাকা পয়সা ধনসম্পত্তি বাংলাদেশকে ফেরত দিকে হবে। জিয়া সাহেব কিন্তু তার ঠিক উল্টো কাজ করেন। বাংদেশে পাকিস্তানিদের যে সব সম্পত্তি জাতীয়করণ করা হয়েছিল, তিনি সেগুলি ফিরিয়ে দিলেন কিংবা সেজন্য দিলেন উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ। কিন্তু পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের পাওনার কথা মেজর জিয়া মুখ ফুটে একবারও বলেননি। বরং ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরে মেজর জিয়া যান পাকিস্তান সফরে। সে সময় পাকিস্তানের পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ হয় : প্রেসিডেন্ট জিয়া পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে নিয়ে একটি কনফেডারেশন' গঠনে আগ্রহী। সংযুক্ত পাকিস্তান গঠনের কথা তখন থেকে আবার নতুন কবরে বাজারে চালু হয়।

১৯৭৯ সালের ১২ জানুয়ারি পাকিস্তানের যোগাযোগ মন্ত্রী ফিদা মহম্মদ খান পেশোয়ারের এক জনসভায় বলেন : বাংলাদেশে আগামী সাধারণ নির্বাচনে জয় লাভের জন্য মুসলিম লীগ যথেষ্ট শক্তিশালী। এখানে মুসলিম লীগ যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকার গঠন করতে পারে, তাহলে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে তার পুনর্মিলনের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এ ধরনের দিবাস্বপ্ন দেখেছিলেন পাকিস্তানের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এয়ার মার্শাল আজগর খান। তিনি তাঁর দলের নির্বাচনী ইস্তেহারে বলেন, 'তাঁর দল বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের কনফেডারেশন গঠন করতে চায়। পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলি ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৮ তারিখের সংখ্যায় তা ফলাও করে প্রকাশ করে।

মেজর জিয়ার আমলে বেশ কয়েকটি বিষয়ে দেশপ্রেমিক বাঙালির মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।যার জন্য সে সব প্রচেষ্টা কোনটাই মেজর জিয়া সফল করতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় জাতীয় পতাকার কথা। ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। কিন্তু বাংলার মানুষের প্রতিবাদে মেজর জিয়া তাঁর পতাকা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত বাতিল করেন। অনুরূপভাবে জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তনের উদ্যোগ গহণ করেও জিয়া ব্যর্থ হন জনগণের চাপে।

জিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী ম্যাডাম খালেদা ও তাঁর সমর্থকরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে নানাভাবে বিকৃত করার চেষ্টা করছে। তাঁরা শুধু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাঁরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকেও ধ্বংস করার অপচেষ্টা চালায়।

১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর ক্ষমতা লাভ করে মেজর জিয়ার বিধবা পত্নী ম্যাডাম খালেদার সরকার বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন কৃর্তৃক "বঙ্গবন্ধু" শব্দটি ব্যবহার না করার জন্য এক গোপন নির্দেশ জারী করে। একমাত্র বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনার বক্তৃতা ও বিবৃতিতে "বঙ্গবন্ধু" শব্দটি উল্লেখ থাকলে তা বাদ দেয়া যাবে না বলে এই নির্দেশে বলা হয়। ঢাকার সংবাদপত্রে এই গোপন নিদের্শের খরব প্রকাশিত হয়। জিয়ার পত্নী ম্যাডাম খালেদার সরকার 'জয় বাংলা' স্লোগানটিও বাংলাদেশের বেতার টেলিভিশনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এই 'জয় বাংলা' শ্লোগান ছিল মুক্তিযুদ্ধের অমোঘ মন্ত্র। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসে বেতার ও টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়নি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম ও মৃত্যু দিবসে কোন বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়নি। অপরদিকে চট্টগ্রাম বেতার থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার বাণী পাঠকারী একাধিক ব্যক্তির মধ্যে শুধুমাত্র একজন পাঠকারীর জন্মদিনে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে।

২০০১ সালের নির্বাচনের পর ক্ষমতায় আসার পর খালেদা জিয়া স্বাধীনতা বিরোধী মতিউর রহমান নিজামী ও অলি আহসান মুজাহিদকে মন্ত্রী করেন এবং নিজের উপদেষ্ঠা করেন আরেক স্বাধীনতা বিরোধী সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে। এ তিনজনেরই স্বাধীনতা বিরোধী হিসেবে বিচারে মৃত্যুদণ্ড শাস্তি হয়।

শুধু মাত্র বেতার ও টেলিভিশন থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম বাদ দেয়নি, তাঁরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালায়। জিয়ার উত্তরসুরীরা বা তাঁর সমর্থকরা জিয়াকে "স্থপতি" হিসেবে গ্রহণযোগ্য করার উদ্দেশ্যে তাকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে স্বীকৃতি লাভের জন্য মিথ্যা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে।

১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনের কিছুদিন আগ পর্যন্ত বি.এন.পির কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণার তারিখ ২৭ মার্চ বলে উল্লেখ করা হয়। জাতির প্রতি প্রদত্ত নির্বাচণী ভাষণে মেজর জিয়ার বিধবা পত্নী ম্যাডাম জিয়া তাঁর স্বামী কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার তারিখ একদিন এগিয়ে ২৬ মার্চ বলে উল্লেখ করেন। এই ডাহা মিথ্যাকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য নির্বাচনের সময় মেজর জিয়ার সমর্থকরা বিভিন্ন প্রচারপত্রে জিয়া কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার তারিখ ২৭ মার্চের পরিবর্তে ২৬ মার্চ উল্লেখ করা হয়। মেজর জিয়ার বিধবা পত্নী ম্যাডাম জিয়া প্রধানমন্ত্রী হবার পর সরকারি প্রচার দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত তার জবানীতে বলা হয়, মেজর জিয়া সর্বপ্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

মেজর জিয়া নিজে ২৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী পাঠ করা সত্ত্বেও ক্ষমতা দখল করার পর বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত অব্যাহত রাখে। এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে ২৭ মার্চের আগেই আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল। মেজর জিয়া তাঁর জীবিতকালে কোন সময় ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে বলে দাবী করেনি।

স্বাধীনতা লাভের প্রায় ২০ বৎসর পর জিয়া কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার তারিখ পরিবর্তনের কেন প্রয়োজন হলো এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। ২৭ মার্চ যদি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। সে প্রশ্নের উত্তর দেয়া মেজর জিয়ার সমর্থকদের পক্ষে সম্ভব নয়, এই বিব্রতকর প্রশ্ন এড়ানোর জন্যই জিয়া কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার তারিখ বদলানোর পদক্ষেপের প্রয়োজন হয়। স্বাধীনতার ঘোষক হিসাবে মেজর জিয়াকে জাতির জনক বলে জিয়ার সমর্থকদের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত কোন দাবি করা হয়নি, সে প্রশ্ন মানুষের মনে জাগতে পারে। জিয়ার সমর্থকরা সম্ভবতঃ ধীরে চলার নীতি গ্রহণ করেছে। মেজর জিয়াকে স্বাধীনতার সর্বপ্রথম ঘোষক বলে স্বীকার করা হলে, তাকে জাতির জনক বলে ঘোষণা করা সম্ভব হবে বলে জিয়াভক্তরা আশা করে।

এ চিন্তা থেকেই তারেক জিয়াসহ বিএনপির নেতারা জিয়াকে প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসাবে প্রচার চালাতে শুরু করেন। তার সাথে যুক্ত হয়েছে এ.কে খন্দকারের ৭ মার্চ সম্বন্ধে বক্তব্য।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত দেশী-বিদেশী শক্তির সহযোগিতায় বিশেষ একটি মহল দীর্ঘদিন ধরে স্বধীনতার ইতিহাসকে বিকৃত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা বঙ্গবন্ধুর পরিবর্তে মেজর জিয়াকে স্বাধীনতার ঘোষক এবং প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধরনের মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করে চলছে। এই বিভ্রান্ত থেকে মুক্তির জন্য এই গ্রন্থে বিভিন্ন বইপত্র ও পত্রপত্রিকা থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে তথ্যাদি পরিবেশন করে পাঠকদের উদ্দেশে উপস্থাপন করা হলো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও মুক্ত মন মানসিকতা নিয়ে এই গ্রন্থখানি যারা পাঠ করেবেন তারা বুঝতে পারবেন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক এবং প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মেজর জিয়া নন। মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক সত্যকে যেভাবে বিকৃত করার চেষ্টা করা হচ্ছে সে চেষ্টাকে প্রতিহত করা আমার নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করি এবং সেই দায়িত্ববোধ নিয়েই এই গ্রন্থটি সম্পাদনা ও প্রকাশ করার উদ্যেগ গ্রহণ করি। এই গ্রন্থে বিভিন্ন তথ্যাদি তুলে ধরার মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক এবং প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অন্য কেহ নন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যিনি যাই করেছেন-তিনি তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব মেনেই করেছেন। যার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সবাই বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার ঘোষক এবং প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে মেনে নেন এবং অন্য কোন নেতা বা মুক্তিযোদ্ধা নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে মেনে নেন এবং অন্য কোন নেতা বা মুক্তিযোদ্ধা নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে দাবি করেনি। মেজর জিয়াও জীবিতকালে কোনদিন কোন বক্তব্যে নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক এবং প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসাবে দাবি করেননি। অপরদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বক্তব্যে নিজের স্বাধীনতা

ঘোষণার কথা বলেন। বঙ্গবন্ধু নিজেই শুধু তাঁর স্বাধীনতার ঘোষণার কথা বলেনি, সেদিন তাঁর ও বাংলার মানুষের শত্রু জেনারেল ইয়াহিয়া, ভুট্টো ও সিদ্দিক শালিক সহ বহু পাকিস্তানি নেতারাও বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার ঘোষক এবং প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করেন। বিদেশী আরো বহু রাজনীতিবিদ তাদের বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুকেই বাংলার স্বাধীনতার ঘোষক হিসাবে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের রাজনীাতিবিদদের মধ্যে যারা বঙ্গবন্ধুকে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরোধিতা করেছেন তাদের মধ্যেও অনেকেই বিভিন্ন সময় বক্তব্য ও বিকৃতিতে বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার ঘোষক এবং প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বহু বিচিত্র রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং জিয়ার মন্ত্রী সভার সিনিয়র সদস্য ও বি.এন.পি'র প্রভাবশালী নেতা জনাব মশিউর রহমান যাদু মিয়া বঙ্গবনন্ধুকে স্বাধীনতার ঘোষক উল্লেখ করে বক্তব্যে বিকৃতি দিয়েছেন। বাংলাদেশের রাজনীতির জগতের আরেক বিচিত্র রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ও দল বদলের ওস্তাদ ব্যারিষ্টার মওদুদ ও শাহজাহান সিরাজ বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা সম্পর্কে যা বলেন তার কিছু অংশ এই গ্রন্থে তুলে ধরা হলো। সেই সাথে তুলে ধরা হয়েছে এই গ্রন্থে বাংলাদেশের খ্যাতিমান লেখকদের বক্তব্য। তারা স্বাধীনতার ঘোষক বঙ্গবন্ধুকে কিভাবে উপস্থাপন করেছেন তাদের গ্রন্থে। এই গ্রন্থটি স্বাধীনতার ঘোষক সম্পর্কে সঠিক তথ্য বাংলাদেশের স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের কাছে ভবিষ্যতে তুলে ধরতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। আমার গ্রন্থটি পাঠ করে পাঠক সমাজ কিছু উপকৃত হন তবেই আমার কষ্ট ও শ্রম সার্থক হবে।

এই গ্রন্থটি রচনার জন্য উৎসাহ উদ্দীপনা ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন শহীদ ডা. সামসুদ্দিন আহমেদ এর পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা বিশিষ্ঠ চিকিৎসাবিদ অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ। আরো বিভিন্ন ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন শান্তনু জোবায়ের ও সুকান্ত জোবায়ের। তাদের নিকট অবশ্যই ঋণী। গ্রন্থটি প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করায় জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ এর কর্ণধার কমল কান্তি দাসের নিকট ঋণ স্বীকার না করে পারছি না।

অধ্যাপক ডাঃ মোহাম্মদ জোবায়ের
তপন কুমার দে
২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৬, ঢাকা।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেমব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এ দেশের মানুষ অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল'জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালের ৬-দফা আন্দোলনে ৭ জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন- গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাঁকে অনুরোধ করলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা এসেমব্লিতে বসবো। আমি বললাম এসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করবো-এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায় কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম-আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে

শাসনতন্ত্র তৈরি করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেমব্লি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেয়া হবে, যদি কেউ এসেমব্লিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেমব্লি চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে এসেমব্লি বন্ধ করে দেয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম থেকে এখানো আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করার পর এ দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কল-কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপনার ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কি পেলাম আমরা? আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে-তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু-আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরিবের উপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি কিসের রাউন্ড টেবিল, কার সঙ্গে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসবো? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘন্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

ভায়েরা আমার, ২৫ তারিখে এসেমব্লি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঐ শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেমব্লি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন 'মার্শল ল' withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখাবো, আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেমব্লিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতার কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুরগাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে-শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জর্জকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা কোনকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়-তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছুই-আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই ৭ দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো-কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়-হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অ-বাঙালি যারা আছেন তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশনে আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনে-পত্র নিতে পারে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম, আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বিদেশের সাথে দেয়া-নেয়া চলবে না।

কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে সুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল। এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা!

স্বাধীনতার ঘোষণা

"পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতে পিলখানার ইপিআর ঘাঁটি রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের লোকদের হত্যা করেছে। ঢাকা চট্টগ্রামের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ, দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান, কোনো আপোস নাই জয় আমাদের হবেই। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা, কর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাপ্রিয় লোকদের এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।"

শেখ মুজিবুর রহমান
২৫ মার্চ, ১৯৭১

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

মুজিবনগর
১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১

যেহেতু, সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বচনের জন্য ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭০ হতে ১৭ই জানুয়ারি, ১৯৭১ অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল,

এবং

যেহেতু, এই সমস্ত নির্বাচনে ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে বাংলাদেশের জনসাধারণ আওয়ামী লীগের ১৬৭ জনকে নির্বাচিত করেছিল,

এবং

যেহেতু, সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান এই সকল গণপ্রতিনিধিকে ৩রা মার্চ, ১৯৭১ মিলিত হওয়ার জন্য আহ্বান করেছিল,

এবং

যেহেতু, উক্ত আহূত সভা, অনিয়মতান্ত্রিক ও বেআইনিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য-স্থগিত রাখা হয়েছিল,

এবং

যেহেতু, বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিগণের সাথে আলোচনারত থাকাকালে পাকিস্তানের কর্মকর্তাগণ তাঁদের প্রতিজ্ঞা পূরণের পরিবর্তে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক অন্যায় যুদ্ধ ঘোষণা করে

এবং

যেহেতু, উপরোক্ত বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্যান্য অনুরূপ ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে, বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনতার অবিসংবাদী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলার মানুষের ন্যায়গত স্বাধিকারের জন্য ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ, বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

এবং

যেহেতু, পাকিস্তানি বর্বরেরা, বাংলার নিরীহ জনসাধারণকে নির্বিচারে হত্যা এবং তাদের উপর অমানবিক ও নৃশংস অত্যাচার করেছে এবং এখনও করছে

এবং

যেহেতু, পাকিস্তান সরকার বাঙালিদের বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধ, গণহত্যা ও অন্যান্য দমনমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ফলে, বাংলাদেশের নির্বাচিত বর্তমান প্রতিনিধিগণ মিলিত হয়ে একটি সংবিধান প্রণয়ন ও সরকার গঠনে অপরাগ,

এবং

যেহেতু, বাংলাদেশের বীর সন্তানগণ তাদের সাহস ও বীরত্ব ও বিপ্লবী চেতনার মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে,

আমরা, যারা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশের জনগণ আমাদের উপর যে গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করেছে তাদের ইচ্ছার প্রতিফলনে আমরা একটি গণপরিষদ গঠন করলাম, এবং আলাপ-অলোচনার মাধ্যমে এবং বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে সাম্য, মর্যদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তার জন্য, বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী এবং বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঘোষিত স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি ঘোষণা করছি এবং যে পর্যন্ত না একটি সংবিধান প্রণয়ন করা হয় সে পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রেসিডেন্ট এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকবেন,

এবং

প্রেসিডেন্ট, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বধিনায়ক থাকবেন এবং তিনি রাষ্ট্রের সমুদয় নির্বাহী ও রাষ্ট্রীয় অন্যান্য ক্ষমতাসহ ক্ষমা প্রদানের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন,

তিনি প্রধানমন্ত্রী ও প্রয়োজনবোধে অন্যান্য মন্ত্রীকেও নিয়োগ করতে পারবেন। তিনি কর ধার্য ও রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয় করতে পারবেন, তিনি গণপরিষদ আহ্বান ও মুলতবি ঘোষণা করতে পারবেন,

বাংলাদেশের জনগণের জন্য একটি সুন্দর ও সুষ্ঠু সরকার গঠনের প্রয়োজনে তিনি যে কোন কাজ করতে পারবেন।

আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আরো ঘোষণা করছি যে, প্রেসিডেন্টের অবর্তমানে তথা প্রেসিডেন্ট যখন তাঁহার দায়িত্ব গ্রহণে অপারগ অথবা দায়িত্ব পালনে সক্ষম নন, সেক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের সমুদয় দায়-দায়িত্ব ভাইস প্রেসিডেন্ট পালন করবেন।

আমরা আরো ঘোষণা করছি যে, জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতি আমাদের যে দায়-দায়িত্ব তা পালন করব।

আমরা আরো ঘোষণা করছি যে, স্বাধীনতার এই ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হতে কার্যকর হবে। আমরা আরো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য আমরা অধ্যাপক এম ইউসুফ আলীকে যথাযথভাবে রাষ্ট্রপ্রধান ও উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য দায়িত্ব অর্পণ ও নিযুক্ত করলাম।

প্রফেসর এম ইউসুফ আলী
এম এন এ

তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণ

বাংলাদেশবাসীর উদ্দেশ্যে : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদের বেতার ভাষণ

(স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে প্রচারিত)

স্বাধীন বাংলাদেশের বীর ভাই-বোনেরা

বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মুক্তিপাগল গণ-মানুষের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার সরকারের পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে আমার সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি তাদের যারা বাংলাদেশের স্বধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে তাদের মূল্যবান জীবন আহুতি দিয়েছেন। যতদিন বাংলার আকাশে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা রইবে, যতদিন বাংলার মাটিতে মানুষ থাকবে, ততদিন মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের বীর শহীদদের অমর স্মৃতি বাঙালির মানসপটে চির অম্লান থাকবে।

২৫ মার্চ মাঝ রাতে ইয়াহিয়া খান তার রক্তলোলুপ সাঁজোয়া বাহিনীকে বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর লেলিয়ে দিয়ে যে নর-হত্যাযজ্ঞের শুরু করেন তা প্রতিরোধ করবার আহ্বান জানিয়ে আমাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আপনারা সব কালের সব দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী মানুষের সাথে আজ একাত্ম। পশ্চিম-পাকিস্তানি হানাদার দস্যুবাহিনীর বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ আপনারা গড়ে তুলেছেন তা এমন এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন যে, পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীনতাকামী মানুষের কাছে আপনাদের এ অভূতপূর্ব সংগ্রাম সর্বকালের প্রেরণার উৎস হয়ে রইল। প্রত্যেকদিনের সংগ্রামের দিনপুঞ্জি আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করছে, বিশ্বের কাছে আমাদের গৌরব বৃদ্ধি করছে।

আপনাদের অদম্য সাহস ও মনোবল, যা দিয়ে আপনারা রুখে দাঁড়িয়েছেন ইয়াহিয়ার ভাড়াটে দস্যুদের বিরুদ্ধে, তার মধ্য দিয়ে আপনারা এটেই প্রমাণ করেছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দিয়ে ধূলি-কাদা আর রক্তের ছাপ মুছে এক নতুন বাঙালি জাতি জন্ম নিল। পৃথিবীর কাছে আমরা ছিলাম শান্তিপ্রিয় মানুষ। বন্ধু-বাৎসল্যে, মায়া ও হাসিকান্নায়, গান, সাংস্কৃতি আর সৌন্দর্যের ছায়ায়

গড়ে উঠা আমরা ছিলাম পল্লী-বাংলার মানুষ। পৃথিবী ভাবত, আমরাও ভাবতাম, যুদ্ধ রণডংকা আমাদের অনেক দূরে। কিন্তু আজ?

আমাদের মানবিক মূল্যবোধ ও আদর্শের পতাকা সমুন্নত রেখে আমরা আবার প্রমাণ করেছি যে, আমরা তিতুমীর-সূর্য সেনের বংশধর। স্বাধীনতার জন্যে যেমন আমরা জীবন দিতে পারি, তেমনি আমাদের দেশ থেকে বিদেশি শত্রু-সৈন্যদের চিরতরে হটিয়ে দিতেও আমরা সক্ষম। আমাদের অদম্য সাহস ও মনোবলের কাছে শত্রু যত প্রবল পরাক্রম হোক না কেন, পরাজয় বরণ করতে বাধ্য। আমরা যদি প্রথম আঘাত প্রতিহত করতে ব্যর্থ হতাম তাহলে নতুন স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ হয়ত কিছুদিনের জন্য হলেও পিছিয়ে যেত। আপনারা শত্রুসেনাদের ট্যাঙ্ক ও বোমারু বিমানের মোকাবেলা করেছেন এবং তাদেরকে পিছু হটে গিয়ে নিজ শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছেন। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন, বাংলাদেশ আজ মুক্ত। বৈদেশিক সাংবাদিকরা আজ স্বাধীন বাংলাদেশের যে কোন জায়গায় বিনা বাঁধায় ঘুরে বেড়াতে পারেন এবং আপনাদের এ বিজয়ের কথা তারা বাইরের জগৎকে জানাচ্ছেন।

আজ প্রতিরোধ আন্দোলানের কথা গ্রাম-বাংলার প্রতিটি ঘরে পৌঁছে গেছে। হাজার হাজার মানুষ আজকের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছেন। বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ই.পি.আর-এর বীর বাঙালি যোদ্ধারা এই স্বাধীনতা সংগ্রামের যে যুদ্ধ তার পুরোভাগে রয়েছেন এবং তাদেরকে কেন্দ্র করে পুলিশ, আনসার, মোজাহিদ, আওয়ামী লীগ, স্বেচ্ছসেবক বাহিনী, ছাত্র, শ্রমিক ও অন্যান্য হাজার হাজার সংগ্রামী মানুষ এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এদেরকে সমর কৌশলে পারদর্শী করা হয়েছে ও শত্রুদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অস্ত্র ও গোলা-বারুদ দিয়ে বাংলার ও মুক্তিবাহিনীকে শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। সাগরপারের বাঙালি ভাইয়েরা যে যেখানে আছেন আমাদেরকে অস্ত্র ও অন্যান্য সহায্য পাঠাচ্ছেন।

সিলেট ও কুমিল্লা অঞ্চলে বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর খালেদ মোশাররফকে আমরা সমর পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছি। খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে আমাদের মুক্তিবাহিনী অসীম সাহসন ও কৃতিত্বের সাথে শত্রুর সঙ্গে মোকাবেলা করেছেন এবং শত্রু সেনাদেরকে সিলেট ও কুমিল্লার ক্যান্টেনমেন্টের ছাউনিতে ফিরে যেতে বাধ্য করেছেন। আমাদের মুক্তিবাহিনী শীঘ্রই শত্রুকে নিঃশেষ করে দেবার সংকল্প গ্রহণ করেছে।

চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলে সমর পরিচালনার ভার পড়েছে মেজর জিয়াউর রহমানের ওপর। নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনীর আক্রমণের মুখে চট্টগ্রাম শহরে যে প্রতিরোধব্যূহ গড়ে উঠেছে এবং আমাদের মুক্তিবাহিনী ও বীর চট্টলার ভাইবোনেরা যে সাহসিকতার সাথে শত্রুকে মোকাবেলা করেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই প্রতিরোধ স্ট্যালিনগ্রাডের পাশে স্থান পাবে। এই সাহসিকতাপূর্ণ প্রতিরোধের জন্য টট্টগ্রাম আজ শত্রুর কবলমুক্ত হয়েছে। চট্টগ্রাম শহরের কিছু

অংশ ছাড়া চট্টগ্রাম ও সম্পূর্ণ নোয়াখালি জেলাকে 'মুক্ত এলাকা' বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল অঞ্চলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মেজর শফিউল্লাহর ওপর। ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল এলাকা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে আমাদের মুক্তিবাহিনী ঢাকার দিকে অগ্রসর হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পূর্বঞ্চলের এই তিনজন বীর সমর পরিচালক ইতোমধ্যে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন এবং একযোগে ঢাকা রওনা হবার পূর্বেই পূর্বাঞ্চলের শত্রুদের ছোট ছোট শিবিরগুলোকে সমূলে নিপাত করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ই.পি.আর-এর বীর সেনানী মেজর ওসমানের ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কুষ্টিয়া ও যশোর জেলার। কুষ্টিয়ার ঐতিহাসিক বিজয়ের পর আমাদের মুক্তিবাহিনী সমস্ত এলাকা থেকে শত্রুবাহিনীকে বিতারিত করেছে এবং শত্রুসেনা এখন যশোর ক্যান্টেনমেন্টে ও খুলনা শহরের একাংশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। মেজর জলিলের ওপর ভার দেওয়া হয়েছে ফরিদপুর-খুলনা-বরিশাল-পটুয়াখালির।

উত্তরবঙ্গে আমাদের মুক্তিবাহিনী মেজর আহমদের নেতৃত্বে রাজশাহীকে শত্রুর কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করেছেন। মেজর নজরুল হক সৈয়দপুরে ও মেজর নওয়াজেশ রংপুরে শত্রুবাহিনীকে সম্পূর্ন অবরোধ করে বিব্রত করে তুলেছেন। দিনাজপুর, পাবনা ও বগুড়া জেলাকে সম্পূর্ন মুক্ত করা হয়েছে। রংপুর ও সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকা ছাড়া জেলার বাকি অংশ এখন মুক্ত।

স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের এ অভূতপূর্ব সাফল্য ভবিষ্যতে আরোও নতুন সাফল্যের দিশারী। প্রতিদিন আমাদের মুক্তিবাহিনীর শক্তি বেড়ে চলেছে। একদিকে যেমন হাজার হাজার মানুষ মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে তেমনি শত্রুর আত্মসমর্পণের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। আর একই সঙ্গে আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসছে শত্রুর কেড়ে নেয়া হাতিয়ার। এই প্রাথমিক বিজয়ের সাথে সাথে মেজর জিয়াউর রহমান একটি বেতার কেন্দ্র গড়ে তোলেন এবং সেখান থেকে আপনারা শুনতে পান স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কণ্ঠস্বর। এখানেই প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়।

আপাতত আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধান কার্যলয় স্থাপিত হয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের মুক্ত এলাকায়। পূর্বাঞ্চলের সরকারি কাজ পরিচালনার জন্যে সিলেট-কুমিল্লা এলাকায় বাংলাদেশ সরকারের একটি কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

আমরা এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রের প্রতিনিধি, কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, তারা যেন স্বচক্ষে এবং সরেজমিনে দেখে যান যে স্বাধীন বাংলাদেশ আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। সাথে সাথে আমরা সমস্ত বন্ধু রাষ্ট্র ও পৃথিবীর সমস্ত সহানুভূতিশীল ও মুক্তিকামী মানুষের কাছে ও 'রেডক্রস' ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে সাহায্যের আহ্বান জানাচ্ছি।

যারা আমাদের সাহায্য করতে ইচ্ছুক অথচ বর্বর ইসলামাবাদ শক্তি যাদের এই মানবিক কাজটুকু করবার বিরুদ্ধে নিষেধ উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে তারা এখন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন।

আমরা যদিও বিদেশ থেকে পাঠানো ত্রাণ-সামগ্রীর জন্যে কৃতজ্ঞ, কিন্তু এটা ভুলে গেলে চলবে না, আজকের দিনে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় ত্রাণের বাণী বয়ে আনতে পারে উপযুক্ত এবং পর্যাপ্ত হাতিয়ার, যা দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ হানাদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে এবং রক্ষা করতে পারে তার ও তার প্রিয় পরিজনের জান, মান আর সম্ভ্রম।

বৃহৎ শক্তিবর্গের অস্ত্রাগারের আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত জেনারেল ইয়াহিয়ারা হানাদার বাহিনী আজ আমাদের শান্তিপ্রিয় ও নিরস্ত্র বাঙালির কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেওয়ার এক পৈশাচিক উন্মত্ততায় মত্ত। আমরা সেইসব বৃহৎ শক্তিবর্গের কাছে মানবতার নামে আবেদন জানাচ্ছি, যেন এই হত্যাকারীদের হাতে আর অস্ত্র সরবরাহ করা না হয়। এ সমস্ত অস্ত্র দেয়া হয়েছে বিদেশি শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে-বাংলার নিষ্পাপ শিশুদেরকে ও নিরপরাধ নর-নারীকে নির্বিচারে হত্যা করার জন্যে নিশ্চয়ই এ অস্ত্র তাদের হাতে তুলে দেয়া হয়নি। বাংলাদেশের কৃষক-শ্রমিকের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে যে অস্ত্র কেনা হয়েছে এবং যাদের টাকায় ইয়াহিয়া খানের এই দস্যুবাহিনী পুষ্ট, আজ তাদেরকেই নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। আমরা অস্ত্র সরবরাহকারী শক্তিবর্গের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে, শুধু অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করলেই চলবে না, যে অস্ত্র তাদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে সে অস্ত্র দিয়ে সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে স্তব্ধ করে দেওয়ার প্রয়াস বন্ধ করতে হবে।

পৃথিবীর জনমতকে উপেক্ষা করে আজও ইয়াহিয়ার ভাড়াটে দস্যুরা বাংলাদেশের বুকে নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা সমস্ত দেশের কাছে অস্ত্র সাহায্য চাচ্ছি এবং যারা জাতীয় জীবনে স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে এসেছেন ও নিজেদের দেশেও হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তারা আমাদের এ ডাকে সাড়া না দিয়ে পারবে না, এ বিশ্বাস আমরা রাখি।

বিদেশি বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের কাছে যে অস্ত্র সাহায্য আমরা চাইছি তা আমরা চাইছি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে-একটি স্বাধীন দেশের মানুষ আর একটি স্বাধীন দেশের মানুষের কাছে। এই সাহায্য আমরা চাই শর্তহীনভাবে এবং আমাদের স্বধীনতার সংগ্রামের প্রতি তাদের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির প্রতীক হিসেবে-হানাদারদের রুখে দাঁড়াবার এবং আত্মরক্ষার অধিকার হিসেবে, যে অধিকার মানবজাতির শাশ্বত অধিকার। বহু বছরের সংগ্রাম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে আমরা আজ স্বাধীন বাংলাদেশের পত্তন করেছি। স্বাধীনতার জন্যে যে মূল্য আমরা দিয়েছি তা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্র হবার জন্যে নয়। পৃথিবীর বুকে স্বাধীন সার্বভৌম একটি শান্তিকামী দেশ হিসাবে রাষ্ট্র পরিবার-গোষ্ঠীতে, উপযুক্ত স্থান আমাদের প্রাপ্য। এ অধিকার বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্মগত অধিকার।

আমাদের বাঙালি ভাইয়েরা, আপনারা পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে থাকুন না কেন, আজকে মাতৃভূমির এই দুর্দিনে সকল প্রকার সাহায্য নিয়ে আপনাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। বিদেশ থেকে অর্থসংগ্রহ করে অস্ত্র কিনে আমাদের মুক্ত এলাকায় পাঠিয়ে দিন, যাতে করে আমাদের মুক্তিবাহিনীর সৈনিকরা অতি সত্বর সে অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে তার মাতৃভূমিকে রক্ষা করবার কাজে।

ইতোমধ্যেই আমাদের বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রত্যেকেই নিজেদের হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন। যাদের হাতে আজও আমরা আধুনিক অস্ত্র তুলে দিতে পারিনি তাদের আহ্বান জানাচ্ছি, যার হাতে যা আছে তাই নিয়ে লড়াইয়ে অংশ নিন। আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, শীঘ্রই আপনাদের হাতে আমরা আধুনিক অস্ত্র তুলে দিতে পারব। ইতোমধ্যে প্রত্যেক আধুনিক অস্ত্র ব্যবহারের ট্রেনিং নেবার জন্যে নিকটবর্তী সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। যাদের হাতে আধুনিক অস্ত্র নেই তাদেরও এই জনযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং ক্ষমতা রয়েছে। শত্রুর ছত্রী ও গুপ্তবাহিনীকে অকেজো করে দেবার কাজে আপনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারেন। সম্মুখসমরের কাজ না করতে পারলেও আপনি রাস্তা কেটে, পুল উড়িয়ে দিয়ে এবং আরো নানাভাবে আপনার উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে শত্রুকে হয়রান ও কাবু করতে পারেন। নদীপথে শত্রু যাতে না আসতে পারে তার সম্ভব্য সমস্ত ব্যবস্থা আপনাকেই গ্রহণ করতে হবে ও সবদিকে কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে। নদীপথে সমস্ত ফেরি, লঞ্চ ও ফ্ল্যাট অকেজো করে দিতে হবে। এ সমস্ত দায়িত্ব পালন করার জন্যে স্থানীয় এলাকার সমর পরিচালকের সাথে সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে হবে এবং তার আদেশ ও নির্দেশাবলি মেনে চলতে হবে।

যুদ্ধে অংশ নেয়া ছাড়াও বাংলাদেশকে সব দিক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্বকেও অবহেলা করলে চলবে না। শাসনকার্যে অভিজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট বাঙালি অফিসারদের মধ্যে যারা এখনো আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেননি, তারা যে যেখানেই থাকুন না কেন, আমরা তাদেরকে মুক্ত এলাকায় চলে আসতে আহ্বান জানাচ্ছি। অনুরূপভাবে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি সমস্ত বুদ্ধিজীবী, টেকিনিশিয়ান, ইঞ্জিনিয়ার, সংবাদপত্রসেবী, বেতার শিল্পী, গায়ক ও চারুশিল্পীদের, তারা যেন অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। আমাদের সামনে বহুবিধ কাজ- তার জন্যে বহু পারদর্শীর প্রয়োজন এবং আপনারা প্রত্যেকেই স্বাধীন বাংলাদেশের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করবার সুযোগ পাবেন। আমরা বিশেষ করে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতাদেরকে বাংলাদেশের এই সংঘবদ্ধ জনযুদ্ধে সামিল হতে আহ্বান জানাচ্ছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে সাড়ে সাত কোটি মানুষের এই ঐতিহাসিক প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষা আন্দোলনকে চিরাচরিত রাজনৈতিক গণ্ডির ঊর্ধ্বে রাখবার জন্যে আমরা আবেদন জানাচ্ছি।

হানাদার শত্রুবাহিনীর সাথে কোনো প্রকার সহযোগিতা করা বা সংস্রাব রাখা চলবে না। বাংলাদেশে আজ কোনো মীরজাফরের স্থান নেই। যদি কেউ হঠাৎ করে নেতা সেজে শত্রু সৈন্যের ছত্রছায়ায় রাজনৈতিক গোর থেকে গাত্রোত্থান

করতে চায়, যাদেরকে গত সাধারণ নির্বাচনে বাংলার মানুষ ঘৃণ্যভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা যদি এই সুযোগে বাংলাদেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তবে বাংলাদেশের মানুষ তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, তারা সাড়ে সাত কোটি বাংলাদেশবাসীর রোষবহ্নিতে জ্বেলে খাক হয়ে যাবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের দেশের উপর একটা যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই স্বাধীন জীবনযাত্রা ব্যাহত হতে বাধ্য। হয়ত কোথাও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ঘাটতি দেখা যেতে পারে।

আমাদের উচিত হবে যতদূর সম্ভব ব্যয়সংকোচ করা এবং জিনিসপত্র কম ব্যবহার করা। দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের কাছে বিশেষ অনুরোধ তারা যেন মজুতদারি ও কালোবাজারির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং জিনিসপত্রের দাম যাতে সাধারণ লোকের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে না যায় তার দিকে দৃষ্টি রাখেন।

এ যুদ্ধে যে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী তাতে সন্দেহের কারণ নেই। আপনারা ইতোমধ্যে সাহস ও ত্যাগের বিনিময়ে যে বিজয় অর্জন করেছেন শত্রুপক্ষ আজকে তা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে। তারা ভেবেছিল যে, আধুনিক সমর সজ্জায় এবং কামানের গর্জনের নিচে স্তব্ধ করে দেবে বাঙালির ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা। আর চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখিয়ে বাঙালিকে তারা বুটের নিচে নিষ্পেষণ করবে। কিন্তু তাদর সে আশা আজ ধূলিস্যাৎ হয়ে গেছে। আমরা তাদের মারমুখী আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে আছি এবং তাদেরকে যে প্রতিনিয়ত হটিয়ে দিচ্ছি এতে তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাদের খাদ্য সরবরাহের সকল পথ আজ বন্ধ- ঢাকার সাথে আজ তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। উড়োজাহাজ থেকে খাবার ফেলে এদেরকে ইয়াহিয়া খান আর বেশি দিন টিকিয়ে রাখতে পারবে না। ওদের জ্বালানি সরবরাহের লাইন আমাদের মুক্তিবাহিনী বন্ধ করে দিয়েছে। ইয়াহিয়ার উড়োজাহাজ আর বেশি দিন বাংলাদেশের আকাশে দেখা যাবে না। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি উত্তাল জনসমুদ্রের মাঝখানে ওরা আজকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। বাংলাদেশের আকাশে শীঘ্রই ঝড়ের মাতম শুরু হচ্ছে। ওরা জানে ওরা হানাদার। ওরা জানে ওদের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ভ্রুকুটি ও ঘৃণা। ওরা ভীত, ওরা সন্ত্রস্ত, মৃত্যু ওদের সামনে পরাজয়ের পরোয়ানা নিয়ে হাজির। তাই ওরা উন্মাদের মতো ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছে।

পৃথিবীর আজ সজাগ হয়েছে। পৃথিবীর এই অষ্টম বৃহৎ রাষ্ট্র বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে আছে বিশ্বের মানুষ যেখানে ওরা এ ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠেছে। বিশ্বের মানুষ আজ আর ইসলামাবাদ সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার মিথ্যা যুক্তি আর অজুহাত স্বীকার করে নিতে রাজি নয়। যে সমস্ত সাংবাদিক বাংলাদেশের এই যুদ্ধের ভয়াবহতা ও নৃশংসতা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন তারা ইয়াহিয়ার এই অন্যায় ও অমানবিক যুদ্ধ আর ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে নিন্দা জানাচ্ছেন। অপরপক্ষে যে সমস্ত সাংবাদিক আমাদের মুক্ত এলাকা পরিদর্শন করছেন তারা বয়ে নিয়ে

যাচ্ছেন বাংলাদেশের মানুষের এই বীর প্রতিরোধ যুদ্ধের খবর আর বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ইয়াহিয়া সরকারের ধ্বংস ও তাণ্ডবলীলার চক্ষুস প্রমাণ।

ইতোমধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া এবং ভারতবর্ষ এই নির্বিচার গণ-হত্যার বিরুদ্ধে তাদের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে এবং সোভিয়েট রাশিয়া অবিলম্বে এই হত্যাযজ্ঞ ও নিপীড়ন বন্ধ করবার আহ্বান জানিয়েছে। গ্রেট বৃটেনও বাংলাদেশের এ অবস্থা সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠেছে। যে সমস্ত পাকিস্তানি বিমান মৃত্যুর সরঞ্জম নিয়ে ঢাকা আসার পথে জ্বালানি সংগ্রহ করছিল, তাদেরকে জ্বালানি সরবরাহ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র সিংহল ও ব্রহ্মদেশ।

যদিও কোন কোন দেশ বাংলাদেশের ঘটনাবলিকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে অভিহিত করেছেন, তবু এ কথা এখন দিব্যলোকের মতো সত্য হয়ে গেছে যে, সাড়ে সাত কোটি মানুষকে পিষে মারার চেষ্টা, তাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে ব্যর্থ করে দেবার ষড়যন্ত্র একটি আন্তর্জাতিক ব্যাপারে পরিগণিত হয়েছে এবং এই সমস্যা আজ পৃথিবীর সমস্ত মানুষের বিবেককে নাড়া দিচ্ছে। বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকে আমরা বিদেশে অবস্থানরত বাঙালি ভাইদের বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি ও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অনুরোধ জানিয়েছি। পৃথিবীর বিভিন্ন রাজধানীতে আমরা আমাদের স্বাধীনতা ও আত্মরক্ষার সংগ্রামে সাহায্য ও সহানুভূতি চেয়ে পাঠাচ্ছি।

আমাদের যে সমস্ত ভাইবোন শত্রুকবলিত শহরগুলোতে মৃত্যু ও অসম্মানের নাগপাশে আবদ্ধ, আদিম নৃশংসতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সাহস ও বিশ্বাসের সাথে মুক্তির পথ চেয়ে আছেন তাদেরকে আমরা এক মুহূর্তের জন্যে ভূলতে পারি না। যারা আমাদের সংগ্রামে শরিক হতে চান তাদের জন্যে রইল আমাদের আমন্ত্রণ। যাদের পক্ষে নেহাৎই মুক্ত এলাকায় আসা সম্ভব নয় তাদের আমরা আশ্বাস এবং প্রেরণা দিচ্ছি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে, শহীদ ভাইবোনদের বিদেহী আত্মার পক্ষ থেকে। শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। ইনশাআল্লাহ, জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

আমাদের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে না বলে আমদের স্থির বিশ্বাস; কারণ প্রতিদিনই আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে এবং আমাদের এ সংগ্রাম পৃথিবীর স্বীকৃতি পাচ্ছে। কিন্তু আমাদের মুক্তিবাহিনীর হাতে শেষ পরাজয় মেনে নেয়ার আগে শত্রুরা আরো অনেক রক্তক্ষয় আর ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করবে। তাই পুরাতন পূর্ব-পাকিস্তানের ধ্বংসাবশেষের ওপর নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলবার সংকল্পে আমাদের সবাইক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। আমাদের এই পবিত্র দায়িত্ব পালনে এক মুহূর্তেরও জন্যেও ভুলে গেলে চলবে না যে এ যুদ্ধ গণযুদ্ধ এবং সত্যিকার অর্থে এ কথাই বলতে হয় যে, এ যুদ্ধ বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের যুদ্ধ। খেটে খাওয়া সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র-জনতা তাদের সাহস, তাদের দেশপ্রেম, তাদের বিশ্বাস, স্বাধীন বাংলাদেশের চিন্তায় তাদের নিমগ্নপ্রাণ, তাদের আত্মহুতি, তাদের ত্যাগ ও তিতিক্ষায় জন্ম নিল এই স্বাধীন বাংলাদেশ। সাড়ে সাত কোটি মানুষের

সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ফলপ্রসূ হয়ে উঠুক আমাদের স্বাধীনতার সম্পদ। বাংলাদেশের নিরন্ন দুঃখী মানুষের জন্যে রচিত হোক এক নতুন পৃথিবী, যেখানে মানুষ মানুষকে শোষণ করবে না। আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক ক্ষুধা, রোগ, বেকারত্ব আর অজ্ঞানতার অভিশাপ থেকে মুক্তি। এই পবিত্র দায়িত্বে নিয়োজিত হোক সাড়ে সাত কোটি বীর বাঙালি ভাইবোনের সম্মিলিত মনোবল ও অসীম শক্তি। যারা আজ রক্ত দিয়ে উর্বর করছে বাংলাদেশের মাটি, যেখানে উৎকর্ষিত হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন মানুষ, তাদের রক্ত আর ঘামে ভেজা মাটি থেকে গড়ে উঠুক নতুন গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা; গণ-মানুষের কল্যাণে সাম্য আর সুবিচারের ভিত্তিপ্রস্তরে লেখা হোক 'জয় বাংলা', 'জয় স্বাধীন বাংলাদেশ'।

১৯৭১-এর ৬ জুলাই সংসদ সদস্যদের প্রথম অধিবেশনে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের উদ্বোধনী ভাষণ

স্বাধীন বাংলাদেশের মাননীয় পরিষদ সদস্যবর্গ

আপনারা আমার সংগ্রামী অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর আমরা সবাই এই প্রথম একসঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পেয়েছি। আজ জাতির ক্রান্তি-লগ্নে আমাদের এই সম্মেলনের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের মুক্তিফৌজের বীর নওজোয়ানেরা অপূর্ব বীরত্বের সাথে এখন শত্রুর মোকাবেলা করছে। হাজার হাজার যুবক পবিত্র মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আত্মোৎসর্গের মহান আদর্শে তারা বলীয়ান।

মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আপনারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ বিশ্বাস করে তাদের দায়িত্ব আপনাদের উপর অর্পণ করেছিল। আপনারা সবাই বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক বৈ আর কিছু নন। আমাদের মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘদিনের সহচর হিসাবে তাঁর জীবনব্যাপী আদর্শ আর সংগ্রামের আমরা ধারক ও বাহক। আদর্শের জন্য, নীতির জন্য, নেতার কাছে আর বাংলার মানুষের কাছে দেওয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য এই ধরনের অটুট মনোবল আর কোন দেশের জনপ্রতিনিধিরা দেখাতে পেরেছেন কিনা তার নজীর আমার জানা নেই। আপনাদের বীরত্ব, আদর্শনিষ্ঠা, মনোবল ও ত্যাগের জন্য আমি অভিনন্দন জানাই। আপনারা গৃহহারা সর্বহারা হয়ে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করেছেন-তাই আপনাদের প্রতি আমার আকুণ্ঠ আন্তরিক সালাম আর অভিনন্দন।

বন্ধুরা আমার, নির্বাচন-উত্তরকালে রমনার রেসকোর্স ময়দানে আমাদের মহান নেতা আমাদেরকে শপথবাণী উচ্চারণ করিয়েছিলেন। সেদিন সাক্ষী ছিল রেসকোর্স ময়দানের লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী জনতা আর বাংলার নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষ। আমি আজ গর্বের সঙ্গে বলব, মহান নেতার হাত ধরে আমরা যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম সে প্রতিজ্ঞায় আমরা অটুট এবং অটল রয়েছি। আপনাদের অসীম মনোবল বিগত কয়েক মাস যাবৎ স্বাধীনতা সংগ্রামকে জিইয়ে রেখেছে। অবশ্যি সঙ্গে সঙ্গে এই কথা বলতে হবে আমাদের যে সমস্ত বীর সৈনিকের, মুক্তিফৌজের যে তরুণ সংগ্রামীরা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছেন তাঁদের

অপূর্ব বীরত্ব বাংলার মানুষের জন্য এক গর্বের বস্তু। আর ভবিষ্যৎ ইতিহাসের জন্য তা এক অপূর্ব বীর গাঁথা।

৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার জন্য আপনারা জনগণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন তা পালন করতে আপনাদের নেতা এবং তার সহকর্মীবৃন্দ কী কী প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, তা আপনাদের জানা আছে।

জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ জানেন, একটা খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে আপনাদের সামনে পেশ করা হয়েছিল। সেই খসড়া শাসনতন্ত্র পর্যালোচনা ও পরীক্ষার জন্য ৩০ সদস্য বিশিষ্ট সাব-কমিটি যখন আলাপ আলোচনা চালাচ্ছিল, তখনই মার্চ মাসের সেই ১ তারিখে হঠাৎ জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব ভুট্টো সাহেবের পরামর্শে আর তাঁর অভিমান রক্ষার জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করে দেন। সারা পৃথিবী জানে, আজকে পাকিস্তান দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার যদি কোন মূল আর সঙ্গত কারণ থাকে, তাহলে সে অবস্থা সৃষ্টি আমরা করি নাই, করেছেন ইয়াহিয়া খান সাহেব আর ভুট্টো সাহেব। আর এর জন্য দায়ী পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকেরা যারা ২৩ বছর পর্যন্ত বাংলার গরীব চাষী-মজুরের রক্ত শোষণ করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে।

আওয়ামী লীগের মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমরা কি অপরাধ করেছি? আমাদের একমাত্র অপরাধ ২২বছর পর্যন্ত আমরা পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করেছিলাম। আমরা বলেছিলাম, বাংলার মানুষকে শোষণ করে, বাংলা চাষী-মজুরের রক্ত শোষণ করে কায়েমী স্বার্থবাদীরা আর পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিবাদীরা যারা বাংলাকে আজ রিক্ত করেছে, শূন্য করেছে, তারাই পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চায়। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সেই সমস্যার সমাধান করতে চাইলাম বলে আমরা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। আমাদের নেতা নির্বাচন-পরবর্তী কালেও একটার পর একটা চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু যারা কায়েমী স্বার্থবাদের দালাল, পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজিবাদের দালাল, পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ত প্রভুদের দালাল আজ যারা পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তাদের ছত্রচ্ছায়ায় রাজনীতি করে শুধু বিলাস আর ভোগ করতে চায়, তারাই বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টায় বাঁধা হয়ে দাঁড়ালো। আওয়ামী লীগের আন্তরিকতাকে তারা দুর্বলতা মনে করে তাকে বানচাল করতে চেষ্টা করলো।

১ মার্চের পর থেকে প্রতিটি ঘটনা যে কত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েছিল আপনারা নিজের চোখে দেখেছেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে- যেদিন ইয়াহিয়া খান সাহেব জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী ঘোষণা করলেন, সেদিন পূর্বাণী হোটেলে আমরা সম্মেলনে আর একবারের মতো বসেছিলাম। সেখানে বঙ্গবন্ধুকে সামনে রেখে আমি ব্যক্তিগতভাবে একটার পর একটা প্রতিজ্ঞাবাণী উচ্চারণ করেছিলাম। আর আপনারা সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিধ্বনিত করে আবার বলেছিলেন বাংলার মানুষের কাছে-আপনারা বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। দেশবাসী জানে বিশ্বাসঘাতকতা আপনারা করেন নাই। জঙ্গী শাহীর

অত্যাচার, ইয়াহিয়ার প্রলোভন কোন কিছুই আপনাদের টলাতে পারে নাই। ইতিহাস এই কাহিনী একদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবে বলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস। সেই ২৫ মার্চের রাতের আঁধারে এই বীভৎস ঘটনার প্রতিবাদে আপনারা রুখে দাঁড়ালেন। বাংলার নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা মফঃস্বল শহরে, জেলা শহরে, গ্রামে, বন্দরে রাজনৈতিক নেতৃত্বে দেওয়ার জন্য রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করবো আমাদের ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের বীরত্ব আজকের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। ইপিআর আমাদের পুলিশ বাহিনী, আমাদের আনছার, আমাদের মোজাহিদরাও বাংলার মানুষের পাশে এসে দাঁড়াল। বন্দুক আর কামান তুলে নিল। আজ তারা সংগ্রামের পুরোভাগে। বাংলার গ্রামে, বন্দরে, গঞ্জে আপনারা দাঁড়ালেন। আমি কিভাবে যে আপনাদের শ্রদ্ধা জানাব তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। যে সমস্ত মিথ্যাবাদী বলে আওয়ামী লীগের নেতারা আর সদস্যরা সংগ্রামের পুরোভাগে ছিল না তাদের আমি জবাব দিতে চাই। বাংলার মানুষ জানে আপনারাই রয়েছেন পুরোভাগে। আমি জানি চট্টগ্রামে, ময়মনসিংহে, যশোরে, রংপুরে, খুলনায়, বরিশালে, ঢাকায়, ফরিদপুরে বাংলার সর্বত্র আপনাদের নেতৃত্বেই সংগ্রাম হয়েছে। নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আপনারা গ্রামে-বন্দরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। বাংলার সৈনিকদের পাশে পাশে আপনারা রয়েছেন। অকুতোভয়ে আপনারা লড়েছেন। বাংলার সৈনিকেরা যখন বুকের তাজা রক্ত মাতৃভূমির জন্য ঢেলে দিচ্ছেন, এর পরে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা না করে আর কি পথ ছিল? স্বাধীনতার জন্য লড়াই না করে কি উপায় ছিল? মূলতঃ এবং বাহ্যতঃ বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হওয়ার মুহূর্তে স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী রেখে যান। আমরা জানতাম বঙ্গবন্ধু যদি গ্রেপ্তার হন, তবে স্বাধীনতা ঘোষণা তিনিই করে যাবেন। আর এই স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যই আমাদের সংগ্রাম করে যেতে হবে।

প্রিয় বন্ধুরা আমরা ২৫ মার্চের রাতের পরে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। তাই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঘোষণা করতে আমাদের একটু বিলম্ব হয়েছিল।

আমরা যে পাঁচজন শেখ সাহেবের পাশে ছিলাম এবং যাদের কাছে কথিত, লিখিত অলিখিত সর্ব প্রকারের দায়িত্ব বঙ্গবন্ধু দিয়ে গিয়েছিলেন ১৩ এপ্রিল তারিখে বাংলার পূর্ব অঞ্চলে সর্বপ্রথম একত্রিত হলাম। পরিষদের সদস্যবৃন্দ যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের সামনে সেদিন আমি আমার সহকর্মীবৃন্দের তরফ থেকে স্বাধীনতা কার্যকরী করার জন্য পরিকল্পনা পেশ করেছিলাম। তখন যোগাযোগহীন অবস্থায় আপনাদের বেশির ভাগই ছিলেন বাংলাদেশে শত্রুর দখলকৃত এলাকার অভ্যন্তরে। অথচ একটা সরকার গঠন না করলে স্বাধীনতা সংগ্রামকে পরিচালনা করা যাচ্ছিল না। সেইহেতু সেদিনের উপস্থিত বন্ধুদের কাছেই আমরা পরিকল্পনা পেশ করেছিলাম।

১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে আমাদের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। আর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের আর একটি আম্রকাননে দাঁড়িয়ে আমরা

বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ এবং বঙ্গবন্ধুর তরফ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।

স্বাধীনতা ঘোষণা করে ১৭ এপ্রিল সারা পৃথিবীর মানুষকে যা বলেছিলাম, আমরা বিশ্বাস করি তা অন্তরের বাণী। বিশ্বাস করি ১৭ এপ্রিলের এই ঘোষণা বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলের মর্মবেদনার এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গের বিরাট বিস্ফোরণ।

স্বাধীনতা ঘোষণার পর আমি আমার সহকর্মী জনাব তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছিলাম। তাঁর পরামর্শে এবং বঙ্গবন্ধুর পূর্বতন নির্দেশের বলে আমি জনাব খোন্দকার মোস্তাক আহমদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী, জনাব মনসুর আলী সাহেবকে অর্থমন্ত্রী আর জনাব কামরুজ্জামান সাহেবকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেছিলাম। আমরা জানতাম, আপনারা যে প্রয়োজনে তাঁদেরকে দীর্ঘকাল নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছেন, আমি আপনাদের সবার সঙ্গে পরামর্শ না করলেও নিঃসঙ্কোচে আর বিনা দ্বিধায় তাঁদেরকে সরকারের দায়িত্ব দিতে পারি।

আমি জানি, আজকে বাংলার ঘরে ঘরে কী হাহাকার! আমি জানি নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের বুকের মধ্যে কী ক্রন্দনের রোল। আপনারা যখন শোনেন আপনার শহরে, আপনার গ্রামে, আপনার গঞ্জে যারা একদিন বিশ্বাস করে, ভালবেসে, আপনাদের ভোট দিয়েছিল তাদের ঘরবাড়ী আজকে জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে, তখন কী মর্মবেদনায় আপনারা পীড়িত হন! আপনার প্রতিবেশী নারীদেরকে বর্বর পশুরা ইজ্জতের হানি করেছে জেনে আপনাদের কলিজা ফেটে যায়। এই ধরনের অত্যাচার পৃথিবীর ইতিহাসে কোন সৈন্যবাহিনী কোনদিন করে নাই। নারীর ইজ্জত লুণ্ঠিত হচ্ছে আজ আমার বাংলাদেশে। হত্যা করা হয়েছে দশ লক্ষ নারী পুরুষ আর শিশুকে। মসজিদ মন্দির আর গীর্জা ধ্বংস হয়েছে। বাংলার ফসল আজকে মাঠে মাঠে লুটিয়ে পড়েছে। আমাদের তরুণদেরকে আজকে হত্যা করা হচ্ছে, গুলি করে মারা হচ্ছে।

এই কাহিনীর মর্মবেদনা আপনাদের বুকের ভেতর যেমন বাজে, আমার বুকে যেমন বাজে, আর সকলের বুকেও তেমনি বাজে। যদি বঙ্গবন্ধু আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকতেন, তাঁর প্রিয় দেশবাসীর এই মর্মন্তুদ দুঃখে তিনি অধীর হয়ে যেতেন তাদের মুক্তির জন্য। তাই বন্ধুরা আপনাদের ব্যথা বিশ্বাবাসীকে বলার জন্য মন্ত্রীসভার সদস্যরা আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। তাঁরা কী পর্যন্ত সফল হয়েছেন তার বিচার করবেন আপনারা। কিন্তু একটা জিনিস আপনাদেরকে আমি স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই-আপনার সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে কাজের অগ্রগতি সম্ভব তার পথ দেখিয়ে দিন।

বিশ্ববাসীর কাছে সারা পৃথিবীর পত্র-পত্রিকা আর কূটনৈতিক কার্যকলাপের দ্বারা আমরা এই কথা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি যে, বাংলাদেশে গণহত্যা চলছে। আজকে আপনাদের মন্ত্রিসভা নিরলস চেষ্টা দ্বারা সারা পৃথিবীর কাছে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে যে ইয়াহিয়া ভুল আর ভ্রান্ত, আর আমরা সঠিক পথে চলেছি। আজকে সারা পৃথিবীর পত্র-পত্রিকা তা গ্রহণ করেছে।

আজকে লন্ডনের "অবজার্ভার," "সানডে টাইম" বা যে কোন পত্র-পত্রিকা দেখুন, ইয়াহিয়ার বর্বরতার নিন্দায় তারা মুখর। যে আমেরিকা সারা পৃথিবীর রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে, "নিউইয়র্ক টাইম" এবং অন্যান্য সমস্ত প্রভাবশালী পত্রিকাগুলি ইয়াহিয়াকে ধিক্কার দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, ফরাসিদেশে, ইটালিতে, জার্মানিতে, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে এমন কি আরবেরও কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ করে বৈরুতের আর সুদানের পত্রিকাগুলি আপনাদের পক্ষে আজকে মত প্রকাশ করে চলেছে।

বন্ধুরা মনে রাখতে হবে আমাদের স্বাধীনতা অন্য কেউ এনে দেবে না। নিজেদের স্বাধীনতা নিজেদেরকেই অর্জন করতে হবে। বাইরের কোন রাষ্ট্র স্বাধীনতার ফল এনে দেবে, এ ধারণা ভুল। দশ লক্ষ বাঙালি রক্ত দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন রক্ত যখন আমরা দিতে শিখেছি তখন আরও রক্ত দেবো, বাংলার মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো। দশ লক্ষ বাঙালি বীর যারা প্রাণ দিয়েছে তাদের কসম দিয়ে আপনাদের বলছি, আজকে স্বাধীনতার লড়াই-এ প্রয়োজন পড়লে আরো প্রাণ বিসর্জন দিব। তবু আপোস করব না। ইয়াহিয়া খান সাহেব তার শেষ বেতার ভাষণে আমাদের হুমকি দিয়েছেন। এই ইয়াহিয়া খান বাংলার নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধিদের সদস্যপদ বাতিলের ব্যবস্থা করেছেন। ইয়াহিয়া খার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমরা নির্বাচিত সদস্য নই। বাংলার মানুষ আমাদেরকে নির্বাচিত করেছে। তাদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্যই আজ আমরা গৃহহারা, সর্বহারা, আজ আমরা বনে জঙ্গলে ঘুরেছি। কে তুমি ইয়াহিয়া? তোমাকে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব কে দিয়েছে ? পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণও তোমাকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেয় নাই। নির্যাতিত পাঠান, বেলুচ, সিন্ধিদেরকেও তুমি শাসন করে চলেছো। পাঞ্জাবের চাষী-মজুরদের উপর অত্যাচারে তুমি জমিদারদের সহায়তা করেছো। তোমার হুমকি ঔদ্ধত্যের উত্তর রণক্ষেত্রে আমাদের বীর সৈনিকেরা দিবে।

সর্বশেষে আপনাদেরকে বলি সংকল্পে অটুট থাকতে হবে। দুর্বলতা কোনভাবে যেন আমাদের মনে স্থান না পায়। পরিপূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার বিকল্প কোন প্রস্তাব আপনাদের কাছে বাংলার মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তৎসত্ত্বেও ইয়াহিয়া খান সাহেবের কাছে বলেছিলাম, আহ্বান জানিয়েছিলাম যুদ্ধ বন্ধ করুন। আমরা দশ লক্ষ মরেছি, তোমার ১৫ হাজার সৈনিককে তো ইতোমধ্যে মুক্তি বাহিনীর লোকেরা খতম করেছে। ২৫ থেকে ৩০ হাজার সৈন্য আহত হয়েছে। শুধু বাংলার ঘরে ঘরে মা- বোনের ক্রন্দন রোল নয়, পাঞ্জাবের ঘরেওতো ক্রন্দনের রোল। সেখানেও মর্মভেদী হাহাকার তোমার কানে কি পৌঁছে না ? তাই যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধান কর।

(১) বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার কর। (২) বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দাও। (৩) সমস্ত সেনাবাহিনী প্রত্যাহার কর। আর (৪) যে ক্ষতি করেছ তার ক্ষতিপূরণ দাও। এই চারটি শর্ত আমি দিয়েছিলাম শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য। ইয়াহিয়া খান প্রত্যুত্তর

দিয়েছেন আটাশে জুন তারিখে। আটাশের পর থেকে শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ রুদ্ধ হয়েছে। এখন বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে বাংলার মাঠে, প্রান্তরে, পদ্মা, মেঘনা, যমুনার কূলে যুদ্ধের মাধ্যমে।

আপনাদের প্রধান সেনাপতির নির্দেশে তার সৈন্যবাহিনী রক্ত ঢেলে দিচ্ছে। তাদের সেই তপ্ত লহু আজ আপনাদের সংকল্পকে আরো দৃঢ় করুক। বাংলার যে শত শত সতী নারী তাদের ইজ্জত দিয়েছে তাদের ইজ্জতের শপথ-ইয়াহিয়া বাহিনীকে নির্মূল না করা পর্যন্ত, বাংলার স্বাধীনতা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বিশ্রাম নাই। আপনারা সংকল্পবদ্ধ হউন, আপনারা শপথ করুন, মুক্তিযুদ্ধে যে কোন অবস্থায় যে কোন অধ্যায়ে আপনারা ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

দীর্ঘকাল বহু সুখে দুঃখে আমরা আপনাদের পাশে পাশে ছিলাম। আমার প্রিয়তম নেতা জনাব শেখ মুজিবুর রহমান স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন, আপনারা দীর্ঘকাল আমাদের ভালবাসা দিয়েছেন, স্নেহ দিয়েছেন, কোনদিন কি আমরা আপনাদের বিশ্বাসের অমর্যাদা করেছি? বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাস, আপনাদের স্নেহ ভালবাসার বিনিময়ে আমরা কি কোনদিন আপনাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছি? ২০-২২ বছরের ইতিহাস যদি একথা বলে সুখে-দুঃখে জয়-পরাজয়ে- গৌরবে-অগৌরবে আপনাদের পাশে পাশে ছিলাম। আপনাদের বিশ্বাসের অমর্যাদা করি নাই। আজ আপনাদের কাছে আকুল আবেদন আবার আপনারা বিশ্বাস করুন। দেখুন আমরা কি করতে পারি, যদি না পারি, তবে শুধু আপনাদের কাছে নয় অনাগত ভবিষ্যতের কাছে আমাদের কি জবাবদিহি করতে হবে না? আমার বিশ্বাস আমার মন্ত্রিসভার সদস্যরা এবং আমার প্রধান সেনাপতিও সজাগ।

১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল এই তিন বছর আমি আপনাদের পরিচালনা করার দায়িত্ব লাভ করেছিলাম। বঙ্গবন্ধু এই তিন বছর কারাগারে ছিলেন। আয়ুবশাহীর দাপট আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমি দেখেছি তখনও আপনারা অধৈর্য হন নাই। আমি কোন দিন ধৈর্য হারাই নাই। বহুবার আপনাদের বলেছি সংগ্রামে জয়ী হতে হলে ধৈর্যের প্রয়োজন। বহুবার সংগ্রামের কৌশল নিয়ে আপনাদের সাথে আমার মতবিরোধ হয়েছে। আজ আমি গর্বের সাথে বলতে পারি আমার প্রবর্তিত কৌশলের ফলে আমরা ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত তথা আয়ুবশাহীকে খতম করেছিলাম।

বিশ্বাস বলে আপনারা আমাকে আবার বঙ্গবন্ধুর সহকর্মী হিসেবে প্রধান সহ-সভাপতি করেছিলেন। এই বিশ্বাসের বলে আপানারা আমাকে জাতীয় পরিষদে ডেপুটি নেতা করেছিলেন। আমি জানি, এই বিশ্বাসের বলে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে আবার আপনারা আমাকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দিয়েছেন। আমার ভাগ্য এই যে, আমার নেতা, আমার ভাই, আমার প্রিয়তম বন্ধু শেখ সাহেব যখনই যান, তার অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়ে যায়। সেই কাজ চিরকাল আপনাদের পাশে পাশে থেকে করেছি। আজও আপনাদেরকে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি-যদি বিশ্বাসঘাতকতা করি, যদি সংকল্পে কোন রকম মলিনতা দেখেন, যদি আপনাদের

নীতি ও আদর্শ থেকে কোনদিন বিচ্যুত দেখেন আপনারা আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করবেন। কিন্তু বাংলার এই সংকট মুহূর্তে, জাতির স্বাধীনতার এই ক্রান্তিলগ্নে যেখানে শত শহীদের রক্তে আজকে ইতিহাস লেখা হয়েছে, আর যেখানে হাজারে হাজারে সৈনিক আজকে বন-প্রান্তরে ইতিহাস লিখে চলেছে, সেই মুহূর্তে আর একবার আপনারা আস্থা স্থাপন করুন।

আর যদি বাংলার স্বাধীনতা এই মন্ত্রিসভার নেতৃত্বে একদিন অর্জিত হয়, সেই গৌরব আপনারা নেবেন, আওয়ামী লীগের কর্মীরা নেবেন, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ নেবেন, মুক্তিযোদ্ধারা নেবেন। আর সেদিন যদি শুধু কিছু ধন্যবাদ, মন্ত্রিসভার সদস্যদের দেন, তবে আমি কৃতার্থ হব। আপনাদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা।

স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কীয় প্রস্তাব

(সোমবার, ১০ই এপ্রিল, ১৯৭২ বাংলাদেশ গণপরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে জাতির জনক কর্তৃক উত্থাপিত স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কীয় প্রস্তাব)।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জনাব স্পিকার সাহেব, আপনার মাধ্যমে আমি আজ কয়েকটা বিষয় এখানে আলোচনা করতে চাই। আজ আমরা এখানে গণপরিষদের সদস্য হিসেবে বসবার সুযোগ পেয়েছি। আমরা আজকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে পেরেছি এবং বাংলাদেশ আজ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। আমরা যে আজ বাংলাদেশের সার্বভৌম গণপরিষদের সদস্য হিসেবে কাজ করতে পারছি, সে সুযোগ এ দেশের জনসাধারণ তাদের রক্ত দিয়ে এনে দিয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম অনেকদিন থেকে শুরু হয়। জনাব স্পিকার সাহেব, আপনার জানা আছে যে, ত্রিশ লক্ষ ভাই-বোনের রক্তের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি। এই গণপরিষদের সদস্য হিসেবে নিশ্চয়ই তাদের আত্মত্যাগের কথা আমরা স্মরণ করব এবং মনে রাখব। আমাদের মনে রাখতে হবে, যে রক্তের বিনিময়ে আমর স্বাধীনতা পেয়েছি, সে রক্ত যেন বৃথা না যায়। রক্ত দিয়েছে এ দেশের লক্ষ লক্ষ ভাই-বোন, নিরীহ জনসাধারণ। রক্ত দিয়েছে এ দেশের কৃষক, ছাত্র, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবীরা, রক্ত দিয়েছে ভূতপূর্ব ইপিআর, রক্ত দিয়েছে আনসার, মোজাহেদরা। রক্ত দিয়েছে প্রত্যেকটি বাঙালি, এমনকি সরকারি কর্মচারীরাও রক্ত দিয়েছে এই স্বাধীনতা সংগ্রামে। নিষ্ঠুর বর্বর ইয়াহিয়া খানের খান সেনারা যে অত্যাচার করেছে, জুলুম করেছে, তা থেকে বাংলাদেশের মা-বোনেরা পর্যন্ত নিস্তার পায়নি। লক্ষ লক্ষ মা-বোনকে নির্যাতন করা হয়েছে। এই পশু সেনাদের আচরণের ইতিহাস দুনিয়ায় আর কোথাও নাই।

আজ তাদের কথা আমরা স্মরণ করছি, স্মরণ করতে হয় আমার সহকর্মী সভ্যবৃন্দের কথা, যারা সেই গত নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাদের আনেককেই বন্দি করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে- তাদের নামও ওই প্রস্তাবে রয়েছে, যে প্রস্তাব আমি আপনার মাধ্যমে পরিষদে পেশ করছি।

তাছাড়া এই দেশের জানা-অজানা লক্ষ লক্ষ লোক, আওয়ামী লীগের লক্ষ লক্ষ কর্মী স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যারা আমাদের এই সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন, দলমত নির্বিশেষে যারা স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিয়েছেন, শহীদ হয়েছেন, তাদের ত্যাগের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে।

জনাব স্পিকার সাহেব, আজ স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, এর সঙ্গে সঙ্গে আমি চারটি স্তম্ভকে স্মরণ করতে চাই, যে স্তম্ভকে সামনে রেখে আমাদের দেশের সংবিধান তৈরি করতে হবে। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। আমরা গণতন্ত্র দিতে চাই এবং গণতন্ত্র দিতেই আজ আমরা এই পরিষদে বসেছি। কারণ,আজ আমরা যে সংবিধান দেব, তাতে মানুষের অধিকারের কথা লেখা থাকবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ জনগণের জানমাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে। এমন সংবিধানই জনগণের জন্য পেশ করতে হবে। আজ এখানে বসে চারটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এমন সংবিধান রচনা করতে হবে, যাতে তারা দুনিয়ার সভ্য দেশের মানুষের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। জনাব স্পিকার সাহেব, জাতির কাছে আমাদের একটা কর্তব্য রয়েছে, একটা বিরাট কর্তব্য আছে। আমি আমার বক্তৃতা বড় করতে চাই না। কিন্তু বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য যাঁরা সংগ্রাম করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, তাদের সেই ইতিহাস আজ এখানে পর্যালোচনা না করলেও চলবে। কিন্তু বিশেষ কয়েকজন নেতার কথা স্মরণ করছি, যাঁরা গণতন্ত্রের পূজারী ছিলেন যেমন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, বর্বর পাকবাহিনীর হাতে নিহত ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত। আর কলম দ্বারা সংগ্রাম করেছেন সেই জনাব তোফাজ্জল হোসেন- আমাদের মানিক ভাই। এদের কথা শ্রদ্ধার সাথে আমরা স্মরণ করতে চাই। স্মরণ করি ১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেকটি আন্দোলনের সময় যাঁরা জীবন দিয়েছেন, যাঁরা কারাগারে জীবন কাটিয়েছেন। গণতন্ত্রকে এদেশে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন, তাদের কথা যদি স্মরণ না করি, তাদের ইতিহাস যদি না লেখা হয়, তবে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা জানতে পারবে না এই সংগ্রামের পিছনে কারা ছিলেন।

গত বছর নির্বাচন হলো। সেই নির্বাচনের পূর্ব থেকেই আমাদের জানা ছিল যে, বাংলাদেশ জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকা সত্ত্বেও তারা আমাদের কলোনি এবং বাজার করে রাখতে চায়। শুধু তাই নয়, তারা আমাদের সংস্কৃতি ও ভাষার ওপর আঘাত করছিল, আমাদের নাগরিক অধিকারের ওপর আঘাত করে আমাদেরকে কলোনি করে রাখতে চেয়েছিল। আমাদের সংগ্রাম তখন থেকেই চলছিল। আমরা জানতাম সংগ্রামকে ধাপে ধাপে এদিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এভাবে সংগ্রাম এগিয়ে আজ চরম সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। ২৫ মার্চ তারিখের ইতিহাস আপনাদের জানা আছে। সেইদিন বর্বর পাক হানাদার বাহিনী কোনো আইন-কানুন মানে নাই। কোনো সভ্য দেশে তাদের কাজের তুলনা পাওয়া যায় না। প্রত্যেক সভ্য দেশে যুদ্ধের একটা নিয়ম আছে। কোনোরূপ ওয়ার্নিং না দিয়েই অতর্কিতে কাপুরুষের মতো বাড়ি-ঘরে আগুন লাগিয়ে, দুধের বাচ্চাকে পর্যন্ত হত্যা করে তারা এক জঘন্য লীলায় মেতে উঠেছিল। অর্ডার দিয়েছিল আওয়ামী লীগের লোক, যাকে পাও তাকেই হত্যা করো, কোনোরূপ দয়ামায়া নাই।তাদের জঘন্য কাজ-কারবারের এমন সমস্ত ইতিহাস আমাদের হাতে আছে, যা দেখলে শিউরে উঠতে

হয়। আমাদের হাতে একজন জেনারেলের দস্তখত করা কাগজ ধরা পড়েছে। তাতে আছে লুটপাট করো। এমনকি পাশবিক অত্যাচারের কথাও আছে। বর্বর ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীকে অসহায় ও নিরস্ত্র সাত কোটি বাঙালির ওপর কুকুরের মতো লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেনাবাহিনী যদি যুদ্ধ ঘোষণা করত, তবে আমরা সে যুদ্ধের মোকাবিলা করতে পারতাম। কিন্তু তারা অতর্কিতে ২৫মার্চ তারিখে আমদের আক্রমণ করল। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, আমাদের শেষ সংগ্রম শুরু হয়ে গেছে। আমি ওয়ারলেসে চট্টগ্রামে জানলাম বাংলাদেশ আজ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই খবর প্রত্যেককে পৌঁছিয়ে দেওয়া হোক, যাতে প্রতিটি থানায়, মহকুমায়, জেলায় প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠতে পারে। সেই জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছিলাম। এই ব্যাপারে আত্মসচেতন হতে হবে। দেশবাসী জানেন একই তারিখে দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এটা হাওয়ার উপর থেকে হয় নাই। যদি কোনো নির্দেশ না থাকত, তবে কেমন করে একই সময়ে একই মুহূর্তে সব জায়গায় সংগ্রাম শুরু হলো। তখন যদি আমি ভারত সরকারের বিষয়ে না বলি, তাহলে অন্যায় করা হবে। আমার দেশের জনসাধারণ যখন প্রাণভয়ে ঘর-বাড়ি ছেড়ে, ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষে যায়, তখন ভারতের জনসাধারণ তাদেরকে বুকে টেনে নেয়, ভারতের জনসাধারণ, পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণ, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং আসামের জনসাধারণ, বিশেষ করে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। কারণ তারা আমাদের জনসাধারণকে বুকে টেনে নিয়েছিল।

স্মরণ করি ভারতের সেনাবাহিনীর ওই সমস্ত জোয়ানদের, যাঁরা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে থেকে সংগ্রাম করেছেন। আমি স্মরণ করি রাশিয়ার জনসাধারণ ও সরকারকে, যারা নিশ্চিতভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন। তারা প্রকাশ্যে আমার গ্রেফতারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন এবং বাংলাদেশে ধ্বংসলীলা করার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেছেন। স্মরণ করি গ্রেটবৃটেনের জনসাধারণকে, পশ্চিম জার্মানির জনসাধারণকে, জাপানের জনসাধারণকে, এমনকি আমেরিকার জনসাধারণকে যারা আমাদের আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। যারা সমর্থন করেছিলেন, তাদের সকলকে আমাদের এই গণপরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। এমনকি জাতিসংঘে রাশিয়া তিনটি ভেটো দিয়েছিল, বিশেষ করে, পোল্যান্ড, তাদের প্রত্যেককে এবং তাদের জনসাধারণকে আমি এই পরিষদের মাধ্যমে ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং স্মরণ করতে চাই।

জনাব স্পিকার সাহেব, এসব কথা বলতে গেলে ভাষা আসে না, মানুষ ভাবপ্রবণ হয়ে যায়। সে জন্য এগুলি বলা আমার পক্ষেও কষ্টকর। কারণ, আমি ভাবপ্রবণ হয়ে যাই। আমরা দেখতে পাই আমাদের লক্ষ লক্ষ মা-বোনদের অত্যাচার করা হয়েছে এবং আমাদের হাজার হাজার ছেলে পঙ্গু অবস্থায় রয়েছে, তাদের জন্য কিছুই করতে পারি নাই। আমাদের গ্রামকে-গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে

ছারখার করে দিয়েছে। আমাদের ধন-সম্পত্তি লুটপাট করে নিয়ে গেছে, রাস্তাঘাট ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে, আমাদের কারেন্সি নোট জ্বালিয়ে দিয়েছে। এ রকম কত নির্যাতনই না আমাদের সহ্য করতে হয়েছে এবং তারা যে সহনশীলতা দেখিয়েছেন সে জন্য তাদের যদি আমরা মোবারকবাদ না জানাই তাহলে অন্যায় করা হবে। আর যে সমস্ত দল আমাকে সমর্থন করেছে তাদেরকেও আপনার মাধ্যমে ধন্যবাদ দিতে চাই এবং শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে চাই।

জনাব স্পিকার সাহেব, আমাদের সামনে আজকে বিশেষ কর্তব্য হলো জাতিকে একটা সংবিধান দেয়া এবং যতো তাড়াতাড়ি হয়, সেই সংবিধান দিবার চেষ্টা করা হবে। আমার সহকর্মী ভাইয়েরা, যারা এখানে উপস্থিত আছেন, আপনার মাধ্যমে তাদের সবাইকে বলে দিতে চাই যে, আপনারা গাছতলায় বসে যুদ্ধ করেছেন, না খেয়ে যুদ্ধ করেছেন, পরনের কাপড়ও ছিল না। আমার সহকর্মীদের আত্মীয়-স্বজনের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে, তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। মেম্বারদের যে অধিকার পাওয়ার আছে, সে অধিকার পুরোপুরি দেবার ক্ষমতা আমার নেই। যদি মাইক্রোফোন বিদেশ থেকে আনবার চেষ্টা করতাম, তাহলে তিন মাস সময় লাগত, অনেক দেরি হয়ে যেতো। এই এসেম্বলি ভবন যে অবস্থায় ছিল, তাতে মাত্র ৩০০ মেম্বারের বসার জায়গা ছিল, আজকে সেখানে ৪৫০ জন বসেছেন। যদি এই এসেম্বলি ভবনও না থাকত, তবে গাছতলায় বসেও আমার মেম্বাররা সংবিধান রচনা করতেন-এই সুনিশ্চিত আশ্বাসটুকু দিতে পারি। আজকে আমাদের জনগণ কী অসুবিধায় আছে। তাদের থাকার মতো ঘর নেই, আমরা কিছু দিতে পারছি না, মানুষ কষ্ট করছে। হাজার হাজার লোক বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের সুযোগ-সুবিধা দিতে পারছি না। অর্থ নাই, জনসাধারণকে সুবিধা করে দিতে পারছি না। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন-আপনার কাছে আবার বলছি যে, আমাদের সামনে কর্তব্য হলো সংবিধান তৈরি করা। আমরা প্রোগ্রাম অনুযায়ী আগামীকাল আবার বসব। শুধু যে আমাদের দলীয় সদস্য থেকে কমিটি করবো তা নয়, দলমত নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে আলোচনা করা হবে, জনগণকে যাতে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী একটা সুষ্ঠু সংবিধান দেয়া যায়, এই উদ্দেশ্যে সকলের মতামত চাইব। এই সংবিধানে মানবিক অধিকার থাকবে, যে অধিকার মানুষ চিরজীবন ভোগ করতে পারে। আমরা গত তেইশ বছরে কী দেখেছি-শাসনতন্ত্রের নামে অশাসনতন্ত্র, জনগণের নিরাপত্তার নামে মার্শাল ল', জনগণের দাবি আদায়ের নামে প্রতারণা। আর বাংলাদেশের কথা উঠলেই 'হিন্দুস্থানের দালাল' এই ধরনের কথা সারা জীবন শুনে আসছি। সে সব যাতে এদেশ থেকে উঠে যায়, সে জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে এবং সে বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

জনাব স্পিকার সাহেব, আপনি এই পরিষদের স্পিকার হয়েছেন। আবার আপনাকে জানাতে চাই যে, আমরা একটা গণমুখী সংবিধান তৈরি করতে চাই এবং সেই সঙ্গে এই আশ্বাস দিতে চাই যে, আপনি যতোক্ষণ নিরপেক্ষ থাকবেন,

আমাদের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। আপনার কর্তব্যটুকু আইন ও আপনার বিবেক অনুযায়ী এবং পার্লামেন্টারি কনভেনশন মেনে নিয়ে পালন করবেন, এই আশা করি। আপনি কোন দল বড়, কোন দল ছোট, তা দেখবেন না, কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বিচার ও ইনসাফ করবেন। আমার দলের পক্ষ থেকে আপনাকে পূর্ন সমর্থন ও সহযোগিতা জানাব।

এখানে যে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল, নজরুল ইসলাম সাহেব তা পড়েছিলেন, আবার সংশোধন করে তা পেশ করা হবে। আপনার মাধ্যমে আমার সদস্য ভাইদের ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং আপনাকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি। তারপর এসেম্বলির কর্মচারীরা রাত-দিন পরিশ্রম করে এতো তাড়াতাড়ি যে এই বন্দোবস্ত করতে পেরেছেন, সে জন্য তাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ, আমি জানি তারা মাত্র কয়েক দিনের নোটিশে খুব পরিশ্রম করে এই বন্দোবস্ত করতে পেরেছেন। তারপর আমি ধন্যবাদ জানাই এই রিপোর্টারদের, এখানে যারা কাজ করছেন। তারা যেন পরিষ্কার, সুন্দর করে রিপোর্ট তৈরি করেন, তাতে ভুল-ভ্রান্তি যেন না হয়, কারণ এটা একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে, এই ইতিহাস যেন নষ্ট না হয়। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

জনাব স্পিকার : এই হাউসের সামনে যে প্রস্তাব ছিল তা সংশোধনের পরে যে আকারের হয়েছে, আমি তা পড়ে শোনাচ্ছি। সংশোধিত প্রস্তাব হচ্ছে :

"বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের যে বিপ্লবী জনতা, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী, বীরাঙ্গনা, প্রতিরক্ষা বিভাগের বাঙালিরা, সাবেক ইপিআর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ ও রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী ও বীর মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের রক্ত দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। আজকের দিনে বাংলাদেশের জনগণের ভোটে যথাযথভাবে নির্বাচিত বাংলাদেশ গণপরিষদ সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁদের স্মরণ করছে।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার যে ঘোষণা করেছিলেন এবং যে ঘোষণা মুজিবনগর থেকে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়েছিল এই সঙ্গে এই গণপরিষদ তাতে একাত্মতা প্রকাশ করছে।

স্বাধীনতা সনদের মাধ্যমে যে গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল আজ সে সনদের সঙ্গেও পরিষদ একাত্মতা ঘোষণা করছে।

এক্ষণে এই পরিষদ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সেই সব মূর্ত আদর্শ, যথা জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা, যা শহীদের ও বীরদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তার ভিত্তিতে দেশের জন্য একটি উপযুক্ত সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করছে।"

এই প্রস্তাবের পক্ষে যারা আছেন, তারা 'হ্যাঁ' বলবেন।

সদস্যগণ : (সমস্বরে) 'হ্যাঁ'। ('না' কেহই বলেন নাই)

জনাব স্পিকার : এই প্রস্তাব গৃহীত হলো।

আগেই সিদ্ধান্ত নিই সরকার গঠনের

তাজউদ্দীন আহমদ

সে দিন বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে দেশের মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনায় যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, তা বাংলাদেশ এবং এ দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বার্থেই নিয়েছিলাম। বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা আর বাঁচা-মরার প্রশ্নকে সেদিন সবচেয়ে উঁচুতে স্থান দিয়েই আমি কাজ করে গিয়েছি। আওয়ামী লীগের একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে এবং একজন খাঁটি বাঙালি হিসাবে আমার দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে পালন করতে পারায় আমি খুশি। তবে সামগ্রিক সাফল্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানেরই। আমারা যা করেছি তা তাঁরই নির্দেশিত পথ।

বাংলদেশের এই বিপ্লব কোনো একদিনের ঘটনা নয়। এর জন্য আওয়ামী লীগ বিরোধী দলের ভূমিকায় থেকে দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে বাঙালি জাতিকে ধীরে ধীরে বিপ্লবের দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছে এবং এবাবেই তাদের মানুষিক প্রস্তুতি ঘটিয়েছে। এরপর ২৫ মার্চ রাতে জেনারেল ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনী নিরীহ বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে সমগ্র বাঙালি জাতি তার প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ শপথ নিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হামলা শুরু হওয়ার পর ঢাকা থেকে পালিয়ে আমি জীবননগরে পৌঁছাই। সঙ্গে ছিলেন ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম।

পালিয়ে যাওয়ার পথে এ দেশের মানুষের স্বাধীনতা লাভের যে চেতনার উন্মেষ দেখে গিয়েছিলাম, সেটাই আমাকে আমার ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে অনিবার্য সুযোগ দিয়েছিল। জীবননগরের কাছে সীমান্তবর্তী টঙ্গি নামক স্থানে একটি সেতুর নিচে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে আমি সেদিন সাড়ে সাত কোটি বাঙালির স্বার্থে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তা হলো : একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম পরিচালনার জন্য কাজ শুরু করা।

সেদিন ওই সীমান্তেই মেজর ওসমানের সঙ্গে আমার দেখা। তাঁর কমান্ডে একটি ব্যাটালিয়ন তখন। কিন্তু হাতে সেই সেকেলে রাইফেল। এর বিপরীতে পাকিস্তানি খানসেনাদের হাতে আধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের বিপুল সম্ভার। সেদিন মেজর ওসমানের বাহিনীর কাছে একটি লাইট মেশিনগানও ছিল না। যা হোক ১ এপ্রিলের মধ্যেই আমি কিছু স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র সংগ্রহ করি এবং সেগুলো মেজর ওসমানের হাতে দিয়ে দিই, যা দিয়ে তিনি ওই সীমান্তে পাকিস্তানি বাহিনীর

অগ্রগতি রোধ করেন এবং তাদের হাত থেকে আরও বহু স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দখল করেন।

এরপর ১০ এপ্রিল আমি স্বাধীন বাংলাদেশে সরকার গঠন করি এবং এদিনই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঘোষণা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। ১১ এপ্রিল মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনার জন্য আমি বিভিন্ন সেক্টরের নাম ঘোষণা করে সেক্টর কমান্ডারও নিয়োগ করি।

স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী চুয়াডাঙ্গায় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিই ১৪ এপ্রিল। এ খবরটা পত্রিকায় আগাম প্রকাশ হয়ে পড়ায় বর্বর পাকিস্তানিরা পরের দিনই চুয়াডাঙ্গায় নির্বিচারে বোমা বর্ষণ শুরু করে। ফলে সেখানে বহু লোক হতাহত হয়। এই বোমাবর্ষণের জন্য সেদিন মুক্তিযোদ্ধাদের চুয়াডাঙ্গা শহর ছাড়তে হয়েছিল। এরপর আমরা মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলা নামক স্থানকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী মনোনীত করে এর নাম দিই 'মুজিবনগর'। ১৮ এপ্রিল কর্নেল ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করি। সেই সঙ্গে শুরু হয় মুক্তিবাহিনীতে লোক নিয়োগ। নিয়মিত, অনিয়মিত, আনসার, পুলিশ, যুবক, তরুণ মিলিয়ে মুক্তিবাহিনীর মোট সদস্যসংখ্যা ছিল এক লাখ এক হাজার।

আমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন যুদ্ধ করতে হয়েছিল, তেমনি কূটনৈতিক ফ্রন্টেও যুদ্ধ করতে হয়েছিল। আমাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শেষ করার লক্ষ্য ছিল নভেম্বর মাস। কেননা, আমি জানতাম বাংলাদেশে বর্ষাকাল শেষ হওয়ার পর পানি নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হানাদার বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের পরাস্ত করতে না পারলে আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ সফলকাম হবে না এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাও আসবে না। এ ছাড়া আরও বুঝেছিলাম যে ওই সময়ের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে না যাওয়া হলে মার্কিনরা তার সুযোগ নেবে এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধকে নিয়ে আসবে বাংলার মাটিতে। কেননা, আমেরিকাকে ভিয়েতনাম থেকে সরতেই হবে। আর এ সম্পর্কে আমরা খুবই হুঁশিয়ার ছিলাম।

মার্কিনরা সব সময়ই আওয়ামী লীগের 'র‍্যাংক ও ফাইলে'র মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার কাজে নিযুক্ত ছিল। এ জন্য তারা নানা রকমের গুজব ছড়াত- দলীয় নেতা, উপনেতা ও কর্মীদের মধ্যে। সেদিন তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হলে আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামই যে ব্যর্থ হয়ে যেত, সে কথা জোর করেই বলা যায়। পাকিস্তানি এজেন্টদের চেয়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এজেন্টরা আমাদের বেশি উৎপাত করেছিল। তারা আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিল এবং আমাদের অগ্রগতি সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর রিপোর্ট প্রকাশ করত।

সূত্র : দৈনিক পূর্বদেশ, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২। সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

প্রথম আলো
১৬ ডিসেম্বর ২০১১

স্মৃতিতে মুজিবনগর সরকার

ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম

১০ এপ্রিল। বিমানে আমাদের আগরতলা রওয়ানা হওয়ার কথা। তাজউদ্দীন ভাই, মনসুর ভাই, শেখ মণি, তোফায়েল আহমেদ ও আমি, লর্ড সিনহা রোড থেকে সোজা বিমানবন্দর যাই। অন্যান্যর মধ্যে মি. নগেন্দ্র সিং আমাদের সঙ্গী হলেন। বিমানটি খুবই ছোট, এতে বসার মতো পাঁচ-ছয়টি আসন ছিল। খুব নিচু দিয়ে বিমান উড়ে যাচ্ছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অব্যবহৃত বিমানবন্দরগুলোর একটিতে আমরা নামি; যেটা ছিল বাংলাদেশ সীমান্তের খুব কাছাকাছি। বিমানবন্দরে আমরা দুপুরের খাবার খাই। বিএসএফের মাধ্যমে খবর দেওয়া হলো কোনো আওয়ামী লীগ নেতার খোঁজ পেলে পরবর্তী কোনো বিমান তৈরি রাখতে। উত্তরবঙ্গ তথা রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা অঞ্চলের কোনো নেতা খুঁজে পাওয়া গেল না। তাদের বেশির ভাগ কলকাতা এসে গেছেন। কিছুক্ষণ পর আমরা বাগডোরা বিমানবন্দরে নামি। সেখান থেকে জিপে করে শিলিগুড়ি যাই। শহর থেকে অনেক ভিতরে সীমান্তের খুব কাছাকাছি একটি বাংলোয় উঠলাম। গোলক মজুমদার এখানে আমাদের অভ্যর্থনা জানান। পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী এখানে কোনো একটি জঙ্গল থেকে গোপনে বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে তাজউদ্দীন ভাইয়ের বক্তৃতা প্রচারিত হবে। এ সময় তোফায়েল আহমেদ কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েন। শেখ মণি, কিছু নির্দেশসহ তোফায়েল আহমেদকে কলকাতা পাঠিয়ে দিলেন।

মনসুর ভাইয়ের জ্বর এসে গেছে। তিনি শুয়ে আছেন। আমি তার পাশে বসে আছি। তার সঙ্গে সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর পদ নিয়ে আলাপ করলাম। তিনি মত দিলেন তাজউদ্দীন ভাই প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি কোনো আপত্তি করবেন না। এরপর মনসুর ভাই বা কামরুজ্জামান ভাই প্রধানমন্ত্রীর পদের ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন তোলেননি। পাঁচজন নেতার মধ্যে তিনজনের সঙ্গে আলাপের পর আমার খুব বিশ্বাস হয়েছিল যে, সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দীন ভাইয়ের প্রধানমন্ত্রিত্বে কোনো আপত্তি করবেন না। তা ছাড়া তাকে উপ-রাষ্ট্রপতি করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। এখন বাকি রইলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ। শুধু তিনি আপত্তি করতে পারেন। তবুও চারজন এক থাকলে মোশতাক ভাইকেও রাজি করানো

যাবে। এখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন ভাইয়ের বক্তৃতা করার পালা। তাজউদ্দীন ভাই প্রচারের জন্য চোখে অনুমতি দিলেন। প্রধানমন্ত্রীর রেকর্ড করা বক্তৃতার ক্যাসেট গোলক মজুমদারের কাছে দেওয়া হলো।

শেখ মণি তাজউদ্দীন ভাইয়ের সঙ্গে একান্তে আলাপ করতে চাইলেন। আমি বাইরের ঘরে বিএসএফের আঞ্চলিক কর্মকর্তার সঙ্গে দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের অবস্থা এবং শত্রুদের তৎপরতা নিয়ে আলোচনা করলাম। শেখ মণির সঙ্গে কথা শেষ করে তাজউদ্দীন ভাই আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি জানান, শেখ মণি এখন সরকার গঠনের ব্যাপারে রাজি নন। আগরতলা গিয়ে দলীয় এমপি, এমএলএ ও নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক শেষে শেখ মণি সরকার গঠনের প্রস্তাব করেছেন। আর এটা না করা হলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

আমি সরকার গঠনের পক্ষে যুক্তি দিলাম। আমি বললাম, সরকার গঠন করতে দেরি হলে সংকট আরও বৃদ্ধি পাবে এবং তাতে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। তা ছাড়া সরকার গঠনের পরিকল্পনা তো নতুন কিছু নয়। মনসুর ভাই ও কামরুজ্জামান ভাই তাজউদ্দীন ভাইকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেনে নিয়েছেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও খন্দকার মোশতাকের তখনো দেখা নেই। তারা কোথায়, কী অবস্থায় আছেন, সে খবর এখনো আসেনি। ইতিমধ্যে বন্ধুরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের কিছুটা রাজনৈতিক স্বার্থ গড়ে উঠেছে। সরকার গঠনে বিলম্ব হলে তাও নস্যাৎ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার গঠনের ব্যাপারে আমরা ভারত সরকারকে আশ্বাস দিয়েছি। তাতে বিলম্ব হলে আমাদের নেতৃত্ব সম্পর্কেও তারা সন্দেহ পোষণ করবে। ভারত সরকারও জানে আমাদের বক্তৃতা শিলিগুড়ির এই জঙ্গল থেকে আজ প্রচার হবে। আমার এসব কথা শেখ মণি মানতে রাজি নন। শেখ মণি জানান, তারা বঙ্গবন্ধু থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। অতএব তাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কারও প্রশ্ন তোলা উচিত নয়। এ সময় তাজউদ্দীন ভাই আমাকে বলেন আমি যেন গোলক মজুমদারকে জানিয়ে দিই যে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা আজ প্রচার হবে না। এ ব্যাপারে পরবর্তী সিদ্ধান্ত তাকে যথাসময়ে জানানো হবে।

গোলক মজুমদারকে ফোন করে জানাই যে, আজ বক্তৃতা প্রচার হবে না। এ কথা শুনে তিনি আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, বিলম্ব করা ঠিক হবে? তিনি বলেন, যে মুহূর্তে সব ঠিকঠাক সে মুহূর্তে তা স্থগিত রাখলে সব মহলে যে প্রশ্ন দেখা দেবে তা আমরা ভেবে দেখেছি কি না। ইতিমধ্যে রেকর্ড করা ক্যাসেট নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে গেলে। আমি গোলক মজুমদারকে বললাম, ক্যাসেট যদি পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন, তাহলে প্রচার করে দিন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এই একটি মাত্র সিদ্ধান্ত একা নিয়েছিলাম। এদিন ছিল ১০ এপ্রিল। রেডিও অন করে খেতে বসেছি। খাওয়ার টেবিলে তাজউদ্দীন ভাই ও শেখ মণি আছেন। রাত তখন সাড়ে ৯টা। সেই আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত এলো। ঘোষণায় আমি বলেছিলাম, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বক্তৃতা দেবেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা

প্রচারিত হলো। সারা বিশ্ববাসী শুনল স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বেতার বক্তৃতা। আমাদের সংগ্রামের কথা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল।

বক্তৃতা প্রচারিত হলো। আমাদের তিনজনের মুখে কোনো কথা নেই। আমি শুধু বললাম, গোলক মজুমদার শেষ পর্যন্ত প্রচার বন্ধ করতে পারেননি। মনসুর ভাই ভাত খেয়ে আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তিনি বক্তৃতা শুনতে পাননি। পরে একক সিদ্ধান্তে বক্তৃতা প্রচারের জন্য তাজউদ্দিন ভাইয়ের কাছে ক্ষামা প্রার্থনা করি। তিনি বলেছিলেন, সে সময় আমার সিদ্ধান্তই ঠিক ছিল। সেদিন বক্তৃতা প্রচার না করলে গোলমাল আরও বৃদ্ধি পেত বইকি।

শেখ মণি তাজউদ্দীন ভাইকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাকে প্রধানমন্ত্রী করার ব্যাপারে তিনি আগরতলা গিয়ে সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। কিন্তু আগরতলা দিয়ে শেখ মণি ভারত সীমান্তের কাছাকাছি কসবায় গিয়ে সংসদ সদস্য মমতাজ বেগমের বাড়িতে চলে যান।

তাজউদ্দীন ভাইয়ের বক্তৃতা প্রচারের পর অনেক রাতে কর্নেল (অব.) নুরুজ্জামান (সেক্টর কমান্ডার) ও আবদুর রউফ (রংপুর) আসেন। গভীর রাত পর্যন্ত তাদের সঙ্গে আলোচনা করি। উত্তরবঙ্গে কয়েকটি সেক্টর রয়েছে। একটি সেক্টরের দায়িত্বে রয়েছেন কর্নেল জামান। তারা জানান, গেরিলা কায়দায় আকস্মিক হামলায় শত্রুদের পর্যুদস্ত করা হচ্ছে। আমি অবাঙালিদের ওপর হামলা না করার পরামর্শ দিলাম। অবাঙালি বিহারিদের ওপর জনগণ ক্ষুব্ধ। রংপুর ও সৈয়দপুরে বেশকিছু বিহারি রয়েছে। অবশ্য ইতিমধ্যে হামলা বন্ধ করা হয়ে গেছে। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব হামলা বন্ধের ব্যাপারে চেষ্টা করছেন। অবশ্য অনেকটা শান্ত হয়ে গেছে। আলোচনা করতে করতে রাত প্রায় ভোর হয়ে গেল। ভোরের দিকে তারা দুজন চলে গেলেন। তাদের অনেক কাজ। এক মুহূর্ত সময় নেই। যোদ্ধারা তাদের নির্দেশের অপেক্ষা করছেন, সরকার গঠনে তারা আনন্দ প্রকাশ করলেন।

পরদিন ১১ এপ্রিল নাস্তা করে আমরা বিমানে উঠি। আগের রাতে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার পর থেকেই শেখ মণি চুপচাপ রয়েছেন। বক্তৃতার কথা শুনে মনসুর ভাই উৎফুল্ল। রাতে বিশ্রামের পর কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত মনসুর ভাই অবিশ্রান্ত কাজ করেছেন। প্রধানমন্ত্রিত্বের বিতর্কের অবসান হওয়ায় মনসুর ভাই যেন বেশি খুশি। খুব নিচু দিয়ে আমাদের বিমান উড়ছে। দুই দেশের সংলগ্ন বিমানবন্দরে আমরা স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের খোঁজখবর নিচ্ছি। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে পাওয়া যেতে পারে এমন একটি স্থানে গিয়ে প্রথমে শুনলাম, নেতৃস্থানীয় কাউকে পাওয়া যায়নি। পরে বিএসএফের স্থানীয় অফিসার জানান, ঢালু পাহাড়ের নিচে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও আবদুল মান্নান রয়েছেন। এ কথা শুনে আমরা ইউরেকা বলে আনন্দে লাফিয়ে উঠি।

প্রায় আড়াই ঘন্টা পরে তারা দুজন এলেন। নজরুল ভাইকে জিপ থেকে প্রথমে চিনতে পারিনি। পরে জানলাম ২৫ মার্চের পর থেকে মান্নান সাহেব খুব

কষ্টে দিনকাল কাটিয়েছেন। পাক বাহিনীর ভয়ে দুই দিন টয়লেটে পালিয়ে ছিলেন। টাঙ্গাইল থেকে সড়কপথে হেঁটে ময়মনসিংহ এসেছেন। তিনি একেবারে জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছেন।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম তার গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। আমাদের খবর পেয়ে নজরুল ভাই যথেষ্ট উৎসাহিত হন। নজরুল ভাইকে তাজউদ্দীন ডেকে নিয়ে একান্তে কথা বলেন। গত কয়েক দিনের ঘটনাবলি তাদের অবহিত করা হয়। আমরা বাইরে বসে আছি। সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দীন ভাইকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোবারকবাদ জানান। এসব দৃশ্য দেখে আমরা সবাই উৎফুল্ল হই। আমরা আবার বিমানে উঠি। আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল আগরতলা। আমরা বিমানে আসন গ্রহণ করি। সামনের আসনে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও মনসুর ভাই। নজরুল ভাই বিমানে বসে ঢাকা পালায়নের কাহিনী বর্ণনা করেন। আমাদের আগরতলায় পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ইতিমধ্যে আগরতলায় অনেক নেতা এসে পৌঁছেছেন। কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে দেখা হলো। তার চেহারায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো গোঁফ তিনি কেটে ফেলেছেন। রাতের খাবারের পর নেতার বৈঠকে বসেন। ডা. টি হোসেনের সঙ্গে আলাপ করে জানলাম, মোশতাক সাহেব প্রধানমন্ত্রী পদের প্রত্যাশী। সিনিয়র হিসেবে এ পদ তারই প্রাপ্য বলে তিনি জানান। সারা রাত সলাপরামর্শ হলো। শেষ পর্যন্ত খন্দকার মোশতাক মন্ত্রিসভায় থাকতে রাজি হলেন। তবে একটা শর্ত হলো, তাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালায় দিতে হবে। তাজউদ্দীন ভাই আমাকে এ কথা জানান। সবাই এতে রাজি হলেন। কেননা, একটা সমঝোতার জন্য ব্যবস্থাটা একেবারে খারাপ নয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আগরতলায় অনুষ্ঠিত বৈঠককে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের প্রথম বৈঠক বলা যেতে পারে। তাজউদ্দীন ভাই ও আমার প্রচেষ্টায় যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল বৈঠকে সেগুলোর অনুমোদন দেওয়া হয়। ১৩ এপ্রিল ছোট বিমানে কলকাতা ফিরে গেলাম। মন্ত্রিসভার সদস্য ছাড়াও আবদুস সামাদ আজাদ ও কর্নেল ওসমানী কলকাতা আসেন। অন্যরা রয়ে গেলেন। বাংলাদেশ থেকে ভারতে পৌঁছার ব্যাপারে আমরা দুটি প্রবেশপথ ঠিক করি। এর একটি হচ্ছে আগরতলা। এ পথে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও সিলেটের লোকজন প্রবেশ করবে।

মন্ত্রিসভার আনুষ্ঠানিক শপথের জন্য ১৪ এপ্রিল দিনটি নির্ধারণ করা হয়েছিল। শপথের স্থানের জন্য আমরা চুয়াডাঙ্গার কথা প্রথমে চিন্তা করি। কিন্তু ১৩ এপ্রিল পাক হানাদার বাহিনীর দস্যুরা সেখানে বোমাবর্ষণ করে। আমরা চুয়াডাঙ্গার কথা বাদ দিয়ে নতুন স্থানের কথা চিন্তা করলাম। শেষ পর্যন্ত মানচিত্র দেখে কুষ্টিয়ার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলাকে মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের উপযুক্ত স্থান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। মন্ত্রিসভার শপথের জন্য নির্বাচিত স্থানের নাম আমি, তাজউদ্দীন ভাই, গোলক মজুমদার ও বিএসএফের চট্টোপাধ্যায়

জানতেন। ইতিমধ্যে দ্রুত কতগুলো কাজ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। অনুষ্ঠানের কর্মসূচি নির্ধারণ ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার খসড়া রচনা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে বিশ্বের কাছে নবজাত বাংলাদেশকে স্বীকৃতির আবেদন জানাতে হবে। ১০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী প্রথম যে ভাষণ দেন, তার কপি ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় তৈরি করা হয়েছিল। ইংরেজি কপি বিদেশি সাংবাদিকদের দেওয়া হয়। সবচেয়ে বড় কাজ হলো স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনা করা। ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবীরা আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন দিয়েছেন্ এদিকে শপথ অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি তৈরি করা হচ্ছে। জানা গেল, প্রধান সেনাপতি ওসমানীর সামরিক পোশাক নেই। কিন্তু শপথ অনুষ্ঠানের জন্য তার সামরিক পোশাক প্রয়োজন। বিএসএফকে ওসমানীর জন্য এক সেট সামরিক পোশাক দিতে বললাম। তাদের স্টকে ওসমানীর গায়ের কোনো পোশাক পাওয়া গেল না। সেই রাতে কাপড় কিনে, দর্জি ডেকে তার জন্য পোশাক তৈরি করা হলো।

শপথ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের হাজির করার ভার ছিল আমার ও আবদুল মান্নানের ওপর। ১৬ এপ্রিল আমরা দুজন কলকাতা প্রেসক্লাবে যাই। ১৭ এপ্রিল জাতীয় ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। স্বাধীনতাযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের দিন। সারা রাত ঘুম হয়নি। ভোরের দিকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমদ, এম মনসুর আলী, এ এইচ এম কামরুজ্জামান ও ওসমানী একটি গাড়িতে রওয়ানা হয়ে যান। আমি ও আবদুল মান্নান ভোরের দিকে পূর্ব কর্মসূচি অনুযায়ী কলকাতা প্রেসক্লাবে যাই। সেই ভোরেও ক্লাবে লোক ধরেনি। ক্লবের বাইরেও অনেক লোক দাঁড়িয়ে ছিল। আমি সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে বিনীতভাবে বললাম, আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আপনাদের জন্য একটা বার্তা নিয়ে এসেছি। তাদের জানালাম, স্বাধীন বাংলার মাটিতে বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ প্রহণ করবেন। আপনারা সে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত। কেউ জানতে চাইলেন কীভাবে যাবেন, কোথায় যাবেন। আমি পুনরায় বলি, আমি আপনাদের সঙ্গে রয়েছি, পথ দেখিয়ে দেব। আমাদের গাড়িগুলো তখন প্রেসক্লাবের সামনে। উৎসাহিত সাংবাদিকরা গাড়িতে ওঠেন। তাদের অনেকের কাঁধে ক্যামেরা। ৫০-৬০টি গাড়িযোগে রওয়ানা হলাম গন্তব্যস্থানের দিকে। আমি ও আবদুল মান্নান দুজনই দুই গাড়িতে। আমার গাড়িতে কয়েকজন বিদেশি সাংবাদিক ছিলেন। পথে তাদের সঙ্গে অনেক কথা হলো। শপথ অনুষ্ঠানের নির্ধারিত স্থান আম্রকাননে পৌঁছাতে ১১টা বেজে গেল। অনুষ্ঠানের আয়োজন প্রায় শেষ। মাহবুব ও তওফিক এলাহি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। আগেই ঠিক করা হয়েছিল যে, চিফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার সনদ পাঠ করবেন। এদিকে পাক হানাদার বাহিনীর চাপের মুখে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের পিছু হটতে হয়েছে। সম্মুখসমরে হানাদার বাহিনীর মোকাবিলা করা মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

নির্দেশ সত্ত্বেও দেশমাতৃকার মুক্তিপাগল যোদ্ধারা বাংকার ছেড়ে আসতে রাজি হচ্ছিল না। মাহবুব ও তওফিক তাদের সৈন্যসহ পাক হানাদার বাহিনীর দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড়েছিলেন। তারা সুকৌশলে পিছু হটে আসেন। মনোবল ঠিক রেখে পশ্চাদপসরণ করা একটা কঠিন কাজ। ক্লান্ত-শ্রান্ত মুক্তিযোদ্ধারা বাংকার থেকে উঠে আসে। ওদের চোখেমুখে বিশ্বাসের দীপ্তি বিদ্যমান ছিল। কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হলো। একটি ছোট মঞ্চে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্য, ওসমানী, আবদুল মান্নান ও আমি। আবদুল মান্নান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ইউসুফ আলী স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেন। একজন সাংবাদিকের প্রাশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এই স্থানকে মুজিবনগর নামকরণ করেন। ১৬ ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ পর্যন্ত মুজিবনগর ছিল অস্থায়ী সরকারের রাজধানী।

[লেখাটি ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তৈরি। সূত্র : বিডিএস'৭১]

বাংলাদেশ প্রতিদিন
১৭ এপ্রিল ২০১৫

ইতিহাসের অনন্য দিন

সিরাজ উদ্দীন আহমেদ

১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের আলোচনা চলে। ইয়াহিয়া খানের আলোচনার পেছনো ছিল গভীর ষড়যন্ত্র। তিনি বাঙালিদের হত্যার নীলনকশা-অপারেশন সার্চ লাইট অনুমোদন করে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার ইয়াহিয়া খানের ঢাকা ত্যাগের খবর বঙ্গবন্ধুকে জানিয়ে দেন। বঙ্গবন্ধু দলের নেতাকর্মীদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ২৫ মার্চ রাত ১১টায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ ড. কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে শেষ সাক্ষাৎ করেন। তারা বঙ্গবন্ধুকে বাসভবন ত্যাগ করে সশস্ত্র সংগ্রামের নেতৃত্বের জন্য অনুরোধ করেন। বঙ্গবন্ধু বাসভবন ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। বাধ্য হয়ে রাত ১১টায় তাজউদ্দীন আহমদ, কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নেন। তারা নিরাপদ স্থানে চলে যান। ব্যারিস্টার কামাল হোসেন বাসায় চলে যান এবং সেখানে গ্রেফতার হন। তাজউদ্দীন আহমদ একটি রাইফেলসহ রেলওয়ের সাবেক চিফ ইঞ্জিনিয়ার এমএ গফুরের বাসভবনে আশ্রয় নেন। ২৭ মার্চ গফুর সাহেবের বাসা থেকে তাজউদ্দীন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম পদ্মা পাড়ি দিযে ফরিদপুর পৌঁছেন। তারা ফরিদপুরের এমপি ইমাম উদ্দিনের বাসায় ওঠেন। ফরিদপুর থেকে তারা ২৯ মার্চ ঝিনাইদহে পৌঁছেন। ঝিনাইদহের এসডিপিও ইপিআর কমান্ডার আবু ওসমান চৌধুরী ও মেহেরপুরের এসডিও তৌফিক এলাহী চৌধুরীর সঙ্গে সীমান্ত অতিক্রম করার ব্যাপারে আলোচনা করেন। ৩০ মার্চ সন্ধ্যায় এসডিপিও মাহবুব উদ্দিন ও মেহেরপুরের এসডিও তৌফিক ইলাহী চৌধুরী বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাজউদ্দীন আহমদের নির্দেশ ছিল তারা স্বাধীন দেশের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতে যাবেন। তৌফিক ইলাহী চৌধুরী এবং মাহবুব উদ্দিন ভারতের টুঙ্গি ফাঁড়িতে ক্যাপ্টেন মহাপাত্রের সঙ্গে দেখা করেন। ক্যাপ্টেন মহাপাত্র বিএসএফের উপমহাপরিচালক গোলক মজুমদারকে তাজউদ্দীন আহমদের আগমনের সংবাদ

দেন। গোলক মজুমদার নিজে টুঙ্গি চলে আসেন। এসডিও তৌফিক ইলাহী চৌধুরী এবং এসডিপিও মাহবুব উদ্দিন, তাজউদ্দীন আহমদ ও আমীর-উল ইসলামকে নিয়ে বিএসএফের টুঙ্গি ফাঁড়িতে চলে আসেন। গোলক মজুমদার তাজউদ্দীন আহমদকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন। গোলক মজুমদার তাজউদ্দীন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামকে নিয়ে কলকাতায় যান। ৩০ মার্চ রাতেই বিএসএফের মহাপরিচালক কেএফ রুস্তমজি বিমানে দিল্লি থেকে দমদম বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। কলকাতার আসাম ভবনের বিএসএফের দপ্তর ছিল। তাজউদ্দীন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম আসাম ভবনের অবস্থান করেন। এ সময় তাদের কাপড়-চোপড় ছিল মলিন। তাদের নতুন কাপড়ের ব্যবস্থা করা হয়। ৩১ মার্চ কেএফ রুস্তমজির সঙ্গে বাংলাদেশ নিয়ে তাজউদ্দীন আহমদের আলোচনা হয়। তাজউদ্দীন আহমদের সিদ্ধান্ত ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন। দেশের নাম হবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এবং জাতীয় পতাকায় থাকবে বাংলাদেশের মানচিত্র ও লাল সূর্য খচিত। রুস্তমজি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করে তার সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়। এ সময় ভারতে সরবিন্দু চট্টোপাধ্যায়কে তাজউদ্দীন আহমদের নিরাপত্তা কর্মকর্তা হিসেবে সহায়তা করার ব্যবস্থা করেন। ১৯৭১ সালের ১ এপ্রিল রাশিয়ার একটি মালবাহী বিমানে তাজউদ্দীন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম এবং কেএফ রুস্তমজি দিল্লি যাত্রা করেন। রুস্তমজি তাজউদ্দীন আহমদকে নিরাপদ স্থানে রাখেন। ৩ এপ্রিল রাত ১০টায় দিল্লির ১০ নম্বর সফদার জং রোডে প্রাধানমন্ত্রীর বাসভবনে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। ইন্দিরা গান্ধী প্রথমেই তাজউদ্দীন আহমদকে জিজ্ঞেস করলেন, শেখ মুজিব কেমন আছেন। উত্তরে তাজউদ্দীন বললেন, তিনি আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং নিরাপদ স্থানে অবস্থান করে আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন। পরের দিন ৪ এপ্রিল ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদের একক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনান্তে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১. স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হবে এবং সরকারকে ভারতে অবস্থানের অনুমতি দেওয়া হয়; ২. সরকার পরিচালনায় সহায়তা প্রদান ৩. মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র প্রদান। বাংলাদেশের জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়। ৪. বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ৫. যোগাযোগের জন্য একটি বিমান প্রদান; ৬. মুক্তিযোদ্ধাদের সংবাদ প্রচারের জন্য বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা; ৭. মুক্তিযোদ্ধাদের পর্যাপ্ত অস্ত্র সরবরাহ করা। দিল্লিতে তাজউদ্দীন আহমদ, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ড. রেহমান সোবহান ও অধ্যাপক আনিসুর রহমানের সঙ্গে দেখা হয়। তারা স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের বিষয় প্রধানমন্ত্রী ভাষণ চূড়ান্ত করেন। এ ভাষণ রেকর্ড করে ৭ এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম কলকাতায় চলে আসেন। ভারত সরকার একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল নরেন্দ্র

সিংকে তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে নিযুক্ত করেন। কলকাতায় তাজউদ্দীন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রে খসড়া প্রনয়ন করেন এবং তাজউদ্দীন আহমদ তা অনুমোদন করেন। কলকাতায় হাইকোর্টের বিখ্যাত আইনজীবী সুব্রত রায় চৌধুরী এ খসড়া দেখে একমত পোষণ করেন। ১০ এপ্রিল খসড়া স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করা হয়।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল কুষ্টিয়ার সীমান্তে বাংলাদেশ থেকে আসা এমএনএ এবং এমপিদের সঙ্গে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বাংলাদেশ সরকার গঠন দিয়ে আলোচনা হয়। এমএনএ এমপিদের কয়েকজন বঙ্গবন্ধুর ভাগিনা শেখ ফজলুল হক মনির সঙ্গে বিপ্লবী পরিষদ গঠনের প্রস্তাব দেন। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম এবং তাজউদ্দীন আহমদ একটি স্বাধীন সরকার গঠনের পক্ষে জোরালো ভাষণ দেন। সরকার গঠনে খন্দকার মোশতাক আহমদ ষড়যন্ত্র করেন এবং তিনি নিজে প্রধানমনন্ত্রী হতে চান। পরিশেষে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে থাকতে রাজি হন। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল এমএনএ-এমপিএ গণঐক্যমত পোষণ করে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন। সরকারে ছিলেন : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত) তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ, এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামরুজ্জামান।

১০ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ির একটি জঙ্গল থেকে বেতারে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের ভাষণ প্রচারিত হয়। এ ভাষণ ১১ এপ্রিল আকাশ বাণী থেকে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। সরকার গঠনের সংবাদ শুনে সার বাংলায় আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। ১১ এপ্রিল কর্নেল এমএজি ওসমানীকে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। ১৩ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ আগরতলায় সংসদ সদস্যদের নিয়ে সভা করেন। সংসদীয় সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলো গৃহীত হয় :

১. বাংলাদেশ সরকারের নাম হবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২. সংসদীয় পদ্ধতি সরকার হবে। রাষ্ট্রপতি হবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হবেন তাজউদ্দীন আহমদ। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করা হয়। স্বাধীনতা ঘোষণা ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ অনুমোদন করা হয়। অধ্যাপক ইউসুফ আলী শপথ পড়াবেন। মুক্তিফৌজকে মুক্তিবাহিনী নামকরণ। বাংলাদেশের রাজধানীর নাম হবে মুজিবনগর। বাংলাদেশকে ৫টি সেক্টরে ভাগ এবং কমান্ডার নিয়োগ।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ১৯৭১ সালের ১৩ এপ্রিল বাংলাদেশ বেতার থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঘোষণা দেন। বেতার ভাষণে তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধরত। ১৪ এপ্রিল সিদ্ধান্ত হয়েছিল চুয়াডাঙ্গায় বাংলাদেশ সরকারের শপথ অনুষ্ঠান হবে। কিন্তু ১৪ এপ্রিল পাকবাহিনীর চুয়াডাঙ্গা দখল

করায় মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৬ এপ্রিল কলকাতা প্রেস ক্লাবে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা করেন। ১৭ এপ্রিল ভোরে মুজিবনগর যাত্রার ব্যবস্থা করেন। ৫০টি গাড়িতে সাংবাদিক এবং বাকি ৫০টি গাড়িতে সংসদ সদস্যরা ১৭ এপ্রিল ১১টায় কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলায় গ্রামের আম্রকাননের বাংলাদেশ সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

১৭ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শপথ অনুষ্ঠিত হয়। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ, এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামরুজ্জামান। শপথ অনুষ্ঠানে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী মন্ত্রিসভার শপথ পড়ান। মন্ত্রিসভাকে গার্ড আব অনার প্রদান করেন ঝিনাইদহের এসডিপিও মাহবুব উদ্দিন আহমেদ। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অভিবাদন গ্রহণ করেন। শপথ অনুষ্ঠানের পর সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনে ভারতের বিএসএফের মহাপরিচাল কেএফ রুস্তমজি ও গোলক মজুমদার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারা মূলত তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সক্ষাতের এবং স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের ব্যবস্থা করেন। রুস্তমজি আজ আমাদের মধ্যে বেঁচে নেই। আমরা এ মহান ব্যক্তিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের মূল দায়িত্ব পালন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবং সংসদ সদস্য ব্যারিস্টর আমীর-উল ইসলাম। তাদের সীমান্ত অতিক্রমে সহযোগিতা করেছেন মেহেরপুরের এসডিও তৌফিক এলাহী চৌধুরী এবং ঝিনাইদহের এসডিপিও মাহবুব উদ্দিন আহমেদ। ১৭ এপ্রিল দিবসটি জাতীয়ভাবে পালন করা হয়। এ দিবসে সেদিন সরকার গঠনে যারা ভূমিকা রেখেছেন, তারা সবাই বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

দৈনিক সমকাল
১৭ এপ্রিল ২০১৫

মুক্তিসংগ্রামের অনন্য দলিল

ড. হাসিবুল আলম প্রধান

১০ এপ্রিল, ১৯৭১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অনন্য ঐতিহাসিক দিন। ঐদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করা হয় এবং যার ওপর ভিত্তি করে ঐদিনই মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের এক বেতার ভাষণের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের একটি স্বাধীন সরকারের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এ বেতার ভাষণটি প্রথম রাত সাড়ে ৯টায় আকাশবাণীর একটি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয় এবং পরে আকাশবাণীর বিভিন্ন কেন্দ্র এবং স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ১১ এপ্রিল পুনঃপ্রচার করা হয়। এ সরকারই আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় শপথ নেয়। এ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠনে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র পাঠ করে শোনান অধ্যাপক ইউসুফ আলী। মুক্তিযুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে এবং শেখ মুজিবের আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করতে শপথ গ্রহণ শেষে তাজউদ্দিন আহমেদ বৈদ্যনাথ তলার নামকরণ করেন মুজিবনগর।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সার্বভৌম গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ঘোষণাপূর্বক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতোপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করার মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করে একটি বৈধ সরকারের অধীনে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করার প্রক্রিয়া শুরু করে এবং ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ মুজিবনগরে সমবেত হয়ে শপথ গ্রহণ করেন। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম মন্ত্রিসভার শপথ পাঠ করানোর পর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। সংবিধান প্রণীত হওয়ার শুরু থেকেই সংবিধানের অন্য যে কোন বিধান সত্ত্বেও চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত বিধানাবলী ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী হিসেবে বিবেচিত হবে। চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত ত্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী সংক্রান্ত ১৫০ অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ ৩(১) অনুযায়ী বলা হয় যে, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হতে এই সংবিধান প্রবর্তনের তারিখের মধ্যে প্রণীত বা প্রণীত বলে বিবেচিত সকল আইন,

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বা যে কোন আইন হতে আহরিত বা আহরিত বলে বিবেচিত কর্তৃত্বের অধীন অনুরূপ মেয়াদের মধ্যে প্রযুক্ত সকল ক্ষমতা বা কৃত সকল কার্য এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হলো এবং তা আইনানুযায়ী যথার্থভাবে প্রণীত, প্রযুক্ত ও কৃত হয়েছে বলে ঘোষিত হলো। অর্থাৎ সংবিধানের শুরু থেকেই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য মৌলিক অংশ। সংবিধানের পরিশিষ্ট-১ এর মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রটি (অনূদিত) সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত আছে সংবিধানের শুরু থেকেই। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল ইংরেজীতে প্রণীত Proclamation of independence যা মুজিবনগরে ঘোষিত ও জারিকৃত তা ২৩ মে ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। শুধু তাই নয়, বিএনপি সরকারের সময় যে সংবিধান অনুসরণ করা হয়েছে সেখানেও স্বাধীনতার ঘোণাপত্র সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য মৌলিক অংশ হিসেবেই বলবৎ ছিল। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন ২০১১ এর ৫০ ধারা বলে ১৫০ অনুচ্ছেদটিকে নতুনভাবে প্রতিস্থাপিত করে এবং যেটি এখন পরিবর্তিতরূপে বর্তমান সংবিধানে বহাল রয়েছে। বর্তমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(১) এ বলা হয়েছে যে, এই সংবিধানের অন্য কোন বিধান সত্ত্বেও ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে এই সংবিধান প্রবর্তনকালে সংবিধানের চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত বিধানাবলী ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী হিসেবে কার্যকর থাকবে।

তাজউদ্দিন আহমদের মৌলিক কিছু নির্দেশনার ভিত্তিতে ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি রচনা করেন। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারির মাধ্যমে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ এবং একটি সরকার গঠনের বিষয়টি আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিবেচনা করে তাজউদ্দিন আহমদ তা কোন একজন খ্যাতিসম্পন্ন আইনবিদকে দিয়ে দেখিয়ে নিতে বলেন। ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি কলকাতার প্রখ্যত ব্যারিস্টার সুব্রত রায় চৌধুরীকে দেখালে তিনি এটিকে যথার্থ ও অপরিবর্তনীয় বলে উল্লেখ করেন। আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায যে, ১৭৭৪ সালে আমেরিকাতে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এক ধরনের বৈপ্লবিক আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি হলে ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই Declaration of Independence নামক সনদ ঘোষণার মাধ্যমে তা পূর্ণতা পায়। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রেই বলা হয় কোন ক্ষমতাবলে এবং প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন, কোন ক্ষমতাবলে একটি গণপরিষদ গঠন করে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র প্রষ্ঠিতা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতোপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করা হলো তাও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রেই উল্লিখিত আছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি তারও উল্লেখ রয়েছে এ অনন্য সাংবিধানিক দলিলে।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (অনূদিত) স্পষ্টভাবে বলা আছে যেহেতু একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশ অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জনকে নির্বাচিত করেন, এবং যেহেতু সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ তারিখে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করেন, এবং যেহেতু এই আহূত পরিষদ-সভা স্বেচ্ছাচারী ও বেআইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়, এবং যেহেতু পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা অব্যাহত থাকা অবস্থায় একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে, এবং যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার ত লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬ মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করে এবং বাংলাদেশ মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান, এবং যেহেতু একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনায় পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ, অন্যান্যদের মধ্যে, বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের ওপর নজিরবিহীন নির্যাতন ও গণহত্যার অসংখ্য অপরাধ সংঘটন করিয়াছে এবং এখনও অনবরত করিয়া চলিতেছে, এবং যেহেতু পাকিস্তান সরকার একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়া, গণহত্যা করিয়া এবং অন্যান্য দমনমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের পক্ষে একত্রিত হইয়া একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং নিজেদের মধ্যে একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে, এবং যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী উদ্দীপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর তাহাদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সেহেতু আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে, নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে এবটি গণপরিষদ গঠন করিলাম এবং পারস্পরিক আলোচনা করিয়া, এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিকমর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে, সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং তদ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতোপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম।

বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া ও তাঁর পুত্র তারেক রহমানসহ কিছু জ্ঞানপাপী জিয়াউর রহমানকে কখনও স্বাধীনতার ঘোষক আবার কখনও প্রথম রাষ্ট্রপতি দাবি করে সংবিধানের প্রতি চরম অবমাননা ও অবজ্ঞা প্রদান করছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের

প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত করে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিভ্রান্তির বীজ বপনের গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। বিএনপির এ ষড়যন্ত্র নতুন কিছু নয়। মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তিমূলে আঘাত হানতে এবং মুক্তিযুদ্ধের শাশ্বত সত্য ইতিহাসকে বিকৃত করতে ২০০৪ সালে বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোট সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস : দলিলপত্র গ্রন্থের ৩য় খন্ডে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর পরিবর্তে জিয়াউর রহমানের নাম উল্লেখ করেছিল। তখন জোট সরকারের এই ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে জনস্বার্থে মামলা হলে ২১ জুন ০৯ তারিখে বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক ও বিচারপতি মমতাজ উদ্দিনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের সাংবিধানিক মৌলিকত্ব তুলে ধরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে রায় দিয়ে ইতিহাসের প্রকৃত সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই রায়ের মাধ্যমে ২০০৪ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস : দলিলপত্র গ্রন্থের ৩য় খণ্ড আইন ও সংবিধান পরিপন্থী ঘোষণা করে বাতিল করা হয়। রায়ে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে, ২৬ মার্চ প্রত্যুষে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন যা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা আছে। সংবিধানের ১৫০ অনুচ্ছেদে এই ঘোষণাকে সাংবিধানিক মৌলিকত্ব দেয়া হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৭ এপ্রিল ২০১৫

জেনারেল জিয়া দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি : একটি হাস্যকর বক্তব্য

সৈয়দ মাহবুবুর রশিদ

এতোদিন বলা হতো জেনারেল জিয়া স্বাধীনতার ঘোষক। ক'দিন আগে তারেক জিয়া এবং জেনারেল জিয়ার এক সময়ের একান্ত সচিব কর্নেল অলি আহমেদ এর সঙ্গে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। তারা উভয়ে বলেছেন যে, জিয়া বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি। এতোদিন বিএনপির ওয়েবসাইটে তাকে সপ্তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেখানো হয়েছে। এটি বন্ধ ছিল কয়েকদিন ধরে। বোধহয় সংশোধন করা হবে।

স্বাধীনতার কোনো একক ঘোষক থাকে না। স্বাধীনতার স্থপতি থাকেন। অনেক সময় জাতির জনক বলা হয়। একটি জাতি স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করে। বাংলাদেশ ১৯৫২ সাল থেকে রক্ত দিতে শুরু করেছে। প্রথমে ভাষার জন্য, পরে স্বাধিকার এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বাধীনতার জন্য অনেক রক্ত দিয়েছে। বলা নেই কওয়া নেই, একজন নিম্ন-মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন, আর স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। বাংলার মানুষ পাকিস্তানকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন ১ মার্চ, ৭১। যে মুহূর্তে তৎকালীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া রেডিওতে বললেন যে, ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে অফিস-আদালত, কলকারখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব জায়গা থেকে লোকজন বেরিয়ে স্লোগান দিলো, 'সব কথার শেষ কথা, বাংলার স্বাধীনতা'। ঢাকা স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ চলছিল, সেটিও বন্ধ হয়ে গেলো। ১৯ মার্চ, ৭১-এ জয়দেবপুরে প্রতিরোধ যুদ্ধে যারা শহীদ হলেন তাদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিসৌধ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে জয়দেবপুর চৌরাস্তায়। জনগণ পাকবাহিনীর যাত্রাপথে বাঁধা দিয়েছিলেন। ২৫ মার্চ '৭১-এ পাকবাহিনী ঢাকায় হামলা শুরু করে। সে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাবনা, কুষ্টিয়াসহ বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়। ২৬ মার্চ ৭১-এ কাকডাকা ভোরে সিরাজগঞ্জের মহকুমা প্রশাসক শহীদ শামসুদ্দিন প্রতিরোধ যুদ্ধের ঘোষণা দেন। আমি তখন এই মহকুমার রায়গঞ্জ থানার ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি আমাকে জানানোর পর আমিও তার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করি। থানার সব অস্ত্র তরুণদের মাঝে বিলিয়ে দেই।

চারদিকে থেকে শতশত জনতা এসে সমবেত হয়ে প্রতিরোধ সংগ্রামের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ২৬ মার্চ সারাদিন পাকিস্তান রেডিও রেকর্ড বাজিয়ে কাটালো। রাত আটটায় জেনারেল ইয়াহিয়া জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। সেখানে তিনি একটি নাম উল্লেখ করলেন যাকে তিনি শাস্তি দেবেন। আর নামটি হলো শেখ মুজিবুর রহমান। জেনারেল জিয়া মেজর জিয়া হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন ২৭ মার্চ। ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের নামটি কি তামাশা করার জন্য উচ্চারণ করেছিলেন। যাহোক জাতি মুক্তিযুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু করেছে প্রথম প্রহর থেকে যখন পাকিবাহিনী হামলা করে। জেনারেল জিয়া প্রথম ঘোষণায় নিজেকে অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন। পরে সংশোধন করে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, তিনি আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামে ঘোষণা দিচ্ছেন। প্রথম যে কাজটি করেছেন তার একাধিক কারণ থাকতে পারে, প্রথমত আবেগের বশে এমনটি হয়েছে অথবা কাকুল সিনড্রমের কারণে। কেননা কাকুল মিলিটারি একাডেমিতে একটি শিক্ষা দেয়া হয় তাহলো অবৈধভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা। কালুরঘাট স্বাধীন বেতার কেন্দ্র চালু করার অন্যতম উদ্যোক্তা মরহুম বেলাল মোহাম্মদ বলেছেন যে, একজন সামরিক অফিসারকে ঘোষণা পাঠ করানোর উদ্দেশ্য হলো সশস্ত্র বাহিনীতে কোনো বিভ্রান্তি না হয়, তারা যেন নির্দ্বিধায় যুদ্ধে অংশ নেয়। বেলাল ভাইদের এখানেই ভুল ছিল। তখন কোনো বাঙালির মনে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। তারা ১ মার্চ পাকিস্তানকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর ৭ মার্চ '৭১-এ বঙ্গবন্ধুর সেই কথা 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বাঙালিকে কর্মস্থির করতে সাহায্য করেছে।

আমি লেখার শুরুতে বলেছি যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের সিদ্ধান্ত জাতির। তাদের অনুমোদিত ব্যক্তি বা দল জনগণের পক্ষে। সেই কথাটি বলতে পারেন। বঙ্গবন্ধু তাদের অনুমোদিত ব্যক্তি। '৭১-এর ৭ মার্চের পূর্বে বঙ্গবন্ধু তো 'স্বাধীনতা' কথাটি উচ্চারণ করেননি। সেদিন করেছিলেন কেননা সেদিন রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত লাখো জনতার চোখের ভাষা তিনি বুঝেছিলেন। সেই ভাষা হলো, 'মুজিব স্বাধীনতার কথা বলো'। তিনি তাই করলেন। এরপর জনগণ আর ফিরে তাকাননি। পাকবাহিনী তাদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে কিন্তু জনতাকে স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে নিবৃত্ত করা যায়নি।

সংবিধান জাতির পবিত্র দলিল। সর্বোচ্চ আইনের উৎস। সেখানে প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে 'আমরা বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া (জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের) মাধ্যমে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।' সংবিধানে এই কথা লিপিবদ্ধ করার পর আর ঘোষকের সুযোগ কোথায়। তবে হ্যাঁ, আমরা জানি যে, অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য ঘোষণা করা হয়, তাদেরকে অনুষ্ঠান ঘোষক বলা হয়, সে সময় ভিন্ন লোক ভিন্ন অবস্থান থেকে স্বাধীনতার যুদ্ধের কথা জনগণকে অবহিত করেছেন। আমিও তো মহকুমা প্রশাককের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু

হওয়ার ঘোষণাটি রায়গঞ্জে উপস্থিত জনতাকে অবহিত করেছিলাম। সম্ভবত ১৮ এপ্রিল '৭১ কলকাতায় অবস্থিত পাকিস্তান ডেপুটি হাই কমিশন অফিসের বাঙালি ডেপুটি হাই কমিশনার হোসেন আলী সদলবলে পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করে। সেই সময় আকাশবাণীতে সাক্ষাৎকালে হোসেন আলীর স্ত্রী বলেছিলেন, যখন তিনি জানলেন যে, পাকবাহিনী নির্বিচারে গণহত্যা চালাচ্ছে, তখন তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। আবেগের তাড়নায় ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলেন তাই এই ভাবে বলেছিলেন। তিনিও তো স্বাধীনতার ঘোষক, তাই না।

এবার আমি আমাদের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির উপাখ্যানে তৎকালীন মেজর জিয়া ২৭ তারিখে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। তবে প্রথমে নিজেকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন এবং পরে সংশোধন করেছেন যার ফলে ঘটনার সেখানে পরিসমাপ্তি ঘটে। এরপর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে তিনি রামগড় সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। কোথায় তার শপথ বা কিসের কর্তৃত্ব গ্রহণ। ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা নিজেদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠন করেন এবং স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র জারি করা হয়। সেখানে বলা হয় যে, বঙ্গবন্ধু প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপতি। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে এই ঘোষণা অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সদস্যরা শপথ নেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী। অন্যান্য মন্ত্রীরা হলেন- এম মনসুর আলী, এ এইচ এম কামরুজ্জামান এবং খন্দকার মুশতাক আহমেদ, তৎকালীন কর্নেল এবং পরবর্তীতে জেনারেল এমএজি ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ দেয়া হয়। শুরু হলো বাংলাদেশ সরকারের যাত্রা। বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে প্রত্যেক সেক্টরের জন্য একজন করে সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ দেয়া হয়। জেনারেল জিয়াও একজন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। মজিবনগর সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এবং কর্তৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। ১ কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাদের নেতৃত্ব দেন তাজউদ্দীন আহমদ। চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। গোটা মুসলিম বিশ্বও বিপক্ষে ছিল। তাদের মোকাবিলা করতে হয়েছে ভারত এবং বাংলাদেশকে যৌথভাবে। পরিশেষে ৬ ডিসেম্বর '৭১-এ ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার পর যৌথবাহিনী গঠন করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর রমনা রেসকোর্স ময়দানে পাকবাহিনী যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। ২৬ মার্চ '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে স্থায়ীভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। অস্ত্রের অভাবে প্রতিরোধ ভেঙ্গে যায়। এপ্রিলের শেষে পাকবাহিনী গোটা দেশে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে।

মুজিবনগর গঠন হওয়ার পর প্রতিরোধ এবং গেরিলা হামলার জন্য বিভিন্নরকম পরিকল্পনা নেয়া হয়। সীমান্তে ইয়ূথ ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত করে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার গঠনের পর বিভিন্ন দূতাবাস থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকরা পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি অনুগত্য প্রকাশ করেন। বাংলাদেশ সরকার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে লন্ডনে একটি মিশন অফিস খোলে। সরাসরি কূটনৈতিক স্বীকৃতি না থাকলেও বিশ্বজনমত গঠনে এবং নানারকম সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এবং তার অন্য সহকর্মীরা। তাদের ভেতর ছিলেন তৎকালীন তরুণ কূটনীতিক মহিউদ্দিন আহমেদ। তিনি পরবর্তীতে সচিব হয়েছিলেন এবং এখন প্রগতিশীল সাহসী কলামিস্ট।

যেসব কথা বললাম, এসব অনেকের জানা। তবুও বলতে হলো যে, একটি দেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে বিজয় অর্জন সহজ কথা নয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক খড়কুটো পুড়াতে হয়। ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার। মুখের সামনে রেডিও পেয়ে ঘোষণা দিয়ে রাষ্ট্রপতি হওয়া যায়। আর সেই ঘোষণা দেয়ার অথরিটি থাকতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা যিনি বলেছিলেন তিনি তো সংশোধন করেছেন। এরপর অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে এসব প্রসঙ্গ তুলে তর্ক-বিতর্ক তোলা হাস্যকর ছাড়া আর কিছু নয়। দেশে বহু সমস্যা রয়েছে যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করর এবং কথা বলার সুযোগ রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের শুরুতে বলা হয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ এই সংবিধান প্রণয়ন করেছে। অর্থাৎ জনগণই সংবিধানের উৎস এবং চালিকাশক্তি। আমাদের সংবিধান তো একই ধরনের কথা।আর আমাদের প্রথম সরকার গঠিত হয় ১৭ এপ্রিল ১৯৭১-এ। এর বাইরে উল্টাপাল্টা কথাবর্তা কাম্য নয়। বিশ্বের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, এটিও প্রতিষ্ঠিত।

ভোরের কাগজ
৫ এপ্রিল ২০১৪

‘ঘোষক’ এবং ‘প্রথম রাষ্ট্রপতি’ সমাচার

আবুল খায়ের

সম্প্রতি বেগম খালেদা জিয়া ও তার পুত্র তারেক জিয়া নতুন কুতর্ক উস্কে দিয়ে বলেছেন, তাঁর পিতা বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করার এমন প্রচেষ্টা স্বাধীন বাংলাদেশে নতুন নয়। ৩০ লাখ শহীদের রক্তে লেখা সংবিধান ও সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করার কুকর্মটি দীর্ঘদিন ধরেই বিএনপির নেতৃবৃন্দ চালিয়ে আসছেন। আগে চলেছে রাষ্ট্রীয়ভাবে। এখন সেটি চলছে দলটির অর্বাচীন নেতৃবৃন্দ কর্তৃক বিভিন্ন সভা-সেমিনারে। মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির এসব হীন প্রচেষ্টা অনৈতিক-অসাংবিধানিক এবং সেহেতু দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচ্য হওয়া জরুরী।

১৯৭১-এর ১০ এপ্রিলে ঐতিহাসিক মুজিবনগরে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ গণপরিষদে, প্রণীত, গৃহীত ও ঘোষিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সাংবিধানিক দলিল ‘স্বাধীনতার পত্র’তে স্পষ্ট উল্লেখ আছে,‘যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর তাদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যে ম্যান্ডেট দিয়েছে সে ম্যান্ডেট মোতাবেক আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, আমাদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠন করে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে, এবং যেহেতু আমরা বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী ঘোষণা করছি এবং এর দ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা অনুমোদন করছি এবং এতদ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন; ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী থাকবেন এবং তাঁর কর ধার্য ও অর্থব্যয়ের ক্ষমতা থাকবে এবং বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল

ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হবেন।' সুতরাং, জনপ্রতিনিধিদের সম্মিলিত ভোটে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদকে পদায়িত হয়েছিলেন তা সুস্পষ্টভাবে ইতিহাসে উল্লেখ আছে। যে বা যারা এই ঐতিহাসিক বৈধ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তথা সাংবিধানিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বলেন তারা শুধু ইতিহাস বিকৃতি করেন না, সংবিধান লঙ্ঘন করেন।

আদতে 'স্বাধীনতার ঘোষক', 'স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি'-এসব বলার আসল উদ্দেশ্য হলো কোন না কোনভাবে জিয়াউর রহমানের নামটি আলোচনার টেবিলে সচল রাখা। তাতে ইতিহাস সংবিধান লঙ্ঘিত হলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু কেন এই নীচ এবং হীন প্রচেষ্টা? আসলে খতিয়ে দেখা দরকার কে এই মেজর জিয়া?

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে জিয়াউর রহমান পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন এবং যুদ্ধ শেষে পাক সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বীরত্বের পদক "হিলাল-ই-জুরাত" পদক জোটে তার ভাগ্যে। (সূত্র : উইকিপিডিয়া ও পাক ডিফেন্স ফোরাম)। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত জিয়াউর রহমান অখ্যাত কোন মেজর ছিলেন না। তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অনুগত এবং প্রচণ্ডরকম ভারতবিদ্বেষী ও মুজিববিদ্ধেষী ছিলেন। তার প্রমাণ তিনি রেখেছেন প্রতি পদে পদে।

জিয়াউর রহমান ১৯৬৮-৬৯-এ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যদের মামলা'য় পাকিস্তান সামরিক সরকারের কৌসুলি কর্নেল মুস্তাফিজুর রহমানের সহকারী ছিলেন। কথিত আছে বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে সামরিক সরকারের পক্ষে কথা আদায়ে এই দু'জন বঙ্গবন্ধুকে জেরা ও নির্যাতন করেন। (সূত্র : জেনারেল জিয়ার রাজনীতি, আবীর আহাদ)।

১৯৭১-এর ২৬ মার্চ 'স্বাধীনতার ঘোষণা' বেতারে সম্প্রচারের জন্য যখন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের উদ্যোক্তাগণ জ্যেষ্ঠ বাঙালি সামরিক কর্মকর্তার খোঁজ করছিলেন তখন বাঙালি নিধনে সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাসের দায়িত্ব পালনে প্রেরিত হয়েছিলেন মেজর জিয়া। কনিষ্ঠ বাঙালি সামরিক কর্মকর্তারা তাকে পথ থেকে ধরে এ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে হাজির করেছিলেন। (সূত্র : স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, বেলাল মোহাম্মদ)।

বাঙালি জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের চূড়ান্ত এক সন্ধিক্ষণে ঘটনাচক্রে সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আজ তিনি হয়ে উঠেছেন 'স্বাধীনতার ঘোষক'। প্রথমবার স্বাধীনতার ঘোষণার খসড়ায় নিজকে 'অথরিটি' ঘোষণা করলে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের চাপের মুখে তা প্রত্যাহার করে পরে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ও অধীনে ঘোষণা পাঠ করেন। এটি ছিল পরিষ্কার অসততা এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা মাত্র।

মেজর জিয়ার কুকীর্তির কিছু কথা সংযোজিত হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর ধারাক্রম পূর্ণতা পারে। ১৯৭১-এর ২৫

মার্চ রাত ১০.৩০ মিনিট ঢাকায় 'অপারেশন সার্চলাইট' অনুযায়ী পাকবাহিনী কর্তৃক পূর্বপরিকল্পিত গণহত্যা শুরু হলে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের সিগন্যাল কোরের বাঙালি সেনিকরা সে খবর প্রথম জানতে পায় এবং তারা একত্রে সমবেত হযে সদলবলে রাত ১২.৩০ মিনিটে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে। তখন চট্টগ্রাম সেনানিবাসে বাঙালি সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ১৮০০ জন্ এ সময় তারা খবর পায় সেনানিবাসের উর্ধ্বতন বাঙালি অফিসার বিগ্রেডিয়ার মজুমদারকে পাকবাহিনী ইতোমধ্যে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গেছে। এ সংবাদে বাঙালি সৈনিকরা আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং পাক সৈনিকদের বন্দী অথবা কোনরকম বাঁধা পেলে হত্যার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তখন রাত ১টা থেকে ১.৩০ মিনিটে ২য় ইস্ট বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার লে.ক. জানজুয়া তার অধস্তন টুআইসি মেজর জিয়াকে যে কোন কৌশলে বাঙালি সৈনিকদের বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ দেন। বসের নির্দেশনানুযায়ী পাক আর্মি ইন্টেলিজেন্সের বিশ্বস্ত ও চৌকস কর্মকর্তা মেজর জিয়া বাঙালি সৈনিকদের উদ্দেশ্য করে তাৎক্ষণিক এক আবেগময় বক্তৃতায় তার অধীনস্ত সৈনিকদের অস্ত্র সমর্পণের অনুরোধ জানান এবং বলেন, বিদ্রোহ করার প্রয়োজন হলে তা আমার নেতৃত্বেই হবে এবং জীবন দেয়ার প্রয়োজন হলে সর্বপ্রথম আমিই জীবন দেব। সুতরাং, অপনারা অবিলম্বে অস্ত্র সমর্পণ করে বিশ্রামে যান। বাঙালি সৈনিকরা তাদের উর্ধ্বতন বাঙালি এই অফিসারের আবেগপ্রবণ কথায় বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করে অস্ত্র সংবরণ করে এবং ঘুমাতে যায়। রাত ২ থেকে আড়াইটার দিকে নিরস্ত্র, ঘুমন্ত ১৮০০ বাঙালি সৈনিকের ওপর মাত্র ৫০০ বালুচ ও পাঞ্জাবী সৈন্যরা অতর্কিতে আক্রমণ চালায় এবং সর্বমোট ১২০০'র অধিক সৈনিক, তাদের পরিবার ও শিশুদের চরম নির্মমতায় নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। সুতরাং ২৫ মার্চ গণহত্যার রাত থেকেই তথাকথিত ঘোষক মেজর জিয়ার হস্ত ছিল বাঙালির রক্তে রঞ্জিত! নিহত সেইসব সৈনিকদের স্মরণে দীর্ঘকাল চট্টগ্রাম সেনানিবাসে কোন স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি হয়নি। এখন হয়েছে কিনা জানা নাই। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের কোন পর্যায়েই তাদের নামও অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কারণ এ ঘটনা প্রকাশিত হলে মেজর জিয়ার বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপ উন্মোচিত হবে বলে তা সুপরিকল্পিতভাবে ধামাচাপা দেয়া হয়। (সূত্র : ১. লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম); ২. সেনাপতির মুক্তিযুদ্ধ ছিনতাই এবং ৩. মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গন থেকে মেজর জিয়ার পলায়ন, সিরু বাঙালি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গোপনে ভারতে আগত প্রখ্যাত পাকিস্তানপন্থী ন্যাপ (ভাসানী) নেতা মশিয়ুর রহমান যাদু মিয়াকে গাড়িতে করে বিভিন্নস্থান ঘুরিয়ে দেখানোর পাশাপাশি মওলানা ভাসানীকে যাদু মিয়ার হাতে তুলে দেয়ার ষড়যন্ত্র সফল করার চেষ্টা করেছিল মেজর জিয়া। (সূত্র : উত্তর রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধ, আখতারুজ্জামান মণ্ডল)। উদ্দেশ্য ছিল মওলানা ভাসানীকে পূর্ব পাস্তিানে এনে নির্বাচন করিয়ে তাকে দিয়ে সরকার গঠন করা। কিন্তু মুজিবনগর সরকারের ত্বরিত পদক্ষেপে তা ভেস্তে যায়। সে সময় মওলানা ভাসানীর অনুরোধে তাঁকে কিছুদিন গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল। এছাড়াও সৈয়দ নজরুল ইসলাম-

তাজউদ্দীন আহমদ নেতৃত্বাধীন মুজিবনগর সরকারকে উৎখাত করে তদস্থলে প্রধান সেনাপতি ওসমানীর নেতৃত্বে ১১ জন সেক্টর কমান্ডারের সমন্বয়ে 'ওয়ার কাউন্সিল' গঠন করে তখনই 'সামরিক ক্যু' করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন মেজর জিয়া। খালেদ মোশাররফের প্রচণ্ড বিরোধিতায় তা ভেস্তে যায়। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্ব ডিসেম্বরের ৬ তারিখের পরপর মিসর থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কতিপয় বাঙালি অফিসার 'পঞ্চম বাহিনী' হিসেবে ভারতে আগমন করে। এদের মধ্যে সম্ভবত ফারুক-রশীদ-ডালিমসহ আরও অনেকেই ছিল। এই খুনীরা মেজর জিয়ার শেল্টারে অবস্থান করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার নামে নানা রকম ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে। বারংবার ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সতর্ক করা সত্ত্বেও কর্নেল ওসমানী এবং মেজর জিয়ার কারণে এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। যুদ্ধের একেবারে শেষদিকে যখন ভারত পাকিস্তান কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশের পক্ষে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বাধীনতার লাল সূর্যটাকে ছিনিয়ে আনার মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত, যখন মার্কিন ৭ম নৌবহর বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার দিকে ধাবিত তখন মেজর জিয়া ও তার খুনী সহযোগীরা মিলিত ধ্বনি উচ্চরণ করেছিল এই বলে যে, ৭ম নৌবহর ঠেকাতে এখন আমাদের সর্বশক্তি নিয়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে যাওয়া উচিত কোনভাবেই ঢাকা অভিমুখে নয়। এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে, মেজর জিয়া ছিলেন মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রবেশকারী সফল পাকিস্তানী গুপ্তচর। এ রকম বহুবিধ বিভ্রান্তিকর উপায়ে মুক্তিযুদ্ধের মহান বিজয়কে স্যাবোটাজ করে চোরাবালিতে নিক্ষেপ করার ষড়যন্ত্রের জাল বুনে গেছেন মেজর জিয়া ও তাঁর সহযোগীরা। প্রকৃতপক্ষে জিয়াউর রহমান ছিলেন উচ্চাভিলাষী এবং কৌশলী।

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট সংঘটিত বঙ্গবন্ধু হত্যার নীলনকশা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ছিলেন এবং এই হত্যাকাণ্ডের পুরোভাগে না থেকেও তিনি ছিলেন এর প্রধান সুবিধাভোগকারী।

১৯৭৫-৭৬ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সংঘটিত অসংখ্য সেনাবিদ্রোহ নির্মমভাবে দমন করে বিচারের নামে প্রহসনের ট্র্যাইব্যুনাল গঠন করে শত শত সৈনিকের মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ঘটনার মূল্যায়ন করতে গিয়ে সর্বোচ্চ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক জিয়াউর রহমানকে 'ঠাণ্ডা মাথার খুনী' বলে উল্লেখ করেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৩০ মার্চ ২০১৪

তারেক রহমানের অভিনব 'রাষ্ট্রপতিতত্ত্ব'

সোহরাব হাসান

ইতিহাস যাঁরা নির্মাণ করেন, তাঁরা কখনোই ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক করেন না। করার প্রয়োজনও হয় না। ইতিহাস নিয়ে তাঁরাই অহেতুক বিতর্ক করেন, ইতিহাসে যাঁদের অবদান রাখার ন্যূনতম সামর্থ্য ও সাহস নেই।

কথাটি মনে পড়ল বৃহস্পতিবার পত্রিকায় লন্ডনে বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বক্তৃতাটি পড়ে। সেখানে বিএনপি আয়োজিত স্বাধীনতা দিবসের সেমিনারে তিনি বলেছেন, 'জিয়াউর রহমানই বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও স্বাধীনতার ঘোষক।' তাঁর দাবি, 'এটি ইতিহাসে লাল অক্ষরে লেখা আছে।

স্বধীনতার ৪৩ বছর পর এটি জিয়া তনয়ের আবিষ্কারই বটে। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় ছিলেন সাড়ে পাঁচ বছর, খালেদা জিয়া ছিলেন ১০ বছরের বেশি। এ দীর্ঘ সময়ে বিএনপির কোনো নেতা-নেত্রী কিংবা সমর্থক বুদ্ধিজীবীও দাবি করেননি যে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন। এখন তারেক রহমান বলছেন, তিনিই প্রথম রাষ্ট্রপতি। এ ব্যাপারে সম্ভবত তিনি বিএনপির আমলে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকাশিত 'সংশোধিত' ইতিহাসকে সাক্ষ্য মানবেন।

প্রত্যুত্তরে আমরা জিয়াউর রহমান আমলের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্রকে প্রমাণ হিসাবে হাজির করছি। দলিলপত্রের তৃতীয় খণ্ডে শেখ মুজিবুর রহমানের একটি এবং জিয়াউর রহমানের দুটি ঘোষণা ছাপা হয়েছে।

প্রথম ঘোষণায় শেখ মুজিব বলেছেন, ...'এটি আমার শেষ বার্তা হতে পারে, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যে আপনারা যেখানে এবং যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ চালিয়ে যান। বাংলাদেশের মাটি থেকে পাকিস্তানের শেষ সেনাটি বিদায় না হওয়া এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত যুদ্ধ করে যেতে হবে।'

জিয়ার দ্বিতীয় ঘোষণায়ও নিজে সরকার গঠনের দাবি করেননি। এমনকি বেঁচে থাকতে তিনি নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক বলেও প্রচার করেননি। কেবল

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম উদ্যোক্তা বেলাল মোহাম্মদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তাঁর ঘোষিত বার্তাটি যে কলমে লেখা হয়েছিল, সেটির খবর তিনি জানেন কি না।

২৭ মার্চ প্রচারিত ঘোষণায় জিয়া বলেছেন, 'আমি জিয়াউর রহমান, বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর অস্থায়ী কমান্ডার ইন চিফ, শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। আমি আরও ঘোষণা করছি যে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা একটি স্বাধীন ও আইনানুগ সরকার গঠন করেছি, যা আইন ও সংবিধান অনুযায়ী কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।'

জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর ২৪ বছর পর ২০০৪ সালে বিএনপি সরকার স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রে জিয়ার একটি নতুন বার্তা যোগ করে এবং বঙ্গবন্ধুর বার্তাটি গায়েব করে দেয়। এটি নিয়ে আইনি লড়াইয়েও তাঁরা হেরে গেছেন। এখন সেই 'সংশোধিত' ইতিহাসের অস্তিত্ব নেই।

তারেক রহমান বলেছেন, জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি। আর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ২৭ মার্চ তিনি শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন সরকারের অধীনে নিজে অস্থায়ী কমান্ডার-ইন-চিফ হিসেবে দেশবাসীকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর ঘোষণার আগে আওয়ামী লীগের নেতা এম এ হান্নানও একটি ঘোষণা দিয়েছিলেন। আর এসব ঘোষণার আগেই দেশের মানুষ যার যার অবস্থান থেকে প্রতিরোধ শুরু করেছিল। ২৫ মার্চ রাতে পিলখানায় ইপিআরের জওয়ানরা এবং রাজারবাগে পুলিশ সদস্যরা যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, তা কারও ঘোষণা বা নির্দেশের অপেক্ষা না করেই।

তারেক রহমানের পর খালেদা জিয়াও ২৭ মার্চ মুক্তিযোদ্ধাদের সমাবেশে বলেছেন, 'জিয়াউর রহমানই প্রথম রাষ্ট্রপতি।' গতকাল দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য রফিকুল ইসলাম মিয়া তাঁর আইনি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন,'১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে প্রবাসী সরকার গঠনের পূর্ব পর্যন্ত কার সরকার ছিল? দিশেহারা জাতিকে পথ প্রদর্শন করেছেন জিয়াউর রহমান, তা প্রমাণ করে সে সময় তিনি দেশের মূল ভূমিকা পালন করে দেশের রাষ্ট্রপতি হওয়া বা করা বা চালাতে হয়েছে, সে ব্যবস্থায় তিনি তা করেছেন। (প্রথম আলো অনলাইন, ২৮ মার্চ ২০১৪)

বিএনপির এই নেতা বলতে চেয়েছেছেন, ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠনের আগ পর্যন্ত জিয়ার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছেন। তার মানে তাজউদ্দীন আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলামেরা প্রবাসী সরকার গঠন করেছেন জিয়ার নেতৃত্বে এবং তাঁর নির্দেশেই। সেনাবাহিনীর প্রধান এম এ জি ওসমানী এবং অন্য সেক্টর কমান্ডাররাও যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জিয়ার নির্দেশেই। অদ্ভুত ও উদ্ভট যুক্তি।

জিয়াউর রহমানকে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হতে হলে তাঁকে একটি সরকার গঠন করতে হতো। সেটি করার ম্যান্ডেট কি তাঁর ছিল? যদি না থাকে, তাহলে তিনি কী করে প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন?

কয়েক বছর আগে এই লেখকের কাছে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইতিহাসবিদ সিরাজুল ইসলাম বলেছিলেন, স্বাধীনতা তাঁরাই ঘোষণা করতে পারেন, জনগণ যাঁদের ম্যান্ডেট দিয়েছে। জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে তিনি এ-ও বলেছিলেন, আমেরিকার গৃহযুদ্ধে কর্নেল পদমর্যাদার এক সেনা কর্মকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার কারণে তাঁকে বিচারের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। কেননা, স্বাধীনতা ঘোষণার এখতিয়ার তাঁর ছিল না।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে জনগণ শেখ মুজিবুর রহমানকে এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগকে ম্যান্ডেট দিয়েছিল। কিন্তু সেই ম্যান্ডেট অনুযায়ী পাকিস্তানি সামরিক জান্তা তাঁর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে না দেওয়ায় স্বাধীনতার বিষয়টি সামনে চলে আসে। সত্তরের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকেই একাত্তরের ১০ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের ঘোষণা আসে এবং ছয় সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। সেই ঘোষণাপত্রে স্বাধীনতা ঘোষণার কারণও ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন লিখেছেন, 'পৃথিবীতে দুটি দেশেরই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আছে। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ।

১০ এপ্রিল স্বধীনতার ঘোষণার পরিপ্রেক্ষেতে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার শপথ নেয়, যার রাষ্ট্রপতি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী হন তাজউদ্দীন আহমদ। সেই মন্ত্রিসভার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও সেনাবাহিনীর প্রধান এম এ জি ওসমানীর অধীনে অন্যান্য সেক্টর কমান্ডারের মত জিয়াউর রহমানও একজন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি জিয়া ফোর্সের প্রধান হন।

তারেক রহমানের ভাষায় লাল অক্ষরে লেখা এই ইতিহাস থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে একাত্তরে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশে যে সরকার গঠিত হয়, তাঁর নেতৃত্ব ও আনুগত্য মেনে নিয়েই জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন।

কেবল তারেক রহমান প্রবাসে বসে এ ঘোষণাটি দিলে তা তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষোভের প্রকাশ হিসেবে মানা যেতে পারে। কিন্তু এক দিন পর তাঁর মা ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশেও একই বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আওয়ামী লীগ মুক্তিযোদ্ধার দল নয়, জিয়াউর রহমানই স্বাধীনতার ঘোষক।' তবে বিএনপির চেয়ারপারসন এটি বলেননি যে জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বেই আওয়ামী লীগের নেতারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন। সেটি তিনি বলবেন না। কেননা, বললে মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগের অবদানকে স্বীকার করা হয়। আমাদের রাজনীতিতে এখন চলছে অস্বীকারের সংস্কৃতি।

আওয়ামী লীগের নেতাদের কাছ থেকে তাৎক্ষণিক যেসব প্রতিক্রিয়া আশা করা গিয়েছিল, তার চেয়ে কম কেউ দেননি। দলের যুগ্ম মহাসচিব মাহবুব উল আলম হানিফ বলেছেন, তারেক রহমান যা বলেছেন, তা সংবিধান পরিপন্থী। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেছেন, খালেদা জিয়াকে ক্ষমা চাইতে হবে।

আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দল আয়োজিত স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা সভায় বলেছেন, তাঁরা (বিএনপি) এত দিন বলেছেন জিয়া স্বাধীনতার ঘোষক, এখন বলছেন প্রথম রাষ্ট্রপতি।.....এখন ফর্মুলা পাল্টেছে, কেউ স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে ইয়াহিয়া খান তাঁকে গ্রেপ্তার করল না কেন? তিনি জিয়াকে নামেই মুক্তিযোদ্ধা বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যের দুটি দিক আছে। প্রথমত, তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বলে উল্লেখ করেছেন। এটি ঐতিহাসিক সত্য। এ সত্য কেউ মুছে ফেলতে পারবে না। অতীতে অনেকে চেষ্টা করে সফল হননি। ভবিষ্যতেও তাঁরা সফল হবেন না। কিন্তু এ-ও সত্য যে আওয়ামী লীগ একাই মুক্তিযুদ্ধ করেনি। আরও অনেক দল এমনকি দলের বাইরের মানুষ এ যুদ্ধে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন। ইতিহাসের ভাগাভাগিতে আমরা যেন তাঁদের কথা ভুলে না যাই। আওয়ামী লীগের নেতাদের মধ্যে একটি প্রবণতা লক্ষণীয় যে তাঁরা নিজেদের ছাড়া অন্য কারও অবদান স্বীকার করতে চান না।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, জিয়াউর রহমান নামেই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। এর মধ্যমে কিন্তু তিনি মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদেরই শুধু খাটো করলেন না, মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য স্বাধীনতা-পরবর্তী যে সরকার তাঁকে বীর উত্তম খেতাব দিল, তাকেও অসম্মান করলেন।

স্বাধীনতার ৪৩ বছরে এসেও আমরা কে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক, কে প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন এসব নিযে অহেতুক বিতর্ক করছি। সামনে তাকাচ্ছি না। এ দীর্ঘ সময়ে আমরা কেন শিক্ষার হার ৬০ শতাংশের ওপরে দিতে পারলাম না, কেন এখনো ২৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে, কেন ৩৭ শতাংশ শিশু অপুষ্টির শিকার, সে প্রশ্ন করছি না। কেন আমাদের দেশ প্রতিবেশীদের চেয়ে প্রায় সব ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে, সে নিয়েও রাজনীতিকদের মধ্যে উদ্বেগ নেই। তাঁরা কেবল ইতিহাসে বন্দী হয়ে আছে।

মাত্র দুই দিন আগে আমরা স্বাধীনতা দিবসে লাখো কণ্ঠে জাতীয় সংগীত গেয়ে জাতিকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করলাম। আর দুই দিন পারই বিভেদ ও বিদ্বেষে পরস্পরকে বিদ্ধ করে চলেছি। এই আত্মঘাতী ইতিহাস চর্চা থেকে জাতিকে রক্ষা করবে কে?

প্রথম আলো
২৯ মার্চ ২০১৪

‘জিয়া প্রথম প্রেসিডেন্ট’ তত্ত্ব ও নান্টু পাগল

এ কে এম শাহনাওয়াজ

জন্মের পর থেকেই বিএনপি বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটিয়ে দলটিকে রহস্যময় করে তুলছে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশ। জন্মের জঠর যন্ত্রণা সহজ নয়। রক্তগঙ্গা বয়ে গেছে এদেশে। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে দেশ। জীবন বাজি রেখে লড়াই করা মুক্তিযোদ্ধারা টগবগ করে ফুটেছে। নানা সংকট ও অরাজকতা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে অস্থির করতে থাকে। কিন্তু একে মোকাবেলা করার মতো দূরদর্শী প্রস্তুতি ছিল না আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের। কোনো বিকল্প না থাকায় সবাই তাকিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়া আওয়ামী লীগের দিকে। বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার পর নতুন আশায় বুক বাঁধে সদ্য স্বাধীন দেশের মানুষ। কিন্তু দলীয়বৃত্ত দ্রুতই বন্দী করে ফেলে বঙ্গবন্ধুকে। বঙ্গবন্ধুর জন্য বড় সুযোগ ছিল-দলের না হয়ে দেশের হয়ে যাওয়া। তেমনটি হতে পারলে আজ দেশের রাজনীতির চেহারাই পাল্টে যেত। তার বদলে সন্ত্রাস, দুর্নীতি স্বজনপ্রীতির অভিযোগ বয়ে বেড়াতে হল বঙ্গবন্ধুকে- আওয়ামী লীগকে। এর কতটুকু সত্য আর কতটুকু ষড়যন্ত্র, তা নির্ণয় করবে ইতিহাস। তবে আশাহত হয়েছিল দেশের মানুষ। যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল তা বাস্তবায়নের সম্ভবনা দেখতে পেল না কেউ। স্বপ্নভঙ্গের বেদনা হতাশ করে তুলল তাদের। এ বাস্তবতাটিকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন জিয়াউর রহমান। ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে বসে কখনও প্রকাশ্যে আবার কখনও নিজেকে আড়াল করে ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় ভূমিকা রেখে চলছিলেন। বঙ্গবন্ধু হত্যা, জেলহত্যা, ক্যু-পাল্টা ক্যু-এর পর বেনিফিসিয়ারি জিয়াউর রহমান এক সময় প্রকাশ্য হলেন। বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হলেন। সুযোগের পুরো সুবিধাটিই হাতে তুলে নিলেন। আর এভাবে জন্ম দিলেন বিএনপি নামের দলটিকে। স্বপ্নভঙ্গ হওয়া হতাশ মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে পারলেন জাদুকরের নৈপুণ্যে। তারপর স্বাধীনতাপ্রিয় বাঙালিকে বিস্মিত করে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধবিরোধী পাকিস্তানপন্থীদের কোলে তুলে নিলেন। স্বাধীনতার এক দশক না পেরোতেই মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শাহ আজিজুর রহমানকে বানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। বিচারের নামে ক্যান্টমেন্টের ভেতর খুন হতে থাকেন মুক্তিযোদ্ধা সেনা অফিসাররা। ক্রমে বিস্ময়ের ঘোর নিয়েই সচেতন মানুষ বিশ্বাস করতে থাকে, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান বোধকরি পাকিস্তানের গোপন এজেন্ডা পূরণ করতে চাইছেন যেনতেনভাবে।

জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক সাফল্য এখানেই যে, তিনি তার দেশের রাজনীতিকে অনেকটা জটিল করে তুলতে পেরেছিলেন। আওয়ামী লীগের ব্যর্থতার সুযোগে অর্থ, অস্ত্র আর নেতৃত্বের লোভ দেখিয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষার্থীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরিছিলেন। সুবিধাবাদী রাজনীতিক, আমলা ও বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশকে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধেকে প্রবলভাবে ধারণ না করতে পারা এ অংশটি নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্মাণের পথ তৈরিতে রাতারাতি জাতীয়তাবাদী হয়ে গেলেন।

বিএনপি ইতিহাসের কাঠগড়ায় নিজেকে দাঁড় করানোর সব রকম পথ তৈরি করতে থাকে জিয়াউর রহমান পরবর্তী পর্বে। পাকিস্তানপন্থী মানসিকতাকে আরও সক্রিয় করে। সাম্প্রদায়িক দলগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব বাড়ায়। মুক্তিযুদ্ধবিরোধী জামায়াতকে নিজেদের ভোটব্যাংক ও বিকল্প পেশিশক্তি হিসেবে পাওয়ার আনন্দে প্রায় স্থায়ী বন্ধু করে ফেলে। জিয়াউর রহমান নিজে দাবি না করলেও ১৯৭৫-এ জন্ম নেয়া দলকে মুক্তিযুদ্ধের দল এবং তাকে স্বাধীনতার ঘোষক বানিয়ে ফেলে বিএনপির পরবর্তী নেতৃত্ব। এতেও সুবিধার ফসল ঘরে না ওঠায় ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের কালিমা ও আবেগ যাতে সফল্য হয়ে আওয়ামী লীগের গোলায় না ওঠে তাই খোদ খালেদা জিয়ার গলাটি যূপকাষ্ঠে তুলে দেয়া হল। শোক দিবসকে উৎসবের দিবসে রূপান্তরিত করার জন্য ঘোষিত হল খালেদা জিয়ার নতুন জন্মদিন। এমন অমানবিক ও নির্লজ্জ আচরণ বিশ্বে আর কোথাও হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। প্রজন্মকে মিথ্যার চাদরে ঢেকে দিতে বিএনপি নেতারা ঘোষক থিওরি দমে দমে প্রচার করতে লাগলেন।

এসবেও যখন খুব সুবিধা হল না, তখন লণ্ডনে বসে ইতিহাস ও সুস্থ রাজনীতি বিচ্ছিন্ন বিএনপি নেতা তারেক রহমান নতুন প্রেসিডেন্ট থিওরি নিয়ে এলেন। ভেবেছিলাম এসব পাগলামিকে বিএনপি নেতারা বাড়াতে দেবেন না। কিন্তু চমকে গেলাম ২২ আগস্ট জয়পুরহাটে খালেদা জিয়ার বক্তৃতা শুনে। দেখলাম তিনি নিজেই ছেলের থিওরি প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাবৎ দেশবাসীকে মূর্খ বিচার করে 'প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার দল বিএনপি'-এমন কথা খোদ বিএনপি প্রধানের মুখ থেকেই শুনতে হল। একবার মনে হল, আংশিক হলেও ঠিক কথাই বলেছেন খালেদা জিয়া। অনেকটা যুক্তিবিদ্যার সেই আমি টেবিল ছুঁয়ে আছি, টেবিল মাটি ছুঁয়ে আছে তাই আমি মাটি ছুঁয়ে আছি ধরনের। মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন জিয়াউর রহমান। পরবর্তী সময়ে তিনি জন্ম দিয়েছিলেন বিএনপি নামের দলটির। যুদ্ধাপরাধী ও স্বাধীনতাবিরোধীদের বুকে জরিয়ে বিএনপি 'মুক্তিযোদ্ধাদের দল'। এখন তো ফর্মুলা অনুযায়ী সব সেক্টর কমান্ডার, যে কোনো পর্যায়ের কমান্ডার বা সার্টিফিকেটধারী মুক্তিযোদ্ধা রাজনৈতিক দল গঠন করলে সেটি মুক্তিযোদ্ধাদের দল হয়ে যাবে। খালেদা জিয়া বন্দী অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানিদের সেনানিবাসে দিন কাটিয়েছেন।

বিএনপির পরের চমক হতে পারে একই ফর্মুলায় প্রথম নারী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে খালেদা জিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করা।

আপাতত 'প্রথম প্রেসিডেন্ট থিওরি নিয়ে একটি কথা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। বন্ধুর দেয়া তথ্যটি আমার মনে ধরেছে। এক অর্থে যৌক্তিকও বটে। একথাটি তো ঠিক, ১৯৭১-এর ২৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করার জন্য সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে মেজর জিয়াকে নিয়ে আসা হয়েছিল। তখন স্বাভাবিকভাবেই তিনি রাজনীতিতে অভিজ্ঞ ছিলেন না। ঘটনার আকস্মিকতায় হয়তো ভেবেছিলেন বিশ্ববাসী বা পাকিস্তানিদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের একটি সাংগঠনিক কাঠামোর ধারণা তুলে ধরা প্রয়োজন। তাই বিবেচায় নিজেকে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বলে ফেলেছিলেন। তারপর যখন তাকে ভুলটি ধরিয়ে দেয়া হল বলা হল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ছাড়া অন্য কেউ প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করলে তা বিশ্ববাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, এরপর থেকে তিনি বিরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রের (প্রথমা প্রকাশ ১৯৮২) তৃতীয় খণ্ডে মুদ্রিত জিয়াউর রহমানের ঘোষণাপত্রে তিনি নিজেকে 'বাংলাদেশ লিবারেশন আর্মির' আঞ্চলিক প্রধান হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। তাই হঠাৎ প্রেসিডেন্টতত্ত্ব শুনে আমার পুরনো বন্ধু কিশোরগঞ্জ থেকে ফোন করলেন। একই ফর্মুলায় এখন নান্টু পাগলকে বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট বলতে হবে।

বিষয়টি বুঝিয়ে বললেন তিনি। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর কয়েকটি বাস্তব ঘটনা লক্ষণীয় ছিল। পাড়ায়-মহল্লায় তরুণরা বাঁশের লাঠি বানিয়ে মার্চপাস্ট করছিল। আমার বন্ধুর পাড়ায়ও অমন প্রশিক্ষণ চলছিল। সেখানে হঠাৎ আবির্ভূত হলেন এলাকার পরিচিত নান্টু পাগল। মাঝ বয়সী মানুষ। কখনও আধা, আবার কখনও পুরো পাগলামি আচরণে পেয়ে বসে। সেদিন নান্টু পাগলের হাতে ছিল মানচিত্রখচিত বাংলাদেশের পতাকা। তিনি কণ্ঠ চড়িয়ে বললেন, 'এহিয়া খান নিপাত যাক। আজ থেকে আমি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট। বাংলাদেশ স্বাধীন করে দিলাম। জয়বাংলা।' উপস্থিত সবাই 'বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট' নান্টু পাগলকে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাল।

বন্ধু বললেন, তারেক রহমানদের দাবি মতো কেউ কোথাও দাঁড়িয়ে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করলেই যদি প্রেসিডেন্ট হয়ে যায় এবং নান্টু পাগলের পরে ও জিয়াউর রহমানের 'ঘোষণার আগে আর কেউ যদি নিজেকে প্রেসিডেন্ট দাবি না করে থাকেন, তবে জিয়াউর রহমানকে প্রথম নয়, স্বঘোষিত দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট বলা যেতে পারে।

আমার বন্ধুর অমন বর্ণনা নিঃসন্দেহে স্যাটায়ার। জিয়াউর রহমানের মতো একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং রাষ্ট্রনায়ককে নিয়ে অমন স্যাটায়ার স্বস্তিদায়ক নয়। একজন মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে অমন স্যাটায়ার নিন্দনীয়ও। আমি বন্ধুটিকে বলেছিলামও সে কথা। বন্ধুটি ক্ষমা চেয়ে বললেন, জিয়াউর রহমাকে হেয় করার কোনো ইচ্ছে এ গল্পের ভেতর নেই। স্বাধীনতার তেঁতাল্লিশ বছর পর বিএনপির

'প্রথম প্রেসিডেন্ট' থিওরির দায় জিয়াউর রহমানের নয়। বস্তুত রজনীতির হীনস্বার্থ চরিতার্থ করতে নিজ নেতাকে লাঞ্ছিত করছেন বিএনপির জীবিত নেতা-নেত্রীরা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই মানুষের প্রকৃত শিক্ষা নয়। অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত মেধা মানুষকে শিক্ষিত করে তোলে। খালেদা জিয়া একটি বড় দলের কাণ্ডারি। তাছাড়া তিনি তিনবার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। তাকে তো ইতিহাস-মূর্খ আর বাস্তববোধ বর্জিত বলা যায় না। তরুণ ছেলে যদি ভুলও করে থাকে, তবে মা হিসেবে তাকে ধমকে দেয়া যায় আর দলীয় নেত্রী হিসেবে সাবধান করে দেয়া যায়। একসময় জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণাতত্ত্ব জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য পারিষদবর্গের ওপর দায়িত্ব ছিল দমে দমে তা বলে বেড়ানো। সে দায়িত্ব এখনও পালিত হচ্ছে। কাজের কাজ তো তেমন হয়নি। সাধারণ মানুষকে যতটা মূর্খ আর বোক ভাবা হয়েছিল, দেখা দেল বাস্তবে তারা তেমনটি নন। তারপরও হুঁশ হয়নি। আজকে আবার প্রেসিডেন্টতত্ত্ব নিয়ে হাজির হয়েছেন নেতা-নেত্রীরা। প্রথম ও দ্বিতীয় দায়িত্ব পালন করলেন যথাক্রমে তারেক ও খালেদা জিয়া। এখন হয়তো মির্জা ফখরুলদের পালা। শুরু হবে আরেক ভাঙ্গা রেকর্ডের বাজনা।

এসব পাগলামো কি বলে দেয় না দলটি চরম হতাশায় ভুগছে? এ হতাশা কাটাতে ভুল পথে হাঁটা কেন? মানতে হবে বিএনপির রাজনৈতিক দুর্বলতা ও ভ্রান্তি আওয়ামী লীগ নেতা-নেত্রীদের অপরিণামদর্শী করে তুলছে। তারা দিনে দিনে অরও বেশি গণতন্ত্রবিচ্ছিন্ন দাপুটে হয়ে পড়ছে। আওয়ামী লীগের প্রতি জনক্ষুব্ধতা বাড়াচ্ছে। শুভবুদ্ধিই পারে বিএনপিকে হতাশামুক্ত করতে। জনকল্যাণমূলক ইতিবাচক রাজনীতি করে জনসম্পৃক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে তাদের। এ সত্যটি যত দ্রুত বিএনপি নেতারা বুঝতে পারবেন ততই তা দলের এবং দেশের জন্য কল্যাণকর হবে।

দৈনিক যুগান্তর
২৭ জুন ২০১৪

জিয়া প্রথম বিশ্বাসঘাতক মুক্তিযোদ্ধা ॥ পরিবারটি অশীলিত ভয়ঙ্কর

মুহাম্মদ শফিকুর রহমান

কে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, কে রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি, তা আমার মতো বয়সী যাঁরা অন্তত ৬ দফা ও ১১ দফাভিত্তিক ছাত্র গণঅভ্যুত্থান, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি, '৭০-এর নির্বাচনে ভোটদান, একাত্তরের মার্চে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, নজিরবিহীন অসহযোগ আন্দোলনের মাঝে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ, মুজিব-ভুট্টো-ইয়াহিয়ার বৈঠক এবং ভুট্টো-ইয়াহিয়ার পালিয়ে যাওয়ার আড়ালে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার গণহত্যা এবং ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে অস্ত্রহাতে নিয়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা-এ সব কার্যক্রম প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অংশ নিয়েছেন, দেখেছেন। তাঁরা ভাল করেই জানেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আমাদের স্বাধীনতার একমাত্র ঘোষক, স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি এবং মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বা সুপ্রীম কমান্ডার অব আর্ম ফোর্সেস। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁরাই নির্দেশনা অনুযায়ী সৈয়দ নজরুল ইসলাম আস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে এবং তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মুজিবনগর বিপ্লবী সরকার, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং পাকিস্তানি সামরিক জান্তাকে পরাজিত করে বিজয় ছিনিয়ে আনেন। এ সব আমরা দেখেছি, অংশ নিয়েছি, যুদ্ধ করেছি, তার পরও যদি কেউ বিতর্ক সৃষ্টি করতে চায় কোন লাভ হবে না, বরং তারাই বিতর্কিত হবে। যে দিন আমরা থাকব না, সে দিনও আমাদের সন্তান তথা একাত্তর প্রজন্ম সকল বিতর্কের জবাব দেবে, যেমন শাহবাগ দিতে শুরু করেছে। যে কথা আগেও বলেছি অনেকবার, ভেবেছিলাম আর বলব না, কিন্তু এখন দেখছি বলতে হচ্ছে। বলার প্রয়োজনও পড়তনা, যদি না, তারেক রহমানের মতো এক অর্বাচীন যুবক নতুন করে আবার সেই ভাঙ্গা রেকর্ড বাজাতে শুরু না করত, যদি না বলত-জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক। এতটুক বললেও হয়ত আমার কলম ধরার পয়োজন পড়ত না, কেননা, ঐ 'ঘাষক-ঘোষক শব্দটি' এখন বেশ তেতো হয়ে গেছে। তাই এবার

আরেকটি মিথ্যার বেসাতি বাজারজাত করর চেষ্টা করল-জিয়া বাংলাদেশের প্রথম ক(?) রাষ্ট্রপতি (!?) এই 'প্রথম' শব্দটি ঠিক আছে, তবে তার ব্যবহার ঠিক নেই, এর যথোপযুক্ত ব্যবহার বা এ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউজ হচ্ছে-জিয়াউর রহমান বাংলাদেরশের প্রথম বিশ্বাসঘাতক মুক্তিযোদ্ধা।

আরেকটি নতুন ইস্যু এবার সামনে আনা হলো। বিএনপির এক নেতা মেজর (অব) হাফিজ বললেন, খালেদা জিয়া মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। খালেদা জিয়া নিজেও ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধা দলের (বিএনপিপন্থী) এক সমাবেশে তা দাবি করলেন। তবে একটু অন্যভাবে। নইলে বলা যেত, হ্যাঁ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে মিলিটারি জেনারেল জাঞ্জুয়ার হেফাজতে থেকে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন? অবশ্য তিনি নিজেই বললেন, '(তারেকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে) জিয়াউর রহমানই স্বাধীনতার ঘোষক এবং বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি। মুক্তিযুদ্ধের সময় জিয়া মুক্তিযুদ্ধে চলে যান তখন আমার ওপরও অনেক অত্যাচার নির্যাতন হয়। আমি তখন ক্যান্টনমেন্টে ছিলাম। ক্যান্টনমেন্টের একটি ব্যারাকে একটি মেসে রাখা হয়। বম্বিং চলছিল। পরে আমাকে আরেক জায়গায় নেয়া হয়। সেখানেও বম্বিং হয়। তারেক রহমান তখন ছোট, কোকো ছিল বিছানায়। আমাদের ওপর অনেক অত্যাচার-নির্যাতন হয়েছে কিন্তু কোন আপোস করিনি। যুদ্ধ শুরু হলে আমার কাছে এসে কেউ কেউ আমাকে বিদেশে নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু যাইনি। কষ্ট স্বীকার করে দেশে থেকেছি (জনকণ্ঠ, ২৮ মার্চ ২০১৪)।' তিনি নির্যাতিত হয়েছেন কথাটি প্রশ্নবিদ্ধ হয়, যখন দেখা গেল জাঞ্জুয়ার মৃত্যুতে তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েও সকল প্রোটোকল ব্রেক করে শোক বার্তা পাঠালেন। অবশ্য আমরা একটি কথা জেনেছিলাম খালেদা জিয়াকে ভারতে নিয়ে যাওয়ার জন্য (যুদ্ধ শুরুর সময়) কয়েক মুক্তিযোদ্ধা তাঁর কাছে গেলে তিনি নাকি বলেছিলেন, 'বরং জিয়াকেই বল ফেরত আসতে, ওসব মুক্তিযুদ্ধ-ফুদ্ধ কিছু না, পাকিস্তান আর্মি সব ঠিক করে ফেলবে' (১৬ ডিসেম্বরের বিজয়ের পর এ কথাটি শোনা গেছে)।

তবে প্রশ্ন হলো, তারেকই বা কেন হঠাৎ করে নতুন এক বিতর্ক সামনে নিয়ে এলেন এবং খালেদা তা সমর্থন করলেন? যদিও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, তা মোটেই আমলে নেননি। তাঁর মন্তব্যটি এসব ফ্রেফ পাগল-ছাগলের প্রলাপ। এতে গুরুত্ব দেয়ার কিছু নেই।' তবে আমি বিষয়টি এভাবে দেখছি না। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর থেকে গত ৩৯ বছর ধরে জিয়া ও তাঁর পরিবার এবং তাঁদের ঘিরে সমবেত রাজাকার-আলবদর গোষ্ঠী ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করেছেন। তাঁরা সশস্ত্র আঘাত হানার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছেন। তাঁরা এমন এক ভয়ঙ্কর প্রজন্ম জন্ম দিয়েছেন যার নাম- তারেক এবং শিবির। কাজেই এ গোষ্ঠীকে গুরুত্ব দিতেই হবে। কারণ ওরা সশস্ত্র, স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি নিরস্ত্র। গণতান্ত্রিক শক্তি নিরস্ত্রই থাকে, ফ্যাসিস্ট শক্তিই হয় সশস্ত্র।

স্বাধীনতার ঘোষক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং প্রথম রাষ্ট্রপতিও বঙ্গবন্ধুই। তারপর বার বার কেন বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়? উত্তরটা অতি

সোজা, এসব লেখাপড়া জানা লোকের ব্যাপার। কোন অশিক্ষিত এবং আদর্শবিহীন লোকের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। বই-প্রবন্ধ, পড়ে জানতে হয়, এসব সিরিয়াস ঘটনাবলী অথবা যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাঁরা। আবার কিছু শিক্ষিত লোক আছে যারা প্রকৃত জ্ঞান লাভের পূর্বেই মনে করে সব জেনে গেছে। অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো আসিফ-পিয়াস মার্কা সিভিল বাটপাড়রা। তাঁদের বলে-লিখে কোনভাবেই বোঝানো যাবে না।

বাংলাদেশের বিএনপি-জামায়াত-শিবিরকে কোনভাবেই বোঝানো যাবে না হিন্দুরা এ মাটিরই সন্তান। সম্ভবত এদের দেখেই দেশের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ, গবেষক, লেখক, কলামিস্ট প্রফেসর ড. মুনতাসীর মামুন তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'বঙ্গবন্ধু এক অনিচ্ছুক জাতিকে স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন।' কম দুঃখে কথাটা বলেননি, বিদ্রোহী কবির মতো 'দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া'ই কথাটি বলেছেন বলে মনে হয়। প্রফেসর মামুনের কথাটি নিয়ে অনেক ভেবেছি। শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এই অনিচ্ছুক জাতি নয়, একটি জনগোষ্ঠী যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন খালদা জিয়া ও তাঁর ছেরে তারেক। জিয়াউর রহমান নিজে যেমন প্রথম বিশ্বাসঘাতক মুক্তিযোদ্ধা, তেমনি তাঁর পরিবারটিও গড়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে। নইলে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করর দুঃসাহস দেখাত না। কোন কোন বুদ্ধিজীবী বলেন, জিয়া কখনও বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে কোন কথা বলেননি। আমি তাঁদের বলব, জিয়া তো বঙ্গবন্ধু হত্যার সঙ্গে জড়িত এবং বঙ্গবন্ধু হত্যার পর সামরিক শাসন দিয়ে ক্ষমতা দখল করেন, জিয়া যা যা করেছেন তার সবই ছিল বঙ্গবন্ধুকে বার বার হত্যার শামিল। যেমন বঙ্গবন্ধু সারাজীবন জেল-জুলুম-নির্যাতন সহ্য করে, দেশ স্বাধীন করে বাঙালির জন্য গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল সংবিধান দিয়েছিলেন, জিয়া ক্ষমতা দখল করে মিলিটারি বেয়োনেটের খোঁচায় তাকে ক্ষতবিক্ষত করেন; 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের বদলে পাকিস্তানি আদলে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, উপস্থাপন; একদিকে সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ' সংযোজন করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক নিষিদ্ধ মদ-জুয়া আবার চালু করেন; শাহ আজিজুর রহমান, আবদুল আলিম, মওলানা মান্নানের মতো রাজাকারদের এমপি, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী বানান, বঙ্গবন্ধু কর্তৃক নিষিদ্ধ জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি পুনরায় চালু করেন এবং একাত্তরের সবচেয়ে বড় খুনী রাজাকার গোলাম আযমকে (বঙ্গবন্ধু নাগরিকত্ব বাতিল করেছিলেন) দেশে আসতে এবং আবার রাজনীতি করতে দেন (খালেদা জিয়া তাঁর নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেন); জিয়া বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিচারের কাঠগড়া থেকে বাঁচানোর জন্য প্রথমে খুনী মুশতাকের সঙ্গে মিলে ইনডেমনিটি বা দায়মুক্তি দেন এবং পরে তাদের বিদেশী দূতাবাসে কূটনীতিকের গুরুত্বপূর্ণ চাকরি দিয়ে বিদেশে পাঠিয়ে দেন; এভাবে শত শত উদাহরণ দেয়া যাবে, জিয়া স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রথম দিন থেকে কাজ করেছেন, বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

পরে খালেদা জিয়া ও তাঁর ছেলে তারেক-কোকো চরম অশীলিত এবং ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নামেন। তাঁদের যে মেধাহীনতা, লেখাপড়াহীনতা, যে আকারের দুর্নীতি, লুটপাট, অস্ত্রের চোরাচালান, শেখ হাসিনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র এভাবে জামায়াতকে কোলে নিয়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কারণে কোন সচেতন মানুষ তাদের পেছনে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু একাত্তরের রাজকার আল বদর থেকে শুরু করে মুসলিম লীগ (ক্ষয়িষ্ণু), হেফাজতের মতো ধর্মের ব্যবসাদার দল ও নেতারা খালেদা জিয়াকে ঘিরে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছে বলেই খালেদারা কিছু ভোট পান।

বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার ঘোষক এবং স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি তা কবি হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে রচিত 'স্বাধীনতার দলিলপত্র' এর ৩য় খণ্ডেই রয়েছে। একাত্তরের ২৫ মার্চ রাত ১১টার থেকে পাকিস্তানি সমরিক জান্তা আক্রমণ চালালে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন-This is my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.

বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণা আগে থেকেই ড্রাফট করা ছিল এবং সময়মতো বঙ্গবন্ধু তা তৎকালীন ইপিআর (বর্তমান বিজিবি)র ওয়ারলেসের মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রচার করেন। তখনকার জেলা প্রশাসক হিসেবে যে সব বাঙলি কর্মরত ছিলেন তাঁরা হাতে পান। চট্টগ্রামে ঘোষণাটি গ্রহণ করেন জহুর আহমদ চৌধুরী এবং তাঁরাই তত্ত্বাবধানে তৎকালীন চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম ঘোষণাটি পাঠ করেন। কিন্তু তা ১০ কিলোহার্টেজের ট্রান্সমিটারে প্রচারিত হওয়ায় ৬০ মাইলের মধ্যকার সামান্যসংখ্যক মানুষ শুনতে পান। পরদিন ২৭ মার্চ ক্যাপ্টেন রফিকসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তৎকালীন মেজর জিয়াকে খুঁজে এন ঘোষণাটি পাঠ করতে দিলে অবশ্য প্রথমে জিয়া বঙ্গবন্ধুর নাম বাদ দিয়ে ঘোষণাটি পাঠ করতে চাইলে জহুর আহমেদ চৌধুরীর ধমক খেয়ে...'On behalf of our great national leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman..' এভাবে পাঠ করেন, যা তখন বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতীয় বেতার তরঙ্গে ধরা পড়ে। জিয়ার জীবদ্দশায় প্রাকাশিত মুক্তিযুদ্ধকালীন ১নং সেক্টর কমান্ডার মেজর রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম রচিত A Tale of Millions গ্রন্থে বলা হয়েছে এভাবেই জিয়া ইতিহাসে নাম লিখতে সক্ষম হন।' অর্থাৎ প্রথম সুযোগটাই তিনি কাজে লাগান এবং পরবর্তীতে তাঁর অশীলিত ভয়ঙ্কর পরিবার তা নিয়ে আজও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছে। চাঁদপুরে ওয়্যারলেস বার্তা ২৬ তারিখ বেলা ১১টার দিকে তৎকালীন ছাত্র নেতৃবৃন্দের হস্তগত হলে তারা সাইক্লোস্টাইল মেশিনে ছেপে বিলি করতে শুরু করে বেলা দেড়টার পর থেকে। নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন রবিউল আউয়াল কিরণ, বাচ্চু, আবদুল মমিন খান

মাখন, লিয়াকত হোসেন, হানিফ পাটোয়ারী, জীবন কানাই চক্রবর্তী, গনেশ কর্মকার (প্রয়াত), আজিজ, মনসুর, মানিক, সেলিম প্রমুখ। তাদের একজন ছাড়া সবাই আজও জীবিত। আমি ২৫ মার্চ বাড়ি যাই। ২৬ মার্চ আড়াইটার দিকে সাইক্লোস্টাইল কপিটি হাতে পাই। তাছাড়া স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ঘোষণাপত্রে, যা ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ গ্রহণ করেন, তাতেও বলা হয়েছে ১৯৭০-এর ৭ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১-এর ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের জনগণ মোট ১৬৯ জনের মধ্যে ১৬৭জন জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করেন, যাঁরা সবাই আওয়ামী লীগের এবং আওয়ামী লীগের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হবে।

এই ঘোষণাপত্রে এও নিশ্চিত করা হয়েছে যে, 'বাংলাদেশে হইবে সার্বভৌম জনগণের প্রজাতন্ত্র এবং এতদ্বারা ইতোপূর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাকে নিশ্চিত করিতেছি এবং এও নিশ্চিত করিতেছি যে, যতদিন না সংবিধান প্রণীত হয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপরাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইবেন।

এপরও কেন খালেদা জিয়া ও তাঁর দুর্নীতিবাজপুত্র তারেক স্বাধীনতার ঘোষণা ও প্রথম রাষ্ট্রপতি নিয়ে বির্তক সৃষ্টি করছেন? আসলে ব্যর্থতা যখন সর্বগ্রাসী হয় তখন হতাশা থেকে মানুষ বৈকল্য বা ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। তখন মানুষ পাগলের প্রলাপ বকে। খালেদা ও তারেক আজ তা-ই করছেন। নইলে উন্মাদ ছাড়া কি জিয়াকে প্রথম রাষ্ট্রপতি বলে? তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু সুন্দর জবাব দিয়েছেন, 'জিয়া যদি রাষ্ট্রপতিই হবেন তবে মেজর থেকে লে. কর্নেল, কর্নেল এভাবে পদোন্নতি নিয়েছিলেন কেন সরকারের কাছ থেকে?

দৈনিক জনকণ্ঠ
৫ এপ্রিল ২০১৪

২৬ মার্চ কালুরঘাট ট্রান্সমিটার সেন্টার হতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করি

এম এ হান্নান

দেশের অন্যান্য স্থানের মত চট্টগ্রামেও ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের দিনগুলোতে অসহযোগ আন্দোলন চলে। ৩ মার্চ পাহাড়তলী এলাকার শ্বরৈহপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব খলিল উল্লাহ সওদাগরের নেতৃত্বে ছাত্র শ্রমিক ও জনগণের একটি মিছিল পাহাড়তলী অয়ারলেস কলোনী সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে জয়বাংলা ধ্বনিসহ প্রদক্ষিণ করার সময় রেলওয়ের বিহারী শ্রমিকরা আধুনিক অস্ত্র দ্বারা অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে এবং অয়ারলেস কলোনী ও ফিরোজ শাহ কলোনীতে বাঙালিদের বাড়ি ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। পাঞ্জাবী সৈন্যরা ছদ্মবেশে বিহারীদেরকে সাহায্য করে। হামলায় মিছিলকারীদের মধ্যে কয়েকজন আহত হয় এবং কয়েকজনের মৃত্যু ঘটে।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মজিবুর রহমান- ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও খন্দকার মোশতাক আহমদকে চট্টগ্রামে পাঠান। তাঁরা উক্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখেন এবং আহত ও শহীদ পরিবারবর্গের কিছু নগদ অর্থ প্রদান করেন।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় চট্টগ্রাম জেলায় পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।

এম, আর সিদ্দিকী ও জহুর আহমদ চৌধুরী যুগ্ম আহবায়ক; এম.এ.হান্নান; এম.এ.মান্নান এবং অধ্যাপক মোঃ খালেদ সদস্য ছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে অর্থাৎ ২৫ মার্চ পর্যন্ত সমগ্র চট্টগ্রাম জেলায় সরকারী, বেসরকারী অফিস আদালত ও স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকে। এ সময় জেলা সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে চট্টগ্রাম জেলার সকল মহকুমা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। সংগ্রাম কমিটির মাধ্যমে অবসর-প্রাপ্ত সামরিক অফিসার, জোয়ান ও আনসারদিগকে একত্রিত করা হয় এবং বেশ কিছু অস্ত্র ও গোলবারুদ জোগাড় করা হয়।

২৪ মার্চ চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টে অবস্থানরত 'সোয়াত' জাহাজ হতে সকাল ৮ ঘটিকায় সময় পাক-সামরিক জোয়ানরা অস্ত্রপাতি ও গোলাবারুদ নামানের কাজ শুরু করে। আমি এম.এ. হলিমের কাছ থেকে এ সংবাদ পাই। সংবাদ পাওয়ার

পর আমি নিউ মোরিং পোর্টে চলে যাই। পরে টিম ট্রাফিক ম্যানেজার গোলাম কিবরিয়া, তৎকালীন পুলিশ সুপার ও ডেপুটি কমিশনারের সাথে অস্ত্র না উঠানোর ব্যাপারে আলাপ করি কিন্তু তারা তাদের অপারগতার কথা জানান। তবে পোর্ট ট্রাস্টের শ্রমিক নেতা নবী মিস্ত্রী ও চিটাগাং স্টীল মিলের ম্যানেজার জাহেদ সাহেব অস্ত্র ও গোলাবারুদ নামানোর ব্যাপারে বাঁধা দেয়া ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সার্বিক সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। তাৎক্ষণিকভাবে নবী মিস্ত্রী মাইক দ্বারা শ্রমিক ও যুবকদের যার যা আছে তা নিয়ে নিউ মোরিং পোর্ট ঘেরাও করার আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক হাজার ছাত্র, শ্রমিক, জনতা নিউ মোরিং পোর্ট ঘেরাও করে ফেলে। পাক-বাহিনীও বাধা দেয়ার জন্য কামান ও মেশিন গান তাক করে রাখে। বিকেলে অবস্থা বেগতিক দেখে ফায়ার ব্রিগ্রেড ময়দানে উত্তেজিত জনতাকে নিয়ে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। উক্ত জনসভায় সালেহ আহমদ (এম.এন.এ), মোশারফ হোসেন (এম.পি.এ), এম. এ মজিদ (এম.এন.এ) বক্তৃতা করেন। আমি সভাপতির ভাষণ দেই। সেখানে উত্তেজিত জনতাকে চট্টগ্রামে সেনানিবাস হতে পোর্ট ট্রাস্ট পর্যন্ত পথে বেরিকেড সৃষ্টি করার আহ্বান জানানো হয়। অল্প কয়েক ঘন্টার মধ্যে কয়েক হাজার লোক শহরের ও শহরতলীর সকল পথে বেরিকেড সৃষ্টি করে। উদ্দেশ্য হল যে পাক-বাহিনী কোন অবস্থাতেই যেন অস্ত্র বা গোলাবারুদ ভর্তি ট্রাক বা গাড়ি সেনানিবাসে নিয়ে যেতে না পারে। এ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি ২৪ মার্চ রাত্রে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে টেলিফোনের মাধ্যমে জানাই। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পাক হানাদার বাহিনী গুলিবর্ষণে করে। গুলিবর্ষণে প্রায় ৩০ জনের মৃত্যু ঘটে। ২৪ মার্চ রাত্রে পাকবাহিনী বেরিকেড ভাঙ্গতে সমর্থ হয় এবং অস্ত্র বোঝাই ট্রাক নিয়ে সেনানিবাসের দিকে অগ্রসর হয়।

২৫ মার্চ চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ ও জেলা সংগ্রাম পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে কুমিল্লা সেনানিবাস হতে একটি আর্মি কনভয় (Army Convoy) চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এ সংবাদ পেয়ে মিরেরশরাই থানার এম,পি এ জনাব মোশাররফ হোসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের সুভপুর সেতু নষ্ট করে দেয়ার জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু কোন Explosive না থাকায় এ প্রচেষ্টা আংশিকভাবে সফল হয় মাত্র।

২৫ মার্চ রাত্রে আবার আমরা এম আর সিদ্দিকী সাহেবের বাড়িতে চট্টগ্রামের সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মিলিত হই। রাত ১০টার সময় শেখ মুজিবুর রহমান এম.আর. সিদ্দিকী সাহেবের নিকট একটি জরুরী সংবাদ দেন। সংবাদটির মূল বিষয়বস্তু ছিল পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

তারপর আমি ও সভার সকল সদস্যবৃন্দ ডেপুটি কমিশনার সাহেবের বাংলোতে আসি এবং বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রেরিত সংবাদের কথাও বলি। কিন্তু ডেপুটি কমিশনার বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করেন। সেখানে পুলিশ সুপার শামসুল হক সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর আন্তরিকতা ও সহানুভূতি প্রকাশ করলেন।

ডেপুটি কমিশনার হতে সাড়া না পেয়ে আমরা সংগ্রাম পরিষদের সদস্যগণ স্টেশন রোডস্থ রেস্ট হাউসে আসি এবং স্থির করা হয় যে প্রতিরোধ আন্দোলনকে বাস্তবায়িত করার জন্য কয়েকজন সদস্য সমন্বয়ে এক একটি ইউনিট তৈরি করে শহরের বিভিন্ন স্থানে দায়িত্ব বন্টন করে দেয়া হবে। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ প্রত্যেক সদস্য স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হন।

রেস্ট হাউস থেকে আমরা ই, পি, আর হেড কোয়ার্টারে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। তৎকালীন ই, পি, আর অফিসের হেড ক্লার্কের সাথে আমাদের টেলিফোনে আলাপ হয়। তাকে জরুরী সংবাদ ও সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি ধারণা দেই। তার মাধ্যমে ক্যাপ্টেন রফিককেও সংবাদ ও সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করানোর জন্য বলা হয়।

কাপ্তাই ই, পি, আর শাখাতেও টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয়। ক্যাপ্টেন হারুন তার পরদিন সকালেই সমস্ত শাখার জোয়ানদিগকে দিয়ে চট্টগ্রাম শহরে ক্যাপ্টেন রফিকের সাথে এসে মিলিত হবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি সকালে এসে কালুরঘাটে পৌঁছেন।

২৫ মার্চ গভীর রাতে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট হতে টেলিফোনে আওয়ামী লীগ অফিসে বলা হয় সেনানিবাসের চার পাশ বেশ কিছু ছাত্র-যুবক ও উৎসাহী জনতাকে পাঠানোর জন্য। সংবাদ পাওয়া মাত্র মাইক যোগে সকলকে অবহিত করা হয়।

২৬ মার্চ খুব সকালে আমি আতাউর রহমান কায়ছার ও এম,এ মান্নানসহ সেনানিবাসের দিকে যাই। পথি মধ্যে পাঁচলাইশ থানার সম্মুখে বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ানদিগকে দেখতে পাই। উক্ত রেজিমেন্টের অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমান তার কোম্পানী নিয়ে কালুরঘাটের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। এখানে আমরা জানতে পারি যে সেনানিবাসের E.B.R. সেন্টারে প্রশিক্ষণরত বাঙালি জোয়ানদিগকে রাত্রে পাক-বাহিনী হত্যা করেছে। আমরা কালুরঘাটে যেয়ে জানতে পারলাম যে, জিয়াউর রহমান বোয়ালখালী থানার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। আমরা মেজর জিয়াউর রহমানকে বোয়ালখালী থানার কুসুমডাঙ্গা পাহাড়ের নিকট তাঁর জোয়ানদের সহ দেখতে পাই; তাঁকে শহরের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানাই এবং শহর সংলগ্ন এলাকায় শিবির স্থাপন করার জন্য অনুরোধ জানাই। তবে ২৭ মার্চ তিনি কালুরঘাট আসবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কাপ্তাই হতে আগত ক্যাপ্টেন হারুন ও ১৫০ জন ই,পি, আর মেজর জিয়াউর রহমানের সাথে একত্রিত হন।

কালুরঘাট হতে চলে আসার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে রেডিও মারফতে বঙ্গবন্ধুর স্বধীনতা ঘোষণার কথা প্রচার করতে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৬ মার্চ কালুরঘাট ট্রান্সমিটার সেন্টার হতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করি। প্রচারে আমাকে সহযোগিতা করেন রেডিও অফিসের রাখাল চন্দ্র বণিক, মীর্জা আবু মনসুর, আতাউর রহমান কায়সার ও মোশাররফ হোসেন প্রমুখ এম.পি. এ ও এম.এন.এ গণ।

২৭ মার্চ বিকালে মেজর জিয়াউর রহমানও রেডিও মারফত স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার পর ঘোষণা বক্তব্য নিয়ে জনমনে কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা দেয়। তাই সেদিন রাত্রে আমি মির্জা আবু মনসুর ও মোশাররফ হোসেন ফটিকছড়িতে অবস্থানরত প্রাক্তন মন্ত্রী এ. কে. খাঁন সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি। পুনঃ ঘোষণার জন্য তিনি একটি খসড়া করে দেন। আমরা ফটিকছড়ি হতে কালুরঘাট ট্রান্সমিটার সেন্টারে উপস্থিত হই। সেখানে মেজর জিয়াউর রহমানের নিকট আমি এ. কে. খাঁন কর্তৃক লিখিত খসড়াটি দেই। পুনরায় ২৮ মার্চ সকালে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মেজর জিয়াউর রহমান সর্বাধিনায়ক হিসেবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

২৮ মার্চ বিকালে মেজর জিয়া তৎকালীন মেজর মীর শওকত ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্মুখযুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে আলোচনা করেন। সেদিন রাত্রে চট্টগ্রাম নৌঘাঁটি আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি ১০ খানা ট্রাক ও বাস যোগাড় করি এবং সন্ধ্যার দিকে সেগুলো হস্তান্তর করি। পরিকল্পনা মোতাবেক তৎকালীন ফুলতলী বাংলা বাহিনী হেড কোয়ার্টার হতে বাংলা বাহিনীর জোয়ানগণ মীর শওকতের নেতৃত্বে কালুরঘাটে পৌঁছেন।

এখানে মীর শওকত আক্রমণ পরিকল্পনা নিয়ে জিয়ার সাথে পরামর্শ করেন এবং উভয়ই ফুলতলী হেড কোয়ার্টারে চলে যান। সেদিন নৌ-ঘাটি আক্রমণ করা যায়নি। পরের দিন ২৯ মার্চ সকালে ফুলতলী বাংলা বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে গেলাম। মীর শওকত ও মেজর জিয়াউর রহমানকে সেখানে পাওয়া গেল না। জানতে পারলাম এক কোম্পানি সৈন্য তাঁরা কক্সবাজার চলে গেছেন। এ সময় তাঁদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল।

৩০ মার্চ পাক-বাহিনী কালুরঘাট রেডিও ট্রান্সমিটার সেন্টার লক্ষ্য করে বিমান হামলা করে। সেখানে সুবেদার ছাবেদ আলী তাঁর প্লাটুন নিয়ে অবস্থান করছিলেন। বিমান হামলার পর শহরের বাংলা বহিনীর জোয়ানগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। চট্টগ্রাম শহরে ই, পি, আর প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে। চক বাজারে ক্যাপ্টেন হারুন, ও লেঃ শমসের মবিন চৌধুরী তাঁদের প্লাটুন নিয়ে যুদ্ধ করেন। শমসের মবিন ও ক্যাপ্টেন হারুন চকবাজার ও কালুরঘাট যুদ্ধে আহত হন। অবশ্য পাকবাহিনী শমসের মবিনকে ধরে ফেলে। কিন্তু রামগড় বাগান বাড়ি, খাগড়াছড়ি, চিকন ছড়া, আমাদের দখলে ছিল। ২ মে পাক-বাহিনীর তীব্র আক্রমণে রামগড়ও পাকবাহিনীর কবলে চলে যায়। বাংলা বাহিনীর সকল জোয়ান ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাবরুমে আশ্রয় নেয়। কয়েকদিনের মধ্যে হরিণা নামক স্থানে জোয়ানদের জন্য শিবির স্থাপন করা হয়। এখানে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও স্থাপন করা হয়। জুন মাসে হরিণা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ক্যাম্প প্রধানের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়। দেশ স্বধীন হওয়া পর্যন্ত আমি উক্ত শিবিরের প্রাধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। তাছাড়া পূর্বঞ্চলীয় বে-সামরিক বিষয়াদি এবং বাহিনীর লিয়াজো অফিসার হিসেবেও নিজ দায়িত্ব পালন করি।

একটি জাতির জন্ম

মে. জে. জিয়াউর রহমান

পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীতে মিঃ জিন্নাহ যে দিন ঘোষণা করলেন, উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্টভাষা। আমার মতে ঠিক সেদিনই বাঙালি হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ। জন্ম হয়েছিল বাঙালি জাতির। পাকিস্তানের সৃষ্টা নিজেই ঠিক সেদিন অস্বাভাবিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের ধ্বংসের বীজটাও বপন করে গিয়েছিলেন, এই ঢাকার ময়দানেই। এই ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীতে চূড়ান্তভাবে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেলো তার সাধের পাকিস্তান। ঢাকা নগরী প্রতিশোধ নিল জিন্নাহ ও তার অনুসারীদের নষ্টামির। প্রতিশোধ নিল যোগ্যতমভাবেই। মহানগরী ঢাকা চিরদিন ছিল মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মানবিক মুক্তি সাধনের পীঠস্থান। সে এবারও হয়েছে মুক্তির উৎসরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবার বিশ্বের নির্যাতিত জনতার গর্বের শহর আশার নগররূপে। অতিপ্রিয় মাতৃভূমির মুক্তির আশায় নগরীর বীর জনতা সংগ্রাম করেছে বীরত্বের সাথে। সংগ্রাম করেছে এবং হানাদার, দখলদার, দস্যুবাহিনীর বিরুদ্ধে। দস্যুবাহিনীর নৃশংসতা আর হত্যার বিরুদ্ধে শির উঁচু করে রুখে দাঁড়িয়েছে ঢাকার মানুষ। সংগ্রাম করেছে দৃঢ়তার সাথে- বর্বর পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে এই ঢাকা নগরীতেই। এই বীর নগরীর পবিত্র ভূমিতে ফিরে এসেছি আমি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের দিনকয়েকের মধ্যেই। বীর নগরীর পবিত্র মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রথমেই আমি সংগ্রামী ঢাকা ও ঢাকাবাসীর উদ্দেশে শির নত করেছি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধায়।

পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের সপ্তাহ খানেক পরে একজন সাংবাদিক আমাকে বলেছিলেন, সেই দুঃস্বপ্নে ভরা দিনগুলো সম্পর্কে কিছু স্মৃতিকথা লিখতে। আমি একজন সৈনিক। আর লেখা একটি ঈশ্বর প্রদত্ত শিল্প। সৈনিকরা স্বভাবতই সেই বিরল শিল্প ক্ষমতার অধিকারী হয় না। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি ছিল এমনই আবেগধর্মী যে আমাকেও তখন কিছু লিখতে হয়েছে। কলম তুলে নিতে হয়েছিল হাতে।

ভারত ভেঙ্গে দু-ভাগ হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল অস্বাভাবিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের। আর তার অব্যবহিত পরেই আমরা চলে গিয়েছিলাম করাচি। সেখানে ১৯৫২ সালে

আমি পাশ করি মেট্রিক। যোগদান করি পাকিস্তান সামরিক একাডেমিতে অফিসার ক্যাডেটরূপে। সেই থেকে অধিকাংশ সময়ই বিভিন্ন স্থানে আমি কাজ করেছি পাকিস্তানি বাহিনীতে।

স্কুলজীবন থেকে পাকিস্তানিদের দৃষ্টিভঙ্গির অসচ্ছলতা আমার মনকে পীড়া দিতো। আমি জানতাম, অন্তর দিয়ে ওরা আমাদের ঘৃণা করে। স্কুলজীবনেই বহুদিন শুনেছি আমার স্কুল বন্ধুদের আলোচনা। তাদের অভিভাবকরা বাড়িতে যা বলতো তাই তারা রোমন্থন করতো স্কুল প্রাঙ্গণে। আমি শুনতাম মাঝে মাঝেই, শুনতাম তাদের আলোচনার প্রধান বিষয় হতো বাংলাদেশ আর বাংলাদেশকে শোষণ করার বিষয়। পাকিস্তানি তরুণ সমাজেই শেখানো হতো বাঙলিদের ঘৃণা করতে। বাঙালিদের বিরুদ্ধে একটা ঘৃণার বীজ বপণ করে দেওয়া হতো স্কুল ছাত্রদের শিশু মনেই। শিক্ষা দেয়া হতো তাদের বাঙালিকে নিকৃষ্টতর মানব জাতিরূপে বিবেচনা করতে। অনেক সময়ই আমি থাকতাম নীরব শ্রোতা। আবার মাঝে মধ্যে আঘাত হানতাম আমিও। সেই স্কুলজীবন থেকেই মনে মনে আমার একটা আকাঙ্ক্ষাই লালিত হতো, যদি কখনো দিন আসে, তাহলে এই পাকিস্তানবাদের অস্তিত্বেই আমি আঘাত হানব। সযত্নে এই ভাবনাকে আমি লালন করতাম। আমি বড় হলাম। সময়ের সাথে সাথে আমার সেই কিশোর মনের ভাবনাটাও পরিণত হলো, জোরদার হলো। পাকিস্তানি পশুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার দুর্বারতম আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হয়ে উঠতো মাঝে মাঝেই। উগ্র কামনা জাগতো পাকিস্তানের ভিত্তি ভূমিটাকে তছনছ করে দিতে। কিন্তু উপযুক্ত সময় আর উপযুক্ত স্থানের অপেক্ষায় দমন করতাম সেই আকাঙ্ক্ষাকে।

১৯৫২ সালে মশাল জ্বললো আন্দোলনের। ভাষা আন্দোলনে আমি তখন করাচীতে। দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন। পাকিস্তানি সংবাদপত্র, প্রচার মাধ্যম, পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবী সরকারী কর্মচারি, সেনাবাহিনী, আর জনগণ সবাই সমানভাবে তখন নিন্দা করেছিল বাংলা ভাষার। নিন্দা করেছিল বাঙালিদের। তারা এটাকে বলতো বাঙালি জাতীয়তাবাদ। তাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তারা এটাকে মনে করেছিল এক চক্রান্ত বলে। এক সুরে তাই তারা চেয়েছিল একে ধ্বংস করে দিতে। আহ্বান জানিয়েছিল এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের। কেউ বলতো ভেঙ্গে দাও এর শিরদাঁড়া। এর থেকেই আমার তখন ধারণা হয়েছিল, পাকিস্তানিরা বাঙালিদের পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতে চায়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তারা চায় বাঙালিদের উপর ছুড়ি ঘুরাতে। কেড়ে নিতে চায় বাঙালিদের সব অধিকার। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকরূপে বাঙালিদের মেনে নিতে তারা কুণ্ঠিত।

১৯৫৪ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হলো নির্বাচন। যুক্তফ্রন্টের বিজয় রথের চাকার নিচে পিষ্ট হলো মুসলিম লীগ। বাঙালিদের আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক যুক্তফ্রন্টের বিজয় কেতন উড়ালো বাংলায়। আমি তখন দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্যাডেট। আমাদের মনেও জাগলো তখন পুলকের শিহরণ। যুক্তফ্রন্টের বিরাট সাফল্যে আনন্দে আন্দোলিত হলাম আমরা সবাই। পর্বতেঘেরা অ্যাবোটাবাদের প্রত্যন্ত

অঞ্চলে আমরা, বাঙালিক্যাডেটরা আনন্দে হলাম আত্মহারা। খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করলাম সেই বাঁধ ভাঙ্গা আনন্দের তরঙ্গমালা। একাডেমি ক্যাফেটেরিয়ার নির্বাচনী বিজয় উৎসব করলাম আমরা। এ ছিল আমাদের বাংলা ভাষার জয়। এ ছিল আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার জয়, এ ছিল আমাদের জনগণের, আমাদের দেশের এক বিরাট সাফল্য।

এই সময়েই একদিন কতকগুলো পাকিস্তানি ক্যাডেট আমাদের জাতীয় নেতা ও জাতীয় বীরদের গালাগাল করলো। আখ্যায়িত করলো তাদের বিশ্বাসঘাতক বলে। আমরা প্রতিবাদ করলাম। অবতীর্ণ হলাম তাদের সাথে এক উষ্ণতম কথা কাটাকাটিতে। মুখের কথা কাটাকাটিতে এই বিরোধের মীমাংসা হলো না, ঠিক হলো এর মুষ্টিযুদ্ধের দ্বন্দে। বাঙালিদের জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে বক্সিং গ্লোভস হাতে তুলে নিলাম আমি। পাকিস্তানির গোয়ার্তুমির মান বাঁচাতে এগিয়ে এলো এক পাকিস্তানি ক্যাডেট নাম তার লতিফ (পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অর্ডিন্যান্স কোরে এখন সে লে. কর্নেল) লতিফ প্রতিজ্ঞা করলো, আমাকে সে একটু শিক্ষা দেবে। পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে যাতে আর কথা না বলতে পারি সেই ব্যবস্থা নাকি সে করবে। এই মুষ্টিযুদ্ধ দেখতে সেদিন জমা হয়েছিল অনেক দর্শক। তুমুল করতালির মাঝে শুরু হলো মুষ্টিযুদ্ধ। বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তানের দুই প্রতিনিধির মধ্যে। লতিফ আর তার পরিষদ দল অকথ্য ভাষায় আমাদের গালাগাল করলো। হুমকি দিলো বহুতর। কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধ স্থায়ী হলো না ত্রিশ সেকেন্ডের বেশি। পাকিস্তানি, আমার প্রতিপক্ষ ধুলায় লুটিয়ে পড়লো। আবেদন জানালো, সব বিতর্কের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য।

এই ঘটনাটি আমার মনে এক গভীর রেখাপাত করেছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতেও বাঙালি অফিসারদের আনুগত্য ছিল না প্রশ্নাতীত। অবশ্য গুটিকয়েক দালাল ছাড়া। আমাদের ওরা দাবিয়ে রাখতো, অবহেলা করতো অসম্মান করতো। দক্ষ ও যোগ্য বাঙালি অফিসার আর সৈনিকদের ভাগ্যে জুটতো না কোনো স্বীকৃতি বা পারিতোষিক। জুটতো শুধু অবহেলা আর অবজ্ঞা। আখ্যায়িত করতো আমাদের আওয়ামী লীগের দালাল বলে। একাডেমির ক্লাসগুলোতেও সবসময়, বোঝানো হতো, আওয়ামী লীগ হচ্ছে ভারতের দালাল। পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করতেই আওয়ামী লীগ সচেষ্ট। এমন কি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই ক্যাডেটদের শেখানো হতো আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন ওদের রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শত্রু।

বাঙালি অফিসার ও সৈনিকদের সবসময়ই পরিণত হতো পাকিস্তানি অফিসারদের রাজনৈতিক শিকারে। সব বড় বড় পদগুলো আর শোভনীয় নিয়োগ পত্রের শিকাগুলো বরাবরই ছিঁড়তো পাকিস্তানিদের ভাগ্যে বিদেশে শিক্ষার জন্য পাঠানো হতো না বাঙালি অফিসারদের। আমাদের বলা হতো ভীরু কাপুরুল। আমাদের নাকি ক্ষমতা নেই ভালো সৈনিক হওয়ার। ঐতিহ্য নেই যুদ্ধের সংগ্রামের।

এরপর হলো আয়ুবী দশক। আয়ুব খানের নেতৃত্বে চালিত এক প্রতারণাপূর্ণ, সামরিক শাসনের কালো দশক। এই তথাকথিত উন্নয়ন দশকে সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল বাঙালি সংস্কৃতিকে বিকৃত করার। আমাদের জাতীয়তা খাটো করার। বাংলাদেশের বীর জনতা অবশ্য বীরত্বের সাথে প্রতিহত করেছে এই হীন প্রচেষ্টা। এ ছিল এক পালা বদলের কাল। এখান থেকেই আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও শিল্প গ্রহণ করেছে এক নতুন পথ; আমাদের বুদ্ধিজীবী মহল, ছাত্র-জনতা আর প্রচার মাধ্যমগুলো সাংস্কৃতিক বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য আসন্ন সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রস্তুতিতে জনগণ ও সৈনিকদের মনোভাবকে গড়ে তোলা আর আন্দোলনে দ্রুততর গতি সঞ্চারণে এদের রয়েছে এক বিরাট অবদান। জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার একমাত্র উৎপাদন হচ্ছে এর সংস্কৃতি।

১৯৬৩ সালে আমি ছিলাম সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে। সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের তদানীন্তন পরিচালক মেজর জেনারেল নওয়াজেশ আলী মালিক একসময় আমার এলাকা পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল একদিন। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কিছুটা উন্নততর করবার সরকারি অভিমত সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন তিনি। একপর্যায়ে এ ব্যাপারে তিনি আমার অভিমত জানতে চাইলে আমি বললাম, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যদি ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করা না হয়, তাহলে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা চালু রাখা সরকারের পক্ষে কঠিন হবে। এর জবাবে তিনি বললেন, বাংলাদেশ যদি স্বয়ংম্ভর হয় তাহলে সে আলাদা হয়ে যাবে। পাকিস্তানের শীর্ষ স্থানীয় সামরিক কর্তাদের বাংলাদেশ সম্পর্কে এটাই ছিল মনোভাব। অথচ তারাই তখন দেশটা শাসন করছিলেন। তারা চাইছিলেন বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেউলিয়া করে রাখতে।

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হচ্ছে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। সে সময়ে আমি ছিলাম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যার নামে গর্ববোধ করতো তেমনি একটা ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডার। সেই ব্যাটালিয়ন এখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীরও গর্বের বস্তু। খেমকারান রণাঙ্গনের বেদিয়ানে তখন আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। সেখানে আমাদের ব্যাটালিয়ন বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিল। এই ব্যাটালিয়নই লাভ করেছিল পাকবাহিনীর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বাধিক বীরত্ব পদক। ব্যাটালিয়নের পুরস্কার বিজয়ী কোম্পানি ছিল আমার আলফা কোম্পানি। এই কোম্পানি যুদ্ধ করেছিল ভারতীয় সপ্তদশ ইনফ্যান্ট্রি ষোড়শ পাঞ্জাব ও সপ্তম লাইট ক্যাডালবীর (সাঁজোয়া বহর) বিরুদ্ধে। এই কোম্পানির জওয়ানরা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে, ঘায়েল করেছে প্রতিপক্ষকে। বহু সংখ্যক প্রতিপক্ষকে হতাহত করে, যুদ্ধবন্দি হিসেবে আটক করে ছিলাম বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় অফিসার ও সৈনিক। আমি তখন তাদের সাথে কোলাকুলি করি এই কোম্পানি অর্জন করেছিল সৈনিকসুলভ মর্যাদা, প্রশংসা পেয়েছিল তাদের প্রীতির। যুদ্ধবিরতির সময় বিভিন্ন সুযোগে আমি দেখা করেছিলাম বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় অফিসার ও সৈনিকের

সাথে। আমি তখন তাদের সাথে কোলাকুলি করেছি হাত মিলিয়েছি। আমার ভালো লাগতো তাদের সাথে হাত মেলাতে। কেননা আমি তখন দেখলাম, তারাও অত্যন্ত উঁচুমানের সৈনিক। আমরা তখন মত বিনিময় করেছিলাম। সৈনিক হিসেবেই আমাদের মাঝে একটি হৃদ্যতাও গড়ে উঠেছিল, আমরা বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিলাম। এই প্রীতিই দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে পাশাপাশি ভাই-এর মতো দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করেছে আমাদের।

পাকিস্তানিরা ভাবতো বাঙালিরা ভালো সৈনিক নয়। খেমকারানের যুদ্ধে তাদের এই বদ্ধমূল ধারণা ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। পাকিস্তানি বাহিনীর সবার কছেই আমরা ছিলাম ঈর্ষার পাত্র। সে যুদ্ধে এমন একটা ঘটনাও ঘটেনি যেখানে বাঙালি জওয়ানরা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেছে। ভারতের সাথে সেই সংঘর্ষে বহুক্ষেত্রে পাকিস্তানিরাই বরং লেজগুটিয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। সে সময় পাকিস্তানিদের সমন্বয়ে গঠিত পাকবাহিনীর এক প্রথম শ্রেণীর সাঁজোয়া ডিভিশনই নিম্নমানের ট্যাংকের অধিকারী ভারতীয় বাহিনীর হাতে নাস্তানাবুদ হয়েছিল। এসব কিছুতে পাকিস্তানিরা বিচলিত হয়ে পড়েছিল। বাঙালি সৈনিকের ক্ষমতা উপলব্ধি করে হৃৎকম্প জেগেছিল তাদের।

এই যুদ্ধে পাকিস্তান বিমানবাহিনীার বাঙালি পাইলটরাও অর্জন করেছিল প্রচুর সুনাম। এসব কিছুই চোখ খুলে দিয়েছিল বাঙালি জনগণের, তারাও আস্থাশীল হয়ে উঠেছিল তাদের বাঙালি সৈনিকদের বীরত্বের প্রতি। বাঙালি সৈনিকদের বীরত্বে ও দক্ষতার প্রশংসা হয়েছিল তখন বিশ্বে বিভিন্ন সংবাদপত্রে। উল্লেখ করা হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের নাম। এ নাম আজ বাংলাদেশেও এক পরম প্রিয় সম্পদ। এসব কিছুর পরিণতিতে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বাহিনী গ্রহণ করলো এক গোপন পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা ঠিক করলো প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বাঙালিদের আনুপাতিক হার কমাতে হবে। তারা তাদের এই গোপন পরিকল্পনা পুরোপুরিভাবে কার্যকরী করলো। কিন্তু এই গোপন তথ্য আমাদের কাছে গোপন ছিল না। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছিল আমাদের মনে। বাঙালি সৈনিকের মনে। বিমানবাহিনীর বাঙালি জওয়ানদের মনে। আমরা তখনই বুঝেছিলাম, বিশ্বের যে কোন বাহিনীর মোকাবিলায়ই আমরা সক্ষম।

জানুয়ারি মাসে আমি নিযুক্ত হয়েছিলাম পাকিস্তান সামরিক একাডেমিতে প্রশিক্ষকের পদে। যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি একদিন শিক্ষক হলাম। মনে রইলো শুধু যুদ্ধের স্মৃতি। সামরিক একাডেমিতে শুরু হলো আমার শিক্ষক জীবন। পাকিস্তানিদের আমি সমর বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। আর সেই বর্বররা এই বিদ্যাকে কাজে লাগালো আমারই দেশের নিরস্ত্র জনতার বিরুদ্ধে এক পাশবিক যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়ে।

সামরিক একাডেমিতে থাকাকালেও আমি সম্মুখীন হয়েছি শুধু নিকৃষ্ট অভিজ্ঞতার। সেখানে দেখেছি বাঙালি ক্যাডেটদের প্রতি পাকিস্তানিদের একই

অজ্ঞতার ঐতিহ্যবাহী প্রতিচ্ছবি। অবৈধ উপায়ে পাকিস্তানিদের দেখেছি বাঙালি ক্যাডেটদের কোণঠাসা করতে। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন যেমন আমি যখন শিক্ষক হলাম তখনো তেমনিভাবেই বাঙালি ক্যাডেটদের ভাগ্যে জুটতো শুধু অবহেলা অবজ্ঞা আর ঘৃণা। আন্তঃসার্ভিস নির্বাচনী বোর্ডে গ্রহণ করা হতো নিম্নমানের বাঙালি ছেলেদের, ভালো ছেলেদের নেওয়া হতো না ক্যাডেটরূপে, রাজনৈতিক মতাদর্শ আর দরিদ্র পরিবারের নামে প্রত্যাখ্যাতকরা হতো তাদের। এর সবকিছুই আমাকে ব্যথিত করতো। এই সামরিক একাডেমিতেই পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে আমার মন বিদ্রোহ করলো। একাডেমির গ্রন্থাগারে সংগৃহীত ছিল সব ভালো বই। আমি জ্ঞানার্জনের এই সুযোগ গ্রহণ করলাম।

আমি ব্যাপক পড়াশোনা করলাম। ১৯৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে, ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা এটাকে আখ্যাতি করেছিল বিদ্রোহ হিসেবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা বিদ্রোহ ছিল না। এটা ছিল এক মুক্তিযুদ্ধ। ভারতের জন্য স্বাধীনতার যুদ্ধ।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তথাকথিত সামরিক যুদ্ধজীবীদের সাথেও মাঝে মাঝে আমার আলোচনা হতো। তাদের পরিকল্পনা ছিল আরো কয়েক দশক কোটি কোটি জাগ্রত বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার। কিন্তু আমি বিশ্বাস করলাম, বাংলাদেশের জনগণ আর ঘুমিয়ে নেই। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের পরিণতিই ছিল এর জ্বলন্ত প্রমাণ। স্বাধীনতার জন্য আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে এটাও ছিল একটা সুস্পষ্ট অঙ্গুলি সংকেত। এই মামলার পরিণতি এক করে দিলো বাঙালিদের।

১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে আমাকে নিয়োগ করা হলো জয়দেবপুরে। ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের আমি ছিলাম সেকেন্ড ইন কমান্ড। আমাদের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল আবদুল কাইয়ুম ছিল একজন পাকিস্তানি। একদিন ময়মনসিংহের এক ভোজসভায় ধমকের সুরে সে ঘোষণা করল, বাংলাদেশের জনগণ যদি সদাচরণ না করে তাহলে সামরিক আইনের সত্যিকার ও নির্মম বিকাশ এখানে ঘটানো হবে। আর তাতে হবে প্রচুর রক্তপাত। এই ভোজসভায় কয়েকজন বেসামরিক ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মাঝে ছিলেন ময়মনসিংহের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার জনাব মোকাম্মেল। লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাইয়ুমের এই দম্ভোক্তি আমাদের বিস্মিত করল। এর আগে কাইয়ুম এক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। ইসলামাবাদে পাকিস্তানি নীতি নির্ধারকদের সাথে সংযোগ ছিল তার। তার মুখে তার পুরনো প্রভুদের মনের কথাই প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তী সময়ে এ ব্যাপারে আমি তাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করি এবং এর কথা থেকে আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সে যা বলেছে তা জেনে শুনেই বলছে। উপযুক্ত সময়ে কার্যকরী করার জন্য সামরিক ব্যবস্থার এক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। আর কাইয়ুম সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আমি এতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এই সময়ে আমি একদিন চতুর্দশ ডিভিশনের সদর

দফতরে যাই। জিএসও-১ (গোয়েন্দা) লে. কর্নেল তাজ আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের কয়েকজন সম্পর্কে আমার কাছে অনেক কিছু জানতে চায়। আমি তার এসব তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য কী জিজ্ঞাসা করি। সে আমাকে জানায় যে তারা বাঙালি নেতাদের জীবনী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করছে। আমি বারবার তাকে জিজ্ঞেস করি, এ সকল খুঁটিনাটির প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের জবাবে সে জানায় ভবিষ্যতে রাজনৈতিক গতিধারায় এগুলো কাজে লাগবে। গতি যে সুবিধার নয়, তার সাথে আলোচনা করেই আমি বুঝতে পারি। সেই বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে চার মাসের জন্য আমি পশ্চিম জার্মানি যাই। এই সময়ে বাংলাদেশের সর্বত্র এর রাজনৈতিক আন্দোলনের ঝড় বয়ে যায়।

পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থানকালে আমি একদিন দেখি সামরিক অ্যাটাচি কর্নের জুলফিকার সে সময়ের পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে অ্যাটাচির সাথে কথা বলছিল। এই ব্যক্তিটি ছিল এক সরলমনা পাঠান অফিসার। তাদের সামনে ছিল করাচির দৈনিক পত্রিকা ডনের একটা সংখ্যা। এতে প্রকাশিত হয়েছিল ইয়াহিয়ার ঘোষনা ১৯৭০ সালেই নির্বাচন হবে। সরলমনা পাঠান অফিসার বলছিল নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ ব্যাপকভাবে নির্বাচনে জয়ী হবে, আর সেখানেই হবে পাকিস্তানের সমাপ্তি। এর জবাবে কর্নেল জুলফিকার বলল, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে সংখ্যা গরিষ্টতা লাভ করতে পারে। কিন্তু কেন্দ্র সে ক্ষমতা পাবে না। কেননা অন্যান্য দলগুলো মিলে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগকে ছাড়িয়ে যাবে। আমি এটা জেনে বলছি। এ সম্পর্কে আমার কাছে বিশেষ খবর আছে।

এরপর আমি বাংলাদেশে ফিরে এলাম। ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে আমাকে নিয়োগ করা হলো চট্টগ্রামে। এবার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটালিয়নের সেকেন্ড ইন কমান্ড। এর কয়েকদিন পর আমাকে ঢাকা যেতে হয়। নির্বাচনের সময়টায় আমি ছিলাম ক্যান্টনমেন্টে। প্রথম থেকেই পাকিস্তানি অফিসাররা মনে করতো, চূড়ান্ত বিজয় তাদেরই হবে। কিন্তু নির্বাচনের দ্বিতীয় দিনেই তাদের মুখে আমি দেখলাম হতাশার সুস্পষ্ট ছাপ। ঢাকা অবস্থানকারী পাকিস্তানি সিনিয়র অফিসারদের মুখে দেখলাম আমি আতঙ্কের ছবি। তাদের এই আতঙ্কের কারণও আমার অজানা ছিল না। শীঘ্রই জনগণ গণতন্ত্র ফিরে পাবে, এই আশায় আমরা বাঙালি অফিসাররা তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম।

চট্টগ্রামে আমরা ব্যস্ত ছিলাম অষ্টম ব্যাটালিয়ানকে গড়ে তোলার কাজে। এটা রেজিমেন্টের তরুণতম ব্যাটালিয়ান। এটার ঘাঁটি ছিল ষোলশহর জওয়ানের এক আগামী দল। অন্যেরা ছিল একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের সৈনিক। আমাদের তখন যে সব অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল তিনশত পুরনো ৩০০৩ রাইফেল, চারটা এলএমজি ও দুটি তিন ইঞ্চি মর্টার। গোলাবারুদের পরিমাণও ছিল নগণ্য। আমাদের এন্টিট্যাংক বা ভারি মেশিনগান ছিল না। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে বাংলাদেশে যখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠল, তখন আমি একদিন খবর পেলাম, তৃতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়ানের সৈনিকরা চট্টগ্রাম

শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিহারিদের বাড়িতে বাস করতে শুরু করেছে। খবর নিয়ে আমি আরো জানলাম, কমান্ডোরা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ নিয়ে বিহারি বাড়িগুলোতে জমা করেছে এবং রাতের অন্ধকারে বিপুল সংখ্যায় তরুণ বিহারিদের সামরিক ট্রেনিং দিচ্ছে এসব কিছু থেকে এরা যে ভয়ানক রকমের অশুভ একটা কিছু করবে তার সুস্পষ্ট আভাসই আমরা পেলাম।

তারপর এলো ১লা মার্চ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সারা দিয়ে দেশে শুরু হলো ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন। এর পরদিন দাঙ্গা হলো বিহারিরা হামলা করেছিল এক শান্তিপূর্ণ মিছিলে, এর থেকেই ব্যাপক গোলযোগের সূচনা হলো। এই সময়ে আমার ব্যাটালিয়নের এনিসওরা আমাকে জানালো প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিংশতিতম বালুচ রেজিমেন্টের জওয়ানরা বেসামরিক পোশাক পরে বেসামরিক ট্রাকে করে কোথায় যেন যায়। তারা ফিরে আসে আবার শেষ রাতের দিকে। আমি উৎসুক হলাম, লোক লাগালাম খবর নিতে। খবর নিয়ে জানলাম প্রতিরাতেই তারা যায় কতকগুলো নির্দিষ্ট বাঙালি পাড়ায়, নির্বিচারে হত্যা করে সেখানে বাঙালিদের। এই সময় প্রতিদিনই ছুরিকাহত বাঙালিকে হাসপাতালে ভর্তি হতেও শোনা যায়।

এই সময়ে আমাদের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জানজুয়া আমার গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখার জন্যেও লোক লাগায়। মাঝে মাঝেই তার লোকেরা গিয়ে আমার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করে। আমরা তখন আশঙ্কা করছিলাম, আমাকে হয়ত নিরস্ত্র করা হবে। আমি আমার মনোভাব দমন করে কাজ করে যাই এবং তাদের উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেয়ার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করি। বাঙালি হত্যা ও বাঙালি দোকানপাটে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ক্রমেই বাড়তে থাকে।

আমাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হলে আমি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবো কর্নেল (তখন মেজর) শওকতও আমার কাছে জানতে চান। ক্যাপ্টেন শমসের মবিন এবং মেজর খালেকুজ্জামান আমাকে জানান যে স্বাধীনতার জন্য আমি যদি অস্ত্র তুলে নেই তাহলে তারাও দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। ক্যাপ্টেন অলি আহমদ আমাদের মাঝে খবর আদান-প্রদান করতেন। জেসিও এবং এনসিওরাও দলে দলে বিভক্ত হয়ে আমার কাছে বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকলো, আসতে থাকলো, তারাও আমাকে জানায় যে কিছু একটা না করলে বাঙালি জাতি চিরদিনের জন্যে দাসে পরিণত হবে। আমি নীরবে তাদের কথা শুনতাম। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম, উপযুক্ত সময় এলেই আমি মুখ খুলবো।

সম্ভবত ৪ঠা মার্চে আমি ক্যাপ্টেন অলি আহমদকে ডেকে নেই। আমাদের ছিল সেটা প্রথম বৈঠক। আমি তাকে সোজাসুজি বললাম, সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমাদের সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। ক্যাপ্টেন আহমদও আমার সাথে একমত হন। আমরা পরিকল্পনা তৈরি করি এবং প্রতিদিনই আলোচনা বৈঠকে মিলিত হতে শুরু করি।

৭ মার্চের রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রিন সিগন্যাল বলে মনে হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম। কিন্তু তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে তা জানালাম না। বাঙালি ও পাকিস্তানি সৈনিকদের মাঝেও উত্তেজনা ক্রমেই চরমে উঠছিল। ১৩ মার্চ শুরু হলো বঙ্গবন্ধুর সাথে ইয়াহিয়ার আলোচনা। আমরা সবাই ক্ষণিকের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমরা আশা করলাম পাকিস্তানি নেতারা যুক্তি মানবে এবং পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে পাকিস্তনিদের সামরিক প্রস্তুতি হ্রাস না পেয়ে দিন দিনই বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। প্রতিদিনই পাকিস্তান থেকে সৈন্য আমদানি করা হলো। বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকলো অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ। সিনিয়র পাকিস্তানি সামরিক অফিসাররা সন্দেহজনকভাবে বিভিন্ন গ্যারিসনে আসা যাওয়া শুরু করল। চট্টগ্রামে নৌবাহিনীরও শক্তি বৃদ্ধি করা হলো।

১৭ মার্চ স্টেডিয়ামে ইবিআরসির লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম আর চৌধুরী, আমি, ক্যাপ্টেন আলি আহমদ ও মেজর আমিন চৌধুরী এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলাম। এক চূড়ান্ত যুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। লে. কর্নেল চৌধুরীকে অনুরোধ করলাম নেতৃত্ব নিতে। দুদিন পর ইপিআর বাহিনীকে সঙ্গে নেয়ার প্রস্তাব দিলাম। আমরা ইপিআর বাহিনীকে আমাদের পরিকল্পনা বললাম।

এরমধ্যে পাকিস্তানি বাহিনীও তৎপরতা শুরু করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করলো, ২১ মার্চ জেনারেল হামিদ খান গেল চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে। চট্টগ্রামে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নই তার এই সফরের উদ্দেশ্য। সেদিন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ভোজসভায় জেনারেল হামিদ ২০তম বালুচ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল ফাতমীকে বললো- ফাতমী, সংক্ষেপে, ক্ষিপ্রগতিতে আর যত কম সম্ভব লোক ক্ষয় করে কাজ সারতে হবে। আমি এই কথাগুলো শুনেছিলাম।

২৪ মার্চ ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ঢাকা চলে এলেন। সন্ধ্যায় পাকিস্তানি বাহিনী শক্তি প্রয়োগে চট্টগ্রাম বন্দরে যাওয়ার পথ করে নিল। জাহাজ সোয়াত থেকে অস্ত্র নামানোর জন্যেই বন্দরের দিকে ছিল তাদের এই অভিযান। পথে জনতার সাথে ঘটলো তাদের কয়েক দফা সংঘর্ষ। এতে নিহত হলো বিপুলসংখ্যক বাঙালি। সশস্ত্র সংগ্রাম যে কোন মুহূর্তে শুরু হতে পারে, এ আমরা ধরেই নিয়ে ছিলাম। মানসিক দিক দিয়ে আমরা ছিলাম প্রস্তুত। পরদিন আমরা পথের ব্যারিকেড অপসারণের কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

তারপর এলো সেই কালোরাত। ২৫ ও ২৬ মার্চের মধ্যবর্তী কালো রাত। রাত ১টায় আমার কমান্ডিং অফিসার আমাকে নির্দেশ দিলো নৌবাহিনী ট্রাকে করে চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়ে জেনারেল আনসারীর কাছে রিপোর্ট করতে। আমার সাথে নৌ-বাহিনীর (পাকিস্তানি) প্রহরী থাকবে তাও জানানো হলো। আমি ইচ্ছা করলে আমার সাথে তিনিজন লোক নিয়ে যেতে পারি। তবে আমার সাথে আমারই ব্যাটালিয়নের একজন পাকিস্তানি অফিসারও থাকবে। অবশ্য কমান্ডিং অফিসারের মতো সে যাবে আমাকে গার্ড দিতেই।

এ আদেশ পালন করা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমি বন্দরে যাচ্ছি কিনা তা দেখার জন্য একজন লোক ছিল। আর বন্দরে প্রতীক্ষায় ছিল জেনারেল আনসারী। হয়তো বা আমাকে চিরকালের মতোই স্বাগত জানাতে। আমরা বন্দরের পথে বেরুলাম। আগ্রাবাদ আমাদের থামতে হলো। পথে ছিল ব্যারিকেড। এই সময়ে সেখানে এলো মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরী। ক্যাপ্টেন অলি আহমেদের কাছ থেকে এক বার্তা এসেছে। আমি রাস্তায় হাঁটছিলাম। খালেক আমাকে একটু দূরে নিয়ে গেল, কানে কানে বললো, 'তারা ক্যান্টনমেন্ট ও শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে। বহু বাঙালিকে ওরা হত্যা করছে'। এটা ছিল একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত সময়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি বললাম, আমরা বিদ্রোহ করলাম। তুমি ষোলশহর বাজারে যাও। পাকিস্তানি অফিসারদের গ্রেফতার করো। অলি আহমদকে বলো ব্যাটালিয়ান তৈরি রাখতে আমি আসি। আমি নৌবাহিনীর ট্রাকের কাছে ফিরে গেলাম। পাকিস্তানি অফিসার, নৌবাহিনীর চিফ পোস্ট অফিসার ও ড্রাইভারকে জানালাম যে, আমাদের আর বন্দরে যাওয়ার দরকার নেই।

এতে তাদের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না দেখে আমি পাঞ্জাবি ড্রাইভারকে ট্রাক ঘুরাতে বললাম। ভাগ্য ভালো, সে আমার আদেশ মানলো। আমরা আবার ফিরে চললাম। ষোলশহর বাজারে পৌঁছেই আমি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে একটা রাইফেল তুলে নিলাম। পাকিস্তানি অফিসারটির দিকে তাক করে, বললাম হাত তুলো সে আমার কথা মানলো। আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। তারা ছিল আটজন। সবাই নির্দেশ মানলো এবং অস্ত্র ফেলে দিল। আমি কমান্ডিং অফিসারের জিপ নিয়ে তার বাসার দিকে রওয়ানা দিলাম। তার বাসায় পৌঁছে হাত রাখলাম কলিংবেলে। কমান্ডিং অফিসার পাজামা পরেই বেরিয়ে এলো। খুলে দিলো দরজা। ক্ষিপ্রগতিতে আমি ঘরে ঢুকে পরলাম এবং গলাসুদ্ধ তার কলার টেনে ধরলাম।

দ্রুতগতিতে আবার দরজা খুলে কর্নেলকে আমি বাইরে টেনে আনলাম। বললাম, বন্দরে পাঠিয়ে আমাকে মারতে চেয়েছিলে? এই আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। এখন লক্ষী সোনার মতো আমার সঙ্গে এসো। সে আমার কথা মানলো। আমি তাকে ব্যাটালিয়ানে নিয়ে এলাম। অফিসারদের মেসে যাওয়ার পথে আমি কর্নেল শওকতকে (তখন মেজর) ডাকলাম। তাকে জানালাম আমরা বিদ্রোহ করেছি। শওকত আমার হাতে হাত মিলালো। ব্যাটালিয়নে ফিরে দেখলাম, সমস্ত পাকিস্তানি অফিসারদেরকে বন্দি করে একটা ঘরে রাখা হয়েছে। আমি অফিসে গেলাম। চেষ্টা করলাম লে. কর্নেল এ আর চৌধুরীর সাথে আর মেজর রফিকের সাথে যোগাযোগ করতে। কিন্তু পারলাম না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তরপর রিং করলাম বেসামরিক বিভাগের টেলিফোন অপারেটরকে। তাকে অনুরোধ জানালাম, ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, কমিশনের

ডিআইপি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের জানাতে যে ইস্ট বেঙ্গ রেজিমেন্টে অষ্টম ব্যাটালিয়ন বিদ্রোহ করেছে। বাংলাদেশর স্বাধীনতার যুদ্ধ করবে তারা।

এদের সবার সাথেই আমি টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কাউকেই পাইনি। তাই টেলিফোন অপারেটরের মাধ্যমেই আমি তাদের খবর দিতে চেয়েছিলাম। অপারেটর সানন্দে আমার অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি হলো। সময় ছিল অতি মূল্যবান। আমি ব্যাটালিয়নের অফিসার, জেসিও আর জওয়ানদের ডাকলাম। তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলাম। তারা সবই জানতো। আমি সংক্ষেপে সব বললাম এবং তাদের নির্দেশ দিলাম সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। তারা সর্বসম্মতিক্রমে হৃষ্টচিত্তে এ আদেশ মেনে নিলো। আমি তাদের একটা সামরিক পরিকল্পনা দিলাম। তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট। ২৬ মার্চ। ১৯৭১ সালে রক্তাক্ষরে বাঙালির হৃদয়ে লেখা একটি দিন। বাংলাদেশের জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে এই দিনটিকে। স্মরণ রাখবে ভালোবাসায়। এই দিনটি তারা কোনোদিন ভুলবে না। কোনো দিন না।

জাতীয় শোক দিবসে নিন্দনীয় জন্মোৎসব এবং আমার কিছু অনুতাপ

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ

আমি এমন একটি সুযোগ হাতছাড়া করেছি-যা আর কেউ কোনো দিন ফিরে পাবে না। তার জন্য আফসোস আমাকে আজও দংশন করে। আমাকে তো 'স্বৈরাচার' বলা হয় সে জন্য আমার কোন দুঃখবোধ নেই। কারণ স্বৈরাচার বলতে যে অর্থটা বোঝানো হয় সেটা আমার আগে-পরে অনেকের জন্য অনেক বেশি প্রযোজ্য হয়ে আছে। তবে একটি ক্ষেত্রে যদি আমি সত্যিকার অর্থে স্বৈরাচার হতে পারতাম তাহলে ইতিহাসের পাতায় একটি মহৎ কাজের অধিকারী হয়ে থেকে যেতাম। আসলে বড় কিছু করার সুযোগ একজন মানুষের জীবনে বারবার আসে না-সেটা একবার হাত থেকে ফসকে গেলে আর ধরা দেয় না। আমার জীবনে ঘটেছে তাই। আমি একটা সিদ্ধান্ত নিলাম, কিন্তু বাস্তবায়ন করতে পরলাম না। ফেঁসে গেলাম সবার মতামত গ্রহণ করতে গিয়ে। অথচ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম- সেটা যদি অন্যের মতের তোয়াক্কা না করে কার্যকর করে দিতাম, তাহলে ওই ক্ষেত্রে আমার নামটা এক মহান মানুষের পাশে ছোট করে হলেও ইতিহাসে থেকে যেত। অতীতের সেসব কথা এবং আত্মোপলব্ধি আজ আমাকে বড় বেশি পীড়া দেয়, সে হলো আমার রাষ্ট্রপতি জীবনের কথা।

একদা আমার মনে হলো–আজ আমি রাষ্ট্রপতি হলাম কী করে! লেফটেন্যান্ট কর্নেল থেকে লেফটেন্যান্ট জেনারেলই বা হওয়ার কী উপায় ছিল আমার! পূর্বসূরি জেনারেল জিয়াউর রহমানেরও কি তার সর্বোচ্চ পদে আসা সম্ভব ছিল? ওই যে লাল-সবুজ পতাকাটা উড়ছে–ওটাই বা কার দান? ওই পতাকা উড়ছে বলেই তো আজ আমি একটি স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপতি। আজ আমি যেখানে আছি; আমার আগে এখানে আরও একাধিকজন এসেছেন, আমার পরে আরও অগণিতজন এখানে আসবেন–এটা কার অবদান? যার অবদান তাঁকে আমরা সবাই চিনি ও জানি। তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। কিন্তু তার স্বীকৃতি কোথায়? যিনি একটি জাতিকে স্বাধীনতা এনে দিলেন–একটি দেশের জন্ম দিলেন, সেই জন্মদাতাকে পিতা বলতে আমাদের কণ্ঠ স্তব্ধ কেন? তাই সেই ভাবনা থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি সাংবিধানিকভাবে

বাংলাদেশের জাতির পিতা বলে ঘোষণা দেব। কিন্তু আমি তা পারলাম না। কারণ আমি স্বৈরাচার হতে পারিনি। গণতান্ত্রিক নিয়ম মানতে চেয়েছি। সবার মতামত জানতে চেয়েছি।

যাদের সহযোগিতা নিয়ে আমি দেশ পরিচালনা করতাম, তাদের মতামতকে আমি গুরুত্ব দিয়ে চলেছি। বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা ঘোষণা দিতে যাদের আপত্তি ছিল তারা এতটাই সোচ্চার হয়ে গেলেন, আমি দ্বিধায় পড়ে গেলাম। যাদের মৌন সম্মতি ছিল কিংবা সমর্থন ছিল, তারা বিরোধিতাকারীদের জান-বাজি আপত্তিতে কোণঠাসা হয়ে গেলেন। অগত্যা আমিও সেই সিদ্ধান্তকে গিলোটিনে পৌঁছে দিলাম। আমি তথাকথিত 'স্বৈরাচার' হতে পারলাম না। তারপর যে কাজটা আমার হাতছাড়া হলো সেটি বাস্তবায়িত হওয়ার পর প্রতিনিয়তই যন্ত্রণায় বিবেক বিধ্বস্ত হয়েছে। তারপরও সান্ত্বনা এই যে, দেরিতে হলেও সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ দেশ এবং এ জাতি তার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানটিকে যোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির জনক। তাকে দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাবে না। তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন না করা স্বাধীনতাকেই অসম্মান করা, এ দেশের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। আমরা কে কোন দল করি, সেটা বড় কথা নয়। আমারা এক জাতি এবং এক দেশের নাগরিক। তেমনই আমাদের জাতির পিতাও এক। জাতির পিতা কোনো বিশেষ দলের সম্পত্তি নয়। তার মালিকানা গোটা জাতির। কিন্তু আমাদের বড় দুর্ভাগ্য, আমরা বিরূপ সমালোচনায় অত্যধিক পটু। আমাদের বোদ্ধা এবং বুদ্ধিজীবীরা এ বিষয়ে আরও বেশি অভিজ্ঞ। আজ যদি আমি বলি বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন আমার চেতনার পথ ও পাথেয়- তাহলে একটি মহল দ্বারা আমি অবধারিতভাবে অন্য একটি দলের দালাল বা তাঁবেদার বলে অভিহিত হব। যে কারণে আমি বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা বলে ঘোষণা দিতে পারিনি। কিন্তু আজ মনে হয় কত বড় ভুল আমি করেছি! কবরে শায়িত জাতির পিতা প্রথমবারের মতো যে রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধানের কাছ থেকে স্যালুট পেয়েছিলেন, সেই সম্মান প্রদর্শনের বিরল সৌভাগ্য ছিল আমার। তখনো যে সমালোচনা হয়নি তাও নয়; তখনো যে টুঙ্গিপাড়ায় যাওয়ার পথে বাধা আসেনি, তাও নয়। তবে তা সবাই উপেক্ষা করলেও ওই একটি ক্ষেত্রে তীব্র বিরোধিতাকে আমলে নিয়ে মহৎ কাজটি করতে পারিনি। তবে একটি প্রশ্ন আমাকে বারে বারে বিদ্ধ করে। ১৯৮৬ সালের পার্লামেন্টে আওয়ামী লীগপ্রধান বিরোধী দলে ছিলেন। তাদের দাবি-দাওয়ার প্রতি আমার সরকার ছিল সব সময় নমনীয়। সেই সময় কেন প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল এবং বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা ঘোষণার দাবি জানাল না, তা আমার কাছে বোধগম্য নয়। তাহলে অন্তত ৩০-৩৫ বছর বয়সের প্রজন্ম অনেক আগেই বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা হিসেবে চিনে আসত।

আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি এবং মনে করি, বঙ্গবন্ধুকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে সর্বসম্মতভাবে জাতির পিতা হিসেবে মেনে নিতে না পারলে রাজনৈতিক

হিংসা-হানাহানির অবসান ঘটবে না এবং জাতি কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না।

আজ একটি পক্ষ শোক দিবসে জন্মদিন পালন করে বিকৃত মানসিকতা নিয়ে উৎসব করে। যারা এটা পালন করেন তারা সমালোচনার মুখে যুক্তি দেখান যে, '১৫ আগস্ট যারা জন্মগ্রহণ করে তারা কি জন্মদিন পালন করবে না? ১৫ আগস্ট জন্মদিন পালন করা কি নিষিদ্ধ করা হয়েছে?' এরকম যুক্তি দেখানো যেতে পারে। যে যা করে তার পক্ষে যুক্তির অভাব থাকে না। চোর যে চুরি করে তার জন্যও সে বিবেকের কাছে একটা যুক্তি দেখায়-'খাব কি-পেটের দায়ে চুরি করি'। কিন্তু কাজটা তো অন্যায়। কোনো অন্যায়কে আমরা প্রশ্রয় দিতে পারি না। বেগম জিয়া যে অবস্থানে আছেন-সেই অবস্থানে থেকে শোক দিবসে মনগড়া জন্মদিন পালন করা অনৈতিক। এটা তিনি করতে পারেন না। একটা বিশাল জনগোষ্ঠির অনুভূতিকে আঘাত করা অন্যায়। এটা করে তিনি রাজনৈতিক হানাহানিকে উসকে দিচ্ছেন। গোটা জাতিকে বিভক্ত করছেন। জাতীয় কোনো ইস্যুতেও গোটা জাতির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথকে রুদ্ধ করে দিচ্ছেন। আমরা তার প্রমাণ হাতে হাতে দেখছি। আজকের বিএনপি রাজনৈতিকভাবে খাদে পড়ে সংলাপের দাবি তুলছে। অপরদিকে প্রধানমন্ত্রী কী বলছেন? তিনি বলছেন- 'কীসের সংলাপ? কার সঙ্গে সংলাপে বসব? যারা আমাকে গ্রেনেড মেরে হত্যা করতে চেয়েছে- তাদের সঙ্গে সংলাপে বসব? যারা শোক দিবসে জন্মদিনের নামে উৎসব করে, তাদের সঙ্গে সংলাপে বসব? নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এসব কথার যুক্তি আছে। সেই যুক্তিতে তিনি বেগম খালেদা জিয়া কিংবা তার দলের সঙ্গে কোনো সংলাপ চাচ্ছেন না। তাহলে এই দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ থাকলে তার মীমাংসা হবে কী ভাবে?

আমার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হাসিনা-খালেদা তো একসঙ্গে বসেছিলেন। তখন বেগম খালেদার জন্মদিন ১৫ আগস্ট ছিল না এবং তখন পর্যন্ত খালেদার দল শেখ হাসিনাকে হত্যার প্রচেষ্টাও চালায়নি। হয়তো তাই তারা একসঙ্গে বসতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেই সম্ভাবনা এখন আর দেখছি না। কারণ শেখ হাসিনা আর যা-ই কিছু করতে পারেন না কেন-তার পিতার রক্তের অবমাননা করতে পারবেন না। কারও পক্ষে তা পারা সম্ভবও নয়। বেগম জিয়ার এমন কি প্রয়োজন ছিল যে, শেষ বয়সে এসে শুধু বঙ্গবন্ধুর শাহাদাতের দিবসটিকে বিদ্রূপ করার জন্য তাকে একটি সাজানো জন্মদিন পালন করতে হবে! কোনো নথিপত্র, প্রমাণাদি বলছে না যে-১৫ আগস্ট খালেদা জিয়ার জন্মদিন। তিনি প্রথম যেবার ক্ষমতায় এলেন তখনো তার জন্মদিন ১৫ আগস্ট ছিল না। আমি দীর্ঘদিন জেনারেল জিয়ার কাছাকাছি, পাশাপাশি এবং তার ঘনিষ্ট ছিলাম। আজও তাকে সম্মান করি। কোনো দিন জেনারেল জিয়াকে ১৫ আগস্ট তার স্ত্রীর জন্মদিন পালন করতে দেখিনি। তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নিই যে, বেগম জিয়ার ঘোষিত তারিখটিই তার সঠিক জন্মদিন- তাহলেও কি ওই সেনসেটিভ দিনে তার কেককাটা উৎসব পালন করা সঠিক হচ্ছে? বরং তিনি যদি বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর দিনটিতে তার প্রতি শ্রদ্ধা

জানিয়ে আগে পরের কোন দিনে ওই কেককাটার উৎসব করেন- তাহলে তার মহত্ত্বই প্রকাশ পেত। ব্রিটেনের রানী এলিজাবেথও জনগণের সুবিধার্থে তার সঠিক জন্মদিনের উৎসব ডিসেম্বরে করেন না। কারণ তখন বড়দিন এবং শীতের তীব্রতার জন্য জুলাই মাসে ব্রিটেনের রানীর জন্মদিন পালন করা হয়। এতে কি তার জন্মদিনের মাহাত্ম্য ম্লান হয়ে যায়? ১৫ আগস্টকে একটি 'তৃপ্তিদায়ক দিন' হিসেবে উদযাপন করার জন্য জেনারেল জিয়ার শাসনামলে তারই পৃষ্ঠপোষকতায় আরেকটি স্বাধীনতাবিরোধী দল সবুর খানের মুসলিম লীগ ওই দিনটিকে 'নাজাত দিবস' নামে পালন করত। বেগম জিয়ার নতুন জন্মদিবস পালনের সঙ্গে ওই নাজাত দিবসের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস! সেই নাজাত দিবসও আর নেই এবং মুসলিম লীগও বিলীন। একটি কথা আছে-'অগ্রজ যেদিকে যায়- অনুজও সে পথে যায়।'

খালেদার বিএনপি কোন পথে যাবে তা নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই-কিন্তু যে বিষবৃক্ষটি রোপণ করে যাচ্ছেন, তার ফলে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, হিংসা-হানাহানি এবং পারস্পরিক বিদ্বেষ মহামারী আকার ধারণ করছে। একজন মুজিব-প্রেমিক যদি দেখেন-শোক দিবসে আরেকটি পক্ষ উৎসব করছে-তাহলে এই দুই পক্ষের মধ্যে সহাবস্থান কস্মিনকালেও কী আশা করা যায়? এটা চরম নিন্দার ও ঘৃণার। মাথাব্যথা সেখানেই যে, এসবের বিরূপ ফল ভোগ করতে হচ্ছে গোটা জাতিকে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
১৮ আগস্ট ২০১৪

নিরস্ত্র বাঙালির সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তর

তোফায়েল আহমেদ

১৯৭১ এর রক্তঝরা মার্চের ৭ তারিখে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ইতিহাসের মাহামানব সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বজ্রকণ্ঠে জাতির উদ্দেশে প্রদান করেছিলেন তাঁর ঐতিহাসিক বক্তব্য। ২৩ বছরের শোষণ-বঞ্চনার বিপরীতে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠ কোটি কণ্ঠের সঙ্গে একাকার হয়ে যে মহিমান্বিত ঐক্যনিনাদ বাংলার আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়, তাতে জাতিগত বঞ্চনার শিকার বাঙালির স্বাধীনতার ঘোষণা ব্যক্ত হয়েছিল।

স্বাধীনতা ঘোষণার প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়েছিল ৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের পর। বিজয়ী দল সরকার গঠন করবে, শাসনতন্ত্র তৈরির জন্য অধিবেশনে মিলিত হবে এই ছিল জাতীয় অভিলাষ। কিন্তু জনমনে কাঙ্ক্ষিত এ রকম একটি গণঅভিপ্রায়কে সমাধিস্থ করে ১ মার্চ দুপুর ১টা ৫ মিনিটে ইয়াহিয়া খান এক বেতার ভাষণে পূর্বঘোষিত ৩ মার্চ ঢাকায় আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন একতরফাভাবে স্থগিত ঘোষণা করেন। মুহূর্তের মধ্যে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে সারাদেশ। দাবানলের মতো আগুন জ্বলে ওঠে চারদিকে। বিশেষ করে ঢাকার মানুষ ক্ষোভে-বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। শতসহস্র মিছিলে জনসমুদ্রে পরিণত হয় পল্টন ময়দান। বিকেল ৩টায় পল্টন ময়দানে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে প্রতিবাদ সভায় জনসাধারণকে আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাই। আজকাল অনেকেই ইতিহাসের অমোঘ সত্যকে এড়িয়ে নিজেকে বড় করে দেখাতে গিয়ে ইতিহাসকে বিকৃতি করে মননের দীনতা ও নীচতা প্রকাশ করে বিভিন্ন মিডিয়ায়। অথচ জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের রক্তঝরা প্রতিটি দিনের কর্মসূচী নির্ধারণ হতো বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছাত্র নেতৃবৃন্দকে ডেকে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনের নির্দেশ দেন। নেতার নির্দেশ পেয়ে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, আসম আব্দুর রব, আব্দল কুদ্দুস মাখন এক বৈঠকে বিকেলে ছাত্রলীগ ও ডাকসুর সমন্বয়ে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। একমাত্র ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দই সব ধরনের ঝুঁকির মধ্যে এ সিদ্ধান্ত নেয়।

২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয় এবং তাঁর নির্দেশে কলাভবনে অনুষ্ঠিত ছাত্রসভায় স্বাধীন বাংলার মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলিত হয়। ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ও উপস্থিতিতে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে পল্টনে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

৪ মার্চ সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। ৩ ও ৪ মার্চ এই ২ দিনে চট্টগ্রামে ১২০ জন নিহত ও ৩৩৫ জন আহত হয়। খুলনায় সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে ৬ জন নিহত ও ২২ জন আহত হয়। ৫ মার্চ টঙ্গীতে সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে ৪ জন নিহত ও ২৫ জন আহত হয়। খুলনা ও রাজশাহীতেও যথাক্রমে ২ জন ও ১ জন নিহত হয়। ৬ মার্চ ঢাকাসহ সারাদেশে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। এদিন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ভেঙ্গে ৩৪১ কারাবন্দী পলায়নকালে পুলিশের গুলিতে ৭ জন নিহত ও ৩০ জন আহত হয়।

সংগ্রামী বাংলা সেদিন ছিল অগ্নিগর্ভ, দুর্বিনীত। কারও চাপিয়ে দেয়া অন্যায় প্রভুত্ব মেনে নেয়ার জন্য, কারও কলোনি বা করদরাজ্য হিসেবে থাকার জন্য বাংলার মানুষের জন্ম হয়নি। বাংলার অপরাজেয় গণশক্তি সেদিন সার্বিক জাতীয় মুক্তি অর্জনের ইস্পাতকঠিন শপথের দীপ্তিতে ভাস্বর প্রিয় নেতাকে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ প্রদান করে উচ্চকিত হয়েছিল এই স্লোগানে, "তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব" "বঙ্গবন্ধু এগিয়ে চলো আমরা আছি তোমার সঙ্গে", "তুমি কে আমি কে বাঙালি বাঙালি", "তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ", "বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো", "স্বাধীন করো স্বাধীন করো বাংলাদেশ স্বাধীন করো"।

ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দান আবহমান বাংলার বাসন্তী সূর্য আর উদার আকাশকে সাক্ষী রেখে নির্ভীক নেতা এবং বীর বাঙালির কণ্ঠ একই সুরে বেঁধে দিয়েছিল। সকলের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় স্বাধীনতার অমোঘ মন্ত্র "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" দিগন্ত কাঁপিয়ে নিযুত কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে 'জয় বাংলা।'

দিনটি ছিল রবিবার। সকাল থেকেই ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধুর বাসভবনটি আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ছাত্রনেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে সরগরম। পূর্ব ঘোষিত সময় অনুযায়ী বেলা ২ টায় সভা শুরু হওয়ার কথা। জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দসহ আমাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করে বঙ্গবন্ধু জনসভার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। রাজ্জাক ভাই, সিটি আওয়ামী লীগের সভাপতি গাজী গোলাম মোস্তফা, মণি ভাই, ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আবদুর রউফ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ আলী, নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুল কুদ্দুস মাখন, সিরাজুল আলম খানসহ আমরা একটি গাড়িতে রওনা করি। নিরাপত্তার জন্য রাজ্জাক ভাই ও গাজী গোলাম মোস্তফা ড্রাইভারকে ৩২ নম্বর সড়কের পশ্চিমদিক দিয়ে যেতে বলেন।

রেসকোর্স ময়দানে তখন মুক্তিকামী মানুষের ঢল। আকারের বিশালত্ব, অভিনবত্বের অনন্য মহিমা আর সংগ্রামী চেতনার অতুল বৈভবে এই গণমহাসমুদ্র ছিল নজিরবিহীন। চারদিকে লাখো মানুষের গগনবিদারী কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে 'জয় বাংলা'। কার্যত ১৯৬৯ থেকেই 'জয় বাংলা' স্লোগানটি ছিল বাঙালির রণধ্বনি। বীর বাঙালির হাতে বাঁশের লাঠি এবং কণ্ঠে জয় বাংলা স্লোগান যে প্রলয় রাত্রির বিদ্রোহী বঙ্গোপসাগরের গর্জন।

রেসকোর্স ময়দানে লাখ লাখ মানুষের মহাসমাবেশ ঘটেছিল সার্বিক জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পরবর্তী কর্মসূচী সম্পর্কে পথনির্দেশ লাভের জন্য। আমরা যারা সেদিনের সেই জনসভার সংগঠক ছিলাম, যারা আমরা মঞ্চে বঙ্গবন্ধুর পদতলের পাশে বসে, ময়দানে উপস্থিত নারী-পুরুষ, অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, কচি-কিশোর, তরুণ-যুবক, কৃষক-শ্রমিক জনতার চোখে-মুখে প্রতিবাদের-প্রতিরোধের যে অগ্নিশিখা দেখেছি তা আজও স্মৃতিপটে ভাস্বর হয়ে আছে। কিন্তু তারা ছিল শান্ত-সংযত। নেতার পরবর্তী নির্দেশ শোনার প্রতীক্ষায় তারা ছিল ব্যগ্র-ব্যাকুল এবং মন্ত্রমুগ্ধ। প্রবল উত্তেজনাময় এবং আবেগঘন মুহূর্ত ছিল সেদিন। বঙ্গবন্ধু যখন বক্তৃতা শুরু করেন জনসমুদ্র যেন প্রশান্ত এক গাম্ভীর্য নিয়ে পিনপতন নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবে যায়। এত কোলাহল, এত মুহুর্মুহু গর্জন নিমিষেই উধাও। আবার পরক্ষণেই সেই জনতাই সংগ্রামী শপথ ঘোষণায় উচ্চকিত হয়েছে মহাপ্রলয়ের উত্তাল জলধির মতো-যেন 'জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার।' জোয়ার-ভাটার দেশ এই বাংলাদেশ, আশ্চর্য বাঙালির মন ও মানস।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমরা সভামঞ্চে এলাম ৩টা ১৫ মিনিটে। কিন্তু ঊর্মিমুখর জনতার মধ্যে অধৈর্যের কোন লক্ষণ দেখিনি। নির্দিষ্ট সময়ের বহু আগেই অর্থাৎ সকাল থেকে জনতার স্রোত এসে মিলিত হতে থাকে রেসকোর্স ময়দানে। জনস্রোতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে যায় সভাস্থল। মানুষ গাছের ওপর উঠে বসে, নেতার বক্তৃতা শোনার জন্য। সেদিনের সেই গণমহাসমুদ্রে আগত মানুষের বয়স, পেশা, সামাজিক মর্যাদা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও শ্রেণীগত অবস্থানের যতই ফারাক থাকুক না কেন, সে জনতার মধ্যে আশ্চর্য যে ঐকতান ছিল তা হচ্ছে, হাতে বাঁশের লাঠি, কণ্ঠের স্লোগান আর অন্তরের অন্তরতম কোণে লালিত জাতীয় মুক্তির স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবির পর কালো মুজিব কোট পরিহিত বঙ্গবন্ধু যখন মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন, বাংলার বীর জনতা বজ্রনির্ঘোষে তুমুল করতালি ও স্লোগানের মধ্যে তাঁকে বীরোচিত অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। তাঁর চোখে-মুখে তখন সাড়ে সাত কোটি মুক্তিকামী মানুষের সুযোগ্য সর্বাধিনায়কের দুর্লভ তেজোময় কাঠিন্য আর সংগ্রামী শপথের দীপ্তির মিথস্ক্রিয়ায় জ্যোতির্ময় অভিব্যক্তি খেলা করতে থাকে। আমরা হিমালয়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তন্ময় হয়ে শুনে যাচ্ছি তার সেই দুনিয়া কাঁপানো ভাষণ। যে ভাষণকে বিশেষজ্ঞগণ তুলনা করেন আব্রাহাম লিংকনের 'গেটিসবার্গ এ্যাড্রেস'- এর সঙ্গে। অমন সাজানো-গোছানো নির্ভুল ছন্দোবদ্ধ, প্রাঞ্জল, উদ্দীপনাময় ভাষণটি তিনি

রাখলেন। কী আস্থা তাঁর প্রিয় স্বদেশের মানুষের প্রতি, তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না!' এমনকি জীবনের চেয়েও প্রিয় তাঁর মাতৃভূমির স্বাধীনতা তাই তিনি শোনালেন।

বঙ্গবন্ধু এতটাই বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ছিলেন যে, ভাষণে তিনি একদিকে স্বাধীনতার ডাক দিলেন, অন্যদিকে শাসকের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে চিহ্নিত করার পাতানো ফাঁদেও পা দিলেন না। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' যেমন বললেন তেমনি চার শর্তের জালে ফেললেন শাসকের ষড়যন্ত্রের দাবার ঘুঁটি। বললেন- সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে, সেনাবাহিনীর ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে, গণহত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে। রক্তের দাগ না মোছা পর্যন্ত অধিবেশনে যোগ না দেয়ার কথাটিও বললেন। ক্যান্টনমেন্টে তখন গুলিবর্ষণ-বোমা হামলার প্রস্তুতি। কিন্তু নেতার বিচক্ষণতায় রক্তপাত এড়ানো সম্ভব হলো।

রেসকোর্স ময়দানে প্রাণের টানে বাংলার মানুষ বার বার ছুটে আসে। এর আগেও এসেছিল '৬৯-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি। সেদিন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসির মঞ্চ উপেক্ষা করে, বাঙালির মুক্তির জয়গান গেয়ে ৩৩ মাস কারাবন্দী থেকে এক অপূর্ব ধৈর্য ও নির্লিপ্ততার মধ্য দিয়ে তিনি স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের মোকাবেলা করেন। বাঙালি সেদিন তাঁর মুক্তির জন্য রাজপথে স্লোগান তুলেছিল, "শপথ নিলাম শপথ নিলাম, মা-গো তোমায় মুক্ত করব।" তাঁকে মুক্ত করে মুক্তমানব শেখ মুজিবকে বাঙালি জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

এই সেই রেসকোর্স ময়দান যেখানে বাংলার মানুষ শুনেছে এক ইউনিট আর প্যারিটির মৃত্যুঘন্টা; ৭০-এর ৭ জুনে শুনেছে ৬ দফার জয়নিনাদ; আর '৭১-এর ৩ জানুয়ারি শুনেছে ৬ দফা ও ১১ দফা বাস্তবায়নে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অগ্নিশপথ। আর ৭ মার্চের রেসকোর্স বাংলার মানুষকে শুনিয়েছে স্বাধীনতার অমোঘমন্ত্র। সেদিন রেসকোর্সে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষকে সম্বোধন করেছেন, 'ভায়েরা আমার।' সাড়ে সাত কোটি বাঙালির নির্যাতিত-মুমূর্ষ-বিক্ষুব্ধ চেতনাকে নিজ কণ্ঠে ধারণ-করে নির্দেশ দিয়েছেন, "...প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে।"

১১০৮টি শব্দ সংবলিত প্রায় ১৮ মিনিটের এই বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু যা নির্দেশ প্রদান করেছিলেন আমরা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। বঙ্গবন্ধু যখন মুক্তি সংগ্রামের রূপরেখা আর চরম আত্মত্যাগের কথা ঘোষণা করছিলেন তখন তাঁর কণ্ঠ কাঁপেনি, থামেনি-গণশক্তির বলে বলীয়ান গণনায়কের কণ্ঠ বজ্রের হুঙ্কারের মতোই গর্জে উঠেছিল। ইতিহাসের আর্শীবাদস্বরূপ- নেতা আর জনতার শিরদেশে

যেন বসন্তের আকাশ হতে বিদায়ী সূর্যের আলোকরশ্মি ঝরে পড়ছিল। ঐতিহাসিক সেই দুর্লভ ক্ষণটিতে আমার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল নেতার পদপ্রান্তে বসে সাড়ে সাত কোটি বঞ্চিত-অবহেলিত-নিরন্ন নরনারীর অবিসংবাদিত নেতার অপরূপ রূপ প্রত্যক্ষ করার।

সর্বাত্মক মুক্তি সংগ্রামের অগ্নিশপথে ভাস্বর, যেকোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত সভাস্থলের প্রতিটি নিরস্ত্র মানুষ সেদিন সশস্ত্র হয়ে ওঠে, তাদের চোখ-মুখ শত্রুর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের আত্মত্যাগের অপার মহিমায় আলোকিত হয়। নেতার বক্তৃতার শেষাংশ " এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" হৃদয়ে ধারণ করে সংগ্রামী জনতার দীপ্ত স্লেগানে রাজপথ প্রকম্পিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে তথা রাজনৈতিক সংগ্রামে জয়যুক্ত আমরা হয়েছি, আমরা ভৌগোলিক স্বাধীনতা, একটি পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত পেয়েছি। কিন্তু মুক্তিসংগ্রাম তথা অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে আমরা জয়যুক্ত হতে পারিনি। এখন আমাদের অর্থনৈতক মুক্তির সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হচ্ছে। তাই ৭ মার্চের ভাষণের আবেদন এখনও অটুট, এখনও স্থায়ী জাতির মননে-হৃদয়ে চেতনায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৭ মার্চ ২০১৪

মুক্তিযুদ্ধের সেন্টার অব গ্রাভিটি

আবুল হাসান চৌধুরী

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের (২৬ মার্চ) পর বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ। এ অনন্য অনুষ্ঠান আরও তিনদিন আগে-১৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু খবরটি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় নিরাপত্তা সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং শপথ গ্রহণের স্থান ও তারিখ কিছুটা পেছানো হয়।

যাদের একাত্তরের সেই সময়ের প্রেক্ষাপট জানা নেই, তারা ওপরের বর্ণনায় বিশেষ কিছু পাবে না। যে কোনো দেশে সাধারণ নির্বাচনের পর গঠিত সরকার রাজধানীতে শপথ গ্রহণ করে এবং সে জন্য স্থানও নির্দিষ্ট করা আছে। ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শপথ অনুষ্ঠান হয়েছিল বঙ্গভবনে। শপথ বাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। এরপর থেকে রাষ্ট্রপতির এ কার্যালয়েই রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। কিন্তু একাত্তরের ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করে মেহেরপুরের প্রত্যন্ত একটি আমবাগানে, যার নাম দেওয়া হয় 'মুজিবনগর'। স্বাধীন বাংলাদেশের এ সরকারে বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। এ সরকারকে গার্ড অব অনার প্রদানের জন্য নিয়মিত সেনাবাহিনী তখনও গড়ে ওঠেনি; কিন্তু পাকিস্তান সরকারের ওপর থেকে আনুগত্য প্রত্যাহার করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা পুলিশ-আনসারদের 'চৌকস দল' এ গৌরবের দায়িত্ব পালনের জন্য খুঁজে পেতে কোনো সমস্যা হয়নি। ব্যাক্তিগতভাবে আমি সে সময়ে লন্ডনে পড়াশোনা করছি। ২৫ মার্চ পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে গণহত্যা শুরু করে। ১ মার্চ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার মুহূর্ত থেকেই 'পূর্ব পাকিস্তান কার্যত পরিণত হয়ে যায় স্বাধীন বাংলাদেশে'। স্বাধীনতার স্লোগান দিয়ে রাজপথে নেমে আসে সর্বস্তরের মানুষ। আমার পিতা বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সে সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য তিনি জেনেভায় অবস্থান করছিলেন। ২৬ মার্চ তিনি জেনেভা থেকে লন্ডন চলে আসেন। আগের রাতে ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে শুরু হওয়া গণহত্যার খবর পেয়ে ব্রিটেনে অবস্থানরত বাঙালিদের

মধ্যে ক্ষোভ-উৎকণ্ঠা প্রচণ্ড। এখানে অবস্থিত বাঙালি পরিবারগুলো স্বজনদের খবর জানতে উদগ্রীব ছিল। কারও বোন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, কারও বাবা সচিবালয়ে চাকরি করছে। কারও ভাই ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয়। কারও মা-বাবাসহ পরিবারের সদস্যরা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থান করছেন। তারা কে কেমন আছে, বেঁচে আছে তো? সবার জন্য দুশ্চিন্তা। একই সঙ্গে এখানে পৌঁছেছিল বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার খবর। ২৬ মার্চ ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড নামে লন্ডনের একটি সান্ধ্য দৈনিকের শিরোনাম ছিল : 'রেজিস্ট শেখ মুজিবুর রহমান'। এতে বলা হয়, পাকিস্তানের সৈন্যরা অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করেছে। বাঙালিদের হত্যা করছে। শেখ মুজিবুর রহমান আহ্বান জানিয়েছেন সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে।

বঙ্গবন্ধুর এ অহ্বানে সবাই অনুপ্রাণিত হয়। তারা সংগঠিত হতে শুরু করে। ১৩ এপ্রিল ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিশেষভাবে আবু সাঈদ চৌধুরীকে অনুরোধ করেন, তার সঙ্গে কথা না বলে তিনি যেন কোনো ঘোষণা না দেন। কারণ তাদের সঙ্গে পাকিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে এবং এ কারণে চাপ আসছে। ১৪ এপ্রিল এক বিবৃতি দিয়ে আবু সাঈদ চৌধুরী পাকিস্তানের সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, তার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের যে দেশের সেনাবাহিনী নির্বিচারে হত্যা করছে, সেখানে তিনি ফিরতে পারেন না। বিবিসি ও অন্যান্য গণমাধ্যমে প্রচারিত এ ঘোষণায় স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া কোটি কোটি বাঙালি উজ্জীবিত হয়। এর চারদিন আগে ১০ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়। এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের পক্ষে আবু সাঈদ চৌধুরীকে ফোন করেন ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম। তিনি তাকে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ দূত হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানান এবং তা সানন্দে গ্রহণ করা হয়। তবে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণের আগে বাংলাদেশ সরকার গঠন বিষয়ে বিশ্ববাসী তেমন জানত না।

বাংলাদেশ সরকার গঠনের যে প্রেক্ষাপট ছিল, তা এখনও অনেকে স্মরণ করতে পারেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগ পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মর্যদা লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকচক্র তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে না দিয়ে ২৫ মার্চ শুরু করে গণহত্যা, ঢাকা শহর পরিণত হয় বধ্যভূমিতে। বঙ্গবন্ধুকে ২৫ মার্চ মধ্যরাতে গ্রেফতার করা হয়। জারি হয় কারফিউ। প্রায় গোটা ঢাকা শহর জ্বলছিল। ২৭ মার্চ সকালে ৫-৬ ঘন্টার জন্য কারফিউ শিথিল হলে প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় চলে আসেন তাজউদ্দীন আহমদ। সঙ্গী ব্যারিষ্টার আমীর উল-ইসলাম। সেখানে তারা পৌঁছান ৩০ মার্চ। ১ মার্চের পর দেশব্যাপী জনগণের প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠিত করতে বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যবৃন্দ এবং আওয়ামী লীগের নেতারাও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার প্রেক্ষাপটে একত্রিত হন। এক চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজেদের মধ্যে অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে তারা

যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হন। এর পেছনে প্রেরণা ছিল একটাই- স্বাধীন দেশ থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করতে হবে। বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্র আমাদের জানায়, ১০ এপ্রিল সরকার গঠনের পর ১৪ এপ্রিল চুয়াডাঙ্গায় শপথের দিন নির্ধারিত ছিল। কিন্তু সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ায় পাকিস্তানি বিমান বাহিনী সেখানে ব্যাপক বোমা হামলা চালালে অনুষ্ঠান মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় স্থানান্তরিত হয়। এর আয়োজন করা হয় ১৭ এপ্রিল। এত তাড়াতাড়ি একটি পূর্ণাঙ্গ সরকার গঠন করা হবে, সেটা অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকের কাছেই অভাবনীয় ছিল। ষাট ও সত্তরের দশকে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত অনেক দেশে 'প্রবাসী সরকার' কিংবা 'অস্থায়ী সরকার' গঠনের রেওয়াজ ছিল। কিন্তু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নেতৃত্ব গঠন করে বাংলাদেশ সরকার। সে সময়ের প্রতিটি সরকারি দলিলে দেখা যাবে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিপক্বতা ও বিচক্ষণতার ছাপ। একই সঙ্গে মুজিবনগরে প্রকাশ করা হয় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, যা বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিরলতম ঘটনার একটি। এ ধরনের সরকার গঠন করার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন রণাঙ্গনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় সেক্টর কমান্ডারদের ওপর। ফলে দ্রুতই সমন্বিতভাবে যুদ্ধ পরিচালনা হতে শুরু করে। বিশ্ববাসী জেনে যায়, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সরকার গঠন করায় কখনোই তার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবং বাংলাদেশ সরকারের নেতৃবৃন্দ বারবার একটি বিষয়ে জোর দিয়েছেন-বাংলাদেশ একটি স্বধীন রাষ্ট্র এবং এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এ দেশ থেকে হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যদের বিতাড়িত করা। আবু সাঈদ চৌধুরী বলতেন, 'ইনভেডিং আর্মি' তাড়াতে হবে। সবকিছু পরিচালিত হতে থাকে বঙ্গবন্ধুর নামে এবং বাংলাদেশর জনগণের কাছে সেটাই ছিল গ্রহণযোগ্য। তারা স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল এবং বঙ্গবন্ধু ও তার সহকর্মীরা অত্যন্ত কঠিন সময়ে খুব দ্রুততার সঙ্গে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। জিয়াউর রহমান যে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে 'বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করছি' বলেন, তার কারণ বুঝতে তাই সমস্যা হয় না। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিশ্বের গণমাধ্যমগুলো বঙ্গবন্ধুকেই একক নেতা চিহ্নিত করে। তিনিই ছিলেন প্রতিরোধের প্রতীক। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের আগে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি বিশ্বের কোনো সরকার স্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু তাতে বৈধতার সমস্যা কখনও দেখ দেয়নি। লন্ডনের একটি ঘটনা বলছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশী ছাড়াও নানা সূত্রে অর্থ জমা হচ্ছিল। এ অর্থ জমা হতো সেখানের ব্যাংকে। পাকিস্তানি হাইকমিশন এ ব্যাপারে আপত্তি জানায়। সে সময়ে ব্রিটেনের কমন্স সভার সদস্য জন স্টোন হাউস একটি ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা করে বাংলাদেশের পক্ষে অ্যাকাউন্ট চালু করার ব্যবস্থা করেন। এ অর্থে কেবল বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রমই পরিচালনা করা হয়নি, মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রসজ্জিতও করা হয়।

আরেকটি ঘটনা বলাও অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পাকিস্তানের একটি জাহাজ থেকে কয়েকজন বাঙালি নাবিক পালিয়ে ব্রিটেনে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাদের পাকিস্তানে পাঠানোর জন্য চাপ দিতে থাকলেও বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের তৎপরতার কারণে এ অপচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং তাদের ব্রিটেনে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া হয়। ব্রিটেনে সে সময়ে শিক্ষার জন্য অনেক বাঙালি ছাত্রছাত্রী অবস্থান করছিল। তারা এসেছিল পাকিস্তান সরকারের আবেদনে বৃত্তি নিয়ে। কিন্তু একাত্তরে অবস্থান নেয় বাংলাদেশের পক্ষে। এরপরও ব্রিটিশ সরকার তাদের বৃত্তি অব্যাহত রাখে। একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিশ্ব ছিল দুই শিবিরে বিভক্ত। সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অনেক সমাজতান্ত্রিক দেশ বাংলাদেশের পক্ষ নেয়। কিন্তু চীন বিরোধিতা করে। যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনে সে সময়ে ছিল রক্ষণশীল সরকার। যুক্তরাষ্ট্রের রিচার্ড নিক্সন সরকার পাকিস্তানের পক্ষ নেয়। কিন্তু তাদের সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদের অনেক সদস্য বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যার তীব্র নিন্দা জানায়। তারা স্পষ্ট জানিয়ে দেয় পাকিস্তানকে কোনো সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া হবে না। সিনেটর টেড কেনেডি ভারতের শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। সিনেটর স্যাক্সবি বলিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণ করেন বাংলাদেশের পক্ষে। এ ধরনের রাজনৈতিক ও নৈতিক সমর্থনের মূলে ছিল মুজিবনগর সরকার গঠন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাদের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা। দুই মেরুতে ভাগ হয়ে থাকা বিশ্বের প্রতিটি কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ের অন্য কোনো ব্যাখ্যা হতে পারে না। বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল সে সময়ে জাতিসংঘে তৎপরতা চালিয়েছে। বিশ্বব্যাংকের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছে। যুক্তরাষ্টের সিনেট ও কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনায় বসেছে। লন্ডন-নিউইয়র্ক-দিল্লি-প্যারিসে বাংলাদেশের পক্ষে বড় বড় মিছিল হয়েছে। প্রকাশ্যে অনুষ্ঠান করে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে।

এসব কিছুই ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার গঠনের ফল। বাংলাদেশ সরকারকে কোনো দেশই আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি জানায়নি, কিন্তু রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন মুজিবনগর সরকারই যে বাংলাদেশের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থনপুষ্ট, সেটা নিয়ে কোনো সংশয় ছিল না। বিশ্ববাসী নিশ্চিত বুঝে যায়, বাংলাদেশের সেন্টার অব গ্রাভিটি মুজিবনগরেই। এখান থেকে পরিচালিত সরকারের প্রতি জনসমর্থন ও আনুগত্যে বিন্দুমাত্র ঘাটতি ছিল না।

দৈনিক সমকাল
১৭ এপ্রিল ২০১২

স্বাধীনতা ও মুক্তির মশাল হাতে বঙ্গবন্ধু এগিয়ে গিয়েছিলেন

ড. আবু সাইয়িদ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃতপক্ষেই জনযুদ্ধ। ইতিহাস প্রমাণ দেয়, স্বাধীনতা অর্জিত না হলে মুক্তির স্বর্ণদ্বারে এগিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। এই সত্যটি হৃদয়ে ধারণ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৭ মার্চ ১৯৭১ রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার সামনে ঘোষণা করেছিলেন- 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। তিনি বাংলাদেশ স্বাধীন করার লক্ষ্যে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। কারাবরণ করেছেন। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। আন্দোলনের প্রত্যেক স্তরে তার জীবন দর্শনের প্রতিফলন ঘটেছে। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে বারবার তিনি ইতিহাসের গতিপথে অগ্রসর হয়েছেন। ইতিহাস নির্মাণ করেছেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর উপলব্ধি করলেন, এ পাকিস্তান জনগণের কোনো কল্যাণ আনতে পারবে না। ধর্মান্ধতা সাম্প্রদায়িক চেতনাকে অপসারিত করার লক্ষ্যে তিনি বাঙালি জাতিকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় সংগঠিত করেন। প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদ মানে তা সাম্প্রদায়িকতা বিরুদ্ধ। সেই জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করেই তিনি বাঙালির আত্মপরিচয়ের সন্ধান দিয়েছেন। ৪৮ সালে তিনি বুঝতে পারলেন বাঙালিদের শোষণ ও শাসন করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাকিস্তান, যেখানে গণমানুষের অংশীদারিত্ব নেই। সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং ধনিক-বণিক শ্রেণী পাকিস্তানের সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্র কব্জা করে গরিব-দুঃখী মানুষকে শোষাণের শৃংখলে বেঁধে ফেলেছে।

২. ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে তিনি বললেন, 'বাঙালিদের ওপর যদি এভাবে শোষণ-নির্যাতন চলতে থাকে তাহলে বাংলার তরুণেরা গেরিলা যুদ্ধ শুরু করলে আমাকে ও আমার দল আওয়ামী লীগকে আপনারা দোষ দিতে পারবেন না।' নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে লাহোর প্রস্তাবকে সামনে রেখে ৬ দফা রচনা করেন। ৬ দফার খসড়া কপি নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খানের বাসায় গেলেন। ৬ দফার খসড়া কপি তার হাতে তুলে দিলেন। আতাউর রহমান খান পুরো খসড়াটি পড়লেন। তারপর শেখ মুজিবকে বললেন, '৬ দফা আমি জাতির সামনে দিতে

পারব না, তাহলে আমার ফাঁসি হবে। আর তোমাকেও বলছি, তুমিও ছয় দফা প্রকাশ করো না, তাহলে তোমাকেও ফাঁসিতে যেতে হবে।' শেখ মুজিব বললেন, 'দেশ ও জাতির স্বার্থে' স্বাধীনতা ও মুক্তির লক্ষ্যে কাউকে না কাউকে ফাঁসির ঝুঁকি নিতে হবে।'

৩. ৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারতের যুদ্ধের পর ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান লাহোরে গোলটেবিল বৈঠক ডাকেন। বঙ্গবন্ধু সেখানে ৬ দফা পেশ করেন এবং এর যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলা এবং গণবিচ্ছিন্ন নেতৃবৃন্দ ৬ দফার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান অস্ত্রের ভাষায় কথা বললেন। বললেন, 'এই সব বিচ্ছিন্নতাবাদীকে কঠোর হাতে দমন করা হবে।' কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে দমানো গেল না। ৬ দফা নিয়ে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে কীভাবে শোষণ-নির্যাতন করা হচ্ছে, কীভাবে রাজনৈতিক, আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর বৈষম্য সৃষ্টি করা হচ্ছে তা তুলে ধরেন। ৬ দফা হয়ে দাঁড়াল বাঙালি জাতির কাছে স্বাধীনতা ও মুক্তির সনদ।

৪. সে সময় মওলানা ভাসানীকে চীনের চেয়ারম্যান মাও সেতুং 'ডন্ট ডিস্টার্ব আইয়ুব'- এই পরামর্শ দিলেন। মাওলানা ভাসানী যিনি মুসলিম লীগের জুলুম-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন, নির্যাতন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন, তিনি নির্বাক ও নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। শোষিত-নিপীড়িত বাঙালি জাতির পক্ষে বঙ্গবন্ধু ছাড়া আর কেউ এগিয়ে এলেন না। ইতিমধ্যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরেবাংলা ইন্তেকাল করেছেন। বঙ্গবন্ধুকে লাহোরে প্রশ্ন করা হল, বাঙালিদের পক্ষে কথা বলবে কে? বঙ্গবন্ধুর স্পষ্ট উত্তর ছিল, 'কেন আমি তো আছি।' ৬ দফা নিয়ে বঙ্গবন্ধু সারা বাংলায় চারণের বেশে ঘুরে আত্মবিস্মৃত জাতিকে জাগ্রত করলেন। আইয়ুব খান তার ডাইরিতে লিখেছেন, '৬ দফা ছিল একটি পিন ছাড়া গ্রেনেড। এটা বিস্ফোরিত হলেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাবে। শেখ মুজিব তাই চায়।' আগরতলা মামলায় তাকে ফাঁসি দেয়ার ষড়যন্ত্র হয়। গণঅভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে বীরের বেশে বেরিয়ে এলেন। ছাত্র নেতৃবৃন্দ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ৬ দফার পরে কী? তিনি স্পষ্ট বলেছেন, '৬ দফা না মানলে ১ দফা অর্থাৎ স্বাধীনতা।' ১৯৬৪ সালে রাজশাহীতে তিনি আমাদের বলেছিলেন, 'আমাদের স্বাধীনতা পেতে হবে।'

৫. যেসব উগ্র বাম ঘরানার বুদ্ধিজীবী বলেন, 'জনগণের মুক্তির জন্য নয়, আওয়ামী লীগ কেবল স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে', তাদের ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু জাতির উদ্দেশে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা পাঠ করার অনুরোধ জানাই। এই ভাষণে শোষণ-বঞ্চনার অবসান ও মুক্তিকামী মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে শোষকের হাত থেকে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে আনার প্রত্যয়দৃপ্ত আহ্বান জানান তিনি। তিনি এও বলেছিলেন, 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে একটা সামাজিক বিপ্লব ঘটানো সম্ভব এবং অন্যায়-অবিচার শোষনমুক্ত

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গড়ে তোলা সম্ভব হবে।' তিনি অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে জাতীয়করণের কথা ঘোষণা করেন। এর মাধ্যমে ব্যাংক-বীমা কোম্পানিগুলোসহ বড় শিল্প-কারখানা জনগণের মালিকানায় আনা অত্যাবশ্যক বলে ঘোষণা দেন। ভাষণে বলেন, শ্রমিকরা শিল্প ব্যবস্থাপনায় ও মূলধন পর্যায়ে অংশীদার হবেন। একচেটিয়াবাদ ও কার্টেল প্রথা সম্পূর্ণভাবে বিলোপ করা হবে। অর্থনীতির সর্বত্র মজুরি কাঠামো ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। এভাবে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা অর্জনের পাশাপাশি জনগণের মুক্তির রূপরেখা ঘোষণা করেন। যারা বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে ক্ষমতার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে আলোচনা করছিলেন, তারা সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ না করেই ভুল তথ্যে বেখাপ্পা কথা বলেন। তারা ইতিহাস বিকৃতির দোষে দুষ্ট।

৬. পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতরে একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র নির্মাণে একদিকে যেমন অসহযোগ আন্দোলনকে সশস্ত্র আন্দোলনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি (৭ মার্চ ভাষণ দ্রষ্টব্য)। জাতিসংঘের চার্টার অনুযায়ী প্রথম আক্রমণকারী হিসেবে চিহ্নিত হলে বিশ্ববিবেক ও জনমত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করত। সেই সময় এ বিষয়ে স্পষ্ট উদাহরণ হল এই যে, চীনের সমর্থনে নাইজেরিয়ার জেনারেল উজুকো বায়াফ্রা প্রদেশকে স্বাধীন করতে গেলে ১০ লাখ লোক নিহত হয় এবং বিশ্বের দেশসমূহ এই সশস্ত্র বিদ্রোহকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে আখ্যা দেয়। বিশ্ববিবেক ও দেশসমূহ টুঁ শব্দ করেনি তখন। সেই অভিজ্ঞতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণে বারবার অনুরোধ করেছেন। তার জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, বাংলার মানুষের অধিকার চাই।' এ ছাড়াও আওয়ামী লীগ নেতা জনাব তাজউদ্দীন-কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ২৪ মার্চ যে খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ করা হয়, পাকিস্তানের সামরিক জান্তা মনে করেছে, এটা মানলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাবে। এসব ঐতিহাসিক ঘটনা ও এর তাৎপর্য একচোখা আওয়ামী বিদ্বেষী বামপন্থীদের পক্ষে জানা বা বোঝা সম্ভব ছিল না। তারা শ্রেণীশত্রু খতমের বাস্তবতাহীন রাজনীতিতে বেহুঁশ ছিলেন।

৭. ইতিহাসের পরিক্রমায় জাতি হিসেবে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের প্রথমেই প্রয়োজন ছিল স্বাধীনতা অর্জন। বঙ্গবন্ধু জানতেন রাজনৈতিক স্বাধীনতাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন, একইসঙ্গে মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বললেন, 'অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে যাবে।'

৮. বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ১৯৭২ সালে সংবিধানের প্রস্তাবনায় লিখিত হল, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত

সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সব নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে। রক্তাক্ষরে লেখা হল, প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ, রাষ্ট্রীয় খাত ও সমবায়ে তাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৪ অনুচ্ছেদে লেখা হল, কৃষক শ্রমিক মেহনতী মানুষের শোষণ মুক্তির কথা। ১৫ অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা ও মৌলিক চাহিদা পূরণের অঙ্গীকার। ১৬ অনুচ্ছেদে শহর ও গ্রামের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য হ্রাসও কৃষি বিপ্লবের প্রত্যয়। ১৯ অনুচ্ছেদে লিখিত হল সুযোগের সমতা এবং সম্পদের সুষম বন্টনের কথা এবং ২০ অনুচ্ছেদে লেখা হল, কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে কর্ম হচ্ছে তাদের অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়। বিশেষভাবে লেখা হল প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুসারে ও প্রত্যেককে কর্ম অনুযায়ী পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থা।

৯. এরপরও বিদ্বিষ্ট হয়ে যারা লেখেন বা বলেন, আওয়ামী লীগ জনগণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ করেনি, তাদের স্পষ্ট ভাষায় বলতে হয়, শোষিত-বঞ্চিত গণমানুষের মুক্তির লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখক মুজিবুর রহমান যেসব বক্তব্য দিয়েছিলেন ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তাদের তা ভালোভাবে জেনে শুনে, পড়ে, বুঝে এ সম্পর্কে লেখা উচিত বা কথা বলা উচিত। এ কথা সত্য যে, জাতির পিতা শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্বে বিশ্বাসী না থেকেও দেশের মাটি ও মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী শোষণ মুক্তির মশাল হাতে এগিয়ে যান। কিন্তু এসব উগ্র চৈনিকপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিবিপ্লবী চক্রের সহযোগিতায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে মুক্তির অভিযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেয়া হয়।

দৈনিক যুগান্তর
২০ আগস্ট ২০১৪

বেগম জিয়া ও তারেক রহমানের মিথ্যাচার

মোহাম্মদ শাহজাহান

বেগম খালেদা জিয়া এবং তার বিদেশে চিকিৎসার নামে থাকা গুণধর পুত্র তারেক রহমান নতুন বিতর্কিত বক্তব্য নিয়ে হাজির হয়েছেন। স্বাধীনতা দিবসের পর দিন ২৭ মার্চ বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমান। তারা যতই বলুক না কেন জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি, কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস হচ্ছে স্বাধীনতার ঘোষক ও প্রথম রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন জিয়াউর রহমান। স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেলেন বলেই আওয়ামী লীগ জিয়াকে ভয় পায়। সে জন্য তারা ওই ঘোষণাকে স্বীকৃতি দিতে চায় না। এর দু'দিন আগেই ২৫ মার্চ বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান লন্ডনে বলেন, 'জিয়াউর রহমানই বাংলাদেশে প্রথম রাষ্ট্রপতি ও স্বাধীনতার ঘোষক। এটি ইতিহাসে লাল অক্ষরে লেখা রয়েছে।' তারেক রহমানের উদ্ভট বক্তব্যের জবাবে ২৭ মার্চ এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'ঘোষক ফর্মুলা পাল্টে এখন রাষ্ট্রপতি বানিয়ে ফেলেছে। মুজিবনগর সরকারের অধীনে মাত্র চারশ' টাকা বেতনে চাকরি করত, স্বাধীনতার পর প্রমোশন নিল জিয়া। জাতির জনক সে প্রমোশন দিল। অথচ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট তার সঙ্গে বড় গাদ্দারি, মোনাফেকি করল। যারা পাকিস্তানি পাসপোর্ট ব্যবহার করত, তাদের নাগরিকত্ব দিল। মন্ত্রী-উপদেষ্টা বানাল। সে স্বাধীনতার ঘোষক হলে কিভাবে স্বাধীনতাবিরোধীদের নাগরিকত্ব দেয়, মন্ত্রী-উপদেষ্টা বানায়?

২৮ মার্চ বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া প্রেসক্লাবে এক মানববন্ধনে বলেছেন, '১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠনের আগে দেশে কোন সরকার ছিল না। জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এরপর থেকে মুজিবনগর সরকার গঠনের আগ পর্যন্ত সময়টা জিয়াউর রহমান কার্যত রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিবেচিত হন।' ২৮ মার্চ আওয়ামী লীগ নেতা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সেগুনবাগিচায় এক অনুষ্ঠানে বলেন, 'জাতীয় সংগীতের চেতনায় জাতি যখন ঐক্যবদ্ধ, ঠিক তখনই বিভ্রান্তি ছড়াতে খালেদা জিয়া ও তার পুত্র উদ্ভট বক্তব্য দিয়ে নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছেন। একইদিন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু কুষ্টিয়া সার্কিট হাউসে বেগম জিয়াকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'যুদ্ধের সময় 'প্রথম রাষ্ট্রপতি' বাংলাদেশ সরকারের অধীনে মেজরের চাকরিতে বহাল থেকে যুদ্ধ

করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি কর্নেল হয়েছেন, সেনাবাহিনীর উপপ্রধান ও প্রধান হয়েছেন। ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সামরিক শাসন জারি করেছেন। সুতরাং জিয়াকে প্রথম রাষ্ট্রপতি বলাটা মিথ্যাচার।' ২৮ মার্চ সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম, ছাত্রলীগ, বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনীর সভাপতি মুনতাসীর মামুন, সম্পাদক মেসবাহ কামাল, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট বেগম জিয়া ও তার পুত্রের মিথ্যাচারের নিন্দা ও প্রতিবাদ করেছেন। খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম ২৮ মার্চ দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক বিক্ষোভ সমাবেশে বলেছেন, 'জিয়াউর রহমানকে দেশের প্রথম রাষ্টপতি দাবি করে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও তার পুত্র তারেক রহমান যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল।'

এই ধরনের পাল্টাপাল্টি বক্তব্য আরও কিছুদিন হয়তো চলবে। আসলে জিয়াউর রহমান যে স্বাধীনতার ঘোষক নন বা প্রথম রাষ্ট্রপতি নন, এ নিয়ে লিখতে শুধু লজ্জাই লাগে না, যারা মিথ্যাচার করেন-ঐসব মিথ্যুকদের প্রতি ঘৃণার পরিমাণটা আরও বেড়ে যায়। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর গত ৩৯ বছর ধরে ইয়াহিয়া, ভুট্টো, টিক্কাদের এদেশীয় প্রেতাত্মা জিয়া, এরশাদ, মওদুদ, বেগম জিয়া সর্বশেষ দেশ-বিদেশে উঁচুস্তরের দুর্নীতিবাজ হিসেবে পরিচিত রাজনীতিবিদ নামের কলঙ্ক পলাতক তারেক রহমানরা আমাদের গৌরবদীপ্ত মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস বিকৃত করে চলেছেন এবং একাত্তরের ঘাতকদের মদদ দিয়ে আসছেন। বিএনপির এক শ্রেণীর নেতা এত নিম্নমানের মিথ্যাচার করেন, যা উল্লেখ করতেও লজ্জা এবং ঘৃণা লাগে। আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী নেতৃত্ব, শেরেবাংলা, সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, তাজউদ্দীন আহমদসহ আরও আনেক রাজনীতিকের গৌরবদীপ্ত অবদান নিয়ে বহু গ্রন্থ রচিত ও লেখালেখি হয়েছে। আমাদের মুক্তিসংগ্রামে অনেক রাজনৈতিক নেতা নেতৃত্ব দিলেও সর্বশেষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী ও সাহসী নেতৃত্বেই ১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীন ভূখণ্ড লাভ করেছি। ছোট্ট দু-একটি উদাহরণ দেয়া যায়। নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা নাটকে বহু অভিনেতা-অভিনেত্রী রয়েছেন। কিন্তু মূল নায়ক হচ্ছে সিরাজ। আগ্রার তাজমহর নির্মাণে ২০ হাজার শ্রমিক বাইশ বছর কাজ করেছেন। কিন্তু তাজমহলের নির্মাতা বা প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সম্রাট শাহজাহানের নামই আসবে। তেমনিভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও শেখ মুজিব, একে অপরের পরিপূরক।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে সত্তরের নির্বাচন। ওই নির্বাচনে সমগ্র পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। আর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার নির্বাচনে মুজিবের দল আওয়ামী লীগ শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ ভোট পায়। সত্তরের নির্বাচনের পর পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলার একমাত্র অধিকার অর্জন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তানের ইয়াহিয়া-টিক্কা-ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন সামরিক জান্তা যদি জনগণের দেয়া ম্যান্ডেট অনুযায়ী মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতো, তাহলে বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিব প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশ পরিচালনা করতেন। ওই অবস্থায় একাত্তরে মুজিবের নেতৃত্বে যেমন স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হতো না, তেমনি বাংলাদেশও স্বাধীন হতো না।

কিন্তু বেগম জিয়ারা ভুলে গেলেও বাংলাদেশের জনগণসহ বিশ্ববাসী, একাত্তরের ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশ ১ মার্চ দুপুর ১টা ৫ মিনিটে ইয়াহিয়া সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দিলে রুখে দাঁড়ায় সমগ্র বাঙালি জাতি। রাজপথে নেমে আসে স্বাধীনতাকামী জনতা। সর্বত্র স্লোগান ওঠে-'ভুট্টোর মুখে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।' 'স্বাধীন করো স্বাধীন করো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।' ওই সময় লাখো জনতা হোটেল পূর্বাণী চত্বরে মিছিল করে যায়। আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের বৈঠক চলছিল হোটেলে। জনতাকে লক্ষ্য করে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে।' অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে ২ মার্চ ঢাকায় ও ৩ মার্চ বুধবার দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু বলেন, ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় তিনি বক্তব্য দেবেন। ৩ মার্চ পল্টনে ছাত্রলীগের সভায় অনির্ধারিতভাবে হাজির হন বঙ্গবন্ধু। মঞ্চসহ মাঠের সর্বত্র ছিল স্বাধীন বাংলার পতাকা। সভায় পদাধিকার বলে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ। সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা রেখে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রস্তাবে কবি গুরুর আমার সোনার বাংলা গানকে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ঘোষণা এবং উপনিবেশবাদী পাকিস্তানি পতাকা পুড়িয়ে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ব্যবহারের কথা বলা হয়। সভায় বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক ঘোষণা করে 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক', 'গ্রামে গ্রামে দুর্গ গড় মুক্তিবাহিনী গঠন কর', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো- বাংলাদেশ স্বাধীন করো', জয়ধ্বনি দেয়া হয়।

৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ১০ লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে বঙ্গবন্ধু প্রকারান্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতাই ঘোষণা করেন। ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনসহ সারা-বাংলাদেশে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান হানাদান বাহিনী ঢাকাসহ সারা দেশে গণহত্যা শুরু করে। ওই রাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা রাতেই ওয়্যারলেসে সারাদেশে পৌঁছে যায়। চট্টগ্রামে রাতেই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার কপি সাইক্লোস্টাইল করে আওয়ামী লীগ নেতারা বিলে করেন। ২৬ মার্চ শুক্রবার দুপুর দেড়টায় চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ হান্নান চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর নামে প্রচার করেন। এরপর আরও অনেকে ওই ঘোষণা ২৬ ও ২৭ মার্চ প্রচার করেন।

জিয়াউর রহমান কিভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করলেন এ ব্যাপারে কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে। মেজর জিয়া ছিলেন চট্টগ্রাম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমন্টের দ্বিতীয় ব্যক্তি। কমান্ডার ছিলেন পাকিস্তানের কর্নেল জানজুয়া। ইপিআর এর ক্যাপ্টেন রফিক (পরে মেজর ও ১ নম্বর সেক্টর কমান্ডার) ২৫ মার্চ ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার আগেই চট্টগ্রামে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ২৫ মার্চ রাত ১১টার পর কর্নেল জানজুয়ার নির্দেশে মেজর জিয়া চট্টগ্রাম বন্দরে সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাস করতে বন্দর অভিমুখে রওনা হন। যানজটের কারণে জিয়ার গাড়ি বন্দরের দিকে ধীরে ধীরে যাচ্ছিল। রাত ১২টার আগেই ঢাকাসহ সারাদেশের বিভিন্ন সেনানিবাস থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সদস্যরা বের হয়ে এসে গণহত্যা শুরু করে। রাত সাড়ে ১১টায় ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান দেওয়ানহাট সেতুর কাছে গিয়ে মেজর জিয়াকে জানান, পাকিস্তানি সৈন্যরা গণহত্যা শুরু করেছে। তিনি বন্দরে না গিয়ে জিয়াকে ফিরে আসার অনুরোধ জানান (সূত্র : বিদ্রোহী মার্চ ১৯৭১)। পরবর্তীকালে বিএনপি নেতা কর্নেল অলি আহমদও বলেছেন, তারা ২৫ মার্চ রাত সাড়ে ১১টায় মেজর জিয়াকে সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাস করতে যাওয়ার পথে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার পর চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতারা ক্যাপ্টেন রফিককে বেতারে গিয়ে কিছু বলার অনুরোধ জানান। আওয়ামী লীগ নেতাদের তার চেয়ে সিনিয়র মেজর জিয়ার সঙ্গে পটিয়ায় গিয়ে যোগাযোগের পরামর্শ দেন ক্যাপ্টেন (পরে মেজর জেনারেল) সুবিদ আলী ভুঁইয়ার 'মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস', মঈদুল হাসানের 'মূলধারা ৭১' সহ বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। বেলাল মোহাম্মদের অনুরোধের পর মেজর জিয়া কয়েকবার কেটেকুটে একটি ঘোষণা নিজেই তৈরি করে বেতারে প্রচার করেন। ২৭ মার্চ মেজর জিয়া তার ইংরেজিতে দেয়া ঘোষণায় নিজেকে বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রধান (Provisional Head of Bangladesh) দাবি করে তার নিজের নামেই স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন।

মেজর জিয়া নিজের নামে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার পর চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতারা, পাকিস্তান সরকারের সাবেক মন্ত্রী একে খান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভিসি (পরে সচিব. রষ্ট্রদূত ও মন্ত্রী) ড. এআর মল্লিকসহ আরও অনেকে অনুভব করেন জিয়ার ঘোষণা দেশ-বিদেশে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে। একে খান ও ড. মল্লিক আওয়ামী লীগ নেতাদের বলেন, জিয়ার নিজের নামের স্বাধীনতা ঘোষণায় আন্তর্জাতিক সমর্থন পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ হচ্ছে জনযুদ্ধ।এটা হচ্ছে রাজনৈতিক সংগ্রাম। এই সংগ্রামের নেতা হচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান। জিয়ার নিজের নামের ঘোষণাকে আন্তর্জাতিক মহল সামরিক বাহিনীর উপদলীয় বিদ্রোহ হিসেবে ধরে নিতে পারে। জনগণের নির্বাচিত নেতা হিসেবে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানেরই স্বাধীনতা ঘোষণার বৈধ অধিকার ও এখতিয়ার রয়েছে, অন্য কারও নয়। এই অবস্থায় মেজর জিয়ার মাধ্যমেই তার ঘোষণার সংশোধনীটি প্রচার করতে হবে। আওয়ামী লীগ নেতারা

মেজর জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি সুবোধ বালকের মতো নতুন করে সংশোধিত ঘোষণা দেন। সংশোধিত ঘোষণায় মেজর জিয়া শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন। মেজর জিয়ার দ্বিতীয় ঘোষণাটি ২৮,২৯ ও ৩০ মার্চ বেতারে বারবার প্রচার করা হয়।

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে ২৬ মার্চ থেকে কয়েকদিন চট্টগ্রাম বেতার বলতে গেলে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। এমএ হান্নানসহ রাজনীতিকদের সঙ্গে মেজর জিয়ার ঘোষণা যারা শুনেছেন, তারা সবাই উজ্জীবিত হয়েছেন। জিয়ার ঘোষণার পর জনমনে একটা স্বস্তি আসে যে সামরিক বাহিনীর সদস্যরাও যুদ্ধ করছেন। এর পরের ইতিহাস সবার জানা। ১০ এপ্রির বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে যুদ্ধকালীন সরকার গঠন করা হয়। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের আম্রকাননে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবাসী সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদসহ মন্ত্রিপরিষদ সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন। তাজউদ্দীন আহমদ রাজধানীর নামকরণ করেন মুজিবনগর। প্রথমে মেজর জিয়া ১১টি সেক্টরের অন্যতম এক নম্বর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। পরে সফিউল্লাহ, জিয়া ও খালেদ মোশাররফের নামে এস ফোর্স, জেড ফোর্স ও কে ফোর্স নামে তিনটি ব্রিগেড গঠন করা হলে জিয়া জেড ফোর্সের অধিনায়ক হন। তখন মেজর রফিক হন ১ নম্বর সেক্টর কমান্ডার। সফিউল্লাহ ও জিয়া একাত্তরের জুলাই মাসে লে. কর্নেল ও নভেম্বরে মাসে কর্নেল পদে পদোন্নতি পান। স্বাধীনতার পর ১৯৭২-এর ৭ এপ্রিল সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন কর্নেল সফিউল্লাহ। এর ২/৩ দিন পর কর্নেল জিয়াউর রহমান হন উপপ্রধান। তারা দু'জন ১৯৭৩ সালে ব্রিগেডিয়ার এবং ১৯৭৪-এর ১৪ সেপ্টেম্বর মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি পান। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু তাদের পদোন্নতি দেন।

১৫ আগস্টের হত্যা-ষড়যন্ত্রে ওতপ্রোতভাবে জড়িত উপপ্রধান জিয়াউর রহমানকে ঘাতকরা বঙ্গবন্ধু হত্যার ৯ দিন পর সেনাপ্রধান বানিয়ে পুরস্কৃত করে। জে. জিয়া ৭৫-এর নভেম্বরে উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, ১৯৭৬-এর এ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং ১৯৭৭-এর এপ্রিলে বিচারপতি সায়েমকে সরিয়ে রাষ্ট্রপতির গদি দখল করেন। জে. জিয়া তার ৬ বছরের শাসনামলে স্বাধীনতাবিরোধী একাত্তরের ঘাতকদের এদেশের রাজনীতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর থেকে বিএনপি ও স্বাধীনতাবিরোধীরা জিয়াকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে প্রচার করে আসছে। সর্বশেষ এ বছর ২৫ মার্চ জিয়াপুত্র তারেক রহমান ও ২৭ মার্চ জিয়াপত্নী খালেদা জিয়া জে. জিয়াউর রহমানকে দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দাবি করেন।

এটা ঠিক, জিয়াউর রহমান ১ নম্বর সেক্টর কমান্ডার ও জেড ফোর্সের কমান্ডার ছিলেন। অন্য সেক্টর কমান্ডারদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু সরকার জিয়াকেও বীর-উত্তম খেতাব প্রদান করেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ। আর এই

জনযুদ্ধের মূল নায়ক ও নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একাত্তরের নয় মাসে শত্রুর কারাগারে বন্দী থাকলেও বঙ্গবন্ধুর নামেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। মনীষী আবুল ফজল বলেছেন, অনুপস্থিত সেনাপতির এমন সেনাপতিত্ব ইতিহাসে বিরল। ২০০৪ সালে বিবিসির বিশ্বব্যাপী বাংলাভাষী শ্রোতা জরিপে শেখ মুজিব সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হয়েছেন। কবি গুরু ছিলেন দ্বিতীয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। ১৯৭১-এর ৫ এপ্রিল নিউজ উইক বঙ্গবন্ধুকে Poet of Politics অর্থাৎ 'রাজনীতির কবি' হিসেবে উল্লেখ করে। ওপার বাংলার কবি অন্নদা শঙ্কর রায় যথার্থই লিখেছেন-'যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা, যমুনা গৌরি বহমান, ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।' এটা এখন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত সত্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হচ্ছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, রাষ্ট্রের স্থপতি, জাতির পিতা এবং দেশটির প্রতিষ্ঠাতা।

জিয়াউর রহমান দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন-বেগম জিয়া ও তারেক রহমানের এই বক্তব্য মিথ্যাচার বা ইতিহাস বিকৃতি শুধু নয়, রীতিমতো হাস্যকর। ১৯৭১-এর ২৭ মার্চ মেজর জিয়া যে নিজেকে দেশের অস্থায়ী প্রধান দাবি করেছিরেন, এজন্য তার কোর্ট মার্শাল হওয়া উচিত ছিল। সাব-সেক্টর কমান্ডার ও জাতীয় সংসদ সদস্য উইং কমান্ডার হামিদুল্লাহ পার্লামেন্টে বক্তৃতাকালে বলেন , 'প্রধান সেনাপতি জে. ওসমানী মুক্তিযুদ্ধকালে জিয়াউর রহমানকে ৩ বার গ্রেফতারে নির্দেশ দিয়েছিলেন।' [মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসপি প্রণীত মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী সরকার, (ঢাকা, ১৯৯৩) গ্রন্থ থেকে সংকলিত]

কর্নেল তাহেরর পুনর্বিচার সংক্রান্ত মামলার রায়ে উচ্চ আদালত জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতাবিরোধী হিসেবে উল্লেখ করে। জিয়াউর রহমান মুক্তিযোদ্ধা হয়েও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাস করতেন না। তিনি মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাস করলে স্বাধীনতাবিরোধী শাহ আজিজকে যেমন প্রধানমন্ত্রী বানাতেন না, তেমনি স্বাধীনতাবিরোধীদের এদেশের রাজনীতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতেন না। পর্যবেক্ষক মহলের মতে , গ্রেনেড হামলা মামলা ও দুর্নীতি মামলার আসামি বেগম জিয়া ও তারেক রহমান গ্রেফতার আতঙ্ক ও সাজা হওয়ার আশঙ্কায় এখন এমন প্রলাপ বকছেন। আমাদের সমাজে কিছু খারাপ প্রকৃতির লোক পদস্থ সামরিক, পুলিশ ও র‍্যাব কর্মকর্তা সেজে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ-বিত্ত হাতিয়ে নেয়। তবে অনেকেরই শেষ রক্ষা হয় না। তখন মাঝেমধ্যে ভুয়া মেজর, ভুয়া দারোগা বা ভুয়া র‍্যাব কর্মকর্তা শিরোনামে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বেগম জিয়া এবং উনার সুপুত্রের কল্যাণে স্বাধীনতার ৪৩ বছর পর বাংলাদেশের মানুষ একজন 'ভুয়া রাষ্ট্রপতি'র সন্ধান পেলেন। হায়রে রাজনীতি! হায়রে মিথ্যাচার!!

দৈনিক সংবাদ
১ এপ্রিল ২০১৪

মা-সন্তানের ইতিহাস জ্ঞানের বহর

ফকীর আবদুর রাজ্জাক

দেশে এখন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন-সেই বিতর্ক সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। অন্য কথায় সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাসি হয়ে যাওয়া বা বয়স্ক মানুষের কাছেও বিস্মৃত ঘটনাকে আঁস্তাকুড়ে থেকে তুলে আনার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে। তারেক জিয়া বা তার মা বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রথম রাষ্টপতির অভিজ্ঞান জাতির সামনে তুলে ধরে নিজেদের অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও ইতিহাস জ্ঞানের বহরই দেশবাসীর সামনে আরেকবার পরিষ্কার করছেন। স্বাধীনতার ৪৩ বছরে কখনই দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন-এ বিষয়টি সামনে কেউ নিয়ে আসেনি। কোন মহল বিতর্কও সৃষ্টি করেননি। মরহুম জিয়াউর রহমানও তার জীবিতকালে এ বিষয় নিয়ে নিশ্চয়ই লজ্জার কারণেই কোন কথা বলেনি। এমনকি জিয়া নিজে একবারও বলেননি তিনিই স্বাধীনতার ঘোষক। তার বিখ্যাত এবং একমাত্র লেখা একটি জাতির জন্মাতেও তিনি ২৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করার কথা বলেছেন। অতঃপর জিয়ার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর থেকে আজ পর্যন্ত তার দল ও দলের নেতারা প্রাণপাত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন জিয়াকে 'স্বাধীনতার ঘোষক' বলে প্রতিষ্ঠা করতে। অথচ বিএনপির জন্মের পর থেকে এ পর্যন্ত একবারও কোন দায়িত্বশীল নেতা জিয়াই বাংলাদশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এই দাবি তুলে কোন প্রকার বির্তক সৃষ্টি প্রয়াস পাননি। রাজনীতি না করার মুচলেকা দিয়ে স্বেচ্ছায় নির্বাসনে থাকা তারেক রহমান কয়েকদিন আগে লন্ডনে বসে বলেছেন জিয়াউর রহমানই ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি। ছেলের এ ঘোষণার একদিন পরেই বিএনপি নেত্রী বেগম জিয়া তারেকের বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। জিয়াই ছিলেন দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি। এর পরের দিন তাদের ওই আবিষ্কারের ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিএনপির আরেক ব্যারিস্টার নেতা। বিএনপির অন্যান্য নেতাদের কেউই এখন পর্যন্ত মুখ খোলেননি। এক খবরে জানা গেছে, বিএনপির অনেক লেখাপড়া জানা নেতাই নাকি তারেক এবং তাদের নেত্রীর এহেন বালখিল্য বক্তব্যে বিস্মিত হয়েছেন। দেশের স্থিরকৃত ইতিহাসের এ বিষয়টির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে নাকি তারা একেবারেই অপ্রস্তুত।

৭১-এর ওই সময়টায় তারেক রহমানের জন্ম হয়েছে। হাফপ্যান্ট পরেন অথবা পরেন না। কিন্তু খালেদা জিয়া তো সাবালিকা ছিলেন। সে সময়ের ঘটনা, আন্দোলন সংগ্রাম ইত্যাদি তারেক রহমানের জানার কথা নয়। কিন্তু বেগম জিয়া গৃহবধূ থেকে এবং ক্যান্টনমেন্টে বাস করেও ওই সময়ের ঘটনা কিছু জানার কথা। অবশ্য লেখাপড়া ও জানার আগ্রহ না থাকলে কোন রাজনৈতিক ঘটনার মধ্যে বাস করেও অনেকেই অনেক কিছু জানতে পারে না। তাই সে সময়ের অজ্ঞ ব্যক্তিদের ক্ষমা করা যেতে পারে। তবে পরবর্তীকালে নাবালক যখন সাবালক হয়েছেন কিন্তু লেখাপড়াও শিখেছেন এবং অন্যজন গৃহবধূর বেড়া ডিঙ্গিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করে একাধিকবার দেশের প্রধানমন্ত্রীও হয়েছেন তিনি কেমন করে ৭১-এর ঘটনা বা স্থিরকৃত বিষয়কে সম্পূর্ণ বিকৃত করে ৪৩ বছর পরে এসে দেশবাসীর সামনে উপস্থাপন করেন? নিরক্ষর মানুষ মূর্খ নয় কিন্তু যারা শিক্ষিত উচ্চ শিক্ষিত বা কিছু লেখাপড়া জানেন তাদের মধ্যেই বেশিরভাগ মূর্খের বাস। এটা সেই মূর্খের ইতিহাস জ্ঞান। যদিও কেউ কেউ বলেছেন দুরভিসন্ধিমূলক। অনেকেই সেটা বলতে চান না। কারণ এতকাল পরে এসে ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা নতুন করে সাজিয়ে কেউ দুরভিসন্ধি সফল করতে পারবে না। এটা হবে সেই আহম্মকের ব্যর্থ চেষ্টা। বেগম খালেদা জিয়ার যেহেতু দেশ ও সরকার পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে সেহেতু সংবিধান বা আইনের বিষয়গুলোও বোঝেন। ৫ম ও ৭ম অনুচ্ছেদ সংবিধান থেকে বাতিল হওয়ার পর '৭৫ পরবর্তী এবং জিয়ার ক্ষমতার আমল পর্যন্ত সবকিছু এমনকি তার ক্ষমতাগ্রহণ দেশ শাসন পর্যন্ত বাতিল ও অবৈধ গন্য হয়েছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালত এ রায় দিয়েছেন যা এখন শাসনতন্ত্রের অঙ্গ। অতএব খালেদা বা তারেকের এসব বক্তব্যে শুধু বেআইনিই নয় রীতিমতো সংবিধান পরিপন্থী। সরকার সংবিধান লঙ্ঘনের দায়ে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করতে পারে। পারবেন কি সে ধরনের মামলা মোকাবিলা করতে?

লেখাপড়ার কোন বিকল্প হয় না। বিএনপি রাজনীতিতে বোধহয় লেখাপড়া জানাশোনার অভাবটা চোখে পড়ার মতো। অবশ্য অন্যান্য দলেও যে এ অভাব নেই তা নয়। তবে তথ্যপ্রযুক্তির এ বিস্ময়কর উন্নতির যুগে এখন সবাই চেষ্টা করছেন নিজেদের মানানসই করতে। ব্যতিক্রম শুধু বিএনপির নেতাদের এক বড় অংশ। এতদসত্ত্বেও দেশবাসী জানে বিএনপিতে বেশকিছু নেতা আছেন যারা কিছু না কিছু লেখাপড়া জানেন। তাদের সর্বাগ্রে উচিত হবে তাদের মূল নেত্রীকে লেখাপড়া ও জানাশোনার ব্যাপারে উন্নত করে তার নেতৃত্বের গুণগান প্রচার করা। নেতানেত্রীর সামনে বাকরুদ্ধ থেকে বা মোসাহেবী করে নেত্রীকে চরম ক্ষতির মাঝে ঠেলে দিয়ে হাস্যকর করা উচিত নয়। '৭১-এ মার্চের শেষ দিকে গোটা জাতি যখন চরম শ্বাসরুদ্ধকর ও উত্তেজনা-আশঙ্কার মধ্যে নিমজ্জিত তখন ন্যাচারাল লিডারের আসনে অধিষ্ঠিত বা বাঙালির আরাদ্ধ অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে শতভাগ নিয়মকানুন মেনে সব সিদ্ধান্তে গ্রহণই

সঠিকভাবে হয়নি। কিন্তু দেশবাসী সেই সিদ্ধান্তকে অমোঘ সিদ্ধান্ত মেনে প্রতিটি আদেশ-নির্দেশ তারা মেনে চলেছে এবং যথারীতি বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। '৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ কেন্দ্র এবং প্রদেশে বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। সংসদীয় পার্টি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নেতা নির্বাচিত করে। একইসঙ্গে চিফ হুইপ, হুইপ প্রভৃতি নির্বচন সম্পন্ন করা হয় শুধু সংসদ অধিবেশন বসলে যেসব পদে নির্বাচন করার বিধান রয়েছে সেগুলো ছাড়া সব পদ পূরণ করা হয়। একইভাবে করা হয় প্রাদেশিক পরিষদেও অর্থাৎ নিয়ম আইন অনুযায়ীই বঙ্গবন্ধু তখন পাকিস্তান পার্লামেন্টের নেতা। পার্লামেন্ট শুরু হলেই আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হতো। কিন্তু '৭১- এর ১ মার্চ পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আহূত সংসদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেন। গোটা বাংলাদেশ তার 'প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। ইয়াহিয়া আলোচনার প্রস্তাব দেন। শুরু হয় আলোচনা। কিছুদিন চলতেই বোঝা গেল আলোচনা ব্যর্থ হবে। লোক দেখানো আলোচনার পেছনে পাকিস্তানিদের অন্য উদ্দেশ্যে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত ২৫ মার্চ অপারেশন সার্চলাইট শুরু করা হয় নারকীয় হত্যাযজ্ঞ গণহত্যা। বঙ্গবন্ধু সব কিছু বুঝেই ৭ মার্চ ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলেন এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

গোটা বাঙালি যখন মনেপ্রাণে ঐক্যবদ্ধ এবং যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে তখনই বঙ্গবন্ধু তার শীর্ষ সহকর্মীদের ডেকে এক বৈঠকে ৬ সদস্যের কমিটি গঠন করেন। কমিটি প্রধান বঙ্গবন্ধু নিজে এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, মোস্তাক আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামরুজ্জামান। মুখেই বলে রাখলেন আমি যদি অনুপস্থিত থাকি তাহলে অস্থায়ী প্রধান থাকবেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। আর যুবনেতা শেখ মণি, সিরাজুল আলম, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ বঙ্গবন্ধুর এ সিদ্ধান্ত মেনে নেন। উল্লেখ্য, এই সার্বিক ব্যাপারটাই ছিল গোপন। বঙ্গবন্ধুও তখনো কাউকে জানাননি তিনি আত্মগোপনে যাবেন না। যখন আত্মগোপনে যাওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ল তখনই তিনি উপস্থিতদের জানিয়ে দিয়েছেন আমি আত্মগোপনে যাব না, আমাকে না পেলে ওরা ঢাকা শহর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। সবাইকে নির্দেশ দিলেন যার ওপর যা দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা সঠিক ভাবে পালন করতে হবে। এরপর আওয়ামী লীগের মূল নেতৃত্ব কলকাতায় চলে যান। ১০ এপ্রিল কলকাতায় সংসদীয় পার্টির বৈঠক ডাকা হয়। তাতে প্রায় ২০০-এর বেশি (এমএনএ ও এমপিএ) সদস্য উপস্থিত হন। সেখানেই গঠিত হয় মুজিবনগর বিপ্লবী প্রবাসী সরকার। সেই সরকারের প্রধান বা রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে। তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী ও তিনজনকে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য করা হয়। উল্লেখ্য বঙ্গবন্ধু নিজেই তার সহকর্মীদের বলে দিয়েছিলেন মুক্তিবাহিনীর প্রধান কমান্ডার হবেন কর্নেল এমএজি ওসমানী ও ডেপুটি হবেন কর্নেল এমএ রব।

স্বাধীনতার পর এ দুজনই জেনারেল হয়ে অবসর গ্রহণ করেন। সংসদীয় কমিটির ওই বৈঠকেই এ দুজনসহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেয়া হয় এবং গঠিত মন্ত্রিপরিষদকে কেবিনেট সম্প্রসারণের ক্ষমতা দেয়া হয়। এই বিপ্লবী প্রবাসী সরকারই ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের মুক্তঅঞ্চল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় শপথ গ্রহণ করে এবং শপথ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এ স্থানটির নামকরণ হয় মুজিবনগর। দেশ-বিদেশে সরকারও পরিচিতি পায় মুজিবনগর সরকার হিসেবে।

অর্থাৎ এ সার্বিক কার্যক্রম তৎকালে পরিচালিত হয়েছিল একটি দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা নিয়মরীতি অনুযায়ী। আওয়ামী লীগ বা শেখ মুজিবই পেয়েছিলেন জনগণের ম্যান্ডেট। স্বাভাবিক নিয়মেই তিনি ছিলেন দেশের ও সরকারের প্রধান। বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার কারণেই তার নির্দেশমতো সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর প্রবাসী সরকার ঢাকায় ফিরে আসে এবং ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। তখন তিনি দেশের রাষ্ট্রপতি ও সরকারের প্রধান। একদিন পরেই তিনি রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং যথারীতি তিনি হন নতুন স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী। এ সার্বিক ঘটনাই ঘটেছিল নিয়মতান্ত্রিকভাবে। পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশের কাছেও প্রমাণিত হয়েছিল শেখ মুজিবের সরকারই বৈধ, নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক। ফলে দ্রুত বাংলাদেশের স্বীকৃতি লাভ সহজ হয়ে যায়। এ সামগ্রিক কার্যক্রমে দেশ, সরকার, জনগণের যথার্থ প্রতিনিধির প্রশ্নে জিয়াউর রহমানের কোন নামগন্ধ নেই। তার নামটি মাঝে মধ্যে আংশিকভাবে এবং মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু মহলের কাছে শোনা যায়। ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করার ঘটানা চট্টগ্রাম ও আশপাশের কিছু এলাকা ছাড়া বৃহত্তম বাংলাদেশে কেউই শুনতে পারেনি। প্রথম তিনি যখন নিজের লেখা ঘোষণাটি রেডিওতে পাঠ করেন তাতেই তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আপত্তি ও বিরোধিতার মুখে দ্রুতই তা পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ঘোষণা দেন। বিএনপির নেতাকর্মীরা বোধহয় এ ঘটনাটি কেউ ফাঁকতালে বাজিমাত' করার চেষ্টা বলে চালিয়েছেন স্বাধীনতার ৪৩ বছর পরে এসে। এতে করে কোন লাভ হবে না বরং আরেকবার তারা 'ফালতু' বলে প্রমাণিত হবেন।

'৭১ সালের ওই সময় দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। '৭০-এর নির্বাচনের পর থেকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত সব কিছু অগ্রসর হচ্ছিল গণতান্ত্রিক টানাপড়েন ও দর কষাকষির মধ্য দিয়ে। পৃথিবী যেমন তার প্রতি সমর্থন জানিয়ে তার দিকেই তাকিয়ে ছিল তেমনি বাঙালি জাতিও ধৈর্য ধরে সেই প্রক্রিয়াকে সমর্থন জুগিয়েছে। কিন্তু যখন পাকিস্তানি শাসকরা সবকিছু ভণ্ডুল করে দিয়ে গণহত্যার পথ বেছে নিল তখনই বাঙালি বিদ্রোহ করল। একটি দেশের সরকারপ্রধান হওয়া বা রাষ্ট্রপতি হওয়া একমাত্র ঘোষণার মাধ্যমে নির্ধারিত হয় না। একমাত্র সামরিক শাসকরা

ক্ষমতা দখল করে তেমন ঘোষণা দিয়ে সরকারের সর্বেসর্বা হয়ে বসেন। জিয়াউর রহমান কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে একবারের জন্য হলেও নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে সেদিন ফেঁসে গিয়েছিলেন। জাতির সেই কলঙ্ক অনেক আগেই মোচন হয়ে গেছে। কেউ তা আর মনে রাখেননি। হঠাৎ করে ৪৩ বছর পরে এসে মা-সন্তান আহম্মকের মতো যে কাজটি করেছেন তা যে ধোপে টিকবে না তা বোধহয় তারা বুঝতে পারেনি। তাই তো শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। যা ওই মা-সন্তানের মধ্যে রয়েছে বিরাট অভাব।

দৈনিক সংবাদ
৩ এপ্রিল ২০১৪

মুক্তিযুদ্ধের 'নূতন' তত্ত্ব

ড. গাজী সালেহ উদ্দিন

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের 'নূতন' তত্ত্ব উপস্থাপন করলেন রাষ্ট্রপতি মরহুম জিয়াউর রহমানের পুত্র তারেক জিয়া ও তাঁরই স্ত্রী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া। নূতনতত্ত্ব হলো জিয়াউর রহমান বাংলাদেমের প্রথম প্রেসিডেন্ট। দ্বিতীয় তত্ত্ব জিয়াউর রহমানই স্বাধীনতার প্রথম ঘোষক। দ্বিতীয় তত্ত্বটি পুরনো হলেও একটি সত্য প্রকাশ করেছেন বেগম জিয়া ও তারেক জিয়া। জিয়াউর রহমানের রেডিওতে ২৭ তারিখের ঘোষণা দিয়েছেন ২৬ তারিখে নয়। তৃতীয় তত্ত্ব হলো বেগম জিয়া একজন মুক্তিযোদ্ধা।

১৯৭১ সালে আমি ২৩ বছরের যুবক পাহাড়তলী পাঞ্জাবী লেনে (বর্তমান শহীদ লেন) থাকি বাবা আলী করিম রেলওয়েতে চাকরি করেন (মুক্তিযুদ্ধে শহীদ) চট্টগ্রামে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক শ্রমিক আন্দোলন সবই ছিল পাহাড়তলী কেন্দ্রিক।

৩ মার্চ ওয়্যারলেস কলোনির (বর্তমান পাহাড়তলী) মোড়ে বাঙালিদের একটি মিছিলে বিহারী ও বেলুচ রেজিমেন্ট আক্রমণ চালায়। তখন ঝাউতলা স্কুলে বাঙালি পরিবারগুলো আশ্রয় নেয়। ২৫ মার্চ শেষরাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মাইকিং হয়েছিল যা আমরা শুনতে পেয়েছিলাম। ২৬ তারিখ ভোর হতেই পাহাড়তলী পুলিশ বিট দিয়ে ও বর্তমান সিডিএ মার্কেটে ইপিআরের ক্যাম্প ছিল। ক্যাপ্টেন ভূঁইয়ার নেতৃত্বে ৪ ট্রাক সৈন্য যারা পূর্বের রাতে চট্টগ্রাম ক্যান্টেনমেন্ট হতে কোনভাবে প্রাণ বাঁচিয়ে আসতে পেরেছিল। দুপুরের দিকে ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া যখন কুমিল্লার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন কুমিল্লা থেকে আগত পাকিস্তানি বাহিনীকে বাঁধা দিতে তার পেছনে বহু ট্রাকে হাজার হাজার উল্লসিত মানুষ এবং সবার সামনে মোটরসাইকেলে ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া, মতি(চালক) ও নূরুল ইসলাম জয় বাংলার স্লোগানে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছিল।

২৭ তারিখে মেজর জিয়ার বেতার ঘোষণার মাধ্যমে প্রথম তাঁকে জানতে পারি। তাঁর উপস্থিতি ও এই ঘোষণা আমাদের উদ্দীপ্ত করেছে এটি সত্যি। ২৭ তারিখের ঘোষণায় মেজর জিয়া নিজেকে সুপ্রীম কমান্ড হিসেবে ঘোষণা দেন। পরে ২৮-২৯ তারিখে পুনরায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। প্রশ্ন হচ্ছে বেতার পরিচালিত হচ্ছিল ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগের

সমর্থকদের দ্বারা। সেই সময় যে কেউ যে কোন ঘোষণা দিতে পারত। তাই বলে কি তিনি প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলেন। সাধারণত একটি সমিতি বা প্রতিষ্ঠানেও প্রেসিডেন্ট হতে হলে কিছু আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন, এটি শুধু অর্বাচীন ব্যক্তিদের মস্তিষ্ক প্রসূত ধারণা। কারণ মেজর জিয়ার বেতার ঘোষণা ছাড়া তাঁর আর কোন তৎপরতা দেখতে পাইনি, প্রথমে তিনি চেষ্টা করেছিলেন কক্সবাজার টেকনাফ হয়ে বার্মায় চলে যেতে, সেখান থেকেও ফিরে আসতে বাধ্য হন। কারণ বার্মার সামরিক জান্তা পাকিস্তানের পক্ষে ছিল। এপ্রিলের ৫ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত কালুরঘাটে মেজর মীর শওকতসহ যুদ্ধ করেন। মেজর জিয়া তখন রামগড়। মেজর জিয়া ভারতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোথাও পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এমন কোন তথ্য আমরা পাইনি। মেজর জিয়ার দ্বিতীয় বারের ঘোষণা সম্পর্কে তৎকালীন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা সাবের আহম্মদ আজগরীর বক্তব্য নিম্নরূপ-মেজর জিয়ার ঘোষণায় প্রশ্ন ওঠে কে এই মেজর জিয়া' এবং তাঁর এই ঘোষণা অর্থাৎ নিজেকে সুপ্রীম কমান্ড দাবি করা হলে বহির্বিশ্বে প্রচারিত হবে এটি পাকিস্তানের একটি অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং সামরিক ক্যু। পরে শিল্পপতি একে খান কর্তৃক লিখিত ঘোষাণাপত্রটি পাঠ করেন যা এখনও আমরা শুনতে পাই। ক্যাপ্টেন কাদের যিনি রামগড় যাওয়ার পথে মিজুদের আক্রমণে ১৭ এপ্রিল শহীদ হন, যাকে রামগড়ে সমাহিত করা হয়েছিল।মুক্তিযুদ্ধে তিনিই প্রথম সামরিক অফিসার শহীদ হন। তখন তাঁর দলের মেজর মীর শওকতসহ কালুরঘাটে এপ্রিলের ৫-৯ তারিখ পর্যন্ত যুদ্ধ করেন। রফিক তখনও হালিশহর। ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া কুমিরায় ৮ বেঙ্গল কালুরঘাটে যুদ্ধ করেছেন, তখন মেজর জিয়া রামগড়ে। একজন গবেষক হিসেবে বলতে পারি, মেজর জিয়া পর পর দু,বার রেডিওতে ঘোষণা ছাড়া পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি গুলিও ছোড়েননি। অন্তত যতদিন চট্টগ্রামে ছিলেন? মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হতো না। ১৯৭৮ সালের ১৪ এপ্রিল এমএ হান্নানসহ ১৩ জনকে 'শব্দসৈনিক' ঘোষণা করা হয়েছিল, যার উদ্যোগ আওয়ামী লীগ সরকার নিয়েছিল কিন্তু তা হতে পারেনি চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জন্য। মেজর জিয়া ও ক্যাপ্টেন ভূঁইয়ার সঙ্গে পাহাড়তলীর মতি সোলেমান ও নূরুল ইসলামের একটি সম্পর্ক হয়। কারণ তাঁদের পাহাড়তলী রেলওয়ে ওয়ার্কশপ হতে একটি জীপ ও মোটরসাইকেল সংগ্রহ করা তখন বেশি প্রয়োজন। নূরুল ইসলামের ভাষায় 'আমরা এপ্রিলের ৫ তারিখে রামগড়ে পৌঁছলে ক্যাপ্টেন ভূঁইয়ার ও মেজর জিয়ার সাক্ষাত পাই। মতি ও নূরু ক্যাপ্টেন ভূঁইয়ার সঙ্গে কুমিরায় ছিলেন কিন্তু অস্ত্রের যোগান না থাকায় তাঁরা শহরে চলে আসেন। পাকিস্তানী বাহিনীর আক্রমণে দলছুট হয়ে পড়েন। মেজর জিয়া ও ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া দু'জনই ছিলেন বিমর্ষ। কারণ তাদের স্ত্রী শহরে রয়ে গেছেন, বিভিন্নভাবে মেজর জিয়া তাঁর স্ত্রী খালেদার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও বিফল হন। পরে জানতে পারেন, বেগম জিয়া অবস্থান পরিবর্তন করে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট চলে গেছেন। ক্যাপ্টেন ভূঁইয়ার অনুরোধে নূর একটি গাড়ি নিয়ে

প্রথমে শেরশাহ কলোনি, পরে আসকার দীঘির পাড় হতে বেগম ভূঁইয়াকে নিয়ে একই দিন রামগড় ফিরে যান।

মুক্তিযুদ্ধ সর্বজনীন, বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে যুদ্ধ করেছেন। কেউ দেশকে ভালবেসে যুদ্ধে গেছেন, কেউ বাধ্য হয়ে এছাড়া কোন মাপকাঠি নেই। খারাপ লাগে যখন মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা নিয়ে মিথ্যাচার হয় ব্যক্তিস্বার্থে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৩ এপ্রিল ২০১৪

ইতিহাস দখলের অপচেষ্টা

ড. হারুন-অর-রশিদ

সম্প্রতি জিয়াপুত্র ও বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান লন্ডনে পৃথক দুটি অনুষ্ঠানে দাবি করেন-'জিয়াউর রহমান দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি' আর স্বাধীনতাউত্তর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'প্রধানমন্ত্রিত্ব অবৈধ'। এধরনের বালখিল্য বক্তব্য দেশের আপামর মানুষকে বিস্মিত, হতবাক ও ক্ষুব্ধ করেছে। তার নিজ দল বিএনপির অনেকেও লজ্জায় মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। কিন্তু লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে তিনি তার ওই বক্তব্য 'কেউ যুক্তি-তর্ক দিয়ে খণ্ডন করতে পারেনি' বলে দম্ভোক্তি করেছেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট লাভ করে মেজরিটি পার্টির নির্বাচিত নেতা ও বাঙালির একমাত্র মুখপাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, ঘোষণা এবং স্বাধীনতার লক্ষ্যে অত্যাসন্ন মুক্তিযুদ্ধের দিকনির্দেশনা দান, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দী হওয়ার পূর্বক্ষণে স্বাধীনতার সরাসরি ঘোষণা এবং '৭১-এর ১০ এপ্রিল স্বাধীনতা সাংবিধানিক ঘোষনা ও বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি (বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি) এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে গঠিত ছয় সদস্যবিশিষ্ট সরকারই (যার অধীনে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত ও পরিচালিত হয়) হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বৈধ, সাংবিধানিক ভিত্তি ও এর নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের মূলে। এ সত্য অস্বীকার কিংবা এটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অর্থ স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব ও ভিত্তিকেই অস্বীকার করা। আর একমাত্র পাকিস্তানি বা পাকিস্তানি ভাবাদর্শে বিশ্বাসীদের পক্ষেই তা সম্ভব।

তারেক রহমানের একটি বক্তব্য হচ্ছে-৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর [তার ভাষায় 'শেখ মুজিব] 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ঘোষণার পর সরকার গঠিত হলো না কেন? সরাসরি সরকার গঠিত হয়নি সত্যি, তবে জেনারেল ইয়াহিয়ার ৩ মার্চ ১৯৭১-এ অনুষ্ঠিতব্য ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অধিবেশন ১ মার্চ স্থগিত ঘোষণার পর ২ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ও নির্দেশে যে পূর্ববাংলার সমগ্র প্রশাসন পরিচালিত হয়েছে; তিনিই যে ছিলেন কার্যত (de-facto) সরকারপ্রধান এবং তার ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর

সড়কের বাড়িটি (বর্তমান স্মৃতি জাদুঘর) পরিণত হয়েছির ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের অনুরূপ বোধ করি বই-পুস্তকে তিনি এসব পাঠ করেছেন। ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পরপর বঙ্গবন্ধু যদি আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার গঠন কিংবা সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন, তাহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা মুক্তিযুদ্ধ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে চিহ্নিত হতো। তা হতো চরম হটকারী পদক্ষেপ। আমাদের পরিণতি হতে পারত নাইজেরিয়ার বেয়াফ্রার মতো।

তারেক রহমানের দ্বিতীয় বক্তব্য অর্থাৎ 'জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক ও প্রথম রাষ্ট্রপতি'। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়লে, ২৬ মার্চ মধ্যরাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু যে সরাসরি বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন-তা প্রতিষ্ঠিত সত্য। এ সম্বন্ধে ১০ এপ্রিল ১৯৭১ মুজিবনগর সরকারের 'স্বাধীনতার সাংবিধানিক ঘোষণাপত্র'তে বলা হয় :

...বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঢাকা যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান...।

পাকিস্তান আর্মির পাবলিক রিলেশন্স অফিসার (১৯৭১ সালের পুরো সময় ঢাকায় দায়িত্বে নিয়োজিত) Siddiq Salik তার উল্লিখিত বইয়ের ৭৫ পৃষ্ঠায় লেখেন, '... When the first shot had been fered, the voice of Sheikh Mujibur Rahman came faintly through a wavelength close to that of the official Pakistan Radio. In what must have been. and sounded like, a pre-recorded message, the Sheikh proclaimed East Pakistan to be the people's Republic of Bangladesh."

২৭ মার্চ লন্ডন থেকে প্রকাশিত The Times পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যানার হেডিং ছিল `Heavy Fighting as Sheikh Mujibur Rahman Decleares East Pakistan Independent'। একই দিন Financial Times পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ' Civil War after East Pakista declares independence' শিরোনামে স্বাধীনতার ঘোষণা সম্বন্ধে লেখা হয়, 'গতকাল [২৬ মার্চ] শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা দিলে সেখানে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে'। এ কথা ঠিক যে, ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ সময়ের মধ্যে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা তাঁর নামে মেজর জিয়ার কণ্ঠে কয়েকবার প্রচারিত হয়। মেজর জিয়ার আগে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এমএ হান্নান, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ একই বেতার কেন্দ্র থেকে ওই ঘোষণা প্রচার করেন। জিয়াউর রহমানই যদি স্বাধীনতার

ঘোষক হবেন, তাহলে বঙ্গবন্ধুর নামে তাকে তা করতে হবে কেন? তারেক রহমান যেহেতু অন্য বিষযে সংবিধান বৈধতার প্রসঙ্গ তুলেছেন: অতএব তার কথা দিয়েই জিজ্ঞেস করছি, মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা বা নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণার সাংবিধানিক বৈধ ভিত্তি কী ছিল?

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠনের একমাত্র বৈধ ক্ষমতা, অধিকার ও কর্তৃত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানেরই ছিল; অন্য কারও নয়। বঙ্গবন্ধুর নাম ব্যতীত এককভাবে মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণাদান বা ঘোষণাপত্র পাঠ চরম শৃঙ্খলা পরিপন্থী হিসেবে চিহ্নিত হতো এবং সে জন্য তার কোর্ট মার্শাল পর্যন্ত হতে পারত। উল্লেখ্য ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৯৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা আমেরিকা 'ফাউন্ডিং ফাদারদের' বাইরে ম্যাকেনটোস নামে সেনাবাহিনীর জনৈক মেজর সে দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। ফলে শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও অবৈধভাবে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হাতে তুলে নেওয়ার অপরাধে তার কোর্ট মার্শাল হয়।

তারেক রহমানের দাবি হচ্ছে, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের পর থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের কোন নেতৃত্ব ছিল না এবং এ সময়ে জিয়াউর রহমান ছিলেন দেশের রাষ্ট্রপতি অর্থাৎ প্রথম রাষ্ট্রপতি। তার এ আষাঢ়ে বক্তব্যে আশ্চর্যান্বিত হওয়া আর ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণের জন্য করুণা। দেখানো ছাড়া আর কী করার থাকে! বস্তুত বঙ্গবন্ধুর আহ্বান ও নির্দেশ অনুযায়ী মার্চের শুরু থেকে দেশব্যাপী পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম চলছিল। ১৯ মার্চ ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে পাকিস্তানি সেনা-সদস্যদের সঙ্গে ছাত্র-জনতার সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে। এপ্রিলের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত দেশের বহু শহর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দখলমুক্ত ছিল। যে কোন মুক্তি সংগ্রামে আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব বা সরকার গঠনের একটি প্রস্তুতিকাল থাকে। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠনের আগ পর্যন্ত আমাদের মুক্তি সংগ্রামের জন্য সেটি ছিল অনুরূপ একটি প্রস্তুতিকাল। কিন্তু তখনও বঙ্গবন্ধুই ছিলেন এর নেতৃত্বমূলে।

জিয়াউর রহমান প্রথম রাষ্ট্রপতি'- এ তথ্য তারেক রহমান কোথায় পেলেন? মেজর জিয়ার রাষ্ট্রপতি হওয়ার বৈধ কোনো ভিত্তি কি ছিল? রাষ্ট্রপতিই যদি হবেন, তাহলে কখন, কীভাবে, কার কাছে তার সে পদ বা ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন? রাষ্টপতি কী করে মুজিবনগর সরকারের একজন বেতনভুক্ত সেনা কর্মকর্তার (সেক্টর কমান্ডার) পদে আসীন হন? জিয়া ছিলেন অত্যন্ত চতুর ও সুযোগ সন্ধানী সেনা অফিসার। ২৮ মার্চ (১৯৭১) তার তথাকথিত 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ'- এর স্বঘোষণাকে ঔদ্ধত্যতা' হিসেবে চিহ্নিত করার কথা। এ ঘটনা দ্বারা কার্যত তার রাজনৈতিক উচ্চভিলাষ প্রকাশ পায়, যা স্বাধীনতা উত্তর বিশেষ করে ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার ঘটনা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে স্পষ্টরূপে দেখা দেয়।

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবতর্নের একদিন পরে রাষ্ট্রপতির স্থানে প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হওয়াকে তারেক রহমান অবৈধ, অসাংবিধানিক বলে তার সাম্প্রতিক বক্তব্যে অভিহিত করেছেন। এ কথা সত্য, ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের 'স্বাধীনতার সাংবিধানিক ঘোষণাপত্র'তে বলা হয়েছিল 'সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ রাষ্ট্রপতি থাকিবেন'। তবে ১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি হিসেবে বঙ্গবন্ধু অন্তর্বর্তীকালীন সাংবিধানিক আদেশ জারি করেন, যা পরবর্তী সময়ে জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়। এ আদেশে ক. সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদ গঠন, খ. মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার, গ. গণপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন এমন একজনকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ঘ. গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক একজন রাষ্ট্রপতি নিয়োগ ঙ. একজন প্রধান বিচারপতি এবং কয়েকজন বিচারপতি নিয়ে হাইকোর্ট গঠন ইত্যাদি বলা হয়। এভাবে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ তাঁর কাছে শপথ নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন।

'জিয়াউর রহমান প্রথম রাষ্ট্রপতি ও স্বাধীনতার ঘোষক' দাবি এবং 'বঙ্গবন্ধুর প্রধানমন্ত্রিত্বকে অবৈধ বলা'- এসব নিছক ইতিহাস বিকৃতি বললে যথেষ্ট নয়। তা হচ্ছে ইতিহাস দখলের অপচেষ্টা। ইচ্ছা করলেই বা নিছক ঘোষণা দিয়ে কেউ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী কিংবা স্বাধীনতার ঘোষক হতে পারেন না। তাহলে মওলানা ভাসানীরই স্বাধীনতার ঘোষক হওয়ার কথা, যেহেতু তিনি ১৯৫৭ সালে পাকিস্তানিদের বিদায় সালাম জানিয়েছিলেন। বস্তুত এ জন্য প্রয়োজন বৈধ অধিকার, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এসবের অধিকারী।

তারেক রহমান হচ্ছেন নতুন প্রজন্মের সদস্য। তিনি তার পিতা জেনারেল জিয়ার পদাঙ্ক হুবহু অনুসরণে স্বাধীনতাবিরোধী, উগ্র ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর পক্ষ অবলম্বন না করে উদার গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাজনীতিতে অগ্রসর হতে পারতেন। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের প্রতিষ্ঠিত বিষয়গুলো নিয়ে নতুন করে কূট-বিতর্ক সৃষ্টি বা জাতিকে বিভক্ত করে এমন রাজনৈতিক বক্তব্য বা কর্মপন্থা পরিহার একান্ত আবশ্যক। মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও চেতনার আলোকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ভবিষ্যৎমুখী রাজনীতি চর্চায় নিজেদের নিয়োজিত করবেন, নেতৃত্ব দেবেন- এটিই জাতির প্রত্যাশা।

দৈনিক সমকাল
২০ এপ্রিল ২০১৪

জাতীয়তাবাদীদের অভিনব ইতিহাস তত্ত্ব

মো. মইনুল ইসলাম

ইদানীং জাতীয়তাবাদী শীর্ষ নেতৃত্ব স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের নতুন ইতিহাস প্রচারে ব্রতী হয়েছে। জেনারেল জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক এবং প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে মাতা বেগম জিয়া ও পুত্র তারেক রহমান এক নতুন প্রচার অভিযানে নেমেছেন। ২৫ মার্চ লন্ডনে পলাতক তারেক বলেছেন, তার পিতা জিয়াউর রহমানই দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি। এর আগে জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক বলেও দাবি করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মাতা খালেদা জিয়া দু'দিন পর এক অনুষ্ঠানে একই কথা বলেছেন। এ ভুয়া এবং বানোয়াট তথ্যের মাধ্যমে মাতা-পুত্র মিথ্যাচার এবং মূর্খতার এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করলেন। তারা যে অতিশয় স্বল্পশিক্ষিত তা এতদিন মানুষ জানত। এবার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তারা মহামূর্খ এবং মিথ্যাচারীরূপে দেশবাসীর কাছে নতুনভাবে আর্বিভূত হলেন। ইংরেজিতে একটি কথা আছে, Where ignorance is a bliss. it is foolish to be wise. অর্থাৎ মূর্খতা যেখানে পরম সুখের ব্যাপার,সেখানে জ্ঞানী হওয়া বোকামি মাত্র। কিন্তু যখন দেশের একটি বড় দলের শীর্ষ নেতা-নেত্রী এক মহামিথ্যাচারের মাধ্যমে দেশের ইতিহাস বিকৃতিতে লিপ্ত হয়, তখন তার একটি যথাযথ জবাব দেয়া দরকার ।

আজকের (৩০-০৩-১৪) পত্রিকায় দেখলাম খালেদা জিয়া বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে এমন আন্দোলন করবেন যা গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে স্থান করে নেবে। তাছাড়া বিক্ষিপ্তভাবে তিনি এমন কিছু বলছেন, যা দেশর সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মুখে শোভা পায় না। তবে সারাজীবনে সত্য বা শিক্ষার পুঁজি নেই তার পক্ষে লাগামহীনভাবে মিথ্যা এবং মূর্খতা প্রদর্শন অসম্ভব কিছু নয়। কথায় আছে, জ্ঞানীর হাত ধরা যায় কিন্তু মূর্খের মুখ ধরা যায় না। যাহোক, বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহানায়ক এবং ঘোষক এবং প্রথম রাষ্ট্রপতিকে এ ব্যাপারে কোন দলিলিক এবং ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণের অবতারণা এখানে করা হবে না। কারণ এটা এত বড় সত্য এবং প্রমাণিত যে, এ ব্যাপারে কিছু বলা একেবারে নিরর্থক। ইতিমধ্যে গত কয়েকদিনের পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য লেখক বেগম জিয়া ও তারেকের দাবিকে নানা তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে মিথ্যা বলে প্রমাণিত করেছে। তাছাড়া একজন বয়োবৃদ্ধ সমাজ সচেতন নাগরিক হিসেবে লেখক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি স্বচক্ষে

দেখেছে। অন্যদিকে পাকিস্তানি জেনারেলদের বই-পুস্তকও পাঠ করার সুযোগ হয়েছে। তারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তান ভাঙার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকেই দায়ী করেছেন। জিয়াউর রহমান নিজেও স্বাধীনতার ঘোষক এবং প্রথম রাষ্ট্রপতি বলে নিজেকে দাবি করেননি। আজকে যদি মাতা-পুত্রের কথা বিশ্বাস করতে হয় তাহলে আমাকে সূর্য পশ্চিমদিকে উদয় হয় এবং পূর্বদিকে অস্ত যায় দাবিকেও বিশ্বাস করতে হবে।

তবে আলোচ্য মাতা-পুত্রের ব্যাপারে এখানে কিছু তথ্য তুলে ধরা দরকার যাতে তাদের মিথ্যাচার এবং মূর্খতার পরিচয়টি আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে। বিএনপির ওয়েবসাইটে তথ্য ছিল জিয়াউর রহমান দেশের সপ্তম রাষ্ট্রপতি। আজ দেখা গেল ওয়েবসাইটটি বন্ধ। তাছাড়া দৈনিক সংবাদে (৩০-০৩-১৪) বেগম জিয়ার পাসপোর্টের ফটোকপি প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা যায় তার জন্ম ৫ আগস্ট ১৯৪৬। তাছাড়া তার আরও তিনিটি জন্মদিন আছে। অথচ শুধু বিদ্বেষবশত জাতির জনকের শোক দিবসকে ম্লান করার জন্য তিনি ১৫ আগস্ট ঘটা করে জন্মদিন পালন করেন। দেশের একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী যদি এমন চরম অশালীনতা এবং মিথ্যাবাদিতার আশ্রয় নেন তাহলে জাতীয়ভাবে মানুষ শিখবে কি! তাছাড়া গত তত্ত্বাবাধায়ক আমলে প্রায় ৩০ লাখ টাকার মতো জরিমানা দিয়ে তার কালো টাকা সাদা করার ঘটনা এত সহজে মানুষ ভুলে যাওয়ার কথা নয়। কে না জানে, বাংলাদেশে নির্বাচনে জালিয়াতি এবং কারচুপির মহানায়ক তার দলই। মাগুরার কালো নির্বাচন, তেজগাঁও-রমনা নির্বাচনে কারচুপি করার ব্যাপক ষড়যন্ত্রের কথা দেশবাসীর অজানা নয়। তার মতে তিনি ও তার দল নির্বাচিত হলেই শুধু নির্বাচন সুষ্ঠু এবং সত্য হয়। পরাজিত হলে কারচুপির নির্বাচন, ফখরুদ্দীন-মইনুদ্দিনের পাতানো নির্বাচনের অভিযোগে মুখর হয়ে উঠেন। অথচ বিগত নির্বাচনকে দেশবাসী যেমন সুষ্ঠু বলে স্বীকার করেছে, তেমনি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করা চারটি আন্তর্জাতিক দলও উক্ত নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ বলে স্বীকৃতি দেয়।

তার নির্বাচন এবং সংসদ প্রীতির ব্যাপারে আরোও কিছু কথা বলা দরকার যাতে তার অসততা এবং নীতি-নৈতিকতাহীনতার চিত্রটি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে। বিগত নবম সংসদ নিয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত টিআইবি রিপোর্টে দেখা যায় বিরোধীদলের নেত্রী হিসেবে সংসদে বেগম জিয়া মাত্র ১০ দিন উপস্থিত ছিলেন। (প্রথম আলো ১৯-০৩-১৪)। আর শেখ হাসিনা ছিলেন ৩৩৬ দিন। ওই সংসদের (নবম সংসদে) ১৭টি অধিবেশনের মাত্র পাঁচটিতে যোগ দেয় বিএনপি। অষ্টম সংসদে যাতে তিনি সরকারি দলের নেত্রী ছিলেন, তাতেও তার উপস্থিত ছিল খুব কম। অথচ সংসদ এবং বিরোধীদলের নেত্রী হিসেবে বেগম জিয়া সব রকমের আর্থিক-অনার্থিক সুবিধা গ্রহণে কোন কার্পণ্য করেননি। তার দলীয় সংসদ সদস্যরাও একই কাজ করেছেন। কর্তব্য কাজ না করে বেতন-ভাতা খাওয়াকে তিনি নিজের বিবেকের কাছে কীভাবে যুক্তিসঙ্গত করলেন, সেটাও মানুষের কাছে

বড় প্রশ্ন। একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর এ ধরনের আচার-আচরণ দেশে নীতি-নৈতিকতার আদর্শকে কতটা সম্মানজনক এবং শক্তিশালী করবে সেটাও ভাববার বিষয়। ভাড়া করা কিছু তোষামোদকারী দ্বারা দেশনেত্রী উপাধি নেয়া যায় কিন্তু দেশবাসীর কাছে নীতি-আদর্শের প্রতীক হওয়া যায় না।

বিএনপির গত মেয়াদ (২০০১-২০০৬) খালেদা জিয়ার ছত্রছায়ায় তদীয় পুত্র তারেকের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী চক্র যথা মওদুদ, খন্দকার মোশাররফ, হারিছ চৌধুরী, ফালু, মীর নাসির ও সাকা চৌধুরী ইত্যাদি দুর্নীতি এবং সন্ত্রাসের এক মহোৎসবের আয়োজন করে। তারই কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাই ঢাকার মার্কিন দূতাবাস থেকে ওয়াশিংটনে পাঠানো কিছু গোপন তারবার্তা থেকে উইকিলিকসের ফাঁসকৃত এসব তারবার্তার দু একটি উল্লেখ করলেই বেগম জিয়া ও তদীয় পুত্র তারেকের লাগামহীন দুর্নীতি এবং মিথ্যাচারের ভয়াল রূপটি ধরা পড়বে। এর মধ্যে খালেদা জিয়ার তখনকার মুখ্য সচিব কামাল সিদ্দিকীর কিছু মন্তব্য উল্লেখের দাবি রাখে। তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে থমাসকে কামাল বলেন, 'তারেক গোয়ার এবং বিপজ্জনক'। থমাসের পরবর্তী মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্যাট্রিসিয়া বিউটেনিস ২০০৬ সালের ২৪ আগস্ট তার সরকারের কাছে পাঠানো এক তারবার্তায় জানান, 'ক্ষমতার মেয়াদের শেষদিকে এসে বেগম খালেদা জিয়ার বিএনপি সরকার নজিরবহীন দূর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে।...বেগম জিয়ার দুই পুত্র ছাড়াও তার মন্ত্রীদের আত্মীয়-স্বজনরা সরাসরি কমিশন বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়েছেন। বিভিন্ন টেন্ডার কিংবা সরকারি কেনাকাটা থেকে তারা কমিশন নিচ্ছেন (ইত্তেফাক ০৬-১০-২০১১)।

সবচেয়ে মারাত্মক বক্তব্যগুলো এসেছে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস এফ মারিয়ার্টির ৩ নভেম্বর ২০০৮ সালে ওয়াশিংটনে পাঠানো গোপন তারবার্তাটি থেকে যা The Daily star ৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ সালে Tareque symbol of Violent politics বা 'সহিংস রাজনীতির প্রতীক তারেক শিরোনামে প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়, 'এই দূতাবাস বিশ্বাস করে তারেক মর্মান্তিকভাবে রাজনৈতিক দূর্নীতির অপরাধে অপরাধী যা বাংলাদেশে মার্কিন জাতীয় স্বার্থের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। তার মিলিয়ন মিলিয়ন জনগণের অর্থ চুরি এই নমনীয় ধরনের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট জাতিটির রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অবনতি ঘটিয়েছে এবং সেখানে একটি স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি মূল লক্ষ্য তাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।' অল্প কথায় অনবদ্যভাবে তাঁর বার্তাটির শেষ অংশ তারেকের রাজনৈতিক অবয়বটি ফুটিয়ে তুলেছে। যাতে বলা হয়, In short, much of what is wrong in Bangladesh. অর্থাৎ সংক্ষেপে বলতে গেলে, বাংলাদেশের অধিকাংশ দোষ-ত্রুটির জন্য তারেক এবং তার সভাসদরাই দায়ী।

উপরোক্ত তারবার্তাগুলোকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল কল্পকাহিনী বলে নাকচ করতে চাইলেও এদেশের শিক্ষিত সচেতন মানুষ তাকে

সঠিক বলেই গ্রহণ করেছে। তারা জানে বিশ্বের মহাশক্তিধর গণতান্ত্রিক দেশটির দূতরা যেমন জ্ঞানী, তেমনি দায়িত্বশীল। তারা অলীক-অবাস্তব কাহিনী তাদের সরকারকে জানাচ্ছে না। মির্জা সাহেবদের মতো নীতি ও আদর্শবান মহাজ্ঞানী মহাজনদের ন্যায়-অন্যায় এবং সত্য-মিথ্যা গলাবাজি শুনতে দেশবাসীর কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। উপরোক্ত তারবার্তাগুলোতে মাতা-পুত্রের যে অবয়ব দেখি, তা একেবারেই দস্যু এবং তস্করসুলভ। এ ধরনের মানুষের পক্ষে নির্লজ্জ মিথ্যাচার এবং অলীক-অবাস্তব ইতিহাস প্রচারের প্রচেষ্টাতে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নেই। প্রশ্ন হলো, সত্য এবং সততার এত অভাব নিয়ে কি একটি জাতির নেতৃত্ব দেয়া যায়।

দৈনিক সংবাদ
১১ এপ্রিল ২০১৪

ইতিহাসের খলনায়ককে নায়ক বানানোর অপচেষ্টা

মাহমুদুল বাসার

জিয়াউর রহমানের উত্থান ঘটে ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ। তার আগে কেউ জিয়ার নাম জানতো না। মেজর রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম বলেন, '২৭ মার্চের আগে জিয়াকে অনেকেই চিনতো না। ২৪ মার্চ রাতেই তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং চট্টগ্রাম শহর দখল করে ফেলেন। ২৫ মার্চ গভীর রাতে থোকেই মাইকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করা হয়। তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন এটাও জানতেন না জিয়া। তখন জিয়া যাচ্ছিলেন সোয়াত জাহাজে অস্ত্র খালাসের জন্য তার তৎকালীন ক্যাপ্টেন অলি (বর্তমানে কর্নেল) জিয়াউর রহমানকে ফেরত আনেন এবং ২৭ মার্চ বিকেলে তাকে সামরিক অফিসারদের পক্ষ থেকে রেডিওতে বলতে বলা হলে জিয়া নিজেকে সুপ্রিম কমান্ডার হিসেবে পরিচয় দেন। তখন এ কে খান ফোন করে বলেন, কে এই জিয়া? আসলে জিয়াকে তেমন কেউ চিনতেন না। পরে ২৮ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। এটাই হলো সত্য ইতিহাস।' (যায়যায়দিন ১১-০৩-২০১০)।

বঙ্গবন্ধুর জীবনী লেখক ড. মযহারুল ইসলাম বলেন, '২৫ মার্চ রাত্রি বারোটার পর বঙ্গবন্ধু যখন আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তখন পর্যন্ত জিয়াউর রহমান মেজর হিসেবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন সৈনিক মাত্র। তিনি তখন চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে তার উর্ধ্বতন পাক সেনাবাহিনীর কর্মকর্তার নির্দেশমতো কাজ করে যাচ্ছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ যে শুরু হয়েছে পিলখানা, রজারবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে আক্রান্ত হয়েছে- এসব কিছুই তিনি জানতেন না। এমনকি ২৬ মার্চ সারাদিন তিনি তার কর্মকর্তাদের নির্দেশ আজ্ঞাবাহী সৈনিক হিসেবে কাজ করেছেন।' (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব- আগামী সংস্করণ-পৃ. ৬৫৪)।

অধ্যাপক আবু সাইয়িদের বক্তব্যও এখানে প্রযোজ্য হবে। তিনি বলেছেন, ২৬ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমানের কর্মপঞ্জি কেমন ছিল বিশ্লষণ করে দেখা যাক-

১। ২৬ মার্চ, সকালে কালুরঘাট ব্রিজ পার হয়ে জিয়াউর রহমানের সঙ্গী দেড়শ সৈন্য দুভাগে ভাগ হয়ে বোয়ালখালী থানা ও পটিয়া থানায় অবস্থান নেয়। জিয়াউর রহমান করলডাঙ্গা আশ্রয় নেয়।

২। ২৬ মার্চ, ৭১, বেলা ১০-১১টার মধ্যে জিয়াউর রহমান পটিয়া থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গেও আলোচনা করেন।

৩। বেলা ১২টার দিকে পুনরায় বোয়ালখালী করলডাঙ্গায় গমন করেন।

৪। দুপুরে সংগ্রাম কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক এম এ হান্নান, এম এ মান্নান ও আতাউর রহমান খান কায়সার জিয়াউর রহমানের সঙ্গে দেখা করে মেজর রফিকের সঙ্গে যুদ্ধে যোগদানের অনুরোধ জানান। জিয়া তাদের জানান যে, তিনি খুবই ক্লান্ত। কৌশল ঠিক করে ২৭ মার্চ চট্টগ্রামে আসবেন।

৫। ২৬ মার্চ ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত জিয়াউর রহমানকে বোয়ালখালী ও পটিয়া থানার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরতে দেখা যায়।

৬। ২৬ মার্চ বিকেলে মেজর জিয়াউর রহমান পটিয়া থানার একটি কক্ষ দখল করেন। সেখানে তার অফিস ঠিক করেন।

৭। ২৬ মার্চ '৭১ রাতে বোয়ালখালী থানার পূর্ব গোমদণ্ডি গ্রামে তিনি শহীদ শেখ মুজাফফর আহমদের বাড়িতে অবস্থান করেন।

৮। কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রের নিরাপত্তার কথা ভেবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মুখ্য সংগঠনক বেলাল মোহাম্মদ প্রথমে মেজর রফিকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন যে, তিনি যুদ্ধে ব্যস্ত আছেন। বেলাল মোহাম্মদ খোঁজখবর নিয়ে ২৭ মার্চ মাহমুদ হোসেনকে নিয়ে বেলা ১১টার পর পটিয়া থানায় এসে পৌঁছান। তার সঙ্গে ছিলেন ফারুক চৌধুরী, ওসমান গণি, কাজী হাবিব, এয়ার মোম্মাদ। বেলাল মোহাম্মদ অনুমতি নিয়ে পটিয়া থানার সংশ্লিষ্ট কক্ষে ঢোকেন এবং জিয়াকে বেতার ভবনের নিরাপত্তার কথা বলেন। তিনি বেতার কেন্দ্রের নিরাপত্তার জন্য একদল সৈন্য পাঠান। পরে সঙ্গী কয়েক অফিসারসহ একটি জিপে যাত্রা করেন এবং সন্ধ্যায় বেতার কেন্দ্রে পৌঁছেন।' (অঘোষিত যুদ্ধের ব্লুপ্রিন্ট-পৃ: ৮১-৮২)।

স্বয়ং বেলাল মোহাম্মদের বিবৃতিও তুলে ধরা দরকার। তিনি বলেছেন, 'পটিয়ার দূরত্ব ১৫/১৬ মাইল। যেতে হলে গাড়ি দরকার। সেই মুহূর্তে মনে পড়েছিল মাহমুদ হোসেনের কথা। ২৭ মার্চ সকাল বেলা যথাসময়েই এসেছিলেন মাহমুদ হোসেন একটি ট্যাক্সি নিয়ে। সঙ্গে আরো লোক ছিলেন।....পটিয়া থানায় মানুষের ভিড়। সবাই ইউনিফর্মধারী মিলিটারি এবং পুলিশের লোক। একটি চেনামুখ, মানিক মিয়া।

: এই যে মানিক মামা, আপনি এখন এখানে?

: আমিতো এই থানার ওসি।

: ভালো হলো। আচ্ছা, এখনে যে মিলিটারি আছেন, ওদের সিনিয়র অফিসার কে আছেন?

: মেজর জিয়াউর রহমান।

মেজর জিয়াউর রহমান আমাদের অনুষ্ঠানে শুনছিলেন। সন্ধা ৭টা ৪০ মিনিটে এবং রাত ১০টায়। আমাদের পরিচয় পেয়ে উল্লাসিত হয়েছিলেন। বলেছিলাম :

আপনার কাছে এসেছি একটা সাহয্য চাইতে। কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবনটিতে যদি প্রহরার ব্যবস্থা করতে পারেন।

ট্রান্সমিটার পৌঁছতে বিকেল ৫টা বেজে গিয়েছিল।....অফিস কক্ষে শুধু আমরা দুজন। আমি ও মেজর জিয়াউর রহমান। বলেছিলাম : আচ্ছা, মেজর সাহেব, আমরাতো সব 'মাইনর', আপনি 'মেজর হিসেবে স্বকণ্ঠে কিছু প্রচার করলে কেমন হয়। কথাটা ছিল নিতান্ত রসিকতা তিনি নিয়েছিলেন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হিসেবে। সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, হ্যাঁ। কিন্তু কি বলা যায়, বলুনতো! আমি এক পাতা কাগজ এগিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি নিজের পকেট থেকে কলম হাতে নিয়েছিলেন। প্রথমে লিখেছিলেন : I' Major Zia do here by declare independence of Bangladesh. আমি তখন বলেছিলাম: দেখুন, বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে বলবেন কি? তিনি বলেছিলেন : হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। নিজের নামের শেষে তীর চিহ্ন দিয়ে লিখেছিলেন : `On bebalf of our great leader Bangabandhu Sheik Mujibur Rahman....।' (কামরুজ্জান লিটন সম্পাদিত বঙ্গবন্ধু স্মারক গ্রন্থ-পৃ: ১৩৭-৩৮)।

জিয়া বেলাল সাহেবের বরাতে বেতারে এটা বিবৃতি প্রচারের সুযোগ পেয়ে নিজেকে Provisional Head of Bangladesh বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। সে সম্পর্কে ড. মযহারুল ইসলাম বলেন, 'এতে আপত্তি জানালে তিনি বলেন : 'দেশ-বিদেশের কাছে গুরুত্ব পেতে হলে এই দাবি প্রয়োজন। তাকে বলা হয় যেন তিনি বঙ্গবন্ধুর পক্ষে নিজেকে অস্থায়ীভাবে ভারপ্রাপ্ত বলে উল্লেখ করেন, যা তিনি অনুসরণ করেননি। এই ঘোষণা শুনে প্রবীণ রাজনীতিবিদ এ কে খান টেলিফোনে জিয়াকে বাস্তব অবস্থা বুঝিয়ে বলেন, অর্থাৎ বিনা পটভূমিতে অনুরূপ প্রাধান্য দাবি করা বিপজ্জনক। আর স্বাধীনতা ঘোষণার দায় ভাগ বহনের ক্ষমতা সে মুহূর্তে শেখ মুজিব ছাড়া আর কারো ছিল না। এ কে খানের দাবি অনুযায়ী, তার বক্তব্যের ভিত্তিতে জিয়া তৃতীয় ঘোষণাটি তৈরি করেন, যেখানে একাধিক বার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নাম উল্লিখিত হয়।' (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, আগামী সংস্করণ-পৃ: ৬৫৬)।

অধ্যাপক আবু সাইয়িদের আরেকটি অভিমত উদ্ধৃতি যোগ্য। তিনি বলেছেন, 'চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রের সম্প্রচার পরিধি ছিল মাত্র ষাট বর্গ মাইল। এর বাইরে প্রযুক্তিগত কারণেই তা শ্রুত হবার কথা নয়। বর্তমানে ফলাও করে বলা হচ্ছে, কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত মেজর জিয়ার ভাষণে সমগ্র দেশব্যাপী লক্ষ কোটি মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। জিয়াউর রহমানের দুটি ভাষণের টেপ পাওয়া যায়। দুটি ভাষণই ইংরেজিতে প্রদত্ত। ইংরেজি বোঝা-জানা রেডিও শোনার লোকের সংখ্যা ছিল এক পারসেন্টের নিচে। নাম ঠিকানা পরিচিতিবিহীন এক মেজরের এ ইংরেজি ভাষণ গ্রামের কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ মানুষ শুনেছে, বুঝেছে এবং পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে? এটা কি আদৌ সম্ভব? এ কথা কোন পাগল বিশ্বাস করবে? (অঘোষিত যুদ্ধের ব্লুপ্রিন্ট, পৃ: ৯১)

মৌলিক প্রশ্ন। এমনকি বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ রাত ১২টা ১মিনিটের পর ইংরেজিতে যে স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছিলেন, তা ছিল আনুষ্ঠানিককতা মাত্র। তার দ্বারাও কোটি কোটি মানুষ প্রভাবিত হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রভাবিত হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের দ্বারা। বঙ্গবন্ধু গেরিলা যুদ্ধের দিকে নির্দেশনা দিয়ে রেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা যুদ্ধেরই ডাক দিয়েছিলেন।

নিজেকে 'প্রভিশনাল হেড' ঘোষণা দিয়ে জিয়া ঔদ্ধত্য এবং দুরভিসন্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। ড. আনিসুজ্জামানের কটি স্মৃতিচারণায় জিয়ার ঔদ্ধত্য ধরা পড়ে। বলেছেন ড. আনিস, আমরা সেখানে পৌঁছোবার পর পরই মেজর জিয়া এলেন টেলিফোন করতে বা অন্য কোনো কাজে। পরিচয় পর্বের পরে আমি তাকে বললাম, 'বেতারে আপনার ভাষণ শুনেছি। তিনি জানতে চাইলেন কোনটা? আমি বললাম যেটায় শেখ মুজিবের নামে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।' জিয়া নিস্পৃহভাব বললেন, 'পুত্তর শেখ! হি মাস্ট বি রটিং ইন দি আটক প্রিজন নাউ।' আমি চমকে উঠে জানতে চাইলাম, 'ডু ইউ নো ফর শিওর?' উনি বললেন, 'দিজ ইজ মাই গেজ। (আমার একাত্তর-পৃ:৪৫)

১৯৪৮ সাল থেকে গড়ে ওঠা বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক সংগ্রামের সঙ্গে জিয়ার কোনো সর্ম্পক ছিল না। তাই তিনি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার মূল্যবোধের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু গবেষক আবদুল মতিনের কথা স্মর্তব্য, " 'স্বাধীনতা' শব্দটির প্রতি জিয়া ও বিএনপির বিতৃষ্ণা সহজাত সংস্কার বলে মনে হয়। ১৯৮০ সালে জিয়াচক্র একতরফাভাবে ঘোষণা করে, আগামী বছর থেকে ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের পরিবর্তে 'জাতীয় দিবস' হিসাবে পালন কর হবে।

১৯৮০ সালের ১৩ আক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তৃতাদানকালে আওয়ামী লীগ সভাপতি আবদুল মালেক উকিল বলেন, ১৯৭২ সালের ১৩ই অক্টোবর বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক গৃহীত সংবিধানের ৫৫ ধারায় পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, বাঙালি জাতি ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করবে। উক্ত ধারা উপেক্ষা করে জিয়া সংবিধান অবমাননা করেছে।

দেশব্যাপী তুমুল প্রতিবাদের ফলে জিয়ার এই সংবিধান-বিরোধী সিদ্ধান্ত কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।" (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব : কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়-পৃ: ৯৩)

স্বাধীনতার তথাকথিত ঘোষক সাহেব জাতীয় সঙ্গীতও পরিবর্তন করার ঘোষণা করেছিলেন। বলেছিলেন, 'নতুন জাতীয় সঙ্গীত ইতোমধ্যে রচিত হয়েছে। সুযোগমতো জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে।' (ঐ)

জিয়া সম্পর্কে জনপ্রিয় কলাম লেখক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর মন্তব্যটি খাপে খাপে সত্য, 'হক সাহেবের বিরুদ্ধে অবাঙালি উর্দুভাষী খাজা নাজিমউদ্দিনকে এবং শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে জিয়াউর রহমানের মতো এক নীতিজ্ঞান ও দেশ প্রেমবর্জিত ক্ষমতা লিপসু সেনাপতিকে বিকল্প নেতা হিসেবে খাড়া করে তাদের

নবলব্ধ স্বার্থ, সুবিধা, লুণ্ঠন, শোষণ ও একাধিপত্য স্থায়ী ও নিরাপদ করার প্রয়াস চালিয়েছে।' (সওগাত যুগ ও মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন- পৃঃ ৭২)

গত ২৬ মার্চ জিয়ার ছেলে তারেক রহমান এক বিপত্তিকর ঘোষণা দিয়ে বলেছেন জিয়া নাকি বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি। বিবৃতিতে তারেক রহমান বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক অবদান অস্বীকারের ভেতর দিয়ে জিয়ার ভিলেন চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

দৈনিক ভোরের কাগজ
৪ এপ্রিল ২০১৪

লন্ডন ষড়যন্ত্র ও চোরের মায়ের বড় গলা

অজয় দাশগুপ্ত

যখনই আমরা পরিস্থিতি সামাল দিয়ে এগুতে চাই ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে দেশ ও জাতিকে জাগিয়ে তুলি নতুন নতুন ইস্যু নিয়ে খালেদ জিয়ার দলও মাঠে নেমে পড়ে। বিলেত অবস্থানরত বিতর্কিত তারেক জিয়া নতুন এক ইস্যু তোলার চেষ্টা করছে। পৃথিবীর আর কোনো দেশ বা জাতিতে এমন মিথ্যাচার দেখিনি। এমন নির্লজ্জ মিথ্যা বলার কারণে তার মতো মিথ্যেবাদীকে শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে আমরা নিমজ্জিত হচ্ছি সর্বনাশা আরেক বিতর্কে। এখনো মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীরা বেঁচে আছে, এখনো আমাদের স্মৃতিতে বিজয় দিবস ও মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশ জ্বলজ্বলে, তারপরও এমন মিথ্যাচার! সামাজিক নেটওয়ার্ক জুড়ে তারেক জিয়ার মন্তব্য নিয়ে চলছে হৈচৈ। তার মতে প্রয়াত মেজর জিয়াই নাকি বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি। স্বাধীনতা দিবসে বাংলাদেশের মানুষ যখন আবেগ ও উচ্ছ্বাসে 'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গেয়ে আকুল ঠিক তখনই তিনি এই অপকর্মটি করেছেন। এটাকে কথার কথা বা মুহূর্তের ভুল ভাবা ঠিক নয়। আমাদের শত্রুপক্ষ অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধবিরোধী চক্র কোনো কাজ তাদের ওস্তাদের নির্দেশ ছাড়া করে না। আর সবকিছুর পেছনেই থাকে দুরভিসন্ধি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। তারেক জিয়া কি কারণে তার প্রয়াত পিতাকে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বললেন, তার কারণ ঠিক এখনই বোঝা যাবে না। তবে টের পাওয়া কঠিন কিছু নয়। তার আগে সামাজিক নেটওয়ার্কের কথায় আসি।

কেউ কেউ বলছেন, বায়ু চড়ে গেলে নাকি মানুষ এমন আবোল-তাবোল কথা বলে। কেউ লিখেছেন, ঠাণ্ডার দেশে বায়ু চড়ার মতো গরম এলো কোথা থেকে? কিন্তু এটা কেউ বলছি না, শীতকালেই মানুষের পাগলামো বাড়ে। আমাদের দেশে অনেক মানুষ আছেন যারা বছরের দশ মাস সুস্থ স্বাভাবিক থাকেন। শুধু শীতের দুই মাসে এদের ঘরে রাখা যায় না। কেউ রাস্তায় রাস্তায় ঘোরেন, কেউ কেউ দিগম্বর হতেও দ্বিধা করে না। তারেক জিয়া ঠাণ্ডার দেশে পাগলামোর অসুখে ভুগছেন কিনা তা পরীক্ষা করবেন চিকিৎসক। তবে ইতিহাসকে দিনদুপুরে দিগম্বর করার এই খায়েশ রোখা জাতির স্বার্থে জরুরি এবং তা সম্মিলিতভাবে।

কে আওয়ামী লীগ সমর্থক বা কে শেখ হাসিনা ও তার দলের নীতিতে আস্থা রাখেন সেটা এখানে বিচার্য হতে পারে না। এটা সমগ্র জাতি জন্য এক নতুন

চ্যালেঞ্জ। এই ষড়যন্ত্র আমাদের জাতিসত্তাকে দুর্বল করে আবারো বিতর্কের ফাঁদে ফেলে জটিল করে তুলবে। এমনিতেই দুর্ভোগের অন্ত নেই আমাদের। বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দীন, সৈয়দ নজরুল, মনসুর আলী, কর্নেল ওসমানী এমনকি ইন্দিরা গান্ধী বা এমন মানুষদের অস্তিত্বও অস্বীকার করছি আমরা। এ কোন জাতি, এ কোন দেশ আসলে? কিভাবে এটা সম্ভব? পৃথিবীর কম দেশ বা কম জাতি তো দেখলাম না? কোথাও এমন নেই। এমনকি হিটলারের দেশের মানুষও হিটলারকে অস্বীকার করে না। যার যা প্রাপ্য বা যার যা পাওয়ার তা দিয়েই মানুষ ভুল শোধরায় নিজের সামনে যাবার পথ সুগম করে।

আমাদের জাতি তা পারেনি। এতো বছর পর এসে মনে হচ্ছে কেবল ধর্মীয় কারণে বা সাম্প্রদায়িকতার জন্য আমরা পাকিস্তান ভাঙা মানতে পারছি না। ধীরে ধীরে ভারতের মতো অমুসলিম প্রধান দেশের কাছে পাকিদের আত্মসমর্পণ ও দেশ ভাঙার প্রতিশোধও যেন জেগে উঠতে চাইছে। বলাবাহুল্য, এই বিপথগামিতার পুরোধা ছিলেন মেজর জিয়া। তাকে ক্ষমতায় বসিয়ে পাকিস্তানি ভাবধারা প্রত্যাবর্তনের কাজ শুরু হয়। মুসলিম লীগ, জামাত, বিএনপি ও রাজাকাররা মিলে আমাদের পিছে টানতে শুরু করে। এখন যা প্রায় প্রতি ঘরে, প্রতি বাঙালির জীবনে কোনো না কোনভাবে আঘাত হানছে। কেন জানি না হঠাৎ করে পাকপ্রীতি ও রাজাকার তোষণের ধুম পড়ে গেছে দেশে। আমার চেনা ডজন ডজন বাঙালির চরিত্র আমাকে রীতিমতো ভাবিয়ে তোলে। ঘরে রবীন্দ্রনাথ গানে, নজরুল, পোশাকে বাঙালি কিন্তু অন্তরে বিএনপি। তাও বিএনপি মানে মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকারের সম্মিলন বা ঐক্য। লেখে লেখে নাম করেছে এমন তরুণকেও দেখি পাক ভীতি নিয়ে কথা বলতে নারাজ। তাদের মতে ইমেডিয়েট থ্রেট বা আশু বিপদের উৎস হচ্ছে ভারত। এমন ভয়াবহ মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বাস্তবতায় দেশের সুশীল ও মিডিয়ার এক বিরাট অংশও ভোল পাল্টিয়ে মধ্যপন্থী। এরা শেখ হাসিনার হাত থেকে পদক নেন। জাগরণ মঞ্চের পক্ষে পোস্টার ছাপাতে সাহায্য করেন আবার মাহমুদুর রহমানের জন্যও কেঁদে আকুল হয়ে পড়েন। এমন দুঃসময়ে লন্ডনে বসে জিয়াউর রহমানকে প্রথম রাষ্ট্রপতি ঘোষণায় তারেকের নির্বুদ্ধিতা বা অজ্ঞাতা ভাবলে ভুল হবে। এটা যদি ষড়যন্ত্রই না হবে, ছাব্বিশে মার্চে এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হবে কোন দুঃখে? এবার আমার ধারণার কথায় আসি।

আমার ধারণা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল, বঙ্গবন্ধু, মাহমুদ উল্লাহ বা ইতিহাস উপেক্ষা করে জিয়াকে প্রথম প্রেসিডেন্ট বলার কারণ তারা পঁচাত্তর থেকে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ বা শুরু করতে চায়। ব্যর্থ প্রেসিডেন্ট মোশতাককে পায়ে ঠেলে জিয়ার আমল থেকে বাংলাস্তানের নতুন ইতিহাস রচনার এই ষড়যন্ত্র রুখতে না পারলে আরো দুই-এক প্রজন্ম পড়ে থাকবে ঘোর অন্ধকারে। আর সে সুযোগে এই জাতি বাংলাস্তানকে আবারো পাকিস্তানে ফিরে যেতে দেখলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না। তারেক জিয়া দুর্নীতি, দুঃশাসন, ডাকাতি বা লুণ্ঠনের মতো অপরাধে দাগি হবার পরও সরকার তাকে স্পর্শ করেনি বা করতে পারেনি। করলে

এ জাতীয় কথা বন্ধ হয়ে যেতো। এর আগেও নির্বাচনের ঠিক আগে বাজে কথা বাজে উদাহরণ আর বর্জনের ডাক দিয়েছিলেন তারেক রহমান। তখন তা কাজে লাগেনি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এবারো তাদের চক্রান্ত কাজে লাগবে না। ফলে এখনই তার কণ্ঠরুদ্ধ করা প্রয়োজন। দিবালোকের মতো সত্যকে মিথ্যা বলার অপরাধে তার বিচার হওয়াও জরুরি। আরেকটা কথা-তার কথা শেষ হতে না হতেই মার কণ্ঠে আরো জঘন্যভাবে ফুটে উঠেছে একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি। বাংলায় কি একেই বলে চোরের মায়ের বড় গলা? আসলে কি হচ্ছে বলুন তো?

দৈনিক ভোরের কাগজ
৩০ মার্চ ২০১৪

বিদেশের মাটিতে ষড়যন্ত্র ও সাবধানতা

অজয় দাশগুপ্ত

জাতি যখন জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে রেকর্ড গড়ায় ব্যস্ত তখন প্রবাসে পালিয়ে থাকা কথিত যুবরাজ নোংরা রাজনীতির ঢাকনা খুলে দিল আরেকবার। তারেক রহমানের বিদেশ পলায়ন কোন সাধারণ ঘটানা নয়। দেশের সম্পদ ও ইজ্জত লুণ্ঠনের মতো দাগের আসামির এমন পলায়ন দেখা যায় বটে, তবে তারা আত্মগোপন করে থাকে। তাদের খোঁজখবর, ভাল-মন্দ আত্মীয়-স্বজন ব্যতিরেকে অন্যরা জানেন না। ইরানের শাহ, তার পুত্র, ফিলিপিনো মার্কোস এ জাতীয় অনেকের কথাই আমরা জানি। একদা ধনী বিত্তশালী রাজাধিরাজদের গরিবী হাল দিনান্তে 'ফকিরি অবস্থাও' আমরা জানি। কিন্তু অদ্ভুত দেশ আমাদের। বিচিত্র মানসিকতা! কিভাবে, কেমন করে দেশ ছাড়ল সেটা জনার পরও একশ্রেণীর উন্মাদ মানুষের সমর্থনে তারেকের মতো আসামিও বিদেশে বসে নানা ধরনের উস্কানি দিতে পারে এবং দিয়ে চলেছে। ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের আগেও তার একটি ভিডিও বার্তা প্রচারিত হয়েছিল। নির্বাচন বয়কটের ডাক দেয়া সে উস্কানিতে কাজ হয়নি। তার চেয়েও বড় কথা সে বার্তায়ও তারেক রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে অমূলক ও বাজে মন্তব্য করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। দিনকে দিন তার এই স্পর্ধা বাড়ছে। বিলেতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে বসবাসের পরও তার আচরণ অগণতান্ত্রিক ও দেশবিরোধী। সে কারণে সিডনিসহ পৃথিবীর বড় বড় শহরে বসবাসরত বাঙালিদের মনে এখন ঘৃণার আগুন জ্বলছে।

এই লেখা যখন লিখছি তখন খবরে দেখলাম বিএনপি নাকি এই বিষয়টি আর প্রচার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু কেন? আইনের ভয়ে না মিথ্যা জায়েজ করা যাচ্ছে না বলে? যে কারণেই হোক তাদের বন্ধ করা না করার ব্যাপারটি এখন মেটার করে না। কারণ তাদের চক্রান্ত ও জারিজুরি ফাঁস হয়ে গেছে। বিএনপির প্রেস সচিব নিজেও এ নিয়ে মিথ্যায় পরিপূর্ণ একটি লেখা লিখে প্রকাশ করে ফেলেছেন। যার মানে তাঁরা ব্যাপারটি এমনি এমনি করেননি। এর পেছনে আছে গভীর চক্রান্ত। আমাদের দোষ, আমাদের ব্যর্থতা হচ্ছে আমরা ফুঁসে উঠতে জানলেও সময়মতো বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি না। যে কারণে স্বাধীনতার ঘোষক নামের তুচ্ছ বিতর্কটি আজও টিকে আছে। অথচ আমাদের জীবদ্দাশায়

ঘটে যাওয়া সে ঘটনার তিন নম্বর ব্যক্তি জিয়াউর রহমান। চট্টগ্রামের আওয়ামী নেতা প্রায়াত জহুর হোসেন চৌধুরী ও এমএ আজিজের অবস্থান ও ভূমিকাই এর যথার্থতা বলে দিতে যথেষ্ট। আবুল কাশেম সন্দ্বীপকে আমি কাছ থেকে দেখেছি। প্রায়ত বেলাল মোহাম্মদও ছিলেন প্রিয়জন। এদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও ঘোষণার যাবতীয় কাহিনী দুমড়েমুচড়ে জিয়া ককটেল কিন্তু জাতি পান করেছে। সে নেশার ঘোর কেটে সত্য যখন উদ্ভাসিত তখন বিএনপির কাছ থেকে আর একটি বিকৃতি ও প্রথম রাষ্টপতি ঘোষণার এই মতলববাজি হেসে উড়িয়ে দেয়ার কিছু নয়। তাদের প্রেস সচিব লিখেছন :

মানলাম, পাঠক বা ঘোষক যাই হোক সেটা জিয়া, আর কেউ নন। তিনি স্বকণ্ঠে, সদম্ভে, জীবনের চরম ঝুঁকি নিয়ে ওই সময়ে সেটা করেছিলেন। স্বাধীনতার ঘোষণা এভাবেই করতে হয়, শত্রু-মিত্র, বিশ্ববাসী সবাইকে শুনিয়ে। গুপ্তপন্থায় বা চিরকুট দিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা হয় না।

তার কথাই যদি মানি সাত মার্চের ভাষণের কথা ভুলি কিভাবে? স্বাধীনতা একটি জন্মপ্রক্রিয়া তার জন্ম কোন মুহূর্ত বা মিনিটের ব্যাপার হতে পারে না। ধারাবাহিক আন্দোলন, সত্তরের নির্বাচন, অসহযোগ সবকিছু বাদ দিযে জিয়ার মতো তখনকার এক সাধারণ মেজর কোন রেডিওতে কি বললেন তাতেই সারা দেশের মানুষ উজ্জীবিত হয়ে গিয়েছিল এ ধারণার প্রচার আর কতকাল? স্বকণ্ঠে মানলাম কিন্তু সদম্ভে মানে কি? যে জাতি তার মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিলগ্নে অসহায়, তার সামনে ঘোর দুর্দিন, ডানে-বাঁয়ে পাকিস্তানি সেনা তার কণ্ঠে তেজ থাকতে পারে কিন্তু দম্ভ আসে কোথা থেকে? আমি জানি না সে সময়কালে মারুফ কামাল সোহেল কত বড়টি ছিলেন বা তার আদৌ জন্ম হয়েছিল কিনা? কে তাকে বলেছে চিরকুটের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা হয়েছিল? এবং তা গুপ্তপন্থায়? লাখ লাখ বাঙালিকে সামনে রেখে জাতির জনক স্পষ্ট বলেছিলেন: এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। অন্ধ, বধির ও মতলববাজরাই এত বছর পর সে ঘোষণাকে পাশ কাটিয়ে কোন এক মেজরের পাঠককে আসল বলে চালাতে চায়। সোহেল কি এটা জানেন না মুক্তিযুদ্ধ কত বড় আর বিশাল? নয় মাস ধরে কত প্রক্রিয়া, কত দূতিয়ালী আর টানাপোড়েন? ইন্দিরা গান্ধী, নিক্সন, ব্রেজনেভ, চৌ এন লাই, কেনেডি কত নেতা, কত ধরনের মধ্যস্থতা আর সংগ্রাম। সেদিন তাজউদ্দীন আর সৈয়দ নজরুলের নেতৃত্বে বাইরে মোশতাকের মতো খুনীও ছিল সঙ্গে। কিন্তু তার সাধের জিয়া কোথায়? লাপাত্তা। এই সেনা অফিসার কোন এক সেক্টর সামলাতে ব্যস্ত আর আজ কিনা তিনি হয়ে গেলেন প্রথম ঘোষক প্রথম রাষ্ট্রপতি? বিশ্ববাসীকে শোনানো কথাই যদি বলা হয় সেটা কি জিয়া করছিলেন না তাজউদ্দীন সরকার? আরও একটা জায়গায় বড় গোলমালে পড়ে গেছে বিএনপি। হঠাৎ ইতিহাসকে নিজেদের দিকে টানার আসল জায়গাটাতে কিছুতেই আসতে পারছে না। সে কথায় পরে আসছি।

আমাদের শত্রুরা চিরকাল অপপ্রচারে এগিয়ে। এ যাত্রায় তাদের এই খায়েশের মূল কারণ যদিও ঝিমিয়ে পড়া দলের মনোবলে হাওয়া লাগানো। আসলে তারা ইতিহাসের গতিপথ বদলানোর ধান্দায় ব্যস্ত। বাংলাদেশের জন্মপ্রক্রিয়া ও স্বাধীনতার মূল চেতনা ধ্বংস করতে হলে এই জায়গাটির প্রয়োজন আছে। দীর্ঘকাল পরে চতুরতার সঙ্গে সেটি তারেকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতি ছিলেন কি ছিলেন না সেটাও আসলে মূখ্য নয়। তিনি যে ভূমিকায় ছিলেন এবং যে ধারাবাহিক সংগ্রামে বাংলাদেশের জন্ম, তাকে হেয় করে নিজেদের সুবিধা লুণ্ঠনই এই অপপ্রচারের মূল উদ্দেশ্য। তারেক জিয়ারা চায় বাংলাদেশের ইতিহাস পঁচাত্তরের পর থেকে শুরু হোক। চাইলেই তা হচ্ছে না বা সম্ভব নয় বলেই এসব বিষয় মাঠে আনা হচ্ছে। ডামাডোলের ভেতর সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ বা অন্যদের সরিয়ে যেনতেন প্রকারে জিয়াকে প্রতিষ্ঠার নামে কুতর্ক শুরু করলে একসময় মোশতাকের ....লাথি মেরে বাংলাদেশের তথাকথিত প্রকৃত স্বাধীনতা বা ভারত মুক্তির যুক্তি খাড়া করা সম্ভব হবে। সে দুঃস্বপ্ন বাস্তবায়নেরই প্রথম ধাপ এই অপপ্রচার। আমাদের সিডনিতেও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী দালাল, রাজাকার বা খুনীদের সমর্থক আছে। ঘাতক ফারুকের পুত্রও বাস করে এখানে। বহুকাল আগে এমন একটা কথা এখানেই শুনেছিলাম। আমি যার বাসায় এই গল্প শুনি সে মহিলা গানবাজনা ভালবাসেন। সঙ্গীতসন্ধ্যা নামের এক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। পরে দেখি সবাই কেমন জানি অন্য টোনে ভিন্ন আঙ্গিকে কথা বলছে। গৃহকর্মীকেও তখন খুব ভাল করে চিনতাম না। নতুন এসেছি। গান শোনা ও আড্ডার কারণেই যাওয়া। পরে সেই ভদ্রমহিলা আমাকে বলেছিলেন দাদা আপনি কি আর কোনদিন আমার বাসায় আসবেন না? আমি তো অবাক! এ জাতীয় প্রশ্নের কারণ কি? সে নিজেই বলল খন্দকার মোশতাক তার আপন মামা, সে কারণেই তার এই আশঙ্ক। কিছুটা অপ্রস্তুত ও বিব্রত বোধ করলেও বলেছিলাম, আপনি যদি তার সমর্থক না হন তাহলে হয়ত আসব। আর যদি ভুলেও তার কর্মকাণ্ড জায়েজ করার চেষ্টা করেন কোনদিনও আসব না। তখনও জানতাম না সেখানে আর কারা উপস্থিত ছিলেন। সবচেয়ে ভোকাল প্রপলভ কুতর্কের উদগাতা যুবকটি ছিল ফারুকপুত্র। বলা বাহুল্য আর কখনও সে মুখো হইনি। অন্তত পনেরো বছর আগের সেই সন্ধ্যায়ও তারা বলছিলেন বাংলাদেশ মূলত পঁচাত্তরেই স্বাধীন হয় এবং জিয়াউর রহমানই প্রথম সফল রাষ্ট্রপতি। তখন এটিকে পাগলামো মনে হলেও এখন দেখছি সবই ধারাবাহিক। হয়ত এসব তত্ত্ব বা আইডিয়ার পেছনে আছে ভিসি এমাজউদ্দীন বা শফিক রেহমানের উর্বর মস্তিষ্ক।

ইতিহাস আমাদের দিকে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ তখনকার মিডিয়াও আমাদের হয়েই কথা বলবে। না বলার কোন কারণও নেই। এক সেক্টরে যুদ্ধ করা পরে বিপথগামী কোন জেনারেল এ দেশ তৈরি করেনি। বায়ান্ন থেকে একত্তরের ধারাবাহিক সংগ্রামের ফসল বাংলাদেশ। আমাদের জাতীয় ও

দেশের ইতিহাসে আর কোনদিন বঙ্গবন্ধু জন্মাবেন না। আমরা পাব না একাত্তরের মতো সবল ঐক্যের জাতিসত্তা। তারপরও আকাশে ধুলা মেঘ বা ঝড় উঠলে কিছু সময়ের জন্য হলেও সবকিছু ঝাপসা ও অন্ধকার হয়ে যায়। সে অন্ধকারে ডাকাত-তস্কর বা লুটেরা মায়ের আঁচলের টাকা বা ইজ্জত লুণ্ঠনেও পিছপা হয় না। আগেও আমরা তা দেখেছি। ফলে চুপ করে বসে থাকা বা এটাকে অগ্রাহ্য করা যাবে না। এখন যারা আওয়ামী লীগের অগ্রভাগে তাদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের সময় এ দলের সঙ্গে ছিলেন না। কেউ কেউ বিরোধিতার পর ফিরে এসেছেন। সুতরাং ভয় থাকবেই। ভয় আগামী প্রজন্মের জন্য। মুক্তিযুদ্ধ না দেখা তারুণ্যের জন্য। তারেক রহমানের মতো কুপুত্র যে দেশে বড় গলায় কথা বলে মিথ্যা বলে মানুষ টানতে পারে সে দেশে ভয় থাকবেই। শুধু কি তাই? চোরের কথা শেষ না হতেই মায়ের বড় গলায় আবার প্রমাণিত হলো বাংলা প্রবাদগুলো কতটা অকাট্য। দেশ-বিদেশে অপরাজনীতি, অপপ্রচার ও মিথ্যার মুখে ছিঁপি পরাতেই হবে। আইন ঐক্য যুক্তিসহ প্রয়োজনে কঠিন হয়েই এ কাজ করার বিকল্প নেই। যার রাজনীতি করাই নাজায়েজ সে কিভাবে এমন কথা বলে? এটাই এখন আমাদের জিজ্ঞাসা।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৩ এপ্রিল ২০১৪

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা ভাটিয়াপাড়া ওয়্যারলেস স্টেশনে পৌঁছায় ২৬ মার্চ ভোর রাতেই

গোপাল গাঙ্গুলী

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ সময় রাত ১২.২০ মিনিট ইপিআর বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। ছাব্বিশ মার্চ শেষ রাতের দিকে মগবাজার ওয়্যারলেস অফিস থেকে shift in charge প্রকৌশলী মেজবাহউদ্দিন আহমদ ঢাকার সঙ্গে চারটি লিঙ্কের মাধ্যমে ১২টি স্থানে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা প্রেরণ করেন। ঢাকা-খুলনা লিঙ্কের ফরিদপুর ও ভাটিয়াপাড় ওয়্যারলেস স্টেশনে একটি বার্তা পৌঁছে যায়।

২৬ মার্চ প্রত্যুষে ভাটিয়াপাড়ার ওয়্যারলেস অফিস থেকে ছাত্রলীগের কর্মী জনপরিচিত পটুমিয়া মধুমতির ওপারে লোহাগড়া কলেজের অধ্যক্ষ, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ওয়াহিদুর রহমানের কাছে বার্তাটি প্রথমে পৌঁছে দেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার অনুরূপ একটি বর্তা প্রবীণ রাজনীতিক ও সাংবাদিক নির্মল সেনও পেয়েছিলেন। প্রাকৃতিক নিয়মে স্বাধীনতার ঘোষণা আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। নড়াইল মহকুমা, লোহাগড়া, কালিয়া থানার সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ, মহকুমা প্রশাসক কামালউদ্দিন সিদ্দিকী, সেকেন্ড অফিসার এটিএম গিয়াসউদ্দিন সকলে স্বাধীনতার বার্তাটি পেয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক নূর মুহম্মদ মিয়া, লেঃ মতিয়ুর রহমান, খোন্দকার আব্দুল হাফিজ, এখলাসউদ্দিন আহমদ, সরদার তছলিমউদ্দিন আহমদ, ডা. আবুল বাশার, বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী, মাহাফুজুর রহমান.....অসংখ্য ছাত্র, যুবক জনতা সব শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

এপাড়ে গোপালগঞ্জ, কাশিয়ানী, মুকসেদপুরে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়। ভাটিয়াপাড়ার ওয়্যারলেস স্টেশনটি সামরিক যোগাযোগ, নিরাপত্তা এবং গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পাকবাহিনীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মাত্র চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই পাকবাহিনী গোপালগঞ্জ হতে ভাটিয়াপাড়ার স্টেশনটির দায়িত্ব নেয় এবং

শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুলে ব্যাপক গণহত্যা চালায়। একটি পুরানো নৌবন্দর হওয়ায় ভাটিয়াপাড়ার সঙ্গে নৌ, রেল, সড়ক যোগাযোগ একটি বৃত্তাকার সংযোগ বিন্দুতে পরিণত হয়।

গণহত্যার ইতিহাসে ভাটিয়াপাড়ার সামরিক ঘাঁটির হানাদার বাহিনী নজিরবিহীন হত্যাকান্ড চালায়। স্বাধীনতার বিজয় দিবসেও ভাটিয়াপাড়া শত্রুমুক্ত করা যায়নি। নড়াইল, গোপালগঞ্জ এলাকার ৮নং সেক্টরের প্রায় দুই হাজার মুক্তিযোদ্ধা এবং মুজিববাহিনী এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো হয়। মাথার ওপরে মিত্রবাহিনীর যুদ্ধবিমান চক্কর দিতে থাকে। আকাশবাণী, বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা ভাটিয়াপাড়ার মুক্তিযুদ্ধের 'রণাঙ্গন বিবরণ' প্রচার করে। পিলখানা হত্যাকাণ্ডে নিহত শহীদ কর্নেল নকিবুর রহমানের বড় ভাই মুক্তিযোদ্ধা টুনু এবং খালত ভাই গোলাম আজাদ দারা বীরপ্রতীক এ যুদ্ধে অংশ নিয়ে জয়ী হয়। শতাধিক হানাদার বাহিনী নিহত হয় ঐতিহাসিক ওয়্যারলেস স্টেশনটি মুক্ত কর হয়। পঁচাত্তরপরবর্তী সময়ে কোন কারণে জনগণের মুক্তিযুদ্ধের স্মারক স্থাপনাটি কেন বগুড়ায় সরিয়ে নেয়া হলো তা জানা যায়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার, মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার উদাত্ত আহ্বানের স্মৃতি স্মরক স্থাপনা ভাটিয়াপাড়ার ওয়্যারলেস স্টেশন এখানেই ফিরিয়ে আনুন।

লাখ লাখ মানুষের অমর শহীদ স্মৃতি শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব গাঁথা সংগ্রাম পরিষদের প্রতিরোধ নেতৃত্বের ইতিহাস এখনও জীবিত মানুষদের অনুভুতির কথা দেশছাড়া শরণার্থীদের ত্যাগের মূল্যায়ন করে ভাটিয়াপাড়ার মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য তথ্য রাষ্ট্রের উদ্যোগে সংগ্রহ করা হোক।

'শিক্ষায় মানবিক হও, বঙ্গবন্ধুর মহান সংস্কৃতি অর্জন কর।'

দৈনিক জনকণ্ঠ
৬ মার্চ ২০১৪

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা
ধানমণ্ডি থেকে চট্টগ্রাম

জামাল উদ্দিন

ইতিহাসের দুর্নিবার ধারায় জাতির সূর্যসন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলার দামাল সন্তানেরা পাকিস্তানি শাসকের বিরুদ্ধে ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে রাজপথে নামে। সেই ষাটের দশক থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলন সংগ্রামে চট্টগ্রামের রয়েছে অনন্য অবদান। চট্টগ্রামের ক্ষণজন্মা পুরুষ এম এ আজিজ, জহুর আহমদ চৌধুরী, এম আর সিদ্দিকী, এম এ হান্নান, জানে আলম দোভাষ, মানিক চৌধুরী, আবদুল্লাহ আল হারুন চৌধুরী,এম এ মান্নান, বিধানকৃষ্ণ সেনসহ অনেকেই বীরত্বের সঙ্গে গণআন্দোলনে নেতৃত্বে দিয়েছিলেন জনতার কাতারে শামিল হয়ে। সে ইতিহাস অনেক গৌরবদীপ্ত ও ঘটনাবহুল।

নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে গড়িয়ে এলো ১৯৭১-এর মার্চ। ২৫ মার্চ রাত সাড়ে নয়টায় সারা দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম পাকিস্তানিবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সূচিত হয় এই চট্টগ্রাম থেকেই। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি ইপিআর এডজুটেন্ট ক্যাপ্টন রফিকুল ইসলাম, পুলিশ বাহিনীর কর্ণধার এসপি শামসুল হক নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় বলতে হয়-চট্টগ্রাম সবার আগে। পরদিন ২৬ মার্চ সূচিত হয় "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র"। ঐদিন দুপুর ১টা ১০ মিনিটে আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নানের কণ্ঠে ধানমণ্ডি থেকে প্রেরিত বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করে বেগবান করেছিল মুক্তিযুদ্ধ। মাত্র ৫ দিনের আয়ুষ্কালের এই বেতারকেন্দ্র পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বোমা হামলা করে ধ্বংস করে দিলেও ইতিহাসের বিবেচনায় এই বেতারকেন্দ্রই প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল প্রকৃত জনযুদ্ধ। এ প্রবন্ধে ধানমণ্ডি থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মাঝে প্রেরণ, কালুরঘাট স্বাধীনবাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে প্রচার ও রামগড় হয়ে ভারতে এবং বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়াকে কেন্দ্র করে রয়েছে এক অজানা ইতিহাস। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় আমরা দেখতে পাই ২৫ মার্চ রাত প্রায় বারটা বেজে গেছে। এরই মধ্যে চট্টগ্রাম সংগ্রাম পরিষদের

সভাপতি জহুর আহমদ চৌধুরীকে সম্বোধন করে এবং সংগ্রাম পরিষদের নেতা এমএ হান্নান, এম আর সিদ্দিকী, এম এ মান্নান, অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদের নাম উল্লেখ করা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী এসে পৌঁছায়। জহুর আহমদ চৌধুরীর বাসার টেলিফোন নাম্বারে ঢাকা থেকে প্রেরিত ঐ বাণী তাঁর স্ত্রী ডা. নুরুন্নাহার জহুর রিসিভ করে ম্যাসেজটি লিখে নেন।

ম্যাসেজটি নিয়ে আখতারুজ্জামান চৌধুরীর পাথরঘাটার জুপিটার হাউজে পৌঁছে জহুর আহমদ চৌধুরী, এম আর সিদ্দিকী ও আখতারুজ্জান চৌধুরী এক জরুরি বৈঠকে মিলিত হলেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাটি কিভাবে ভারতে প্রেরণ করা যায় তাই নিয়ে তিন নেতা সিদ্ধান্ত নিলেন, ম্যাসেজটি সীমান্তবর্তী থানা রামগড়ে পৌঁছানো যাবে। রামগড় থানার ওসি ছিলেন আবদুল মান্নান চৌধুরী। তিনি আখতারুজ্জান চৌধুরীর নিকটাত্মীয় এবং বাড়িও একই থানার (আনোয়ারা থানা) বেলচুড়া গ্রামে। রাত প্রায় দুইটার দিকে আখতারুজ্জামান চৌধুরী টেলিফোনে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার ম্যাসেজটি জানিয়ে দিলেন রামগড় থানার ওসি আবদুল মান্নান চৌধুরীকে। রামগড় সীমান্তের অপরপাড়ে ভারতের ত্রিপুরার রাজ্যের সাবরুম থানা। থানার ওসি ছিলেন মি. মুখার্জী। সীমান্ত থানা হিসেবে দুজনের ছিল পূর্বপরিচয়। কিন্তু কোনো টেলিফোন যোগযোগের ব্যবস্থা না থাকাতে রাতে ম্যাসেজটি পৌঁছানো সম্ভব নয়, তবে তিনি নিজেই সকালে ম্যাসেজ নিয়ে সাবরুম থানায় যাবেন বলে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন। এদিকে ২৬ মার্চ সকাল ৮টার দিকে ওয়্যারলেস মারফত চট্টগ্রামের এসপি শামসুল হক কর্তৃক প্রেরিত আরেকটি ম্যাসেজও পেয়ে যান ওসি আবদুল মান্নান চৌধুরী। এর কিছুক্ষণ পর জহুর আহমদ চৌধুরী ও এম আর সিদ্দিকীও পর পর ফোন করে ম্যাসেজটি দ্রুত ভারতে পৌঁছানের জন্য ওসি আবদুল মান্নান চৌধুরীকে পুনরায় অনুরোধ জানান। সকাল দশটার একটু আগেই তিনি সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাবরুম থানায় পৌঁছেন এবং বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রেরিত স্বাধীনতা ঘোষণার ম্যাসেজটি সাবরুম থানার ওসি মি. মুখার্জীর হাতে বুঝিয়ে দেন এবং বাংলাদেশের তখনকার সার্বিক পরিস্থিতি আলোচনা করে অনুরোধ জানালেন জরুরি ভাবে ম্যাসেজটি যেন ত্রিপুরা-কলকাতা হয়ে দিল্লিতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। অতঃপর তিনি রামগড়ে ফিরে আসেন।

স্বাধীনতার ঘোষণা সংবলিত বঙ্গবন্ধুর সেই বার্তাটি

"ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতে পিলখানায় ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের লোকদের হত্যা করছে ঢাকা-চট্টগ্রামের রাস্তায় যুদ্ধ চলছে আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন

ও আদেশ, দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান।

আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করর জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোনো আপোস নেই, জয় আমাদের হবেই। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা, কর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাপ্রিয় লোকদের এই সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন।"- শেখ মুজিবুর রহমান।

২৬মার্চ ১৯৭১

চট্টগ্রাম বেতারে এম এ হান্নানের স্বাধীনতা ঘোষণা

প্রতিরোধ যুদ্ধ প্রক্রিয়ায় চট্টগ্রাম স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় ২৫ মার্চ মধ্যরাত থেকে অসংখ্য মাইকযোগে। সংগ্রাম পরিষদ নেতারা শহরে মাইক নামিয়ে পরদিন তা বেতারে ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেন। ২৫মার্চ মধ্যরাতে শত্রুবাহিনী ঢাকা দখল করলে ঢাকা বেতারও তাদের দখলে চলে যায় কিন্তু চট্টগ্রামে আন্দোলনরত জনগণের সঙ্গে ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে ইপিআর ও এসপি শামসুল হকের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী ও সেনাবহিনীর বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যরা একাত্মতা ঘোষণা করলে চট্টগ্রাম বেতার বাঙালিদের দখলে আসে।

২৬ মার্চ সকালে আখতারুজ্জামান চৌধুরীর বাসভবনে নেতৃবৃন্দ জড়ো হন। সেখানে দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় স্বাধীনতার ঘোষণাটি রেডিওর মাধ্যমে জনগণকে জানানো প্রয়োজন। তখনো সবাই আদৌ জানতেন না, বঙ্গবন্ধু কোথায় কী অবস্থায় আছেন্ আখতারুজ্জামান চৌধুরীর বাসার আলোচনার সময় এম এ হান্নান, এম এ মান্নান, ডা. এম এ মান্নান এমপি, আতাউর রহমান খান কায়সার, শাহজাহান চৌধুরী, মীর্জা আবু মনসুর, তরুণ কর্মী রাখাল চন্দ্র বণিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমে সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে, জহুর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক নুরুল ইসলাম চৌধুরী ও এম আর সিদ্দিকসহ চট্টগ্রামের তৎকালীন এমপিদের মধ্যে যাঁরা শহরে আছেন তাঁরা একযোগে রেডিও স্টেশনে যাবেন এবং নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের পক্ষে জহুর আহমদ চৌধুরী তা (স্বাধীনতার ঘোষণা) বেতারে প্রচার করবেন। আখতারুজ্জামান বাবুর বাসা থেকে নেতারা আগ্রাবাদ বেতার কেন্দ্রের দিকে যাবার সময় তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন। তিনি সহ ডা. এম এ মান্নান, এম এ হান্নান, আতাউর রহমান খান কায়সার, মীর্জা মনসুর, শাহজাহান চৌধুরী প্রমুখ রওনা দেন আগ্রাবাদ বেতার কেন্দ্রে। তখন বেলা প্রায় ১২টা।

অপরদিকে আখতারুজ্জামান বাবুর বাসা এবং বেতার কেন্দ্রে যাওয়ার আগে সকাল ১০টা নাগাদ জিপিওর সামনে এম এ হান্নানকে দলীয় কিছু নেতাকর্মীর সঙ্গে আলাপ করতে দেখেন চট্টগ্রাম কাস্টম অফিসের তৎকালীন প্রিভেন্টিভ

অফিসার এম এ হালিম। তিনিও এম এ হান্নানকে স্বাধীনতা ঘোষণার একটি কপি পাওয়ার কথা জানান এবং বেতার কেন্দ্রের কিছু লোকের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। এম এ হান্নান হালিমকে কিছুক্ষণ পর আগ্রাবাদ আসার কথা বলে চলে যান জহুর আহমদ চৌধুরীর বাসার দিকে। সেখান থেকে আগ্রাবাদের উদ্দেশে রওনা দেন অন্য নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে। আগ্রাবাদ বেতার কেন্দ্রের কর্মীরা ততোক্ষণে পাকিস্তানিদের পক্ষ ত্যাগ করে কাজ বন্ধ করে চলে গেছেন রেডিওতে বাঙালিদের খবর না শোনার প্রতিবাদ হিসেবে।

জনাব হান্নান ও তাঁর সঙ্গীরা বেতার কেন্দ্রে কাউকে উপস্থিত না পেয়ে বেতারের আঞ্চলিক প্রকৌশলী মীর্জা নাসির উদ্দিনের আগ্রাবাদ সরকারি কলোনির বাসায় লোক পাঠান তাঁকে ডেকে আনার জন্য। কিন্তু তিনি প্রথমে যেতে চাননি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি করতে হবে এই ভয়ে। কাস্টম কর্মকর্তা হালিমসহ স্থানীয় লোকজন মীর্জা নাসিরকে বুঝিয়ে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে শেষ পর্যন্ত এক প্রকার জোর করে নিয়ে যান এমএ হান্নান সাহেবের কাছে। আবদুস সোবহান নামে একজন রেডিও ইঞ্জিনিয়ারকেও নেয়া হয় সঙ্গে। কিন্তু মীর্জা নাসিরসহ অনেকের কাছে কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থানের কারণে আগ্রাবাদ কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান প্রচার চলানো ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচিত হয়। তাই সবাই রওনা দেন কালুরঘাট বেতার প্রচার কেন্দ্রের দিকে। যাবার পথে চকবাজারের বাদুরতলা এলাকায় অবস্থানরত দেলোয়ার হোসেন নামে একজন বেতার প্রকৌশলীকেও সঙ্গে নেয়া হয়।

২৬ মার্চ দুপুর ১টা ১০ মিনিটে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম অধিবেশন

দুপুর প্রায় ১টার দিকে সবাই পৌঁছেন কালুরঘাট সম্প্রচার কেন্দ্রে। মীর্জা নাসিরসহ বেতার প্রকৌশলীদের দেখে কর্তব্যরত আনসার আমিনুল কোনো বাঁধা দেয়নি। বেতার কর্মীরা ট্রান্সমিটার অন করার ব্যবস্থা করেন। এদিকে সেখানে কি বলা হবে তা ঠিক করছিলেন এম এ হান্নান, আতাউর রহমান খান কায়সার, ডা. এম এ মান্নান, শাহজাহান চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন প্রমুখ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে। অনুষ্ঠান ঘোষক হিসেবে ঠিক করা হয় রাখাল চন্দ্র বণিককে। অনুষ্ঠান যখন প্রচার শুরু হয় তখন বেলা ১টা ১০ মিনিট। রাখাল চন্দ্র বণিক ঘোষণা করেন, চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র। একটি বিশেষ ঘোষণা, একটু পরেই জাতির উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের বিপ্লবী সাধারণ সম্পাদক জনাব এম এ হান্নান। আপনারা যাঁরা রেডিও খুলে বসে আছেন তাঁরা রেডিও বন্ধ করবেন না।

এভাবেই বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণা বেতারে সর্ব প্রথম সম্প্রচার করেন আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান। এম এ হান্নানের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারের অনুষ্ঠানটি ছিল রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্বতঃউৎসারিত সিদ্ধান্তের ফল। এটি বেতার কর্মীদের উদ্যোগের সংঘঠিত অনুষ্ঠান ছিল না। সূচনার দিক

থেকে এটি প্রথম অধিবেশন। ইয়াহিয়ার হিংস্রতায় সারা বাংলাদেশ যখন বিভ্রান্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তখন চট্টগ্রাম থেকে প্রচারিত এই একটি ঘোষণা পথ দেখালো সারা বাংলাদেশকে। স্বাধীনতার সেই ঘোষণা প্রচারিত হলো চট্টগ্রাম থেকে। মহাত্ম গান্ধীর ভাষায় আবারো বলতে হয়-"চট্টগ্রাম সবার আগে।"

বেতার সম্পর্কে রাজনৈতিক নেতাদের অনভিজ্ঞতার কারণে প্রথম অধিবেশনে বেতার ঘোষণার নিয়ম-কানুন মানা হয়নি। দুপুরে অনুষ্ঠিত এ বেতার অল্পক্ষণ চালু থাকে। নেতারা তাঁদের কাজে চলে যান, বেতার কর্মীরা ঘরে ফিরে যান। এম এ হান্নানের অনুরোধে শাহ ই জাহান চৌধুরী ভেতরে থেকে যান।

২৬ মার্চ

বেতারের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের এক অংশের আলোচনার স্থান ছিল ডা. মোহাম্মদ শফি ও মুশতারি শফির বাটালী রোডের বাসভবন। সেখান থেকে আলোচনা ও যোগাযোগ করে বেতারে যুক্ত হন কবি বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, আব্দুল্লাহ আল ফারুকসহ অনেকেই। বেতারের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের মাঝে বেলাল মোহাম্মদকেই বেতার চালুর প্রথম উদ্যোক্তা বলা চলে। তিনি ২৬মার্চ দুপুরের আগেই বের হন প্রায়োজনীয় লোকজন জোগাড় করতে। তাঁর সঙ্গে অন্যদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমদ, জাফর ইমাম চৌধুরী। সবাই বের হন প্রয়োজনীয় আরো লোক জোগাড়ের আন্বেষণে। বেতারের সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক আবদুল কাহহার, আঞ্চলিক পরিচালক নাজমুল আলম, ইঞ্জিনিয়ার মীর্জা নাসির উদ্দিন, সরকারি কর্মকর্তা এমএ হালিম, হাবিবুর রহমান, প্রকৌশলী মোসলেম খান, দেলোয়ার হোসেন মাহবুব হাসান প্রমুখ তাঁদের সঙ্গে যুক্ত করে আগ্রাবাদের যান। এর মাঝে অনেকে যুক্ত হলেও অনেকে আবার চলে যান। বেতার চালু করতে ও সহযোগিতা করতে তাঁরা সবাই যান আগ্রাবাদ বেতার কেন্দ্র থেকে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে। বেতার দ্বিতীয় অধিবেশন চালু করেন সন্ধ্যা ৭.৪০ মিনিট। সন্ধ্যাকালীন এই অনুষ্ঠানটিকে বেলাল মোহাম্মদ অভিহিত করেন 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' প্রথম অধিবেশন। ২৬ মার্চের সান্ধ্য অধিবেশনটি চলে প্রায় আধাঘন্টা। এ সময়ে এম এ হান্নান আবারো আসেন কালুরঘাট সম্প্রচার কেন্দ্রে ডা. আবু জাফরকে সঙ্গে নিয়ে। তিনি স্বকণ্ঠে পুনরায় প্রচার করেন বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি। আবুল কাসেম সন্দ্বীপ এবং আশিকুল ইসলামও ঘোষণাটি পাঠ করেন। কুরআন তেলাওয়াত করেন কবি ও অধুনালুপ্ত দৈনিক পূর্বপাকিস্তান পত্রিকার সম্পাদক আবদুস সালাম, বাংলা খবর পাঠ করেন আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, ইংরেজি নিউজ বুলেটিন পাঠ করেন বেতারের অনুষ্ঠান প্রযোজক আবদুল্লাহ আল ফারুক। অনুষ্ঠান ঘোষণায় ছিলেন তৎকালীন বেতারের অনুষ্ঠান ঘোষক ডা. এম সুলতান উল আলম। 'জয় বাংলা বাংলার জয়' গানের ১ম খন্ড সূচক সুর হিসেবে বাজানো হয়, যা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সকল পর্যায়ে প্রচারিত হয়েছে।

বলা বাহুল্য ২৬ মার্চের দুপুরে ও সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধুর নামে প্রচারিত স্বাধীনতার ঘোষণা শুনে নেতাকর্মী ও সাধারণ জনগণের মধ্যে ধারণা জন্মে যে, জনগণের পক্ষে তথা প্রতিরোধযোদ্ধাদের দখলে একটা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র রয়েছে এবং বঙ্গবন্ধু এই বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে যুদ্ধের দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। ২৬ মার্চ রাতে বিবিসির খবরেও বলা হয়, বাংলাদেশের কোনো এক জায়গা থেকে গোপন বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস দখলে বিএনপির অব্যাহত অভিযান

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

কোন সভ্য দেশে নিজের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধের মতো রণাঙ্গন, ন্যায় যুদ্ধ, বিপ্লবাত্মক ইতিহাসের অধ্যায় নিয়ে কোন ধরনের অশ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটতে পারে এমন কাজ কেউ করার কথা সাধারণত ভাবেন না। এটিকে জাতীয় অনুভূতির প্রতি চরম আঘাত হিসেবেই গণ্য করা হয়। একই সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রাম বা জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধে যাঁরা সফল নেতৃত্ব প্রদান করেছেন নাম জানা অজানা সেই সব মানুষ যাঁরা অকাতরে আত্মহুতি দিয়েছেন দেশ ও জনগণের জন্যে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে ছোট বড় সবাইকে সচেষ্ঠ থাকতে দেখা যায়। দেশ ও জাতির জন্য আত্মত্যাগের এমন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে সব জাতিই তার জাতীয় গর্ব শৌর্যবীর্য, আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম এবং প্রেরণা সৃষ্টির মহান উৎস হিসেবে একবাক্যে গ্রহণ করে থাকে। ফলে নতুন প্রজন্ম জাতীয় ইতিহাসের অমরাত্মার প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে চলার সুযোগ পায়। আমাদের দেশের যাঁরা বিদেশ সফর করেছেন বা বিদেশে কর্মরত আছেন তাঁরা অনেক দেশেই উল্লিখিত বিষয়গুলো দেখেছেন বা দেখছেন।

এ সবের ব্যত্যয় পৃথিবীর কতটা দেশে ঘটেছে তা জানি না, তবে বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে গর্ব করার, শৌর্য-বীর্যের অহঙ্কার করার মতো যে মহান মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাকে রাজনৈতিকভাবে দখল করার আপাত নিরীহ যে প্রক্রিয়া ১৯৭৫ সালে শুরু হয়েছে তা এখন দলবল নিয়ে দেশ দখলের দুর্দনীয় অভিযানে পরিণত হয়েছে। এটি আর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করার চৌর্যবৃত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, রীতিমতো একাত্তরের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে হটিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে একজন সামরিক অফিসারের একক নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযান এবং বীরত্বগাথার কল্পিত বিষয়ে পরিণত করা হচ্ছে। এর সঙ্গে দল আছে, দলীয় অনুগত 'বুদ্ধিজীবী' আছেন যাঁরা ইতিহাস দখলের সৈন্য-সামান্ত, জেনারেল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। সম্প্রতি ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন আয়োজিত তারেক রহমান সম্পাদিত 'জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট ও স্বাধীনতার ঘোষক' শিরোনামের একটি

বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠান দেখেই আমি এটিকে বিএনপির মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস দখলের অভিযান হিসেবে তুলনা করেছি তা কিন্তু নয়। এই অভিযানটি কিন্তু দৃশ্যমান হয়েছে ২০০১ সালে, এর আগে অভিযান প্রস্তুতি কয়েক পর্বে ছিল। আমি যেহেতু আমার গবেষণার স্বার্থে ১৯৭৮ পরবর্তী সময় থেকে বিষয়টিকে নিরবছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণে রেখেছি, বোঝার চেষ্টা করেছি, সময়ে সময়ে এর প্রবণতাটি কোথায় কখন কোন শক্তি ও রূপে মোড় নিচ্ছিল তা নিশ্চিত হয়েই বলছি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস দখলের দ্বিতীয় পর্বে এসে বিএনপি, জামায়াত, অতি ডান, অতি বাম, সুবিধাবাদী এবং সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন শক্তির ব্যাপক সমাবেশ ঘটেছে। সৈন্য-সামন্ত, জেনারেল, পরিষদ নিয়েই দখলের উদ্দেশ্যে কোন অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সেটি ২০০১ সালে ব্যাপকভাবে ঘটেছিল বলে ছাপাখানায় প্রস্তুতকৃত বই আটকে রেখে মাত্র ২/৩ সপ্তাহের মধ্যে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অন্তত ২০টি পাঠ্যপুস্তকে দলবাজ ২ জন সাংবাদিক এবং একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ঝাঁটা দিয়ে বিদায় করে তদস্থলে মীর জাফরীয় বয়ানে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখানো হয়েছিল, ২০০৪ সালে ১৬ খণ্ডের দলিলপত্রের তৃতীয় খণ্ডে জিয়াউর রহমানের নামে একটি জাল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংযুক্ত করা হয়েছিল, এর ভিত্তিতে ২০০৫ সালে একেবারে মূলসুদ্ধ তুলে দিয়ে দখলীকৃত রাজত্বে মনের মাধুরী মিশিয়ে যে ইতিহাস লেখা হয়েছে তা কেবলই জিয়াউর রহমানের 'মুক্তিযুদ্ধ' জনগণের নয়। কেউ আমার কথা বিশ্বাস না করলে একটু দয়া করে ২০০২ সাল এবং ২০০৬ সালে প্রকাশিত (সংশোধিত সংস্করণ) পাঠ্য বইগুলো দেখে নিন।

প্রসঙ্গের শুরুতে আবার ফিরি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পর স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যবই নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী লেখানোর উদ্যেগ নেয়া হয়নি। তখন পূর্ব পাকিস্তানের আমলের কারিকুলাম অনুযায়ী লিখিত সমাজ পাঠ ও ইতিহাস বই-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের অংশটি খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে সংযোজন করা হয়েছিল। প্রথম কারিকুলাম প্রণয়নের উদ্যোগ ১৯৭৬-৭৭ সালে নেয়া হয়। সেই অনুযায়ী সমাজ পাঠ ও ইতিহাস লিখিত হয়। তাতে মুক্তিযুদ্ধের পাঠ বিশেষ কোন গুরুত্ব পায়নি। খুব সাদামাটাভাবেই পাঠ্যপুস্তকে সংক্ষিপ্ত আকারে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের একটা বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম এবং কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে রাজনৈতিক নেতা এমএ হান্নানের পর ২৭ মার্চ তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানের পঠিত ঘোষণার কথা উল্লেখ করা হয় ঐ সময়ের পাঠ্য পুস্তকে। যেহেতু তিনি তখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন তাই ১৯৭১ সালে তার ভূমিকা স্মরণ করিয়ে দিতেই বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকে এক দুই লাইনে উল্লেখ করা হয়েছিল। ১৯৭৮-৭৯ সালের আগে কোনো পাঠ্যপুস্তকে চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত ঘোষণার বিষয়টি অতটা গুরুত্ব পায়নি। জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকার সুবাদেই তখন পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃপক্ষ হয়ত গুরুত্ব দিতে গিয়ে এমএ হান্নান

এবং জিয়াউর রহমানের ঘোষণার কথা উল্লেখ করছে। সেক্ষেত্রে এম এ হান্নানের ২৬ মার্চ এবং জিয়াউর রহমানের ২৭ মার্চের ঘোষণার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। একজন রাজনীতিবিদ এবং অন্যজন সামরিক অফিসারের আহ্বানে তখন সাধারণ মানুষ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেরণা হিসেবে বিষয়টিকে দেখা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের শুরুর অসংখ্য ঘটনা এবং উদ্যোগের মধ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ফলে জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, এর বেশি কিছু ভাবার প্রয়োজন নেই। আগেই বলেছি, ১৯৭২ থেকে ১৯৭৮-৭৯ সাল পর্যন্ত সংশোধিত পাঠ্যপুস্তকের কোথাও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার কৃতিত্ব কেউ দাবি করেনি, উল্লেখও করা হয় নি।

জিয়াউর রহমানের জীবদ্দশায় পাঠ্যপুস্তকে এম এ হান্নানের পর ২৭ মার্চ তার ভূমিকার কথা এক লাইনেই স্থান করে নিয়েছিল। তবে এটিই যে পরবর্তীকালে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বলে দাবি করা হবে, মুক্তিযুদ্ধে তার একক নেতৃত্বর কৃতিত্ব দাবির বিষয় হয়ে উঠবে তা জিয়াউর রহমান নিজেও হয়ত স্বপ্নেও কল্পনা করেননি। তাঁর মৃত্যুর এক দশক পর্যন্ত বিষয়টি নীরবই ছিল। ১৯৯১ সালে বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর অবস্থা পাল্টে যায়। বিএনপির পেছনে জড়ো হতে থাকে এককালের ভাসানীপন্থী বলে পরিচিত রাজনীতিবিদ এবং সমর্থকদের বড় অংশ, দক্ষিণ পন্থায় বিশ্বাসী গোষ্ঠী জামায়াতের সমর্থন, সুবিধাবাদী গোষ্ঠী-যারা বিএনপিকে সম্মুখে রেখে আওয়ামী লীগেরই নয়, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অংশীদার হওয়ার স্বপ্ন দেখেনি তারাই এখন মুক্তিযুদ্ধে ১৯৭১ সালে জিয়াউর রহমানের অবদানকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করার বিদ্যাচর্চায় ব্যস্ত হয়। তারা দেখেছে বঙ্গবন্ধু এবং তার অনুসারীরা মুক্তিযুদ্ধের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। জিয়ার জন্য তেমন পদ সৃষ্টি করা তাদের দরকার হয়ে পড়ে। সেখান থেকেই স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া কথাটি মুখে মুখে উচ্চারিত হতে থাকে। ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত কখনও জিয়াউর রহমানের নামের সঙ্গে স্বাধীনতার ঘোষকের কথা উচ্চারণ করতে শোনা যায় নি। কেননা স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার আইনগত এবং রাজনৈতিক বৈধতা থাকে মূল নেতারই। ১৯৭১ সালের কোন দলিলেই বঙ্গবন্ধুর বাইরে অন্য কারও নামের চিহ্ন খুঁজে পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ইতিহাস তো ১৯৭১ সালেই সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৭১ সালে যার নাম সেক্টর কমান্ডারে ছিল তাঁর নাম স্বাধীনতার ঘোষণায় তুলে আনার মতো অপরাধ দ্বিতীয়টি হতে পারে না। যা হোক ১৯৯১ থেকে রাজনীতির মাঠে বিএনপি এবং উগ্র ডান ও উগ্র বাম শক্তি জিয়াকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে প্রচার করতে থাকে। একটি বিশেষ মিশন নিয়েই মহলটি মাটে নেমেছিল। তখন ছিল প্রচার-প্রচারণার অভিযান। এর পক্ষে রাজনৈতিক শক্তির সমাবেশ ঘটানোর চেষ্টা করা হলো। ১৯৯৪-৯৫ সলে দ্বিতীয়বার পাঠ্যপুস্তকের কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়। পাঠ্যপুস্তকও প্রণীত হয়। ১৯৯৬ সালে সেই পাঠ্যপুস্তক প্রথম প্রকাশিত হয়। তাতে জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক পদে অধিষ্ঠিত করা না হলেও

২৭ মার্চ কালুরঘাট বেতা কেন্দ্র থেকে তার ঘোষণার প্রভাবেই নাকি বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল-এমনটি দাবি করা হয়। তখন থেকে বিদায় দিয়ে দেয়া হয় এমএ হান্নানকে। বঙ্গবন্ধু উপাধিটি পাঠ্যপুস্তকে স্থান পায়নি। তিনি একজন নিষ্প্রভ নেতা এমন অবস্থানেই তাকে উপস্থাপন করা হয়। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিব স্বাধীনতার কথা বললেও ৪ দফা প্রস্তাব দিয়ে পাকিস্তানীদের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ করে দেন। সুখের বিষয় ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ৭ সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে ১৮টি বইতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়। ফলে ২০০১ সাল পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির সুযোগ মহল বিশেষের আর হয় নি। তবে ২০০১ এর নির্বাচনের পর ১০ অক্টোবর ক্ষমতা গ্রহণের আগেই জোট সরকারের একনিষ্ঠ সমর্থক দু'জন সাংবাদিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের জনৈক শিক্ষক ১৮টি পাঠ্যপুস্তকে দা-কুড়াল নিয়ে কাঠ কাটার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ছাপাখানা থেকে পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে আনা হয়। লেখা হয় জিয়াউর রহমানের বন্দনার জীবনী, শেখ মুজিবকে ব্যর্থ শাসক, জিয়াউর রহমাকে সময়ের ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হওয়া ক্ষণজন্মা মহাপুরুষরূপে। মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ঢাকায় নয়, চট্টগ্রাম সেনানিবাসে মেজর জিয়ার বিদ্রোহের মাধ্যমে শুরু হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শেখ মুজিব পাকিস্তানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। জিয়াউর রহমান রণঙ্গনে যুদ্ধ করেছেন, আওয়ামী লীগের নেতারা ভারতে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। এমন ইতিহাস কোন গাঁজাখোর, বিকৃত মানুষই লিখতে পারে। কোন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ তা পারার কারণ নেই! বলে রাখি, পাঠ্যপুস্তক লিখতে কিছু (শিক্ষা বিজ্ঞান) জ্ঞানের প্রয়োজন অবশ্যই থাকতে হয়। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরাই কেবল জানেন কোন শ্রেনীর শিক্ষার্থীকে কী পাঠ দিতে হয়, কেন দিতে হয়, তাতে শিখন ফল কী অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু ২০০১ সালে বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকগুলোতে জোট সরকারে ধর্মযুদ্ধের আচরণ বিস্ময়কর বললেও কম বলা হবে। পুস্তকের এ সব পাঠের লেখালেখিতে তখন ভাসানীর আদর্শে উজ্জীবিত সাংবাদিক, শিক্ষক এবং দক্ষিণ পন্থায় বিশ্বাসী আর একজন সাংবাদিকই দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস দখলের লক্ষে সূচিত ধর্মযুদ্ধের সেই উন্মাদনায় পাঠ্যপুস্তক, প্রচার মাধ্যম, রাজনৈতিক মাঠ, সর্বত্রই জিয়াকে মুক্তিযুদ্ধের কাণ্ডারী করা হয়, বঙ্গবন্ধুকে উচ্ছেদ করা হয় তার ইতিহাস নির্ধারিত স্থান থেকে।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদসহ প্রবাসী সরকার বলে কিছুই তাতে ছিল না। 'জিয়াই একা দেশ স্বাধীন' করার অনেক কল্পকাহিনী তৈরি করা হলো। এটিকে দলিলিকভাবে প্রমাণিত বলে দেখানোর জন্যে জিয়াউর রহমানের নামে একটি নতুন ঘোষণাপত্র তৈরি করা হলো (২০০৪ সালে), এখানে বঙ্গবন্ধুর প্রেরিত তারবার্তর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি–এমন কথা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা লিখেছিলেন। এ সব বুদ্ধিজীবী একাত্তর সালে কোথায় ছিলেন জানিনা, তবে তাদের দলিলপত্র প্রমাণ করার জ্ঞান যে উদ্ভট তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে

প্রতিষ্ঠিত তা ইতিহাসের একজন ছাত্র হিসেবে আমি বলতে মোটেও দ্বিধা করব না।

পরিসরের অভাবে আমি এই লেখায় সেই সব লেখার উদ্ধৃতি দিতে পারছি না। তবে বিএনপি এবং তার সঙ্গে থাকা একদল জ্ঞানপাপী বুদ্ধিজীবী শিল্পী-সাহিত্যিক ২০০১ সালে সূচিত অভিযানের থিম থেকে মোটেও সরেনি। তাদের সরার কোন লক্ষণ মোটেও নেই। কেননা ইতিহাস তত্ত্বের মৌলিক কোনো জ্ঞান না রেখেও এদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক যখন মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, প্রথম মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান বলে বক্তৃতা করেন, লেখালেখি করেন তখন বিএনপি কেন ইতিহাস দখলের অভিযান বন্ধ করবে!

তারেক রহমান সুদূর লন্ডনে বসে 'জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট ও স্বাধীনতার ঘোষক' শিরোনামে ১৪৩ পৃষ্ঠার একটি বই সম্পদনা করেছেন। সেটির প্রকাশনা উৎসব ঢাকায় হয়ে গেল। তাতে বিএনপির কিছু বাম নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য, অধ্যাপক, শিল্পী, সংস্কৃতিসেবী, আইনজীবী সাংবাদিকসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর এমাজউদ্দীন, ডা. জাফরুল্লাহ, গাজী মাযহারুল আনোয়ারসহ ডজনখানেক আলোচক বইটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ৪টি পত্রিকা উক্ত অনুষ্ঠানের বিশেষ প্রচার করেছে। দৈনিক দিনকাল প্রধান শীর্ষ খবর করে দুই পৃষ্ঠায় সভার বিস্তারিত বিবরণ ছাপিয়েছে। দৈনিক ইনকিলাব, সংগ্রাম এবং নয়া দিগন্ত প্রথম পাতায় গুরুত্ব দিয়ে অনুষ্ঠানের সংবাদ পরিবেশন করেছে। তবে অন্য পত্রিকাগুলো এমন একটি অনুষ্ঠানকে ততটা গুরুত্ব দেয় নি। যারা দিয়েছে তাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অঙ্গীকার, বিশ্বাস এবং অবস্থান করাও অজানা থাকার কথা নয়। বক্তাদের আলোচনা থেকেই বোঝা যায় তারা তারেক রহমানের দেয়া শিরোনামকে সমর্থন করেন। সভাপতির ভাষণে এমাজউদ্দিন বলেছেন, বাঙালি জাতির সাড়ে চারহাজার বছরের ইতিহাসে প্রথম মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান। মুক্তিযোদ্ধা আর কেউ হতে চাননি। হতে চেয়েছেন জিয়াউর রহমান। একাত্তর সালের ২৫ কী ২৬ মার্চ প্রথম বিদ্রোহ করেন জিয়াউর রহমান। এ বিরল সম্মান পাওয়ার যোগ্য তিনি। (নয়া দিগন্ত, ১৭.৬.২০১৪) এবার পাঠক বলুন এমাজউদ্দীন সাহেবের কাছে কী আমাদের জানতে চাওয়া উচিত নয় যে, তিনি বাঙালি জাতির প্রথম মুক্তিযোদ্ধা, প্রথম বিদ্রোহী হিসেবে জিয়াউর রহমানকে কীভাবে শনাক্ত করলেন? ঢাকা শহরে পিলখানা, রাজারবাগে যারা প্রথম অস্ত্র হাতে ২৫ মার্চ রাতে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন তাদের কি মুক্তিযোদ্ধা বলা হবে না? আরও যারা চট্টগ্রামসহ সারা দেশে সেই রাতে যুদ্ধে নেমেছিলেন তাদের কী বলা হবে? জিয়াউর রহমান একাই এ দেশে মুক্তিযুদ্ধ করেনি, অসংখ্য সামরিক, বেসামরিক মানুষ শুরু করেছেন, মুক্তিযুদ্ধ একটি গণযুদ্ধে রূপান্তরিত হওয়াসহ এর রাজনৈতিক নেতৃত্বের অনবদ্য ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে মহান মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব চিত্র। সেখানে জিয়াউর রহমানও অন্যতম একজন ছিলেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে

জিয়াউর রহমানকে এককভাবে 'সিংহাসনের' আসনে প্রতিষ্ঠিত করার মানসিকতাই পরশ্রীকাতরতার প্রকাশ ঘটায়, ষড়যন্ত্রমূলক, হীনস্বার্থ চরিতার্থকারীর আচরণ বলে চিহ্নিত করা যায়। এতে কোনো বিদ্যাবুদ্ধির ছোঁয়া নেই, জিঘাংসায় হিংস্রতা ছড়ায়, মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস দখলের প্রবৃত্তি দেখা যায়। আলোচকদের বেশির ভাগই মুক্তিযুদ্ধের নাম করে যে সব কথা বলেছে তাতে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ করণীয় এর কোনোটিই প্রকাশ পায় না। জিয়াউর রহমানকে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম রাষ্ট্রপতির পদে বসাতে চান ক্রুসেড তথা ধর্মযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে, ১৯৭১-এর বাস্তবতা দিয়ে নয়, ইতিহাসজ্ঞান দিয়েও সম্ভব নয়। একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন কীভাবে তাতো আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও জানেন। এমাজউদ্দীন সাহেব দাবি করেছেন, ২৬ মার্চ থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত জিয়াই নাকি অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপতি ছিলেন। কে তাকে তখন রাষ্ট্রপতি বানালেন, তার সরকারে কে কে মন্ত্রী ছিলেন, কী আইন তিনি প্রণয়ন করেছেন এর জবাব এমাজউদ্দীন সাহেব তার নবআবিষ্কৃত দলিলপত্র দিয়ে আমাদের জানালে জাতি উপকৃত হতো। প্রশ্ন করতে পারি কী, ১০ এপ্রিল কী জিয়াউর রহমানের হাত থেকে তাজউদ্দীন আহমদগণ ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাকে সেক্টর কমান্ডে পাঠিয়ে দিলেন? এর জবাব এমাজউদ্দীন আহমেদ কী দেবেন জানিনা তবে উন্নত কোন দেশে হলে এর জন্য তাকে কি পুরস্কার দেয়া হতো তা তিনি হয়ত বুঝতে পারেন। এ ধরনের মনগড়া বক্তব্য দিয়ে যারা সেদিন জিয়াউর রহমানের ভূমিকাকে আকাশে তুলতে চেষ্ট করেছেন তারা তাকে আসলেই বিতর্কিত করতেই ভূমিকা রেখেছেন।

তবে বইটি সম্পাদনার মাধ্যমে এবং এর প্রকাশনা উৎসব করে আয়োজক এবং আলোচকগণ যে বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছেন তা হচ্ছে বাংলাশের মুক্তিযুদ্ধ তারা দখল করবেনই। একই সঙ্গে ১৯৭১ সালকে আদি ও অকৃত্রিমভাবে থাকতে দেয়া হবে না। কেননা, সেই ইতহাসে জিয়াউর রহমানের অবস্থান অনেক পেছনে। জিয়াউর রহমান যে ইতিহাসে প্রধান নয়-সেই ইতিহাস তারা মানবে কেন? তারা যেটি মানবে তা হবে জিয়া মুক্তিযুদ্ধের প্রথম রাষ্ট্রপতি, প্রথম ঘোষক, প্রথম মুক্তিযোদ্ধা। নতুন এই মিশনের অভিযানে শুধু বিএনপি একা নয়, আরও কারা কারা আছে তাদের অংশ বিশেষকে তো সেদিন দেখা গিয়েছেই। বেতার ঘোষণা থেকে স্বাধীনতার ঘোষক, স্বাধীনতার ঘোষক থেকে প্রথম রাষ্ট্রপতি, প্রথম মুক্তিযোদ্ধা সব আসনেই জিয়াউর রহমানকে বসানোর অভিযানে এবার নেমেছেন তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের বিশেষ গোষ্ঠী। আগামীতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া গেলে সেভাবেই 'ইতিহাস' লেখা হবে, প্রচার করা হবে। গেলানো হবে। ১৯৭১-এর বাংলাদেশের প্রকৃত ইতিহাসকে মুছে ফেলা হলে এমন অভিযানের বোধহয় দরকার রয়েছে। সেটির দ্বিতীয় পর্বের নমুনা দেখা গেল। এর প্রকৃত রূপ দেখা যাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর। কেউ কেউ বলবেন এ সব

সম্ভব হবে না।আমি বলব, সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশে জিয়াউর রহমানের জন্য ১৯৭১ সালের আসল পদ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যখন স্বাধীনতার ঘোষক পদে অধিষ্টিত করা সম্ভব করা গেছে (এদেশের অনেকেই তাই বিশ্বাস করে। এদের ইতিহাস জ্ঞান এমনই গভীর যে বাস্তবে না থাকলেও কল্পনায় ইতিহাস লেখা যায়, সেটিই তাদের ইতিহাস!) ভবিষ্যতে তারেক রহমানের সম্পাদিত ইতিহাস হবে বাংলাদেশের সকল দেশপ্রেমিকের গঠন পাঠনের ইতিহাস। সেই অভিযান তারা সফল করবেই, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ তাদের কাছে অতীতের বিষয়। এখন নয়া জামানা। নয়া ইতিহাস রচনা করতে হবে। সেই ডাক সুদূর লন্ডন থেকে এসেছে, ঢাকায় প্রকাশনা উৎসব হয়েছে। ক্ষমতায় আসলে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হবে। অতএব, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস দখলের অভিযান বহু আগে শুরু হয়েছে, বর্তমানে চলছে, আগামীতে অব্যাহত থাকবে-এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। একাত্তরে ছিলাম বীর বাঙালি, এখন বাংলাদেশী হয়েছি। সুতরাং বাংলাদেশী মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চাই, সে জন্যেই এই অভিযান।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২২ জুন ২০১৪

বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে এবং বাবার অনুপ্রেরণায় মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করি

ডা. জিয়াউদ্দীন আহমেদ

সুদীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের পর ১৯৪৭ সালের মধ্য আগস্ট প্রতিষ্ঠা হয় পাকিস্তান। তখন আমাদের এই বাংলা পাকিস্তানের একটি প্রদেশ ছিল। তাই আমরা তখন পাকিস্তানের একটি প্রদেশের নাগরিক হই। আমাদের অনেক আশা ছিল ইংরেজ শাষণ মুক্ত হয়ে একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে সকল প্রকার বিদেশী শাষণ-শোষণ ও নিপীড়ণ-নির্যাতন থেকে মুক্তি পাব। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই নিরাস হলাম। প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই টের পেলাম এক বিদেশী শাষকের হাত থেকে আরেক বিদেশী শাষকের কবলে পড়ি। তাই পাকিস্তানিদের শাষণ-শোষণের হাত থেকে মুক্তির লক্ষ্যে এই বাংলার মানুষ আন্দোলন সংগ্রাম শুরু করে। ২৪ বছরের আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তানি শাষকদের বিতারিত করে এই বাংলার বীর জনতা। আর এ সমস্ত আন্দোলন সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

পাকিস্তানিদের দুঃশাষণ থেকে মুক্তির জন্য আন্দোলনের শুভ সূচনা হয় ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। এরপর ৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬২ শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, ৬৬ ছয় দফা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০-এর সাধারণ নির্বাচন ও ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করে পাকিস্তানিদের দুঃশাসন থেকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ লাভ করি। এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার নেতৃত্বেই সকল আন্দোলন সংগ্রাম সহ একাত্তরের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে বাংলার বীর জনতা অংশ গ্রহণ করে।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে। বিপুল বিজয়ের পরও পাকিস্তানি শাষকগোষ্ঠি বিজয়ী আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে গড়িমশি শুরু করে। পাকিস্তানিদের তালবাহানা দেখে আওয়ামী লীগ প্রধান বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের কর্মসূচি

প্রণয়ন করে ১৯৭১ সালের প্রথম দিক থেকেই। মার্চ মাসে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। এই আন্দোলনই বাংলার মানুষকে ধাপে ধাপে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে জন্য সংঘটিত করে। ২রা মার্চের পতাকা উত্তোলন, ৩ মার্চের স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ এবং ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ বাংলার মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার ইঙ্গিত প্রদান করে। তাই সারা বাংলায় শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তির যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি পর্ব। এ সময় সিলেট শহরেও শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি। আমি আমার বন্ধু বান্ধব সহ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আলাপ আলোচনা শুরু করি এবং সংগঠিত হতে থাকি। ইতোমধ্যে ২৫ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলার মানুষের উপর ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড শুরু করে। তারা গ্রেফতার করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গ্রেফতারের আগে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এই ঘোষণা কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ২৬ মার্চ প্রচার করে আওয়ামীলীগ নেতা এম.এ হান্নান। পরবর্তীতে ২৭ মার্চ মেজর জিয়া বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।

জিয়ার ঘোষণা শোনার পর বুঝতে পারলাম বাঙালি সৈনিকরাও পাকিস্তানিদের বিরোদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। শুরু হয় পাকিস্তানিদের প্রতিরোধ করার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য এপ্রিলের ৩ তারিখ আমি (মেডিকেল প্রথম বর্ষের ছাত্র), সালাম (কর্নেল অব.), আনিস (মেজর অব.) ও আবুল হাসান বুলু (মেডিকেল পঞ্চম বর্ষের ছাত্র), মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করার উদ্দেশ্যে কাউকে না জানিয়ে বিয়ানীবাজার পুলিশ ফাঁড়ি থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করতে চাই। পরের দিন কর্নেল রবের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তাঁর নির্দেশে তেলিয়াপাড়ায় গিয়ে মেজর শফিল্লার দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগদান করি।

মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের কয়েকদিন পর আমার বাবা অধ্যাপক ডা. শামসুদ্দীন আহমেদকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নৃশংসভাবে হত্যা করে। এ সংবাদ আমি ২ মাস পর জানতে পারি মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে অবস্থানরত অবস্থায়। উল্লেখ্য ১৯৭১ সালের ৭ এপ্রিল হানাদাররা সিলেটে ভারি অস্ত্রসহ হামলা চালালে মুক্তিযোদ্ধারা শহর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। ৯ এপ্রিল হানাদার বাহিনী হাসপাতালে প্রবেশ করে এবং চিকিৎসা সেবাদানরত ডা. শামসুদ্দীন, তাঁর একনিষ্ঠ সহযোগী ডা. শ্যামল কান্তি লালা, অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার কোরবান আলী, নার্স মাহমুদুর রহমান, পিয়ন মো. মহিবুর রহমান, মকলিসুর রহমানসহ মোট সাতজনকে গুলি করে হত্যা করে। কয়েকদিনের কারফিউ শেষ হওয়ার পর ১৩ এপ্রিল তাঁর চাচা মৌলবি মঈনউদ্দিন হোসেন লাশ খুঁজে বের করেন। তারপর তিনি ডা. মোবারক আলী, ভায়রা সৈয়দ আবদুন নবী ও অন্যদের উপস্থিতিতে (পুরাতন) সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল অঙ্গনে ডা. শামসুদ্দীনসহ অন্য শহীদদের কবরস্থ করেন। সেই জায়গায় আজ গড়ে উঠেছে স্মৃতিসৌধ। পরবর্তীকালে তার পাশেই গড়ে উঠেছে শহীদ মিনার। শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন অগণিত মানুষ।

বাবার এই নির্মম হত্যাকাণ্ড আমাকে সশস্ত্র লড়াইয়ে জন্য আরো ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে। আমি তখন শপথ নেই পাকিস্তানিদের পরাজিত করে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই বাবার হত্যার প্রতিশোধ নিব। সেই সাথে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে আমার বাবার সপ্ন বাস্তবায়ন হবে। কারণ আমার বাবা প্রতিটি মুহূর্তে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন। এজন্য তিনি আমাদেরও স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখাতেন। তাই আমি আমার সশস্ত্র লড়াইয়ের স্মৃতি উচ্চারণ করার আগে বাবার সম্পর্কে দুই চারটি কথা উল্লেখ করতে চাই।

সিলেট মেডিকেল কলেজের সার্জারি বিভাগের প্রধান আমার বাবা ডা. শামসুদ্দীন আহমেদ ১৯৭১-এর মার্চের প্রথম দিকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠির মনোভাব স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তখনই সিলেট মেডিকেল কলেজে একটি Blood bank ও Emergency squad গঠন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ২৫ মার্চের গণহত্যা শুরু হওয়ার পর হাসপাতালে অনবরত আগত আহতদের চিকিৎসা দিতে তিনি অন্য চিকিৎসকদের নিয়ে সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকেন। তিনি পরিষ্কারভাবে ছাত্রদের বলেন, 'এই রকম হিংসাত্মক কার্যক্রম ও গণহত্যার একমাত্র সমাধান-বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং তার জন্য প্রয়োজন সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ।' ঐ সময়ে একদিন পাঞ্জাবি সৈন্যরা তাঁদের সঙ্গে চাকরিরত বাঙালি ডা. লে. মঈন ও ক্যাপ্টেন মাহবুবকে গুলি করে হাসপাতালে দিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন মাহবুব মৃত্যুবরণ করেন কিন্তু ডা. লে. মঈনকে বাবা অপারেশন করে সুস্থাবস্থায় হাসপাতাল থেকে সরিয়ে দেন। তখন ডা: মঈন তাকে সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন "আমি তাদের ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও আমাকে তারা গুলি করেছে। আপনাকে যে মারবে তারা নিঃসন্দেহে তবু তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন আমাকে এখানে থাকতে হবে। সিলেট শহরে আটকে পড়া মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক দেওয়ান ফরিদ গাজী এমপিসহ কয়েকজনকে অ্যাম্বুলেন্সের সাহায্যে দূরে সরিয়ে দেন। আমার মুক্তিযুদ্ধে যোগদানে বাবা শঙ্কিত না হয়ে আমার মাকে সান্ত্বনা দিয়ে দেশের জন্য দায়িত্ব পালনে তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। হানাদারদের গণহত্যায় আতঙ্কিত সিলেটে মেডিকেল কলেজের ছাত্র-শিক্ষক-ডাক্তাররা শহরতলিতে আশ্রয় নিতে শুরু করলে এক পর্যায়ে হাসপাতাল প্রায় ডাক্তারশূন্য হয়ে পড়ে। সমস্ত হাসপাতালে আহতদের সেবার জন্য ডা. শামসুদ্দীনের সাথে থেকে যান ডা. শ্যামল কান্তি লালা, অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার কোরবান আলী ও নার্স মাহমুদুর রহমানসহ আরো কয়েকজন। ডা. শামসুদ্দীন মহিলা নার্সদের হাসপাতাল ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। তাঁর নিজের মা ও সদ্য বিবাহিতা বড় মেয়ে ও তার জামাই, বড় ছেলে ও ছোট দুই মেয়েকে গ্রামে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ আমার মা সিলেট মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ হোসনে আরা আহমেদ স্বামীকে সাহায্য করার প্রয়াসে শহরে থেকে যান। মা হাসপাতালে রোগীদের খাবার সরবরাহ ও প্রয়োজনে নার্সের কাজ

করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ডা. শামসুদ্দীন অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও পরিচিত সবাইকে এই ভয়ঙ্কর ক্ষেত্র থেকে সরে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। তাঁকে তাঁর চাচা প্রধান শিক্ষক মৌলভি মঈনউদ্দিন হোসেন হাসপাতালে না যাওয়ার জন্য ধরে অনুরোধ করলে তিনি শান্ত হাসি হেসে বলেন, 'এখনই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। তাছাড়া জেনেভা কনভেনশনের শর্ত অনুযায়ী হাসপাতালে যুদ্ধ বা রক্তক্ষয় হওয়ার কথা নয়।'

এপ্রিলের একবারে প্রথম দিকে বাঙালি দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের অতর্কিত আক্রমণে পাক হানাদাররা সিলেট শহর ত্যাগ করে শালুটিকর বিমানবন্দরে চলে যায়। সেই সময় হাসপাতালে কিছু পাকিস্তানি সৈন্যও ভর্তি ছিল। সেসব আহত শত্রুসেনাকে আক্রমণ করা থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরত রাখেন ডা. শামসুদ্দীন।

এবার কিছু যুদ্ধের স্মৃতি উল্লেখ করতে চাই। সময়টা একাত্তরের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি। লেফটেন্যান্ট হেলাল মোরশেদের নেতৃত্বে ১৪ জন সৈনিক নিয়ে একটা স্পেশাল প্লাটুন গঠন করা হয়েছে। যার দায়িত্ব হবে অনবরত শত্রুর কাছাকাছি বিচরণ করা এবং সুযোগ বুঝে বারবার হামলা চালানো। সারাক্ষণ শত্রুকে ব্যস্ত রাখলে তারা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং রেগুলার বাহিনী নিয়ে ক্যাপ্টেন নাসিম সহজেই মুখোমুখি যুদ্ধে শত্রুকে ঘায়েল করতে পারবেন। আমরা ছাত্র তিন বন্ধু ছাড়া আর সবাই ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাছাই করা যোদ্ধা। ক্যাপ্টেন নাসিম মাধবপুরে ঘাঁটি করেছেন, শত্রুর মুখোমুখি। ঠিক হলো শাহবাজপুর ব্রিজে দখলকৃত পাকিস্তান বাহিনীর ঘাঁটির ওপর রেইড করতে হবে। স্পেশাল প্লাটুনের এবং তার সঙ্গে আমার প্রথম অপরেশন। স্থানীয় একটি ছেলে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের পথ চলতে হবে রাতের অন্ধকারে। কাকপক্ষিতেও যেন টের না পায়। শত্রুকে পাশ কাটিয়ে পেছনে গিয়ে অতর্কিতে চালাতে হবে আক্রমণ তারপর দ্রুত ফিরে আসতে হবে ঘাঁটিতে। সেদিন ছিল অমাবস্যা, নিকশ কালো রাত। বৃষ্টি থেমে গেছে ততক্ষণে, কিন্তু মেঠোপথ কাদায় একাকার। সমস্ত রাত আমাদের হাঁটতে হবে পথে। গ্রামের ভেতর দিয়ে, মানুষের উঠান পেরিয়ে, কখনো ঘরের কিনার ঘেঁষে সন্তর্পণে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছি আমরা। পরনে আমাদের লুঙ্গি ও শার্ট এবং খালি পা। পিঠের মাঝে আমার ঝুলানো চাইনিজ লাইট মেশিনগান ও দু'টি ভারি ম্যাগজিন, কোমরে আঁটা দু'টি গ্রেনেড। কথা বলা বা শব্দ করা বারণ, তাই একজনের পিঠে রাখা আছে আরেকজনের হাত নাহলে নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে দল থেকে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা । ঝানু সৈনিকদের হাঁটার সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে দু'বার আমি হারিয়ে গেলাম। বাধ্য হয়ে পাখির ডাকের সংকেত দিয়ে আবার মিলিত হলাম। ভোর হওয়ার আগেই আমরা শাহবাজপুর ব্রিজের কাছে চলে এসেছি। আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী একটা টিনের মসজিদের ভেতর সবাই আশ্রয় নিলাম। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষই পালিয়ে গেছে। প্রচুর বাড়িঘর ভস্মীভূত। বুঝলাম শূন্য গ্রামে এবং পরিত্যক্ত মসজিদই দিনের আলোতে গা-ঢাকা দেয়ার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে রাতের জন্য।

লে. মোর্শেদ দু'জন সাহসী হাবিলদারকে রেকি করতে পাঠালেন। তারা চাষীর ছদ্মবেশে দুটো গরুকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে ব্রিজের কাছে গিয়ে শত্রুর ঘাঁটির অবস্থা, মেশিনগানের পোস্ট এবং আমাদের পশ্চাদপসরণের সম্ভাব্য পথ নির্ধারণ করে এলো। সারারাত ভারী অস্ত্র কাঁধে নিয়ে পথ চলে ক্লান্ত আমি লাইট মেশিনগানটা মাথার নিচে দিয়ে শক্ত ধূলিময় মেঝেতে অনায়াসে ঘুমিয়ে পড়লাম। বিকেলে যখন ঘুম ভাঙলো তখন দেখলাম, কলা পাতার ওপর গরম ভাত আর ডাল বাড়া হয়েছে। সবার খাবার পর লে. মোর্শেদ আমাদের সবাইকে যার যার পজিশন বুঝিয়ে দিল। অন্ধকার নেমে আসছে, মোমবাতির ক্ষীণ আলোকেও ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা চলছে, নিচুগলায় ফিসফিস করে কথা বলছে কেউ কেউ। শক্ত করে ধরে থাকলাম আমার হাতের এলএমজিটাকে, এই মুহূর্তে আমার সবচেয়ে বিশ্বাসী বন্ধু। শীতল ইস্পাত থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে লাগল আমার রক্তে। বিস্কিটের টিনের মতো মসৃণ ম্যাগজিনের ওপর কয়েকবার হাত বুলালাম। ধীরে ধীরে মনে পড়তে লাগল বাবা, মা ভাই, বোন ও বন্ধুদের কথা। এবার দুর্বার সাহস ফিরে পেলাম।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া তখনো বাঙালি সৈনিকদের দখলে। দু'দিনের মধ্যেই হাতে হাতে সাব-মেশিনগান, রাইফেল, লাইট মেশিনগান আর গ্রেনেড ছোড়ার ট্রেনিং নিয়ে আমরা চারজন ছাত্র মিশে গেলাম ২য় ইস্ট বেঙ্গ রেজিমেন্টের সঙ্গে। ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডার মৃদুভাষী মেজর কাজী মোহাম্মদ সফিউল্লাহ ছোটখাটো বক্তৃতা দিলেন। 'অন্যায়ভাবে বাঙালিদের ওপর হত্যা, ধ্বংস ও বর্বরতা শুরু করেছে পাকিস্তানি সৈন্যরা। এখন জাতীয় কর্তব্য হবে দেশকে শত্রুমুক্ত করার জণ্য প্রাণপণে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া। কতদিন যুদ্ধ চলবে জানি না তবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জয় আমাদের হবেই।

কিছুদিন সালাম, আমি আর আনিস ভাইকে নবগঠিত পুলিশ, ইপিআর ও ছাত্র-জনতা তৈরি কোম্পানিগুলোর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্বভার দেয়া হলো। আমাদের আর্মি ক্যাডেট হিসেবে পরিচয় করানো হলো সাংগঠনিক সুবিধার্থে। তখন মুক্তিযুদ্ধের মাত্র প্রথম পর্যায় এবং ভারতের সঙ্গে আগের কোনো বোঝাপড়া না থাকায় ভারতের কাছ থেকে তখনই কোনো সামরিক সাহায্য পাওয়া গেল না। তাই বেঙ্গল রেজিমেন্ট স্বল্প লোকবল ও সীমিত অস্ত্র নিয়ে হানাদারদের মরিয়া হয়ে প্রতিহত করার চেষ্টা করছিল। আর আমরা ক্যাম্পে রণক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য সারাক্ষণ উদগ্রীব হয়ে থাকতাম। তখনই একদিন হঠাৎ করে হাজির হলো এক তরুণ সুদর্শন বাঙালি লেফটেন্যান্ট, তার এক হাত প্লাস্টারে ঢাকা, যুদ্ধের সময় শত্রুর গুলি লেগে ভেঙে গেছে। তাতে সে দমবার পাত্র নয়, আরেক হাত তো এখনো আছে। অনায়াসে ছুড়তে পারবে গ্রেনেড অথবা চালাতে পারবে সাব-মেশিনগান। মোর্শেদ জানাল, তার স্পেশাল প্লাটুনের পরিকল্পনা। পরিষ্কারভাবে বোঝালো এই ঝুঁকির মর্মার্থ। আত্মঘাতী অভিযান। আমি যেন এতদিন তারই জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তক্ষুণি কোম্পানির দায়িত্ব আমার সহকারী ওয়াকারের কাছে

দিয়ে মোর্শেদদের সঙ্গে চলে এলাম শত্রু হননের দুর্বার স্বপ্ন নিয়ে। একের পর এক দ্রুত ভাসতে থাকলো স্মৃতিগুলো।

হঠাৎ করে তন্দ্রা ভাঙলো, দেখি সবাই তৈরি হয়ে গেছে। এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে। এলএমজিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, গ্রেনেডগুলো চেক করে নিলাম। একটা প্রচণ্ড শক্তি অনুভব করলাম। আজ আমার প্রথম অপারেশন। চঞ্চলতা নেই ভেতরে, ভয় যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। অদ্ভুত, অব্যক্ত এক অনুভূতি। শত্রুর গুলি আজ আমাকে কিছুতেই স্পর্শ করতে পারবে না বলে এক দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছে। হঠাৎ করে আবার বাবা, মা, ভাই ও বোনদের কথা মনে পড়ল, বন্ধুদের মুখ ভেসে উঠল। কে, কোথায় কীভাবে আছে বা নেই কিছুই জানি না, কোনোদিন কাউকে দেখতে পাব কিনা তাও জানি না। চিন্তাটাকে দূর করার জন্য মনে করতে চাইলাম সামনের শত্রুকে আক্রমণ করার এই মূহূর্তে আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

নিঃশব্দে সবাই আবার গাঢ় অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লাম। কাদায় ভরে গেছে পথ। জল আর কাদায় অতি সন্তর্পণে হাঁটলেও প্যাচপ্যাচ শব্দ হতে লাগল। হঠাৎ নিস্তব্ধতা খানখান করে পাকিস্তানিরা আকাশে সার্চ পিস্তল ছুড়ল। আগের নির্দেশমতো নিঃশব্দে সবাই মাটিতে শুয়ে পড়লাম। সাদা আলো চারদিক আলোকিত হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। সব চুপচাপ মনে হলো। তারা টের পেল না আমাদের উপস্থিতি। সন্তর্পণে আবার রওনা হলাম শত্রুর ছাউনির দিকে খুব ধীরগতিতে। আরো কাছাকাছি আসার পর লে. মোর্শেদ দু'জন করে পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সবাইকে যার যার পজিশনে বসিয়ে দিল। আমি লাইট মেশিনগানটা নিয়ে সবার ডানদিকে বসলাম। হাত ধরে ইশারায় সে দেখলো আমার প্রথম টার্গেট, শত্রুর ভারী মেশিনগানের বাঙ্কার। নিকষ অন্ধকারে কিছুই পড়লো না চোখে। বাঙ্কার কত দূরে বোঝা গেল না। ট্রিগারে আঙুল রেখে শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম সংকেতের। দুই ইঞ্চি মর্চার দিয়ে মোর্শেদের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও শুরু করতে হবে ব্রাশ ফায়ার। ঘুটঘুটে অন্ধকারে সামনে কতক্ষণ তাকিয়ে আছি জানি না, হঠাৎ যেন অন্ধকার ভেদ করে আমার দৃষ্টিতে ধরা দিতে থাকলো কিছু রেখা। ব্রিজ, ছাউনি, শত্রুর ট্রাকগুলো সবকিছু যেন এখন ঠাহর করতে পারছি। হঠাৎ দেখি সামনে খুব কাছে দুটো ছায়া নড়ে উঠল। মনে হলো ছাউনি থেকে বাঙ্কারে আসছে দু'জন শত্রুসেনা। তক্ষুণি আক্রমণের সংকেত, মোর্শেদের মর্টার গর্জে গঠল, ছাউনিতে আঘাত করেছ শেলটি। আমার নিশানা ততক্ষণে দু'টি ছায়ার দিকে নিবদ্ধ, ট্রিগারে আঙুল চেপে ধরলাম সব শক্তি দিয়ে। শুরু হয়ে গেল অ্যাটাক। আচমকা পেছন থেকে এই আক্রমণে হৈচৈ পড়ে গেছে পাকিস্তানিদের মধ্যে।

অনবরত স্বয়ক্রিয় অস্ত্রের শব্দে কাঁপতে থাকলো গোটা এলাকা। মাঝে মাঝে মর্টারের শব্দ। শত্রুরা কিছুটা সামলে নিয়ে পাল্টা আক্রমণ করছে। হঠাৎ দেখি সামনের বাঙ্কার থেকে প্রচণ্ড শব্দে ভারী মেশিনগান গর্জে উঠলো, আমার মাথার

খুব কাছ দিয়ে ছুটতে লাগল গুলি। বুঝলাম বাঙ্কারে যারা ছিল তাদের এক্ষুণি স্তব্ধ করে দিতে হবে। গ্রেনেডের পিনটা খুলে ছুঁড়ে দিলাম আন্ধকারে মেশিনগানের ফুলকির দিকে লক্ষ্য করে, তারপর কানে হাত দিয়ে পজিশন নিলাম। গ্রেনেডের বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল শত্রুর বাঙ্কার। তথাপি আবার ব্রাশ ফায়ার করতে থাকলাম আরো কিছুক্ষণ সেদিকে। তারপর ছাউনির দিকে ঘুরিয়ে ধরলাম নিশানা। সেদিন থেকে বেশকিছু স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলি আসছিল। আবার গর্জে উঠলো আমার এলএমজি। অনবরত ঠিকরে বেরুচ্ছে আগুন, উত্তপ্ত হয়ে গেছে ইস্পাতের শরীর। ধারে কয়েকটি গ্রেনেড ফুটলো।

কতক্ষণ গুলি চলছে খেয়াল নেই, ধীরে ধীরে শত্রুর গোলাগুলি কমতে লাগলো। হঠাৎ দেখি ডানদিকে রাস্তায় হেডলাইট বন্ধ করে এগিয়ে আসছিল একটি গাড়ি, মুহূর্তে লাইটটা জ্বলে আবার নিভে গেল। ওইদিকে তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়ে নিলাম এলএমজির নলটি, আবারো কিছুক্ষণ চেপে ধরলাম ট্রিগার। গাড়ি থেকে কোনো গুলি এলো না মোর্শেদ তৎক্ষণাৎ সংকেত দিয়েছে ফিরে যাওয়ার। মেশিনগানটা হাতে নিয়ে ক্রলিং করে পিছু হাঁটতে থাকলাম।

একটা বাড়ির আড়ালে এসে উঠে দাঁড়ালাম সোজা হয়ে। দু'টো এলএমজি থেকে শত্রুরা তখনো চালিয়ে যেতে থাকলো গুলি। বেশ কয়েকবার বাঁশির মতো শব্দ করে খুব কাছ দিয়ে উড়ে গেল গুলি, ভ্রূক্ষেপ না করে চালাতে লাগলাম। মোর্শেদ দেখে নিল আমাদের কেউ হতাহত হয়নি। অজানা একটি আনন্দে ভরে উঠেছে বুক। আমরা লাইন করে এগিয়ে যেতে লাগলাম মাধবপুর আমাদের ঘাঁটির দিকে। (গ্রামের লোকজন পরদিন ২২ জন শত্রুসেনার লাশ ট্রাকে করে নিয়ে যেতে দেখেছে)

ধীরে ধীরে আলোকিত করে অন্ধকার কাটতে লাগল। এতদিনের একটা অব্যক্ত অসহায় যন্ত্রণা ক্রোধ ও ঘৃণার সংমিশ্রণে ভরা ভারি বুকটা একটু হালকা মনে হলো। বুক ভরে জোরে জোরে কয়েকবার নিঃশ্বাস নিলাম। বেশ হালকা লাগছে।

অনেকদিন পর ভোরের বাতাসের ঘ্রাণ নিলাম। সামনে তাকিয়ে দেখলাম চোখজুড়ানো সবুজ ক্ষেত আর এঁকেবেঁকে চলে গেছে মেঠোপথ, অনেক দূরে দিগন্তের দিকে। হঠাৎ মনে হলো কবে শেষ হবে এই পথ।

জাতির জনকের ঘোষণায় ও আহ্বানে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম

দেবেশ চন্দ্র সান্যাল

আমাদের এই বাংলাদেশের জন্মের পূর্বে এই ভূখণ্ডের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ধর্মীয় আদর্শের মিলে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের দুইটি অংশ ছিল। আমাদের ভূখণ্ডের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। আর আমাদের ভূখণ্ড থেকে ১০০০ কিলোমিটারের অধিক দূরে অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তান। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি বিহারী মুসলমানেরা এদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। তাদের কোনো ন্যায় নীতি ছিল না। তারা বিভিন্ন ভাবে আমাদের বঞ্চিত করত। ১৯৫২ তারা আমাদের মাতৃভাষা বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার পরিকল্পনা করেছিল। উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করা ঠেকাতে গিয়ে সালাম, বরকাত, জব্বার, সহ শতাধিক বাঙালি জীবন দিয়েছে। বাঙালিদের আন্দোলনের মুখে ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সাধারণ নির্বাচনে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর হতে ১৭ জানুয়ারি' পর্যন্ত অবাধ সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ভোটারগণ বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করেছিল। সেই সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের গণপরিষদের ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি এবং ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি প্রাাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ৩০০ টি আসনের ২৮৮টি আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী বিজয়ী হয়েছিল। তখন জাতীয় পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল মনোনীত সংরক্ষিত ১৩টি মহিলা আসন সহ ৩১৩টি। ইহার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ছিল ৭টি মহিলা আসনসহ ১৬৯টি। এই ১৬৯টির মধ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসনের অধিকারী ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পিপলস পার্টি ৪টি মহিলা আসহন সহ ৮৮টি আসনের অধিকারী ছিল। অন্যান্য সব দলমিলে পেয়েছিল বাকি ৫৮টি আসন। এই সাধারণ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলাম ও মুসলিম লীগ আওয়ামী লীগের বিপক্ষে নির্বাচন করেছিল। এদেশের মানুষ জানতে পেরেছিল, জামায়াত ইসলাম মাওলানা মওদুদীবাদী ও পশ্চিম পাকিস্তানের দালাল। সে কারণে জামায়াতে ইসলামীর একজন প্রার্থীও নির্বাচিত হতে পারেনি।

গণতন্ত্রের নিয়মানুসারে সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ট দল হওয়ায় তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের দায়িত্ব ছিল সরকার গঠনের জন্য আওয়ামী লীগকে আহ্বান জানানো। কিন্তু প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান বাঙালিদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা দিতে রাজি ছিলো না। এই কুখ্যাত বিহারী শাসক ষড়যন্ত্র শুরু করল। ১৭ জানুয়ারি পাখি শিকারের কথা বলে ইয়াহিয়া খান, জুলফিকার আলী ভুট্টো ও অন্যান্য জেনারেলদের নিয়ে লারকানায় ভুট্টোর বাসায় একত্রিত হয়ে বাঙালিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নীল নকশা তৈরি করেছিল। তাই ইয়াহিয়া খান তালবাহানা করে সময় কাটাতে লাগলো। আর বাঙালিদের হত্যা করে হলেও সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল বাতিলের ষড়যন্ত্র করতে থাকল।

৩ জানুয়ারি ১৯৭১ রবিবার রমনা রেসকোর্স ময়দানে জাতির জনকের ডান পার্শ্বে ১৫১ জন আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্য (এম.এন.এ) এবং বাম পার্শ্বে ২৬৮ জন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য (এম.পি.এ) কে গণ মহাসাগরের সম্মুখে দাড়করাইয়া নিজে শপথ বাক্য পাঠ করান। ১ মার্চ জাতির জনকের আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ২ মার্চ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সংসদের আওয়ামী লীগ হতে নির্বাচিত সকল সদস্য শেখ মুজিবকে যে কোন সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ গ্রহণ করার পূর্ণ অধিকার দেয়। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবণের পশ্চিম ফটকে প্রথম বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন ডাকসু নেতা আ.স.ম আব্দুর রব। ১১ জানুয়ারি ইয়াহিয়া ঢাকায় আগমণ করে জাতির জনকের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে। ১৩ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া মিথ্যা আশ্বাস দিলো ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হবে। ১৬ ফেব্রুয়ারি জাতির জনককে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির নোতা নির্বাচন করা হয়। ১ মার্চ সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান দুপুর ১২ টায় জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে ৩ মার্চে আহুত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বে-আইনিভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করল। জাতীয় অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা শুনে জাতির জনক ৩ মার্চ কে জাতীয় শোক দিবস পালনের ঘোষণা দিলেন। বঙ্গবন্ধু ঢাকা এবং সারাদেশে ৫দিনের জন্য হরতাল ও অনির্দিষ্ট কালের জন্য অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। তার মুখের একটি কথায় সারা পূর্ব পাকিস্তান অচল হয়ে গেল। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য পাক হানাদারেরা কারফিউ দিল। ছাত্র-জনতা সেই কারফিউ ভেঙ্গে পথে নেমে এল। চারদিকে মিছিল শ্লোগান আর বিক্ষোভ। সেনা বাহিনীর গুলিতে মানুষ মারা যাচ্ছে। তারপরেও কেউ থেমে রইলো না। দলে দলে সবাই পথে নেমে এল। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের জনসভায় জাতীয় সংগীত হিসাবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আমার সোনার বাংলা" গানটি নির্বাচিত করা হলো। কেন্দ্রের সঙ্গে মিল রেখে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদে উদ্দ্যোগে শাহজাদপুরেরও খণ্ড খণ্ড মিছিল হল। বিকাল ৩টায় রবীন্দ্র কাচারী বাড়ি সংলগ্ন ঐতিহাসিক বকুল তলায় এম.পি.এ আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে সভা হয়। ৭

মার্চ তৎকালীন ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) রেসকোর্সের প্রান্তদেশে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯ মিনিট বাঙালিকে অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত করতে ঐতিহাসিক ভাষণে ঘোষণা করলেন, '...তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে,...আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি...আমরা পানিতে মারবো। ...এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' জাতির জনক ৭ মার্চ সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষনা দিলে কুর্মিটোলায় অবস্থিত সুসজ্জিত বিমান বাহিনী মুহূর্তেই তাহাকেসহ লক্ষ লক্ষ জনতাকে বোমার আঘাতে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার প্রস্তুতি ছিল। উপস্থিত মানুষের ঢল থেকে বারবার উচ্চারিত হলো জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, "আমার নেতা তোমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব"। ৯ মার্চ ইয়াহিয়া খান জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনর এবং সামরিক প্রশাসক করে পাঠালো। এইদিন রবীন্দ্র কাচারী বাড়ির ঐতিহাসিক বকুল তলায় জাতীয় পরিষদ সদস্য, থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সংগ্রাম পরিষদেও আহ্বায়ক সৈয়দ হোসেন মনছুরের সভাপতিত্বে সভা হয়। সভায় শাহিদুজ্জামান হেলাল, কোরবান আলী, বাকী মির্জা, আব্দুল গফুর সরবত, বিনোদ বিহারী জেয়ার্দ্দার প্রমুখদের নিয়ে বিভিন্ন সাব কমিটি করা হয়। ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান নিজে ঢাকায় এসে ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ঢাকার কথা বলে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রহসনমূলক আলোচনা করতে থাকল। এর মাঝে প্রত্যেকদিন বিমানে করে ঢাকায় সৈন্য আনতে থাকে এবং যুদ্ধ জাহাজে করে অস্ত্র চট্টগ্রামের পতেঙ্গা বন্দরে নঙ্গর করে। ২১ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানে বিজয়ী পিপল্‌স পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো আমাদের দেশে এসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে যোগ দিল। ২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস। পাকিস্তান দিবসে জাতির জনকের ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িতে " আমার সোনার বাংলা" গানের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তোলা হল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ বিকেল পৌণে ৬টায় আলোচনা শেষ না করেই ভুট্টোকে রেখেই বেলুচিস্থানের কসাই নামে পরিচিত পূর্ব পাকিস্তানের নব নিযুক্ত গর্ভণর জেনারেল টিক্কা খানকে বাঙলি নিধনের নির্দেশ দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেলো। টিক্কা খান ২৫ মার্চ মধ্যরাতে অপরেশণ সার্চলাইট নাম দিয়ে বাঙালি হত্যা শুরু করল। পাকহানাদারেরা নির্বিচারে বাঙালি হত্যা শুরু করে বাঙালি জাতির উপর মহান মুক্তিযুদ্ধ চাপিয়ে দিল। জাতির জনক ইতিহাসের জঘন্যতম বাঙালি নিধন সার্চলাইটের ভয়াবহতা দেখে পাকিস্তানিদের হানাদার আখ্যা দিয়ে রাত ১২.২০ মিঃ এ বাসায় উপস্থিত সকলের সম্মুখে আনুষ্ঠানিক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও শেষ বার্তা", ১২টায় বর্বর পাকবাহিনী ঢাকা পিলখানা এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইনে অতর্কিতে হামলা চালায়। লক্ষ লক্ষ বাঙালি শহীদ হয়েছে। যুদ্ধ চলছে। আমি শেখ মুজিবুর রহমান এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের

স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। "এই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা যে যেখানে আছেন এবং আপনাদের যার কাছে যা আছে তাই নিয়েই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। যতদিন পর্যন্ত শেষ পাকিস্তানি সৈন্য বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত না হয় এবং যতদিন পর্যন্ত চুড়ান্ত বিজয় না আসে ততদিন আপনারা যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন" জয় বাংলা রেকর্ড করালেন। তিনি প্রথম চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এম.এ হান্নানের ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব জহুর আহাম্মেদ চৌধুরীকে টেলিফোনে স্বাধীনতা ঘোষণার কথা বলেন। তারপর নিজে বলে দিয়ে বাসায় উপস্থিত আওয়ামী লীগ কর্মীদের দিয়ে একটি টেলিগ্রাম বার্তা লেখালেন। ই.পি.আর হেডকোয়ার্টার এর ওয়ারলেস অপারেটরকে ফোন করে টেলিগ্রাম বার্তা লিখে নিতে বললেন। তারপর ২জন আওয়ামী লীগ কর্মীর হাতে দিয়ে ১ জনকে পিলখানাস্থ ই.পি.আর হেডকোয়ার্টারের ওয়ারলেস অপারেটরের কাছে এবং অন্যজনকে গুলিস্থানস্থ টি.এন.টি অফিসে পাঠালেন। জাতির জনকের স্বাধীনতার বার্তাটি ওয়ারলেসের মাধ্যমে দেশের সর্বত্র পাঠানো হল। পরে জানা গেছে শুধু মাত্র এই টেলিগ্রাম বার্তাটি পাঠাতে গিয়েই ওয়ারলেস অপারেটর শহীদ হন। ই.পি.আর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমেও স্বাধীনতা ঘোষণার কথা ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম জানানো হলো।

২৫ শে মার্চ রাত্রি ১টায় সিরাজগঞ্জের এস.ডি.ও এ.কে সামস উদ্দিন জাতির জনকের স্বাধীনতার ঘোষণার বার্তা পেয়ে ট্রেজারির সকল অস্ত্র আব্দুল লতিফ মির্জা ও অন্যান্য স্বাধীনতাকামীদের হাতে দিয়ে দেন। ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত্রি ২টায় (২৬শে মার্চের প্রারম্ভে) শাহজাদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চিত্তরঞ্জন বাবু এম.পি.এ আব্দুর রহমানের বাসায় এসে জাতির জনক কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার টেলিগ্রামের কপি সবাইকে দেখালেন। এম.পি.এ জনাব মোঃ আব্দুর রহমান ইংরেজীতে পাওয়া ঐ টেলিগ্রামে বঙ্গানুবাদ করে লিফলেট তৈরি করে শাহজাদপুরের সর্বত্র বিলির ব্যবস্থা করলেন। মানুষের মুখে মুখে জাতির জনকের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণার ও ২৬ শে মার্চের শেষ বার্তার কথা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়লো। জাতির জনকের স্বাধীনতা ঘোষণার সংবাদ পেয়ে ইয়াহিয়া খান করাচী বেতার কেন্দ্র থেকে এক বেতার ভাষণে শেখ মুজিবকে দেশদ্রোহী আখ্যায়িত করে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এদিকে পাকিস্তানি মেজর জাফরের নেতৃত্বে এক প্লাটুন পাকহানাদার কমান্ডো বাহিনী জাতির জনকের ধানমন্ডিস্থ ৩২ নাম্বারের বাড়ি ঘিরে ফেলে মাইক দিয়ে বার বার জাতির জনককে স্যারেন্ডার করার অনুরোধ করছিল। স্যারেন্ডার না করলে কামান দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে বাড়ি-ঘর উড়িয়ে দেয়া হবে বলে হুমকিও দিচ্ছিল। তখনও জাতির জনকের বাড়িতে আওয়ামী লীগের বেশকিছু নেতাকর্মী ছিল। ধরা না দিলে পাকহানাদারেরা বাড়ি উড়িয়ে দিয়ে বাড়ির সবাইকে হত্যা করবে বিবেচনায় নিরুপায় হয়ে সবাইকে

রক্ষার জন্য নিজে এগিয়ে গিয়ে বীরের মত রাত ১.৩০ মিনিটে পাকহানাদারদের হাতে গ্রেফতার হলেন।

পাকহানাদারেরা জাতির জনককে বন্দী করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায়। জাতির জনককে যাতে হত্যা করতে না পারে সেজন্য কৌশল হিসেবে ভারতীয় বেতার কেন্দ্র আকাশবাণী হতে প্রচার করা হলো জাতির জনককে হত্যা করা হযেছে। ভারতীয় বেতারে প্রচারিত সংবাদের পাল্টা সংবাদ হিসাবে রেডিও পাকিস্তান থেকে প্রচার করা হলো শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয় নাই বন্দী করা হয়েছে এবং নিরাপদ আবস্থায় পাকিস্তানি আর্মিদের নিরাপদ হেফাজতে আছে। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে এমন ঘোষণাটি চাচ্ছিল আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহযোগিতাকারী ভারত সরকার। পাকিস্তানি আর্মিদের নিরাপদ হেফাজতে আছে ঘোষণার পর আর পাকিস্তানি হানাদারেরা বাংলার অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করতে পারবে না।

২৬ মার্চ দুপুরে চট্টগ্রামের আগ্রাবা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম.এ হান্নান। তাকে সহযোগিতা করেন প্রকৌশলী আমিনুর রহমান ও রাখাল বণিক। আগ্রাবাদে বাঙালি নিয়ন্ত্রিত বেতার কেন্দ্রটি নিরাপদ নয় ভোবে ২৬ মার্চ বিকালে আওয়ামী লীগ নেতা বেলাল মোহাম্মদ, রেডিও ইঞ্জিনিয়ার নাসিরউদ্দিন ও অন্যান্যদের দিয়ে বেতার ট্রান্সমিটারটি কালুর ঘাটে স্থানান্তর করা হয়। বেতার কেন্দ্রটি নামকরণ করা হয় বিপ্লবী বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র। সন্ধা ৭.৩০ মিনিটে ২য় অধিবেশন শুরু হয়। ২য় অধিবেশনে এম.এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা দ্বিতীয় বার পাঠ করেন। অধ্যক্ষ আবুল কাশেম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা্ পাঠ করে শোনান। তারপর বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রটি ডঃ আনোয়ার আলীর স্ত্রীর সাহায্যে বঙ্গানুবাদ করে তা বেতারে প্রচার করা হয়।

চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও বাঙালি সৈনিকরা ভাবলেন আর্মির কোন উর্দ্ধতন অফিসার দিয়ে জাতির জনকের স্বাধীনতা ঘোষণাটি পাঠ করানো হলে বাঙালিরা আরো বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে ও মুক্তিযুদ্ধ বেগবান হবে। তখন জিয়াউর রহমান অষ্টম ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর ও বাঙালি সকল আর্মির সিনিয়র ছিলেন। ২৬ মার্চ বিকেলে মেজর জিয়াউর রহমান বিহারী কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল জানজুয়ার নির্দেশে সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র নামানোর দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন। বেগম খালেদা জিয়া ও তার দুই পুত্র ক্যান্টনমেন্টে পাক আর্মিদের নিয়ন্ত্রনে ছিল। স্ত্রী এবং সন্তানদের হত্যাকরবে ভয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ অবলম্বনের সাহস পাচ্ছিলেন না। মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরীর কাছ থেকে জানতে পারলেন ই.পি.আর এর চট্টগ্রাম সেক্টরের এ্যাডজুটেন্ট ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার বার্তা পেয়ে ২৫ মার্চ রাত্র ১টায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে

পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছেন। জয়দেবপুরসহ সারদেশের সর্বত্র ই.পি.আর ও আর্মিরা বিদ্রোহ করে পাকহানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে। মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরীর কাছ থেকে বার্তা পেয়ে তদানীন্তন মেজর জিয়াউর রহমান সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র নামানোর দায়িত্ব পালনে যাওয়ার পথে বিদ্রোহ করেন। তিনি বাঙালি সৈনিক পাঠিয়ে মেজর মির শওকত আলী, ক্যাপ্টেন শমসের মবিন, ক্যাপ্টেন অলি আহম্মদ সহ বাঙালি অফিসারদের বার্তা পাঠান যে তিনি বিদ্রোহ করেছেন তার নিয়ন্ত্রনাধীন ৮ম বেটালিয়ান বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ শুরু করেছে। তিনি ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় সামরিক বাহিনী নিয়ে পটিয়ার করাইল ডাঙ্গা থেকে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে আসেন। পটিয়া থেকে মেজর জিয়াকে নিয়ে আসেন বেলাল মোহাম্মদ, আব্দুল্লাহ আল-ফারুক, আবুল কাসেম সন্দিপ ও অন্যান্যারা। ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় তিনি জ্যেষ্ঠ সামরিক অফিসার হিসাবে ১০ কিঃওয়াট মধ্যম তরঙ্গ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কালুরঘাট থেকে জাতির জনকের পক্ষে ঘোষণাটি পাঠ করলেন। তিনি পাঠ করেন "I Major Zia, Provisional Commander in chief of Bangladesh Liberation Army here by proclaim on behalf of our great leader the suprem commender of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman the independence of Bangladesh. I also declare, we have already framed of sovereign, legal Governmennt under Sheikh Mujibur Rahman which pledges to function as per law and the constitution." ২৮ মার্চ আবার জিয়াউর রহমান পঠিত বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত লিখিত স্বাধীনতার ভাষণটি পাঠ করেন সামরিক বাহিনীর ক্যাপ্টেন শমসের মবিন চৌধুরী। ২৯ তারিখেও একই ভাষণ পাঠ করেন সামরিক বাহিনির সুবেদ আলী ভুঁইয়া। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ক্ষণ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পাক হানাদার হিসাবে আখ্যায়িত হলো।

৩০ এপ্রিল' ৭১ বাঘাবাড়ি ঘাটের দক্ষিণ পাড় এসে পাকহানাদার বাহিনী এক বিকট শব্দের শক্তিশালী মর্টারসেল ছাড়লো। এই মর্টার সেলের ভয়ঙ্কর আওয়াজে গোটা এলাকার মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পরে। মর্টার সেলের গুলিটি বেলকুচি থানার বালাবাড়ি গ্রামের শ্রী কমলেশ চৌধুরীর বাড়িতে গিয়ে পড়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানিরা এদেশের বাঙালি হত্যা, লুণ্ঠন ও বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন চালানোর জন্য এদেশীয় দোসর খুঁজতে থাকল। জামায়াতে ইসলামী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান শাখার আমীর গোলাম আযম লাহোরে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে কাজ করার অঙ্গীকার করে। তার অঙ্গীকার অনুসারে জামায়েতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামী দল পশ্চিম পাকিস্তানিদের পক্ষ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ও আবস্থান নিয়েছিলো। জামায়াতে ইসলামী ও তাদের তৎকালীন ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘ সেনাবাহিনীর পক্ষে যোগ দিয়েছিল। রাজাকার, আলবদর, আল শামস ও শান্তি কমিটি গঠন করেছিল। শাহজাদপুর থানার কৈজুরী গ্রামের মোঃ কোরবান আলী বার.এট.ল. জামায়াতে ইসলামী

মনোনীত প্রর্থী হিসাবে আওয়ামী লীগ প্রার্থী সৈয়দ হোসেন মনসুর এর বিরুদ্ধে এম.এন.এ পদে এবং মাওঃ সাইফুদ্দিন এহিয়া খান মজলিস মুসলীম লীগ প্রার্থী হিসাবে এম.পি.এ পদে আওয়ামী লীগ প্রার্থী মোঃ আব্দুর রহমানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছিল। ব্যারিস্টার কোরবান আলী কৈজুরী ও পোরজনা রাজাকার ক্যাম্পের প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ন্ত্রক ছিল। মাওঃ সাইফুদ্দিন এহিয়া খান মজলিস শাহজাদপুর থানা শান্তি কমিটির সভাপতি। মোঃ আতাউর রহমান আতা ছিল পোরজনা রাজাকার ক্যাম্পের কমান্ডার।

১৯৭১ সালের ১ সেপ্টেম্বর রাত ৩টায় কৈজুরী রাজাকার ক্যাম্পের নিয়ন্ত্রক জামায়াত নেতা ব্যাস্টার কোরবান আলীর ভাই ছগির উদ্দিন ও পোরজনা রাজাকার ক্যাম্পের রাজাকার কমান্ডার মোঃ আতাউর রহমান আতার নেতৃত্বে পুঠিয়া গ্রামের অধিবাসী খুকনী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও পোরজনা উচ্চ বিদ্যালয়ের পদত্যাগী প্রধান শিক্ষক হিতেন্দ্র নাথ চন্দ কে ধরে নিয়ে বাড়ির সামান্য দূরে গুলি করে হত্যা করে। আমার মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পরায় শাহজাদপুর রাজাকার ক্যাম্পের জয়নাল রাজাকার ও পোরজানা রাজাকার ক্যাম্পের রাজাকার কমান্ডার মোঃ আতাউর রহমান আতা বাড়িতে এসে আমার বাবাকে আলটিমেটাম দিয়ে যায়। ৭ দিনের মধ্যে আমাকে হাজির করে না দিতে পারলে বাড়ির সবাইকে গুলি করে হত্যা করা হবে ও বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হবে। দিশেহারা হয়ে আমার বাবা ও দাদারা আমাদের বসতবাড়ি গ্রামের মোঃ হোসেন আলীর কাছে নামমাত্র মূল্যে বিক্রিয় করে ভারতে চলে যায়। জামায়াতে ইসলামের নির্দেশে আমার গ্রামের জামে মসজিদের মাইক দিয়ে ঘোষণা করেছিল, 'ভারত পাকিস্তানকে ভাঙার ষড়যন্ত্র করে এদেশের হিন্দুদের দিয়ে গোলমাল বাঁধিয়েছে। হিন্দুরা ইসলামের দুশমন, এদেশের শত্রু, ভারতের অনুচর তাদের বাড়ি-ঘর, মালামাল সবাই লুট করে নিয়ে তাদেরকে নির্যাতন করে হত্যা করুন।' জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামী দলগুলোর নির্দেশ পেয়ে আমাদের গ্রামের মাহতাব আলী সরকার ও অন্যান্যরা শাহজাদপুরের প্রাণ গোপাল সাহা, গৌর কুন্ডু ও অন্যান্য হিন্দু দোকানের সকল মালামাল প্রকাশ্যে দিবালোকে লুট করে আনলো।

প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান আমাদের গ্রামে আসলেন। ন্যাশনাল ব্যাংক আব পাকিস্তানের ব্যবস্থাপক শাহজাদপুর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তাহাজ্জত হোসেনসহ উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরা আমাদের গ্রামের সহ অধ্যক্ষ নুরুল ইসলামের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। ২৫ মার্চ, ১৯৭১ এ ঢাকায় জঘন্যতম নারকীয় ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শীরা ঢাকা থেকে গ্রামে ফিরে এলো। তাদের মুখে থেকে নারকীয় হত্যার কথা শুনে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলাম। ১০ এপ্রিল ১৯৭১ স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সাংবিধানিক ঘোসণা পত্র জারি করে সরকার গঠন করা হয়। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ মেহেরপুর জেলার সিমান্তবর্তী অঞ্চল ভবের পাড়ার বৈদ্যনাথ তলার (মুজিবনগর)

আম্র কাননে ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনের বিজয়ী আওয়ামী লীগ এম.এন.এ/এম.পি.এ দের গঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে। তখন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানিদের হাতে বন্দী হয়ে পাকিস্তানের কারাগারে থাকায় জাতির জনককে রাষ্ট্রপতি করে সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতিকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি করা হয়। জনাব তাজ উদ্দিন আহম্মদ প্রধানমন্ত্রী এবং কর্নেল (অবঃ) আব্দুর রব এম.এন.এ চীফ অব ষ্টাফ ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে খন্দকার ডেপুটি চীফ অব স্টাফ নিযুক্ত হন। সিরাজগঞ্জ মহকুমা প্রশাসক এ.কে শামস্ উদ্দিন, আব্দুল লতিফ মির্জা ও অন্যান্যদের কাশিনাথপুরের ডাব বাগান, বাঘাবাড়িঘাট, নগরবাড়ী ও ঘাটিনা ব্রীজ প্রতিরোধ যুদ্ধে সহযোগিতা করি। আমি তখন রতনকান্দি আদর্শ নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীর ছাত্র। বাংলাদেশ তখন পাকহানাদার ও তাদের এদেশিয় দোসর জামায়াতে ইসলাম ও মুসলিমলীগসহ ও অন্যান্য ইসলামী সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের দখলে চলে গেল। পাকহানাদারেরা হিন্দু ও আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের বাড়ি-ঘর পোড়ানো, লুটতরাজ, হত্যা ও নির্যাতনসহ জঘন্যতম মানবতা বিরোধী কাজ শুরু করল। যে কোন পুরুষকে ধরলে পাকহানাদারেরা বলতো কাপড়া তোল, চার কালেমা বাতাও। মালাউন কাহা হয়ে, মুক্তি কাহা হায়। ১৫ আগস্ট ১৯৭১ প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এ্যাডভোকেট আবদুর রহমানের সঙ্গে ভারতে গেলাম। বয়সের স্বল্পতার কারণে মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ কর্তৃপক্ষ আমাকে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়াতে রাজি হলেন না। উপায় না পেয়ে মুক্তিযুদ্ধ প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ছেড়ে আমি আমার পিসেমহাশয় বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের বাড়ি মালদা জেলার ওল্ড মালদাতে চলে গেলাম। ভারতের সরকার তখন বাংলাদেশী শরনার্থীদের জন্য বাস ট্রেন ফ্রি করে দিয়েছে। বাসের কন্ট্রাক্টর বা ট্রেনের টিটি টিকেট চাইতে এলে জয় বাংলা বললেই আর টিকেট বা ভাড়া চাইতো না। পিসে মহাশয়ের বাড়িতে তিনদিন থাকলাম। ১৯৭১ সালের ২৯ জুলাই প্রথম বিমান চাঁদ মল্লিকের ডিজাইনে বাংলাদেশ নামে ৮টি ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ নিতে এসে আত্মীয় বাড়িতে বা শরণার্থী ক্যাম্পে বসে বসে খাওয়াতে মন সায় দিল না। সিদ্ধান্ত নিলাম বাড়িতে ফিরে এসে প্রশিক্ষণহীন অবস্থাতেই অন্যান্যদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবো। কামারপাড়া ভারত সিমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের জয়পুরহাট জেলার মধ্যে প্রবেশ করলাম। আমার পরনে ছিল পিসেমহাশয়ের দেয়া ভারতীয় কাপড়ের ইংলিশ প্যান্ট ও শার্ট। এক বৃদ্ধা মহিলা আমাকে সিমান্ত পারি দেওয়া দেখে এগিয়ে এলেন। বিভিন্ন কথা বার্তা শুনলেন। তারপর বললেন "বাবা, তুমি ভারতে ফিরে যাও, ঐ সামনে বাংলাদেশের পাচবিবি থানার পাকহানাদার মিলিটারী ও রাজাকার ক্যাম্প দেখা যাচ্ছে। তোমার পরনে এই ভারতীয় কাপড় দেখলেই ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে।" মা বয়সী মহিলার কথায় দিশেহারা হয়ে বসে বসে কিছুক্ষণ কাঁদলাম। আর কোন পথ না থাকায় পুনরায় ভারত সিমান্ত পার হয়ে কামারপাড়া মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ শিবিরে এলাম।

মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ যুব শিবিরে এসে শাহজাদপুরের এরশাদ ও রাজ্জাক ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। এরশাদ ও রাজ্জাক ভাই আমাকে নিয়ে কামারপাড়া মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক আবু সাইদের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে বিশেষ বিবেচনায় মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করলেন। আমাদের প্রথমে প্রশিক্ষণ হলো কামারপাড়া রিক্রুটিং ক্যাম্পে। প্রশিক্ষণে ফলোইং করিয়ে প্রথমেই জাতীয় সঙ্গীত "আমার সোনার বাংলা....." গাওয়া হতো। তারপর বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের রণ সঙ্গীত "চল-চল-চল....."গাওয়া হতো। তারাপর জয় বাংলা, জয়বঙ্গবন্ধু বীরবাঙালি অস্ত্রধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর, গ্রামে গ্রামে দুর্গ গড়, শেখ মুজিবের অস্ত্র ধর প্রভৃতি শ্লোগান দিয়ে সবাইকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করা হতো। আমাদেরকে কামার পাড়া রিক্রুটিং ক্যাম্প থেকে মালঞ্চও কুড়মাইল স্থানান্তর করা হলো। তারপর পতিরাম যুব ট্রেনিং শিবির এ নিয়ে ট্রেনিং দেওয়ানো হলো। হায়ার ট্রেনিং হলো শিলিগুঁড়ি জেলার পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত পানিঘাটা নামক ক্যাম্পে। এই ক্যাম্পের থ্রি নট থ্রি রাইফেল, গ্রেনেড, এল.এম.জি, এস.এম.জি, এস.এল.আর, স্টেনগান ও অন্যান্য আগ্নেয় অস্ত্রের প্রশিক্ষণ হলো। প্রশিক্ষক শিখসেনা ডি.এস.ভিলন জানালেন আমার এফ.এফ নং ৪৭৪২।

পানিঘাটা ট্রেনিং সেন্টারে জানলাম আমাদের পূর্ববর্তী মুক্তিযোদ্ধাদের স্লেটে এফ.এফ নং লিখে বুকের উপর রেখে ছবি তোলা হয়েছে। ক্রমাগত কয়েকদিন বৃষ্টি হওয়ার কারণে আমাদের ব্যাচের এফ.এফ নং লিখে ছবি তোলা হল না। স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল আদর্শ ছিল ১. ধর্ম নিরপেক্ষতা ২. বাঙালি জাতীয়তাবাদ। ৩. গণতন্ত্র এবং ৪. সমাজতন্ত্র। ১৯৭২ এর সংবিধানের ৮ (১) ধারায় এই চারটি আদর্শ সংবিধানের স্তম্ভ হিসাবে রচিত হয়।

প্রশিক্ষণ শেষে ৭ নং সেক্টরের অস্ত্র সরবরাহ প্রধান অফিস তরঙ্গপুর এনে আমাদের একটি গ্রুপ করা হলো। আমাদেরকে ৭নং সেক্টর এলাকায় কাজ করার নির্দেশ দিলেন। রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া এবং দিনাজপুর জেলার কিছু অংশ ছিল ৭নং সেক্টর এলাকা। তখন ৭নং সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন মেজর কাজী সুরুজ্জামান এবং সাব সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর গিয়াস উদ্দিন আহম্মেদ চৌধুরী। আমাদের গ্রুপের সদস্য সংখ্যা ২১ জন। আমরা তরঙ্গপুর থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে ট্রেন পথে আসাম প্রদেশের ধুপরি ও গৌহাটি হয়ে মানকার চর ভারতীয় সিমান্তে এলাম। মানকার চর রাত থেকে পরদিন বাংলাদেশের মুক্তঞ্জাল রংপুর জেলার রৌমারী এলাম। রৌমারী থোকে সিরাজগঞ্জের এম.এন.এ মোতাহার হোসেন তালুকদার, শাহজাদপুর কলেজের অধ্যাপক সরফুদ্দিন আউয়াল আমাদেরকে সিরাজগঞ্জের চরে আসার নৌকা রিজার্ভ করে দিলেন।

আমরা নৌকা যোগে বাহাদুরাবাদ ঘাটের সম্মুখ দিয়ে বেলকুচির এম.এন.এ আব্দুল মোমিন তালুকদারের গ্রামের বাড়ির সম্মুখে যমুনার চরে পৌঁছালাম। যমুনা নদীর পাড় ঘেষা জঙ্গলে আজ এখানে কাল সেখানে ও সিংগুলির চর এ নৌকায়

থাকি। প্রতিদিন সকালে গ্রুপ করে করে রেকি করার জন্য বের হই। আর মোমিন তালুকদার এর ভাই রশিদ তালুকদারের প্রস্তুত রাখা খাদ্য নিয়ে শেল্টারে ফিরি। আজ এ শ্লেটার, কাল সে শ্লেটারে থেকে বিভিন্ন থানা ও রাজাকার ক্যাম্পে গেরিলা পদ্ধতিতে আক্রমন করলাম। 'জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' ছিল রণাঙ্গণে প্রধান সাহসী হওয়া ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হওয়ার ধ্বনি।

বেলকুচি থানা আক্রমণ যুদ্ধ, মাহমুদা কোলা গ্রামের মোঃ আব্দুল হামিদের রেকিতে ঝাঐল ব্রীজের রাজাকারদের ধরে আনার কালিয়া হরিপুর যুদ্ধ, কল্যাণপুর যুদ্ধ ও ২৫ নভেম্বর শাহজাদপুরের ধীতপুর যুদ্ধসহ মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিজয়ী হয়ে ৯ ডিসেম্বর ভোরে রণাঙ্গনের সাথীদের নিয়ে বিজয়ীর বেশে আকাশ মুখী থ্রি নট থ্রি রাইফেলের গুলি করতে করতে ও দুইজনের হাতে জাতীয় পতাকা উড়াতে উড়াতে নিজ গ্রামে চলে এলাম। আমার গ্রামে ফেরার সংবাদ পেয়ে একনজর দেখার জন্য দলে দলে লোকজন ও স্কুল সাথীরা এল। তখনও দেশ স্বাধীন হয় নাই। বাঘাবাড়ীঘাট পাক হানাদারদের দখলে্ রতনকান্দি আদর্শ নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে প্রধান শিক্ষক দেবেন্দ্র নাথ সান্যাল, সহকারী শিক্ষক মাওঃ রফিকুল ইসলাম, মোঃ শাহআলম ও অন্যান্য শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে দৃপ্তকণ্ঠে শাহজাদপুর পূর্বাঞ্চলকে হানাদার মুক্তঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করলাম।

৯ আগস্ট ১৯৭১ পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের হেড কোয়ার্টার থেকে একপ্রেস বিজ্ঞপ্তি তে জানানো হয়, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং অন্যান্য অপরাধের জন্যও নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান এর বিশেষ সামরিক আদালতে বিচার করা হবে। ১১ আগস্ট থেকে প্রহসন মূলক ট্রায়াল শুরু হয়। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৩ তারিখ বেলা ৪টায় ডাঃ মালিক পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনর হিসাবে শপথ গ্রহণ করে। ২৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের সমস্যা, ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী ৯১ লক্ষ বাংলাদেশী শরনার্থীর সমস্যা, করাচীর মিয়াওয়ালি ইয়াহিয়ার কারগারে বন্দী বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসন ও অন্যান্য গুরুত্ব পূর্ণ আলোচনার জন্য ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি মস্কো সফর করেন এবং ২০ বছর মেয়াদি ভারত সোভিয়েত মৈত্রি চুক্তি করেন। ৪ মাস প্রহসন মূলক বিচার কার্য চলার পর পাকিস্তানের সামরিক আদালত ৩ ডিসেম্বর' ৭১ বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়।

পাকিস্তানের সামরিক আদালতে এই রায় ঘোষণার দিনই ভুটান প্রথম বাংলাদেশ কে স্বীকৃতি দেয়। ৪ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে যৌথ বাহিনী গঠন করে পাক-বাহিনীকে পরাজিত করে জাতির জনকের মৃত্যুদন্ডের আদেশ কার্যকরী করার পূর্বেই বাংলাদেশ স্বাধীন করার অঙ্গীকার নিয়ে ভারতীয় সেনা বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লেঃ জেঃ জগজিৎ সিং অরোরা মুক্তি বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে দূর্বার বেগে পাকহানাদার বাহিনীর উপর ঝাপিয়ে পড়েন। ৬

ডিসেম্বর, ৭১ সোমবার বেলা ১০টায় ভারতীয় লোকসভা ও রাজ্যসভা উভয় সংসদের সম্মাতিতে তুমুল করতালির মধ্যে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের কথা ঘোষণা করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের মাত্র ২দিনে পূর্বে ১৪ ডিসেম্বর,৭১ আলবদর, আলসামস্ বাহিনীর সহযোগিতায় জাতিকে মেধাশূন্য করতে পাকিস্তানি হানাদারেরা বাঙালি বুদ্ধিজীবিদের বাড়ি বাড়ি থেকে ৩০ জন বাঙালি বুদ্ধিজীবিকে ধরে নিয়ে রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে নৃশংস ভাবে হত্যা করে। কোন ভাবেই আর বাঁচর পথ না পেয়ে স্বাধীনতা বিরোধী পাকি দোসর অধ্যাপক গোলাম আযম সহ অনেকেই পাকিস্তানে ও অন্যান্যদেশে পালিয়ে গেল। তখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন জেনারেল মানেকস। পাকিস্তানি পরাজিত বাহিনীর প্রধান নিয়াজি জেনারেল মানেকস এর কাছে অনুরোধ করলেন। তারা প্রকাশ্যে এবং মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। কারণ তারা বিগত নয় মাসে নিজেরা ও সহযোগী রাজাকার, আলবদর, আলসামসদের দিয়ে বাঙালিদের উপর যে অমানবিক অত্যাচার করেছে তাতে মুক্তি বাহিনীরা হাতে পেলেই প্রতিশোধ হিসাবে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করবে। তারা ক্যান্টনমেন্টে ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করতে ইচ্ছুক। জেনারেল মানেকস পাকিস্তানি পরাজিত বাহিনী প্রধান নিয়াজির দুইটি দাবির একটি মেনে নিলেন। ভারতীয় সেনা প্রধান ফিল্ড মার্শাল মানেকশ এর নির্দেশে চীফ অব ষ্টাফ মেজর জেনারেল জ্যাকব পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিল নিয়ে দুপুরের পর ঢাকায় এলেন। বাংলাদেশ সেনা বাহিনী প্রধান কর্ণেল (অবঃ) এম.এ.জি ওসমানী ও চীফ ও ষ্টাফ মেজর জেনারেল আব্দুর রব তখন সিলেটের রণাঙ্গণে ছিলেন। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে খন্দকারকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে খন্দকার ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্যদের উপস্থিতিতে নৃশংস বর্বরতার সমাপ্তির প্রতীকী চিহ্ন হিসাবে ১০০জন আর্মি ও সৈনিক মাটিতে অস্ত্র রেখে মাথা নিচু করে দাড়িয়ে ও পাকবাহিনী প্রধান আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজির রিভালবারটি পূর্বাঞ্চলীয় ভারতীয় বাহিনীর প্রধান জগজিৎ সিং অরোরার কাছে দিয়ে আত্মসর্মপণ দলিলে স্বাক্ষর করে।

৮ জানুয়ারি '৭২ পাকিস্তানি কারাগার থোকে মুক্ত হয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডন ও নয়াদিল্লিতে সংবর্ধনা নিয়ে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ বাংলাদেশে এলেন। মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীনতা বিরোধীদের একদিনের মধ্যে বিচার করতে চাইলো। কিন্তু মহৎপ্রাণ জাতির জনক পরে দেখা যাবে বলে সবাইকে শান্ত করলেন। তিনি বাংলাদেশে এসে ভারতীয় মিত্রবাহিনীকে এদেশ ছেড়ে চলে যাবার এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র জমা দেওয়ার আদেশ করলেন। ১৫ মার্চ ১৯৭২ এর ভিতর ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ থেকে চলে যায়। জাতির জনক

স্বাধীনতার জন্য রক্ত দেয়া' শহীদের রক্তের প্রতীকী হিসাবে জাতীয় পতাকায় বাংলাদেশের মানচিত্রের পরিবর্তে সবুজের মাঝে লাল সূর্য খচিত জাতীয় পতাকা ঘোষণা করেন।****

মহান মুক্তিযুদ্ধে আমি বিভিন্ন সম্মুখ, গেরিলা ও অপারেশনে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। আমি যে সকল সম্মুখ ও গেরিলা যুদ্ধে যদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। তার মধ্যে নিম্নগুলি স্মরণীয় :

১. বেলকুচি থানা আক্রমণ যুদ্ধ : ২৪ অক্টোবর কমান্ডার স্যার আমাকে বেলকুচি থানা রেকি করার নির্দেশ দিলেন। সিদ্ধান্ত হলো আমি একজন বাদাম বিক্রেতা হিসাবে থানায় গিয়ে চারপাশের রাস্তা ও বাংকারের অবস্থান, থানার পুলিশ সংখ্যা, রাজাকার ক্যাম্প সহ সবকিছু রেকি করে আসবো। রতন কুমার দাস এক আটি শোলার মধ্যে রাইফেল নিয়ে শোলা বিক্রেতা হিসাবে থানার পার্শ্বস্থ বাজারে থাকবে। আমার মেজ দাদা সমরেন্দ্র নাথ ন্যাশনাল একটা ব্যাগের মধ্যে কিছু শাক নিয়ে তার মধ্যে ৩টি গ্রেনেড নিয়ে আমাকে অনুসরণ করবেন। পরিকল্পনা অনুসারে বিকাল চারটার সময় আমি একজন বাদাম বিক্রেতা হিসাবে সফল ভাবে রেকি করে সন্ধ্যা সাত এম.এন.এ আব্দুল মমিন তালুকদারের বাড়িতে শেল্টার নেওয়া আমাদের গ্রুপ ও জনাব মোঃ আমির হোসেন ভুলুর গ্রুপে এসে বিস্তারিত রিপোর্ট করলাম। সিদ্ধান্ত হলো আমাদের দলের ১৭ জন ও আমির হোসেন ভুলুর গ্রুপের সকলে ২৫ অক্টোবর ভোরে থানা এবং আমাদের গ্রুপের অন্য ২৩ জন মুসলিম লীগ নেতা আব্দুল মতিন এর বাড়ি আক্রমণ করা হবে। পরিকল্পনা অনুসারে আমি, আমার মেজদা ও রতনসহ ১৭জন কমান্ডার মোঃ আব্দুল মান্নান স্যারের কমান্ড অধীন হয়ে থানার পশ্চিম পার্শ্বে আক্রমন করবো। জনাব আমির হোসেন ভুলুর গ্রুপের মুক্তিযোদ্ধারা থানার উত্তর পার্শ্বে অবস্থান করবে। মুসলিমলীগ নেতা আব্দুল মতিন এর বাড়ি আক্রমণের নেতৃত্ব দিবেন। আমাদের দলের রবীন্দ্র নাথ বাগচী। পরিকল্পনা অনুসারে রাত ৩টায় আমরা একযোগে বেলকুচি থানা ও আব্দুল মতিনের বাড়ি এম্বুস করলাম। ক্রোলিং করে আমাদের দল থানার সম্মুখস্থ সেন্ট্রির সামনে গেলাম। কমান্ডার স্যার কমান্ড করলেন আমরা গুলি ছুঁড়লাম। গুলি খেয়ে সেন্ট্রি ঢলে পড়লো। ২ ঘন্টা ব্যাপি যুদ্ধ হলো। আমরা বিজয়ী হয়ে থানার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। ঢুকে দেখলাম ৩ জন রাজাকারকে গুলি চালিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়ে থানার পুলিশ ম্যালেশিয়া ও অন্যান্যরা যমুনা নদীতে অবস্থিত স্পীড বোর্ড ও লঞ্চে পালিয়ে গেছে। ৩জন রাজাকারকে ধরে নিয়ে এলাম। মতিন সাহেবের বাড়ীতে আক্রমণ করে মতিন সাহেবকে ধরা যায় নাই। তিনি পালিয়ে গেছেন। বিজয়ী হয়ে আমরা দুইদল একত্রিত হয়ে বিজয় উল্লাস করলাম। সকাল আট পর্যন্ত বিজয় উল্লাস করে দৌলতপুর শামসুল হকের বাড়িতে শেল্টার নিলাম। এই যুদ্ধে ৩জন পাকি ম্যালেশিয়া মারা গিয়াছিল।

২. কালিয়া হরিপুর অপারেশন : ৪ নভেম্বর ১৯৭১ আমরা কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে ষ্টেশন সংলগ্ন ব্রিজ পাহারারত রাজাকার ক্যাম্প অপারেশন করেছিলাম। আমাদের এই যুদ্ধের গাইড ছিলেন সিরাজগঞ্জ সদর এর এম.এন.এ জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন তালুকদার এর ভায়রা ঝাউল গ্রামের মোঃ আব্দুল হামিদ। রাত নয়টায় সমেশপুর থেকে হাঁটা পথে গিয়ে আমরা পজিশন নিলাম রেললাইনের পূর্ব দিকে। ঐ রাতে আমাদের পাসওয়ার্ড ছিল জবা ও গোলাপ। সিদ্ধান্ত ছিল যুদ্ধ করতে গিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে সবাই একত্রিত হবো তামাই গ্রামের আমাদের কমান্ডার স্যার জনাব মোঃ আব্দুল মান্নানের বাড়িতে। আমি ক্রোলিং করে রেল লাইনে বৈদ্যুতিক মাইন পুতে রেখে এসে তারটি কমান্ডার স্যারের হাতে দিলাম। রাত নয়টা পঁচিশ মিনিটে একদল আর্মি ও রাজাকার টহল দিতে গেলে তাদের পায়ে আমাদের মাইনের তার লেগে বিদ্যুৎ সংযোগ অবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পাকি হানাদারেরা টর্চ লাইট মেরে আমাদেরকে খুজতে থাকে আর বারবার বকাবকি করতে থাকে। পাকি আর্মি ও রাজাকারদের সংখ্যাধিক্য থাকায় আমাদের কমান্ডার স্যার গুলি করতে নিষেধ করলেন। আমরা ক্রোলিং করে পিছিয়ে এসে নিরাপদ আশ্রয়ে একত্রিত হয়ে কল্যাণপুর চলে এলাম। পরদিন সিরাজগঞ্জ সদর থেকে শতাধিক আর্মি এসে কালিয়া হরিপুর ষ্টেশন সংলগ্ন ৩টি গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছিল।

৩. কল্যাণপুর যুদ্ধ : সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলাধীন বেলকুচি সদরের ৭ কিঃমিঃ দূরে দক্ষিণ পশ্চিম কোনে অবস্থিত কল্যাণপুর গ্রাম। ৪ নভেম্বর '৭১ রাত একটায় কালিয়া হরিপুর থেকে আমাদের গ্রুপটি দুই গ্রুপে বিভক্ত করে কমান্ডার স্যার একগ্রুপ নিয়ে যমুনা নদীতে নৌকায় চলে গেলেন। আর আমরা সতের জন রবীন্দ্র নাথ বাগচীর কমান্ডাধীনে পায়ে হাঁটা পথে রওনা হয়ে ভোর ৫টায় এসে পৌছাই কল্যাণপুর মাদ্রাসায়। আমরা মাদ্রাসায় অবস্থান নেই। সকালে রাইফেলে ফুলতুরী মেরে মাদ্রাসা মাঠে প্রকাশ্যে পিটি প্যারেট করি। পিটি প্যারেট শেষ করে আমরা পর্যায়ক্রমে সকালে জলখাবার খেতে থাকি। পর্যায়ক্রমে সেন্ট্রি রাখা হয়। সকাল ১০.৩০ মিঃ দিকে সেন্ট্রি এসে বললো পাকিহানাদার আসছে। কমান্ডার রবীন্দ্র নাথ বাগচীর নেতৃত্বে আমরা কল্যাণপুর রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে বাঁশ ঝোপের মধ্যে পজিশন নিলাম। দেখলাম দু'জন মুখ বাঁধা স্বাধীনতা বিরোধী পাকিদালাল পথ দেখিয়ে বওড়া গ্রামের মধ্যে দিয়ে আমাদের মাদ্রাসা সেল্টার কল্যাণপুর নিয়ে আসছে। আমরা পাকিহানাদারও তাদের দোসর রাজকারদের ফলো করে কল্যাণপুর মাদ্রাসার কাছের রাস্তার পার্শ্বে বাঁশ ঝোপের মধ্যে পজিশন নিলাম। পাকিহানাদাররা আমাদের কাছা-কাছি আসতেই কমান্ডারের কমান্ড পেয়ে ফায়ার শুরু করলাম। পাকি হানাদাররা লাফ দিয়ে রাস্তার উত্তর পার্শ্বে পজিশন নিল। গোলাগুলির সংবাদ পেয়ে কল্যাণপুর বিল এলাকা, ধুলের চর ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গ্রামে

অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপগুলো আমাদের দিকে মার্চ করল। আমরা আরো সাহসী হয়ে সম্মুখ যুদ্ধ করতে থাকলাম। একঘন্টা ব্যাপী সম্মুখ যুদ্ধ চললো। পাকিহানাদাররা কভারীং ফায়ার করতে করতে বওড়া গ্রামের মধ্য দিয়ে কামারপাড়া হয়ে বেলকুচি থানায় গিয়ে আশ্রয় নিল। আমরা ফায়ার করলে সাধারণ মানুষ মারা যাবে এই বিবেচনায় ফায়ার করা যায় নাই। এই যুদ্ধে রাস্তায় দৌড়াতে গিয়ে একজন শিশু মারা যায়। তিনজন পাকিহানাদার গুলিবিদ্ধ হয়েছিল।

৪. ধীতপুর যুদ্ধ ঃ আমরা সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার ধীতপুর নামক গ্রামে সংঘঠিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। টাংগাইলের যুদ্ধে পারাজিত হয়ে পাকিহানাদাররা নৌকায় পার হয়ে মালিপাড়া এসে পায়ে হেটে কৈজুরী ওয়াপদা বাঁধ দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের গ্রুপ সহ শাহজাদপুর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত সকল মুক্তিযোদ্ধা দল একত্রিত হয়ে তাদের আক্রমন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। ইহা ছিল ২৫ নভেম্বর' ৭১। আমরা কৈজুরী থেকে তাদের পিছু ধাওয়া করলাম। পাকিহানাদররা সংখ্যায় ছিল ৩০/৩৫ জন। ধীতপুর নামক স্থানে গিয়ে ওরা পজিশন নিয়ে আমাদের ওপর গুলি চালানো শুরু করল। আমরাও পজিশন নিলাম। আমাদের দলের অবস্থান হলো ওয়াপদা বাঁধের পশ্চিম পার্শ্বে। আধাঘন্টা পাকিহানাদারদের গায়ে না লেগে সাধারণ গ্রামবাসীদের গায়ে লাগতে পারে ভেবে আমরা মাঝে মাঝে দুই একটা আকাশ মুখি গুলি ছুঁড়তে থাকলাম। পাকি হানাদারদের পক্ষ থেকেও দুই একটা গুলি আসছিল। এই ভাবে সারা রাত্রি পজিশন অবস্থান থাকলাম। ভোর হলে ক্রোলিং করে দুঃসাহসিক ভাবে পাকিহানাদার সেল্টারের কছে গেলাম। ওরা ধীতপুরের সার গুদামে অবস্থিত ডিসপেনসারীতে সেল্টার নিয়েছিল। আমার হাতে এল.এম.জি আমার সামনে কমান্ডার রবীন্দ্র নাথ বাগচী ও পিছনে আমার মেজদাদা সমরেন্দ্র নাথ সান্যালসহ ১৭ জন সহযোদ্ধা। আমাদের গ্রুপের পিছনে আরও পাঁচ সাতটি গ্রুপের পাঁচশতাধিক মুক্তিযোদ্ধা। পাকিহানাদার সেল্টারে গিয়ে দেখি দুইজন রাজাকার গুলি চালাচ্ছে। আমাদের কমান্ডার তাদের কে সারেন্ডার করার কমান্ড করলেন। তারা উপায় না পেয়ে সারেন্ডার করল। এই রজাকার দুইজনের নাম ছিল লতিফ ও কামাল। ওদের কাছ থেকে জানা গেল ওদেরকে গুলি চালানোর নিদের্শ দিয়ে পাকিহানাদারেরা রাত ১.০০ টার পর ভেরাকোলা খেয়াঘাট পার হয়ে বেড়া নগরবাড়ি হয়ে পালিয়ে গেছে। এই যুদ্ধে আমাদের সহযোদ্ধা আমির হোসেনের গ্রুপের বৃশালিখা গ্রামের মোঃ আব্দুল খালেক শহীদ হয়েছিলেন। তিনজন পাকিহানাদার ও দুইজন সাধারণ মানুষ মারা গিয়েছিল।

জাতির জনকের আদেশ অনুসারে আমি আমাদের গ্রুপের অন্যান্যদের সঙ্গে ২৬শে জানুয়ারি' ১৯৭২ ইং বুধবার সিরাজগঞ্জের ইব্রাহিম বিহারীর বাসায় সাব

সেক্টর কমান্ডার মেজর গিয়াস উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী সম্মুখে লেঃ সাইফুল্ল্যার নিকট অস্ত্র জমা দিলাম। সরকারী উদ্যোগে মহকুমা প্রশাসকের কার্যালয়ের পশ্চিম পার্শ্বে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে মিলিশিয়া ক্যাম্প করা হলো। মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মসংস্থানে সহযোগীতা করার জন্য মিলিশিয়াতে ভর্তি হওয়ার আহ্বান জানানো হল। আমার বাবা মা আমাকে লেখাপড়া করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাই আমি আর মিলিশিয়া ক্যাম্পে ভর্তি হলাম না। বাড়ি চলে এলাম।

১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ সিরাজগঞ্জ মহকুমা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে আমাকে সংবাদ দেওয়া হল অস্ত্র জমা দেয়ার রশিদ ফেরত নিয়ে আমাকে মহান মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক মুহম্মদ আতাউল গণি ওসমানী স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট নং ১২৯১৫৮, একটি সাদা কম্বল ও বকেয়া রেশনিং এল্যাউন্স ও পকেট ভাতা হিসাবে ১১০ টাকা দেয়া হলো। আমি মহান মক্তিযুদ্ধের দায়িত্ব শেষ করে রতনকান্দি আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এসে অষ্টমশ্রেণীর অটোপাশের সার্টিফিকেট নিয়ে শাহজাদপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শুরু করলাম।

স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গে কিছু কথা

অধ্যাপক ডা: মো: জোবায়ের

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। স্বাধীনতা ঘোষণার পরই তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি হন। তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণা ওয়্যারলেস ও ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে চট্টগ্রামসহ সারা প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় প্রেরণ করা হয়।

১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশ গণপরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন : পাকবাহিনী অতর্কিতে ২৫ মার্চ আমাদের আক্রমণ করলো। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের শেষ সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। আমি ওয়্যারলেসে চট্টগ্রাম জানালাম, বাংলাদেশ আজ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই খবর প্রত্যেককে পৌঁছিয়ে দেওয়া হোক যাতে প্রতিটি থানা, মহকুমায়, জেলায় প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠতে পারে সেইজন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছিলাম। দেশবাসী জানেন একই তারিখে দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়েছিলা। এটা হওয়ার উপর থেকে হয় নাই। যদি কোন নির্দেশ না থাকত, তবে কেমন করে একই সময়ে, একই মুহূর্তে সব জায়গায় সংগ্রাম শুরু হলো?

অধিবেশনে আলোচনার পর সর্বস্মতিক্রমে গ্রহীত প্রস্তাবের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার যে ঘোষণা করেছিলেন এবং যে ঘোষণা মুজিবনগর থেকে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়েছিল, একই সঙ্গে এই গণপরিষদ তাতে একাত্মতা প্রকাশ করেছে।

স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ৭ জুন ৬ দফার বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত এক গণসমাবেশে বক্তব্য দেয়ার সময় বলেন, "২৫ মার্চ রাতে ইয়াহিয়ার বর্বরবাহিনী আমার ওপর আক্রমণ চালায়। সেদিন রাতে আমার অবস্থা যে কেমন ছিল, সেটা কেবল আমিই জানি, আমি জানতাম ঘর থেকে বের হলেই আমাকে গুলি করে মারবে। মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। কিন্তু বাংলার মটিকে আমি ছাড়তে পারি নাই। রাত ১১টার সময় আমার সমস্ত সহকর্মীকে ও

আওয়ামী লীগ নেতাদের হুকুম দিলাম বের হয়ে যাও। যেখানে পার এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। খবরদার স্বাধীনতা না আসা পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেয়ো।"

রাতে আমি চট্টগ্রামে নির্দেশ পাঠালাম। আগে যাকে ইপিআর বলা হতো, তাদের সদর দপ্তর ছিল চট্টগ্রামে। পিলখানা হেডকোয়ার্টার্স তখন শত্রুরা দখল করে নিয়েছে। ওদের সাথে আমার যোগাযোগ ছিল। আমি যখন পিলখানায় যোগাযোগ করতে পারলাম না। তখন আমি চট্টগ্রামের সাথে যোগযোগ করে বললাম, 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। তোমরা বাংলার সব জায়গায় ওয়্যারলেসে খবর দিয়ে দাও। পুলিশ হোক, সৈন্যবাহিনী হোক, আওয়ামী লীগ হোক, যে যেখানে আছে। পশ্চিমাদের বাংলা থেকে খতম না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাও। বাংলাদেশ স্বাধীন। তারা আমার কথা মতো খবর পৌঁছিয়েছিল।

১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন : ২৫ মার্চ তারিখে আমি যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম, আমি যখন বাংলার মানুষকে ডাক দিলাম, তখন আমি গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম। কিন্তু আমার সহকর্মীরা আমার অনুপস্থিতিতেও সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ যুবক, লক্ষ লক্ষ কৃষক, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, রক্ত দিয়েছে। আর কারো কথায় নয় শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকেই তারা জীবন দিয়েছে। স্বাধীনতার ইতিহাসকে কোনদিন মিথ্যা করতে নাই। আমার সহকর্মীরা যারা এখানে ছিল, তারা সকলে জানতো যে ২৫মার্চ রাতে কী ঘটবে। তাদের বলেছিলাম, আমি মরি আর বাঁচি সংগ্রাম চালিযে যেয়ো। বাংলার মানুষকে মুক্ত করতে হবে।৭ মার্চ কি স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলা বাকি ছিল? প্রকৃতপক্ষে ৭ মার্চ স্বাধীনতার সংগ্রাম ঘোষণা করা হয়েছিল। সেদিন পরিষ্কার বলা হয়েছিল। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব- কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়, আব্দুল মতিন পৃ. ৩৮-৩৯)

বঙ্গবন্ধুর বাসার হাজী গোলাম মোর্শেদ স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গে বলেন : ২৫ মার্চ '৭১-এর মধ্য রাতের দিকে একটি টেলিফোন আসল। গোলাম মোর্শেদ টেলিফোন ধরেন। টেলিফোনকারী বঙ্গবন্ধুকে চাইলেন। গোলাম মোর্শেদ তার পরিচয় জানতে চাইলেন। টেলিফোনকারী বললেন যে বঙ্গবন্ধুকে বলুন আমি সেই লোক যাকে বঙ্গবন্ধু তার বাণী পাঠানোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। গোলাম মোর্শেদ বঙ্গবন্ধুকে জানালেন সে কথা। বঙ্গবন্ধু নিজে টেলিফোন না ধরে গোলাম মোর্শেদকে ধরতে বলেন, টেলিফোনকারীকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ জানলে উত্তরে তিনি জানালেন বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি প্রচার করা হয়ে গেছে এবং ট্রান্সমিটার দিয়ে তিনি এখন কী করবেন তা জানতে চান। মোর্শেদ বঙ্গবন্ধুকে এসে একথা জানালেন। বঙ্গবন্ধু টেলিফোনকারীকে ট্রান্সমিটার নষ্ট করে পালিয়ে যেতে বললেন। মোর্শেদ টেলিফোনকারীকে বঙ্গবন্ধুর সব নির্দেশ জানিয়ে দিলেন। (স্বাধীনতার ঘোষক, ইমন সরকার পৃঃ ৩০)।

ড. ওয়াজেদ মিয়া লেখেন : বঙ্গবন্ধুর বার্তাটি ছিল টেপকৃত। ঢাকার বলদা গার্ডেন থেকে ঐ টেপকৃত বার্তাটি সম্প্রচারের পর ইপিআর ওই বীর সদস্যটি বঙ্গবন্ধুর বাসায় ফোনে যোগযোগ করে পরবর্তী নির্দেশ জানতে চান। তখন বঙ্গবন্ধু জনাব গোলাম মোর্শেদের মাধ্যমে ইপিআর-এর ওই সদস্যটিকে সম্প্রচার যন্ত্রটি বদদা গার্ডেনের পুকুরে ফেলে দিয়ে তৎক্ষণাৎ উক্ত স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, ড. ওয়াজেদ মিয়া, পৃ. ৮১)

শেখ হাসিনার কথা থেকে পাওয়া যায় ইপিআর-এর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে ২৫ মার্চের মধ্যরাতের পর অর্থাৎ ২৬ মার্চ ৩-৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ সভাপতি জহুর আহমদ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক হান্নান সাহেবকে বার্তা পাঠানো হয়। তার জন্য তারা ব্যবস্থা করেছিলেন। (ঐ)

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. এ আর মল্লিক স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন, ২৬ মার্চ হান্নান ও এম আর সিদ্দিকীর সাথে টেলিফোনে আমার কথা হয়। তিনি আরো উল্লেখ করেন চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করে আমাদের শোনানো হয়। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ঘোষণা করা হয়। দুপুর দেড়টার দিকে ওই কেন্দ্র থেকে হান্নান বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা পাঠ করেন। (আমার জীবন কথা, ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম, এ আর মল্লিক, পৃ. ৬৫)

ড. এ আর মল্লিক তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ২৭ মার্চ জিয়াউর রহমান নিজ নামে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। আমার মনে আছে তিনি বলেছিলেন "আই মেজর জিয়া ডু হেয়ারবাই ডিক্লার' ইত্যাদি। সাথে সাথে আমি আপত্তি জানাই। আমি হান্নান সাহেবকে ফোনে বলি যে জিয়ার ঘোষণায় বঙ্গবন্ধুর নাম থাকা প্রয়োজন। মেজর জিয়া পরে ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধুর নাম করে তাঁর পক্ষে থেকে। (আমার জীবন ও কথা ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম। এ আর মল্লিক, পৃ. ৬৬)।

২৬শে মার্চ ১৯৭১ সনে সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্লানডেস্টাইন রেডিওতে জনাব ওয়ালটার ক্রনকাইট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। তিনি এই খবরটি প্রচার করেন বহির্বিশ্বে। এর সত্যতা সিবিএস খবর মার্চ ২৬, ১৯৭১ প্রচার করে। সূত্র প্রফেসর ডাঃ জিয়াউদ্দীন আহমদ

স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে শ্রী নির্মল সেন তার লেখা 'মা জন্মভূমি' গ্রন্থের ৫১ ও ৫২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন : ১৯৭১ সালের সাতাশে মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে মেজর জিয়ারউর রহমান একটি ঘোষণা দিয়েছিলেন। এ ঘোষণাটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং সাহসিকতাপূর্ণ। মরহুম জিয়াউর রহমান নিঃসন্দেহ কৃতিত্বের দাবিদার। একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতেই এই ঘটনাটি বিবেচ্য। কিন্তু এর বেশি কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা হয়েছিল ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)। যদিও এই ঘোষণার আনুষ্ঠানিকতা ছিল না। এ ছাড়াও একটি ঘোষণা ২৬ মার্চ রাতে শেখ

সাহেব পাঠিয়েছিলেন বেতার মারফত। ঘোষণাটি এসেছিল শেখ মুজিবুর রহমানের নামে। আমি নিজ চোখে সে ঘোষণা দেখেছি। এ ব্যাপারে কারও তৈরি করা কথা বা তত্ত্ব শুনতে বা বুঝতে আমি রাজি নই। আমি জিয়াউর রহমানের অমর্যদা করতে চাই না। কিন্তু তাঁর সমর্থকদের তার সীমাবদ্ধতা ও তার ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে। একটি কথা স্বীকার করতে হবেই যে স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের নামে। শ্রী নির্মল সেন একই গ্রন্থের ৫৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন : আজ স্বীকৃতি দেয়া ভালো যে, আমরা বামপন্থীরা বাঙালি উঠতি শিক্ষিত মানুষের মন-মানসিকতা বুঝতে পারিনি। আমরা আওয়ামী লীগের ৬ দফাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দলিল বলে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম। বুঝতে চেষ্টা করিনি যে এই ৬ দফা রুখবার জন্য আইয়ুব সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে এক শ্রেণীর বামপন্থীরা নিজেদের হুলিয়া প্রত্যাহার করেছেন। প্রকাশ্য রাজনীতিতে এসেছেন ৬ দফা বিরোধিতা করার মুচলেখা দিয়ে। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের পর এই নেতারা যদি বলতে চান যে তারই এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা, তা হলে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করবে কি? আমরা মেহনতি মানুষের কথা বলি। কিন্তু ১৯৭১ সালে এদেশের মেহনতি মানুষের আস্থা আমাদের ওপর ছিল না। তাদের নেতা ছিল শেখ মুজিবুর রহমান।

২৩শে মার্চ, ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর রোডে বঙ্গবন্ধুর বাড়ী। রাত আটটার দিকে পি আই এ বার চৌদ্দজন বিমান ক্যাপ্টেন ও কর্মচারী নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাসায় গেলাম। বঙ্গবন্ধুর বাড়ী প্রচণ্ড ভিড়। এক ফাঁকে আমি বাসার ভেতর গিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করলাম, বললাম পি আই এ পাইলটসহ নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তা আপনার সাথে কথা বলতে চান। বঙ্গবন্ধু আমার কথা সাড়া দিয়ে খুব অল্প সময়ের জন্য আমাদের সঙ্গে কথা বললেন। ক্যাপ্টেন আলমগীর ও জনাব তালুকদার দুজনে আমাদের তৈরী দাবির কথা জানালাম।

বঙ্গবন্ধু ধৈর্য সহকারে আমাদের বক্তব্য শুনলেন। তারপর কাগজপত্র ফিরিয়ে দিয়ে আমাকে (আলমগীর সাত্তার) ধরে একপাশে নিয়ে আমার কানের কাছে মুখ এনে আস্তে আস্তে বললেন, পি আই এ কে আবার দুভাগ করতে হবে কিরে? কিসের আলাদা এয়ার লাইনস্? সম্পূর্ণ দেশটাই তো আলাদা করে দিচ্ছি। স্বাধীন দেশ হলে তো এমনিতেই আলাদা এয়ার লাইনস্ হবে। সাবধানে থাকিস–বলে আলতো করে আমার গালে চড় দিয়ে বঙ্গবন্ধু চলে গেলেন (পৃষ্ঠা ৫২, ৫৩ সত্তায় বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ, আলমগীর সাত্তার)

স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আব্দুল হক তার এক লেখায় উল্লেখ করেন : আজ সকালে উঠেই শুনলাম শেখ সাহেব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন অসহযোগ চালিয়ে যেতে বলেছেন এবং যেভাবে সম্ভব পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধ করতে বলেছেন। বিপ্লবী বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে খবর প্রচার করা হলো। (আবদুল হক, রোজনামচায়, চার দশকের, রাজনীতি পরিক্রমা, প্রেক্ষাপট : বাংলাদেশ, ১৯৫৩-৯৩, নূরুল হুদা সম্পাদিত, পৃ. ২০১)।

বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা মেজর সুবিদ আলী ভূঁইয়া লিখেছেন : মেজর জিয়া বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত তার স্বাধীনতার ঘোষণায় বলেছিলেন যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে এই সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে এবং তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে রয়েছেন। অন্যদিকে তখন পাকিস্তান বেতার থেকে বার বারই জানানো হচ্ছিল যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে তাকে আটক রাখা হয়েছে। বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে অবশ্য এ ঘোষণা করা হয়েছিল যে বঙ্গবন্ধু সুস্থ আছেন এবং যথাসময়েই বেতারে তাঁর কণ্ঠ শোনা যাবে।

এ ধরনের পরস্পরবিরোধী খবরে সারা বিশ্বেও তখন বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল সন্দেহ নেই। তবু এটা কেন করতে হয়েছিল? তার কারণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির কাছে একটি ব্যক্তি মাত্র নন। তিনি নিজেই একটি ইতিহাস, বাংলাদেশের সংগ্রামী ঐতিহ্যের মূর্ত প্রতীক। তিনি বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতীক, সংগ্রামী চেতনার উৎস। সেদিন সংগ্রামী বাঙালি জাতির প্রাণে তড়িৎ সঞ্চার করার জন্যে এই একটি নাম ব্যবহার না করে উপায় ছিল না। কাজেই ২৬ মার্চ থেকে যে রক্তক্ষয়ী, দীর্ঘ, তিক্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলো, সেই লড়াইয়ে বাংলাদেশের আপামর জনসাধরণকে টেনে আনার জন্যেই শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ব্যবহার করা হয়েছিল। বাংলাদেশের মানুষ যদি সত্যি সত্যিই জানতো এবং বিশ্বাস করতো যে বঙ্গবন্ধু আমাদের মধ্যে নেই তিনি পশ্চিম পাকিস্তানি দস্যুদের হাতে বন্দী রয়েছেন, তাহলে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই দেখা দিত বিশৃঙ্খলা, হতাশা। সাধারণ মানুষের মধ্যেও কাজ করতো নিরুৎসাহ, সন্দেহ, সংশয়। ফলে মুক্তিযুদ্ধ শুরুতেই দুর্বল হয়ে পড়তো। এই কারণে মিথ্যা জেনেও সংগ্রামী ঐতিহ্য ও অনমনীয় ব্যক্তিত্বের প্রতীক এই নামটিকে মুক্তিযুদ্ধের অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। (মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস, মেজর এম এস এ ভূঁইয়া, পৃ. ২৭, ২৮)।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ সন্ধ্যাবেলা কালুরঘাট ট্রান্সমিটার সেন্টার থেকে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের কর্মতৎপরতা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। প্রথম দিনের অধিবেশনে সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার সংক্ষিপ্ত বার্তাটি সংবাদের আকারে পাঠ করেন আবুল কাসেম সন্দ্বীপ। হান্নান সাহেব অধিবেশন চলাকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও পুনরায় স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে তার ভাষণ প্রচার করেন। পরদিন ২৭ মার্চ সন্ধ্যাবেলা দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে মেজর জিয়া ও আরও কয়েকজন পৃথক পৃথকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করেন এবং এ সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন। কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়ার কণ্ঠ শোনা যায় ২৭ মার্চ, ২৮ মার্চ ও ৩০ মার্চ। (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়, আবদুল মতিন, পৃ. ২৪)।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের মহানায়ক ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যথা সময়েই তিনি বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাই

তো ২৬ মার্চ ৭১-এর আগ মুহূর্তে এবং ২৫ মার্চ-এর শেষ মুহূর্তে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালি জাতির ওপর গণহত্যা শুরু করে। বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী ছেড়ে দেয়ার পরমূহূর্তেই বন্দী করে হানাদার পাক সৈন্যরা। এ ব্যাপারে ৮ মে '৭১ জামায়েত ইসলামের মুখপত্র দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে লিখলো "অধৈর্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গত ২৬ মার্চ সশস্ত্র বিদ্রেহের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা এটে সব আয়োজন সম্পন্ন করেছিলেন। সামরিক সরকার তা জানতে পেরেই ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে আকস্মিক হামলা চালিয়ে তাঁর সে পরিকল্পনা নস্যাৎ করেছেন এবং পাকিস্তানকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। কেবল ৭ মার্চ ও ২৬ মার্চই নয়। ২৩ মার্চ, '৭১ তারিখেও অর্থাৎ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসেও বঙ্গবন্ধু বাংলাকে স্বাধীন বাংলা রূপে প্রতিপন্ন করেছেন। এইদিন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাংলাদেশের সর্বত্র পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। বাঙালি জনগণ পাক সরকারের নির্দেশ অমান্য করে। দৈনিক নিউজ ডে পত্রিকার বিজ্ঞ সাংবাদিক এ বি এম মূসা কর্তৃক পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে গিয়ে ১৯৭১-এর বাংলার গণহত্যার নায়ক জেনারেল টিক্কা খানের সাথে গৃহীত সাক্ষাৎকারের অংশ প্রণিধানযোগ্য। গত ১৯ এপ্রিল, '৯২ দৈনিক নিউজ ডে পত্রিকায়, পেস টু ফেস উইদ টিক্কা খান শিরোনামে প্রকাশিত উক্ত সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ স্বনামধন্য কলামিস্ট শ্রদ্ধেয় আনিসুজ্জামান সাহেব গত ১১ মার্চ, ৯৩ দৈনিক খবরের ৫ম পৃষ্ঠায় ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রচারে অনীহা কেন? শীর্ষ পর্যালোচনায় উল্লেখ করেছেন। জনাব এ বি এম মূসার এক প্রশ্নের উত্তরে খান বলেন, "মুজিব ডিক্লেয়ার্ড ইন্ডিপেডেন্স অন টুয়েন্টি থার্ড মার্চ অ্যান্ড এস্কড বেঙ্গলি আর্মি অফিসার্স টু রিভল্ট"। জনাব মূসা টিক্কা খানকে প্রশ্ন করেন কিন্তু আপনি কেন বলেছেন যে থার্ড ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান ফ্লাগ দেয়ার ওয়াজ বাংলাদেশ ফ্লাগ এভরিহয়ার, কর্নেল ওসমানি ওয়াজ ট্রেনিং দি ইউনিভারসিটি ভয়েজ, মুজিব হ্যান্ড কমপ্লেট কন্ট্রোল। হি হ্যাড সাপ্লাইজ টু দি ক্যান্টনমেন্ট"।

অনুবাদ : ২৩ মার্চ প্রজাতন্ত্র দিবসে পূর্ব পাকিস্তানের সব জায়গায় পাকিস্তানি পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশের পতাকা উড়ানো হয়। কর্নেল ওসমানি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুজিব ক্যান্টমেন্টের রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। জনাব মূসার প্রশ্নে উত্তরে জেনারেল টিক্কা খান বলেন-"মুজিব হ্যাড সেট টু অল দি বেঙ্গলি আর্মি অফিসার্স টু রিভল্ট"। জনাব মূসা প্রশ্ন করেন- অন টুয়েন্টি থার্ড মার্চ? জনাব টিক্কা খান বলেন, অন টুয়েন্টি থার্ড অ্যান্ড ল্যাটার অন সিক্সথ মার্চ দে রিভল্ট ফাস্ট অ্যাট জয়দেবপুর অ্যান্ড ল্যাটার ইন চিটাগাং।

বঙ্গানুবাদ : মুজব সকল বাঙালি সামরিক অফিসারদের কাছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য নির্দেশ পাঠান।

স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল মালেক উকিল বলেন, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ সকাল ১০টায় নোয়াখালী সার্কিট হাউস ময়দানে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিশিষ্ট নাগরিক এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানায়। নির্ধারিত সময়ের আগেই সার্কিট হাইস ময়দান এক বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হয়। উক্ত সমাবেশে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি হিসেবে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম করার জন্য দলমত, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে আহ্বান জানাই। উপস্থিত সবাই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য শপথ গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে হঠাৎ করে জেলা প্রশাসক জনাব মনযুরুল করিম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কর্তৃক ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আমার হাতে দেন। (বংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬)

স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে সাবেক সচিব মনযুর-উল-করিম বলেন ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাত্রে প্রায় মধ্যরাতের পর আমি শেখ মুজিবুর রহমানের নামে আসা একটি ওয়্যারলেস মেসেজ পাই। সেখানে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কথা ছিল। পাশের জেলা কুমিল্লাতে যোগযোগ করে জানতে পারি তাঁরও অনুরূপ বার্তা পেয়েছেন। পরে পাকিস্তানি সৈন্যরা কুমিল্লার জেলা প্রশাসক শামসুল হক খানকে হত্যা করে। আমি পরদিন ২৬ মার্চ সকালে নোয়াখালী সার্কিট হাউসের সামনে উপস্থিত জনতাকে বার্তাটি পরে শোনাই। তিনি আরো বলেন, আমার ধারণা হয় ঢাকায় যে ট্রান্সমিটিং থেকে এই ওয়্যারলেস বার্তাটি পাঠানো হয়েছিল সেখানে কেউ বেঁচে নেই। পাকিস্তানি সৈন্যরা সম্ভবত সবাইকে হত্যা করেছিল। ২৫ মার্চ গভীর রাতে নোয়াখালীর পুলিশ ইন্সপেক্টর এস ইউ খান চৌধুরী একটি বার্তা পেয়ে সাথে সথেই পাঠিয়ে দেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আব্দুল মালেক উকিল সাহেবের কাছে (বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ইতিহাস, একটি অনুসন্ধান, মোহাম্মদ হান্নান, পৃ. ৫০, ৫১)।

২৬ মার্চ রাতে হঠাৎ চট্টগ্রাম বেতারের মিটারে ঘোষণা করা হয় স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্টর সাথে যে আলাপ আলোচনা করেন তা ব্যর্থ হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের হঠকারিতার ফলেই এই ব্যর্থতা এবং বিশেষ করে গত রাতে বাংলাদেশের সব ক্যান্টনমেন্টে বাঙালি সৈন্যদের হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া সর্বত্রই নিরীহ জনসাধারণের ওপর অতর্কিতে হামলা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে জনাব আবদুস সামাদ আজাদ বলেন- পাকিস্তানের পক্ষ থেকে যে কোনো সংকটজনক অবস্থাকে প্রতিরোধ করার জন্য বঙ্গবন্ধু ১৬ মার্চ, '৭১ সালে আলাদাভাবে জেনারেল ওসমানীকে সিলেট থেকে এসে গোপনে ইপিআর এবং অন্যান্য জায়গায় যারা ছিলেন তাঁদের সতর্ক করে দেয়ার জন্য বলেছিলেন। জনাব আবদুস সামাদ আজাদ বলেন-ইতোপূর্বে বঙ্গবন্ধু

আমাকে নিয়ে জেনারেল ওসমানীর সাথে মিরপুরে একটি বাড়িতে বসেছিলেন। কাজেই পূর্ব প্রস্তুতি আমাদেরও ছিল।

জনাব আবদুস সামাদ আজাদ আরো বলেন-হানাদার বাহিনীর সম্ভাব্য আঘাত প্রতিহত করার জন্য সংগোপনে জেনারেল ওসমানীর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু একটা কাজ করেছিলেন। তাকে দিয়ে কিছু কিছু বাঙালি সামরিক অফিসারকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল। প্রয়োজনে প্রতিরোধ যুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়ার জন্য। (স্বাধীনতার ঘোষক কে, ইমন সরকার, পৃ. ৪০-৪৩)।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে অধ্যাপক আবু সাইয়িদ বলেন, "২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় কী ঘটেছে তা জানি না। সকালে ঢাকা বেতারে ভিন্ন কণ্ঠ। সশস্ত্র লড়াই অতি নিকটে।' থানা থেকে অস্ত্র নিয়ে এলাম। দুপুরে সিরাজগঞ্জ ওয়্যারলেস স্টেশন থেকে চিঠিসহ পিয়ন এল। এতে লেখা ছিল রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সাথে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোন আপোষ নাই। জয় আমাদের হবেই। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ কর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাপ্রিয় লোকদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা। (স্বাধীনতার ঘোষক কে, ইমন সরকার, পৃ. ৩২)।

স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ, শ্রীসুরঞ্জিত সেন গুপ্ত বলেন- ২৬ মার্চ, '৭১ আমি একখানা টেলিগ্রাম পেলাম। টেলিগ্রামের প্রেরকের ঠিকানায় শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ছিল। এই টেলিগ্রামটি পাওয়া মাত্র জনসভা করলাম। তিনি আরো বলেন, টেলিগ্রামখানা ছিল ইংরেজিতে। তাতে বাংলা অর্থ হয় : আমরা আক্রান্ত, আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম। তোমরা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত কর। শ্রীসুরঞ্জিত সেনগুপ্ত আরো বলেন, আমি প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হিসেবে ওই নির্দেশ পাই। আমি বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে এ ধরনের নির্দেশই আশা করেছিলাম। টেলিগ্রামখানাকে আমি, জাতীয় নির্দেশ হিসেবেই ধরে নিয়েছিলাম। জনসভা করে আমি ওই টেলিগ্রাম সেখানে পাঠ করে জনতাকে শুনিয়েছিলাম। (একাত্তরের রণাঙ্গন, শামসুল হুদা, পৃ ৩৭৯-৩৮০)।

স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে কে এম সফিউল্লাহ বীর উত্তম বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী ছাপানো হ্যান্ডবিল আকারে চট্টগ্রামে বিলি করা হয়েছিল ২৬ মার্চ ৭১ সকালের মধ্যে। ২৬ মার্চ বিকালেও এমনি শত শত হ্যান্ডবিল চট্টগ্রামে বিলি করা হয়েছিল। এই হ্যান্ডাবিলে বঙ্গবন্ধুর

বরাত দিয়ে বলা হয়েছিল- ২৬ মার্চ, ৭১-এর রাতে পাকিস্তানিদের হাতে বন্দী হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন। ওয়্যারলেসযোগে প্রেরিত বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা বাণী চট্টগ্রাম উপকূলে নোঙ্গর করা এক বিদেশি জাহাজে প্রথম গৃহীত হয়েছিল। জাহাজের ক্যাপ্টেন সাথে সাথেই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার বাণী টেলিফোনযোগে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমদ চৌধুরীকে জানিয়েছিলেন। জনাব চৌধুরী ওই রাতের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর বাণী হ্যান্ডবিল আকারে ছেপে নেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং একই সাথে ত্বরিত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য প্রত্যেক জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ২৫ মার্চ ৭১ দিনগত রাত ছিল ঠিকই কিন্তু রাত ১২টা পার হলেই যে পরবর্তী ক্যালেন্ডার ডেট হয় এটা অনেকেরই খেয়াল থাকে না। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। (স্বাধীনতার ঘোষক কে, ইমন সরকার, পৃ. ৩৬)।

১৯৮০ সালে জেনারেল এম এ জি ওসমানী বলেন, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেনি। বঙ্গবন্ধুই সেদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়, পৃ. ৩৩)।

জেনারেল ওসমানী অপর এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন-২৫ মার্চ রাত ১০টায় বঙ্গবন্ধু আমাকে বলেছিলেন আপনাকে যেন কোনো অবস্থাতেই ধরতে না পারে। তিনি আমাকে যুদ্ধ পরিচালনা করার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। জেনারেল ওসমানী জাতীয় সংসদে স্বাধীনতা ঘোষণা প্রাসঙ্গিক বিতর্কে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ১৯৮১ সালে পুনরায় দ্ব্যর্থতীনভাবে বলেন- বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৯৮০ সালের আগস্ট মাসে জাতীয় জনতা পার্টির কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর স্মরণ সভায় জেনারেল ওসমানী বলেন- বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উদাহরণ সৃষ্টিকারী শীর্ষতম ব্যতিক্রম, তিনি একমাত্র মহান বাঙালি যিনি বিবেক ব্যবসা করেনি। (স্বাধীনতার ঘোষক, ইমন সরকার, পৃ. ৩১)।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাজারবাগ ও পিলখানায় পাকিস্তানি আক্রমণের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন প্রখ্যাত লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ আইনজীবী আবুল মনসুর আহমেদ বলেন, ২৫ মার্চ, '৭১-এ পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের ওপর আক্রমণ করে। আমাদের নেতাকে বন্দী করে তাদের দেশে নিয়ে যায়। কিন্তু তার আগেই আমাদের নেতা ফর্মালি স্বাধীনতা ঘোষণা করে সহকর্মীদের মুজিবনগরে আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশ দেন। ২৬ মার্চ, '৭১-এ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আস্থা স্থাপন করে, তাঁর নির্দেশে বাঙালি সৈন্য ও জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অস্ত্রধারণের কথা ঘোষণা করা হয়। (স্বাধীনতার ঘোষক কে, ইমন সরকার, পৃ. ৩৪)।

১৯৯২ সালের ৩১ মার্চ ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্রের এক আলোচনা সভায় বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা সাবেক বিমানবাহিনীর প্রধান এ কে খন্দকার বীর উত্তম স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে মন্তব্য করেন। মেজর জিয়া কর্তৃক ২৭ মার্চ স্বাধীনতা

ঘোষণা করার অসঙ্গত দাবি খণ্ডন করে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান ২৬ মার্চ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য দেশব্যাপী তাঁর ঘোষণা শোনেননি। (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়, আব্দুল মতিন পৃ. ৩৩-৩৪)।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণ ও স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে চট্টগ্রামের প্রথম বিদ্রোহী সৈনিক বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা মেজর রফিক বলেন- লাখো মানুষের কণ্ঠে মানব গর্জনের মতো ধ্বনিত হতে লাগল 'জয় বাংলা'। কি যে জাদু মাখা ছিলো এই স্লোগনে। এর ঐন্দ্রজালিক শক্তির পরিধি নিরূপনের ক্ষমতা বুঝি আর কারো নাই। গণঅভ্যুত্থানের সময় এবং যুদ্ধ চলাকালে এ স্লোগান বাঙালির জীবনে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। জীবন বাজি রেখে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে এর উদ্দীপনা উক্তির তুলনা হয় না, তাই জয় বাংলা জয় ধ্বনি আমাদের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। "মেজর রফিক আরো বলেন-সেদিনের সভায় শেখ মুজিবের দেয়া ভাষণ ছিলো বাঙালি জাতির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ। গভীর আবেশ, নির্ভুল যুক্তি এবং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনাপূর্ণ এ ভাষণে অকুতোভয় শেখ মুজিব বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন-আর যদি একটা গুলি চলে তাহলে বাংলার ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, আমার অনুরোধ প্রত্যেক গ্রামে, মহল্লায় ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন। হাতে যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। মনে রাখবেন রক্ত যখন দিয়েছি। আরো দেবো, তবু এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। (লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, মেজর রফিক, পৃ. ৪৫, ৪৬, ৫০)।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিজেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এই মন্তব্য করে এম আর আখতার মুকুল বলেন- তাই সে রাতেই ২৬ মার্চ তিনি দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন। সর্বত্র বেতার যোগে পাঠাবার জন্য টেলিফোনে নিম্নোক্ত বাণীটি সেন্ট্রাল টেলিগ্রাম অফিসে জনৈক বন্ধুকে ডিকটেশন দিলেন। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা জনাব এম এ হান্নানের কাছে এই বাণী যথাসময়ে পৌঁছেছিল। বঙ্গবন্ধুর ডিকটেশনটি ছিল নিম্নরূপ : "দি পাকিস্তান আর্মি হ্যাজ অ্যাটাক পুলিশ লাইন অ্যাট মিড নাইট। গেদার স্টেংথ টু রোজস্ট অ্যান্ড প্রিনেয়ার ফর এ ওয়াব অব ইনডিপেনডেন্স।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নায়ক, স্বাধীনতার ঘোষক। আর সেজন্যই ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের সময় পাকিস্তানিদের হাতে বন্দী শেখ মুজিবুরের উচ্ছোষিত প্রশংসা করে বলেছিলেন- এই নবজাতক রাষ্ট্রের তিনি জনক বর্তমান মুহূর্তে আমাদের সমস্ত চিন্তা তাকে কেন্দ্র করে। (লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, মেজর রফিক, পৃ. ৩১০)।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিরোধ সংগ্রামীদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত সাংবাদিক সাপ্তাহিক যায়যায়দিন পত্রিকার সম্পাদক শফিক রেহমান

বলেন, বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ ভাষণ না দিলে এদেশ স্বাধীন হতো না। (দৈনিক খবর, ১-৯-৯৭)।

"জিয়ার জন্মদিন : বিটিভির অনুষ্ঠানে ইতিহাস বিকৃতি" শীর্ষক এক নিবন্ধে জয়নাল আবেদিন একাধিক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত ড. রওনক জাহানের "পাকিস্তান ফেইলিওর ইন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশান" গ্রন্থে বলা হয়েছে ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনরতার ঘোষণা করেন। মওদুদ আহমদের "বাংলাদেশ কনস্টিটিউশনাল কোয়েস্ট ফর অটোনামি" গ্রন্থের ২৫৭ পৃষ্ঠায় মেজর জিয়া কর্তৃক ২৭ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার কথা উল্লেখ করা হয়। "মানিকগঞ্জ জেলার ইতিহাস" গ্রন্থের ৭০৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ২৫ মার্চ রাতে পাকবাহিনীর আক্রমণের কথা ও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ওয়্যারলেসের মাধ্যমে হরিরামপুর থানায় পৌঁছলে সেখানকার দেশপ্রেমিক জনগণ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাক বাহিনীকে প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। "বাখরগঞ্জ জেলার ইতিহাস" গ্রন্থের ৫০১০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ২৬ মার্চ সকাল ৮ ঘটিকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার তারবার্তা সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম মঞ্জু পান এবং তিনি তারপর বার্তাটির অনুলিপি পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরেপাজপুর ও ভোলায় পাঠিয়ে দেন। বাংলা ১৩৯৯ সনে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত বর্ষপঞ্জির ২৬ মার্চের পাতায় লেখা হয়েছে : ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা প্রেরণ।

১৯৭১ সালের ১লা মার্চ সারা বাঙলাব্যাপী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এই অসহযোগ আন্দোলনে কেবলমাত্র বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এ আন্দোলনে সেনাবাহিনীতে চাকরিরত সাধারণ বাঙালি সৈনিকদের মধ্যেও বেশ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। তারাও আস্তে আস্তে স্বাধীনতার মোহমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হতে থাকেন। তবে অফিসারদের মধ্যে যারা ছিলেন তাদের অনেকেরই এ ব্যাপারে যথেষ্ট দ্বিধা সংকোচ ছিল। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মেজর জিয়া। তার বিধবা পত্নী খালেদা জিয়া ১৯৯১ সালের ১৯ মার্চ দেশের প্রধানমন্ত্রী হবার পর তার যে জীবন বৃত্তান্ত সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে, তা থেকেই এই উক্তির সারবত্তা মিলে।

এই জীবন বৃত্তান্তে বলা হয়েছে যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যখন মেজর জিয়া বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন, তখন বেগম খালেদা জিয়া প্রথমে চট্টগ্রাম পরে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানি সামরিক অফিসারদের হাতে বন্দী ছিলেন। এই তথ্যই প্রমাণ করে যে, মেজর জিয়া কোনো পূর্ব পরিকল্পনা মতো স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করেননি। হঠাৎ করেই তাকে যুদ্ধে অংশ নিতে হয়েছে। এবং এই হঠাৎ করে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করাতে মেজর জিয়া তার পত্নীকেও বলে যেতে পারেননি। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে তাকে তার অন্যতম সহকর্মী মেজর রফিক যে জোর

করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে নিয়ে গেছেন, এটা দিবালোকের মতোই সত্য। তা না হলে মেজর জিয়া যদি পূর্ব পরিকল্পনা মতো মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতেন তা হলে তিনি তার তৎকালীন তরুণী পত্নী বেগম খালেদা জিয়া ও শিশু পুত্র তারেককে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের ভিতরের বাসায় রেখে যেতেন না। আগেই তাদের সরিয়ে দিতেন। বেগম খালেদা জিয়াকেও এই নয় মাস হানাদার বাহিনীর অফিসারদের হতে বন্দী জীবনযাপনকালে এতো নির্যাতন ভোগ করতে হতো না। মেজর জিয়ার অন্যান্য সহকর্মী ও সেক্টর কমান্ডারগণ যেমন মেজর কে এম সফিউল্লাহ, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, মেজর জয়নাল অবেদীন ও মেজর কাজী নূরুজ্জামান প্রমুখ পূর্ব পরিকল্পনা মতো স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করেছেন এবং সেই মোতাবেক তাদের পরিবার পরিজন স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের অগেই ক্যান্টনমেন্টের বাহিরে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের কারো স্ত্রী পুত্র কন্যাদের পাক হানাদারদের হাতে বন্দী থাকতে হয়নি।

স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগর সরকারকে বেশ কয়েকটি চাপের মধ্যেই কাজ করতে হয়েছিল। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর র‍্যাংকের যে সব অফিসার এই যুদ্ধে অংশ নিয়ে সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের কেউ কেউ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে তারা যে সব সুযোগ সুবিধা ভোগে করতেন, সে সব সুযোগ সুবিধার জন্য দাবি জানাচ্ছিলেন। অন্যদিকে মেজর জিয়া, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর জলিল ও মেজর তাহের এ ধরনের কোনো চাপ না দিলেও যুদ্ধ পরিচালনা এবং যুদ্ধ শেষে দেশের শাসনভার নিজেদের হাতে নেবার একটা প্রচেষ্টা চালায়। মেজর জিয়া ছিলেন এ প্রচেষ্টার প্রদান হোতা। (একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলি, নাজিমুদ্দিন মানিক, পৃ. ৬৪ : ৬৭)।

মেজর জিয়া যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেননি সে সম্পর্কে কিছু প্রমাণ মেলে অধ্যাপক আবু সাইয়িদের লেখায়। তিনি তাঁর লেখায় উল্লেখ করেন, স্বাধীনতার পর সেনাবাহিনীর প্রথম চিফ অব স্টাফ নিয়োগ নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। যুদ্ধকালীন সময়ে মেজর জিয়ার কথাবার্তায় ও কার্যকলাপে তার রাজনীতিবিরোধী মনোভাব ধরা পড়েছিল। তাছাড়া ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নেতিবাচক। তাই মেজর জিয়া সিনিয়র হওয়া সেত্ত্বেও তাকে ডিঙ্গিয়ে কে এম সফিউল্লাকে সেনাবাহিনীর প্রধান নিয়োগ করা হয়। সরকার সশস্ত্র বাহিনীত্রয়ের প্রধান সেনাপতি নিয়োগে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এটা চিরাচরিত নিয়ম। (বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড, ফ্যাক্টস অ্যান্ড ডকুমেন্টস, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, পৃ. ৯৩-৯৪)।

মেজর জিয়ার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহিত্যিক পণ্ডিত ও দার্শনিক অধ্যাপক আহমদ শরীফ লেখেন- জিয়াউর রহমানও ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা, তার ছিল ইসলাম ও পাকিস্তানপ্রীতি, পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঙালি বলে তাকে

হত্যা করবে আশঙ্কায় তিনি মুক্তিযোদ্ধা হন। এবং প্রথমে নিজের নামে ও পরে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন চট্টগ্রামের কালুরঘাট এলাকায় তৈরি বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে। অধ্যাপক আহমদ শরীফ আরো বলেন, "তার ইসলামপ্রীতির সাক্ষ্য প্রমাণ হচ্ছে চার নীতিভিত্তিক সেকুলার সংবিধানকে তিনি করলেন বিসমিল্লাহ জড়িত এবং পাকিস্তানপন্থী ইসলাম পছন্দ রাজাকারদের করলেন তার শাসন ও প্রশাসনের সহযোগী ও বিশ্বস্ত সহচর। (সময় সমাজ মানুষ, অধ্যাপক আহমদ শরীফ, পৃ. ২৫)।

মেজর জিয়া শুধু পাকিস্তানি দালালদের মন্ত্রিসভায় নেয়াই নয়, তিনি ক্রমশ পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দাবি ছিল, অখণ্ড পাকিস্তানের টাকা-পয়সা ও অন্যান্য সম্পত্তির অর্ধেক প্রাপ্য বাংলাদেশের। পাকিস্তানকে সে সব টাকা-পয়সা ধন-সম্পত্তি বাংলাদেশকে ফেরত দিতে হবে। জিয়া সাহেব কিন্তু ঠিক তার উল্টো পথে যাত্রা শুরু করলেন। বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের যে সব সম্পত্তি জাতীয়করণ করা হয়েছিল তিনি সেগুলি পাকিস্তানিদের ফিরিয়ে দিলেন। কিংবা সেজন্য দিলেন উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ। কিন্তু পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের পাওনার কথা তিনি একবারও মুখ ফুটে বললেন না। বরং ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরে তিনি গেলেন পাকিস্তান সফরে। সে সময় পাকিস্তানের সংবাদপত্রসমূহে খবর বেরুলো : প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে নিয়ে একটি কনফেডারেশন গঠনে আগ্রহী। সংযুক্ত পাকিস্তান গঠনের কথাটা তখন আবার বাজারে চালু হলো। (বাংলাদেশ: ষড়যন্ত্রের রাজনীতি জিয়া পর্ব, পরেশ সাহা, পৃ. ৩৮)

মেজর জিয়ার পাকিস্তান প্রীতি সম্পর্কে প্রখ্যাত লেখক আবদুল মতিন লেখেন-ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর জিয়া মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত সাম্প্রদায়িক শক্তি ও পাকিস্তানপন্থী রাজাকারদের রাষ্ট্রীয় জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠত করার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুর চার মূলনীতিভিত্তিক বাংলাদেশকে দ্বিতীয় পাকিস্তানে পরিণত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়, আবদুল মতিন, পৃ. ৮৫)।

মেজর জিয়ার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা ছিল যে, তিনি মুক্তিযুদ্ধের চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী না হয়েও সময় ও পরিবেশের চাপে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। এ সম্পর্কে অধ্যাপক আবু সাইয়িদ লেখেন, ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল তেলিয়াপাড়ার হেডকোয়ার্টারে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাঙালি সামরিক অধিনায়কগণ সমবেত হন। সেখানে উপস্থিত সামরিক অধিনায়কদের মধ্যে ছিলেন কর্নেল ওসমানী, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর কাজী নুরুজ্জামান, মেজর নুরুল ইসলাম, মেজর কে এম শফিউল্লাহ, মেজর মঈনুল হোসেন চৌধুরী, লেঃ কর্নেল ওসমানীকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ সিদ্ধান্তে প্রকাশ্যে কোন বিরোধিতা দেখা না দিলেও ভিতরে ভিতরে কোনো কোনো সামরিক অফিসারের মধ্যে এ বিষয়ে স্পষ্টতই দ্বিমত ছিল। কারণ মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের দাবিদার

ছিলেন মেজর জিয়া, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর কে এম শফিউল্লাহ। মেজর জিয়া কোনোরূপ যুদ্ধ বা সশস্ত্র প্রতিরোধে অংশগ্রহণ না করে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বিপ্লবী সরকারের প্রধান বলে নিজেকে ঘোষণা করেন এবং প্রায় একই সময়ে সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেছিলেন। তেলিয়াপাড়ার সামরিক অধিনায়কদের বৈঠকে উপস্থিত হয়েই মেজর জিয়া অতি সহজেই বুঝতে পারেন যে সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসেবে তার বেতার ঘোষণা তার জন্য শুভ প্রতিক্রিয়া বয়ে আনেনি। মেজর জিয়া সভায় হাজির হয়ে বুঝতে পারেন যে, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব বা মুক্তিবাহিনীর সেনাপতির পদ দখল করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। কেননা ইতোমধ্যেই মেজর খালেদ মোশাররফ এবং কে এম শফিউল্লাহ সমঝোতামূলক ঐক্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। মেজর সফিউল্লাহ ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফের কাছাকাছি লোক। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে চাকরিরত অবস্থায়, জিয়াউর রহমান বাঙালিদের প্রতি অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সম্পর্কে অনিশ্চয়তার রাজনীতি সচেতন খালেদ মোশাররফের নিকট স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র নেতৃত্বদান মেজর জিয়া ছিলেন অগ্রহণযোগ্য। শফিউল্লাহ খালেদের সমঝোতায় ক্ষুব্ধ মেজর জিয়ার নিকট ওই অবস্থায় কর্নেল ওসমানীকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় সামরিক নেতৃত্ব প্রদানের বিষয়টিতে সম্মতি জ্ঞপন ব্যতীত অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। (জেনারেল জিয়ার রাজত্ব, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, পৃ ৯-১০)।

মেজর জিয়ার বিশ্বাসই ছিল না যে, সত্যি সত্যি পাকিস্তানিরা তাদের ওপর আক্রমণ করতে পারে। সেজন্য ২৬ মার্চ মেজর জিয়া চট্টগ্রাম বন্দরে এম ভি সোয়াত থেকে অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ নামানোর কাজে সাহায্য ও তদারকি করার জন্য রওনা হন। পথিমধ্যে জানতে পারেন পাকিস্তান আর্মি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কেন্দ্র আক্রমণ করে বহু সেনা অফিসারকে হত্যা করেছে। তখন মেজর জিয়া সটকে পড়েন। মেজর জিয়া যখন চট্টগ্রাম হতে পটিয়ার দিকে রিট্রিট করেন সে সময় মেজর রফিক বিপদ ও বাঁধা সত্ত্বেও বীরত্বের সঙ্গে চট্টগ্রামে যুদ্ধে পরিচালনা করেছেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মেজর জিয়া প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করেও বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করে হিরো বনে যান। (জেনারেল জিয়ার রাজত্ব, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, পৃ. ৬)।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মেজর জিয়া তার সমসাময়িক বাঙালি অফিসারদের সচেতনভাবে এড়িয়ে চলতেন, এর কারণ ছিল বেশি সুযোগ সুবিধার আশা। সাচ্চা পাকিস্তানি না হলে সুযোগ সুবিধা পাওয়ার আশা ছিলো কম। সুযোগ সুবিধার সোনার চাবিটা ছিল পাকিস্তানি অফিসারদের হাতে। তারা সুযোগ সুবিধা দিতেন তাদের পছন্দসই সামরিক অফিসারদের। আর এই পছন্দের মাপকাঠি ছিলো পাকিস্তানিপ্রীতি এবং বাঙালি বিদ্বেষী। এক্ষেত্রে মেজর জিয়া ছিলেন তাদের পছন্দসই ব্যক্তি। মেজর জিয়া তার চলনে-বলনে, আচার-আচরণে, চিন্তা চেতনায়-একজন শুদ্ধতম পাকিস্তানি হিসেবে গড়ে ওঠার সামান্য সুযোগটুকু হাতছাড়া করেননি। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর আস্থাভাজন হওয়ার ক্ষেত্রে

মেজর জিয়ার নিরলস প্রচেষ্টার দাসানুগ আচরণ তদানীন্তন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাঙালি অফিসারদের অনেকের নিকট দৃষ্টিকটু হলেও এক্ষেত্রে তাদের কারার কিছুই ছিলো না। বাঙালিদের বীতশ্রদ্ধ প্রভুভক্ত গর্বোদ্যত এই তরুণ সামরিক অফিসারটি গোপন সার্ভিস রেকর্ডের মাধ্যমে অতি স্বল্প সময়েই কর্তা ব্যক্তিদের নজরে আসতে সমর্থ হন, পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠী ও বাঙালি রাজনীতিবিদ, আমলা, সামরিক অফিসারদের মধ্য হতে তাদের একান্ত অনুগত বাধ্যনুগত বিশ্বস্ত বসংবদ সৃষ্টি চেষ্টায় সর্বদাই তৎপর ছিলেন। সামরিক ক্ষেত্রে মেজর জিয়ার এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড ও পাকিস্তানপ্রীতির দৌলতে এবং সামরিক কর্মকাণ্ডের তার স্বাভাবিক নিয়মনিষ্ঠা আচার আচরণ ইত্যাদি মিলিযে ক্যাপ্টেন জিয়া অচিরেই পাকিস্তানি সামরিক অধিনায়কদের প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠেন। সেই জন্যই ১৯৫৮ সালে আইয়ুবের সামরিক শাসক জারির পরপরই বাঙালি রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের ও ছাত্রদের সম্পর্কে গোপন রিপোর্ট প্রদানের দায়িত্বে মেজর জিয়াকে জেনারেল আইয়ুব খান বেছে নিতে ভুল করেননি। আইয়ুবের আর্শীবাদ নিয়ে মেজর জিয়া আইয়ুবের পক্ষে কাজ করার দায়িত্ব নিয়ে সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর কর্মকর্তা হয়ে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে পোস্টিং পান। সামরিক গোয়েন্দা কর্মকর্তা হিসেবে ফিণ্ড মার্শাল আইয়ুবের কর্মকাণ্ডের সফল বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তি হিসেবে ক্যাপ্টেন জিয়া প্রায় দুই বছর পাঞ্জাব রেজিমেন্টে কর্মরত থাকাকালে পাঞ্জাবি সামরিক কর্তৃপক্ষের আরো বিশ্বস্ততা অর্জন করেছিলেন। তারই ফলে ১৯৫৯ সালে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে মেজর জিয়াকে বেশ কিছুদিন দিনাজপুরে অবস্থান করতে হয়। এখানেই অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী বেগম খালেদার সাথে তার পরিচয় এবং পরিণয়। বিয়ের বেশ কিছু মাস তদানীন্তন শাহবাগ হোটেলে বৌ-ভাত অনুষ্ঠিত হয়। সামরিক শাসনের অধীনে অতিথি আপ্যায়নের বিধি মেজর জিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি। (জে. জিয়ার রাজত্ব, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, পৃ. ৩৪)।

মেজর জিয়ার পাকিস্তান প্রেমপ্রীতি থাকাটা স্বাভাবিক। কারণ তিনি পাকিস্তানি সাচ্চা পরিবেশের মধ্য দিয়েই বড় হয়েছেন। কলকাতার হেয়ার স্কুলে মেজর জিয়ার শিক্ষাজীবন শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর জিয়ার পিতা মনসুর রহমান চাকরি করার সুবাদে পূর্ববাংলায় না এসে পাকিস্তান চলে যান সপরিবারে। জিয়ার বয়স তখন বার বছর বাংলার বুকে শুরু হয় ভাষার জন্য রক্তদান ১৯৫২ সালে। বাংলায় যখন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার বাংলা ভাষার জন্য বুকের রক্ত ঢেলে দিচ্ছে, মেজর জিয়া তখন করাচিতে উর্দু শিখতে ব্যস্ত। কাজেই ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে কোনো ধারণা বা ভাষা আন্দোলনের চেতনা ও মর্মবাণী ধারণ করা তার পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিলো না। জিয়া ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান সামরিক একাডেমীতে একজন অফিসার ক্যাডেট হিসেবে বিশেষ কমান্ডো ট্রেনিং লাভ করেন। ওই কলেজে এবং একাডেমীতে পরিবেশগত পরিমণ্ডল এমনই ছিলো যে খাঁটি পাকিস্তানি না হলে ওই কলেজে ঢোকা একজন বাঙালির পক্ষে সম্ভব ছিলো

না। মেজর জিয়ার সুবিধা ছিলো এই যে তাকে কোনো সময় বাংলা বলতে হয়নি এবং বাঙালি বলে পরিচয় দেয়া ছিলো তার একেবারেই অপছন্দ। এই অপছন্দের দিকটিই তার চাকরিক্ষেত্রে পদোন্নতির বিশ্বস্ত মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। একজন খাঁটি পাকিস্তানি হিসেবে মেজর জিয়ার গায়ে 'বাঙালি' বা প্রাদেশিকতার গন্ধ না থাকায় পাকিস্তানি সামরিক অধিনায়কদের পছন্দের লোক হতে তার কোনো অসুবিধা হয়নি। অনেকেই তার কথায় ও কণ্ঠস্বরে উর্দু বাচনভঙ্গির যে আমেজ লক্ষ করেন, তাদের হয়তো অজানা যে, মেজর জিয়া যে স্কুলে বা কলেজে অধ্যয়ন করেছেন, সে সব প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষা তার পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। কিশোর জীবনের মানস গঠনের প্রাক্কালে পিতার চাকুরিসূত্রে বাঙালি সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন, আত্মীয় পরিজন থেকে সিটকেপড়া এবং বাংলাদেশের নিয়ম চেতনার বিপরীতে একটি ভিন্ন পরিবেশে ও পরিস্থিতির মধ্যে মেজর জিয়ার শৈশব জীবন শুরু হয়। করাচি একাডেমী স্কুলে ভিন্ন ভাষা ও ভিন্ন আচরণগত দিকের সাথে খাপ খাইতে গিয়ে এবং তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলার প্রতিযোগিতায় জিয়ার কিশোর জীবন বাঙালিদের মানস গড়নে গড়ে উঠেনি। (জেনারেল জিয়ার রাজত্ব, আধ্যাপক আবু সাইয়িদ, পৃ. ১-২)।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ২৫ মার্চ রাতে স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে যে ডাক ও ঘোষণা দিয়ে ওয়্যারলেস মেসেজটি পাঠান তা পৌঁছে যায় বাংলার আনাচে-কানাচে। এ সম্পর্কে কয়েকটি জেলার কথা উল্লেখ করা হলো।

কিশোরগঞ্জ : ২৬ মার্চ ভোরে কিশোরগঞ্জে আওয়ামী লীগের বরাবর সদর থানা ওয়্যারলেস সেটের মাধ্যমে ঢাকা থেকে বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা পৌঁছে।

চুয়াডাঙ্গা : ২৫ মার্চ রাতেই তার বার্তাটি আওয়ামী লীগ নেতা সংসদ সদস্য ইউনুস আলী এডভোকেটের হাতে পৌঁছে যায়।

গাজীপুর : ২৬ মার্চ সকালে স্থানীয় তার অফিস থেকে বঙ্গবন্ধুর পাঠানো রাতের বার্তাটি তার অফিসের কর্মচারীরা নেতাদের কাছে পৌঁছে দেন।

টাঙ্গাইল : কাগমারী ওয়্যারলেস কেন্দ্রে বার্তাটি প্রথম ধরা পরে। ইংরেজিতে পাঠানো বার্তাটি কাগমারী ওয়্যারলেস কেন্দ্র থেকে টাঙ্গাইল থানায় পাঠানো হয়। থানা থেকে জেলা আওয়ামী লীগ অফিসে খবর পাঠানো হয়। খন্দকার আসাদুজ্জামান ও খন্দাকার আব্দুল বাতেন সহ জেলার নেতৃবৃন্দ তা প্রচার করেন। অপরদিকে মির্জাপুরের গোড়াইয়ে অবস্থিত ক্যাডেট কলেজের ওয়্যারলেসেও ধরা পড়ে। প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ফজলুর রহমান খান তা গ্রহন করেন এবং মাইকযোগে সারা জেলায় প্রচার করেন।

মানিকগঞ্জ : সদর থানার ওয়ারলেস কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ সংকলিত বার্তা ধরা পড়ে। বার্তা পাওয়ার সাথে সাথেই মানিকগঞ্জ ট্রেজারি থেকে অস্ত্রশস্ত্র দখল করে ছাত্র যুবকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

সিলেট : সিলেটে পুলিশ ওয়ারলেসে বঙ্গবন্ধুর ১টি বার্তা দেওয়ান ফরিদ গাজীর কাছে আসে। কিন্তু সিলেটের পুলিশ সুপার তা গোপন করে ফেলে। একজন কনস্টেবল ব্যাপারটা জেনে ফেলেন এবং নেতাদের কাছে মূল বক্তব্যটি পৌঁছে দেন।

শেরপুর : ২৫ মার্চ সকালে সংগ্রাম পরিষদের অফিসে স্বাধীনতার বার্তাটি পৌঁছে দেন ওয়্যারলেস কেন্দ্রের কর্মীরা। নিউ মার্কেটের সামনে এক বিশাল সমাবেশে বার্তাটি পড়ে শোনানো হয়।

বরিশাল : বরিশালে ২৬ মার্চ সকালে পুলিশের বেতার কর্মীদের কাছ থেকে বার্তটি পাওয়া যায়। বার্তাটি পাওয়ার সাথে সাথে সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে বরিশাল সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলা সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

নোয়াখালীর পুলিশের রেঞ্জ ইন্সপেক্টর এস ইউ খান চৌধুরী বার্তাটি পেয়ে সাথে সাথে পাঠিয়ে দেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল মালেক উকিলের কাছে। একই সাথে জেলা প্রশাসক মনযুর উল করীমও এই বার্তা পান। পরদিন ২৬ মার্চ সার্কিট হাউসের সামনে এক সমাবেশে জেলা প্রশাসক নিজে বার্তাটি পড়ে শোনান। এই রকম বেশ কয়েকটি জেলার প্রাপ্ত তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রত্যক্ষ যুদ্ধ শুরু করার বার্তাটি প্রায় সকল জেলায় ও মহকুমাতেই পৌঁছেছিল। সেখানে সিলেটের মতো ঘটনা থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ সিলেটের পুলিশ কর্মকর্তা ওয়্যারলেসের বার্তাটি পাওয়ার পর লুকিয়ে ফেলেছিল। (বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ইতিহাস : একটি অনুসন্ধান : মোহাম্মদ হান্নান, পৃ.৫০)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে ড. মযহারুল ইসলাম লেখেন- ২৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেন- বাংলার মানুষ কারও করুণার পাত্র নয়। আপনার শক্তির দুর্জয় বলেই তারা মুক্তি ছিনিয়ে আনবে। বঙ্গবন্ধু আরো বলেন-'মনে রাখবেন সর্বাপেক্ষা কম রক্তপাতের মাধ্যমে যিনি চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন তিনিই সেরা সিপাহশালার।' মুজিব বলেন-'মুক্তির লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবই। বাংলার মানুষকে আর পরাধীন করে রাখা যাবে না।

ওইদিন বঙ্গবন্ধু আরো বলেছিলেন-আগামীকাল সমস্যার সুরাহা না হলে বাঙালি নিজের পথ নিজেরাই বেছে নিবে। সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে কোনো ষড়যন্ত্র দাবিয়ে রাখতে পারবে না। দাবি আদায় না পর্যন্ত চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকুন। বঙ্গবন্ধু বলেন-আমার মাথা কেনার শক্তি কারও নেই। আমি বাংলার মানুষের সাথে শহীদের রক্তের সাথে বেইমানী করতে পারবো না।

বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল চালিকাশক্তি ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাইতো ক্যাপ্টেন রফিক ২৩ মার্চ, '৭১-এ জনাব এম আর সিদ্দিকীকে ঢাকায় যাবার অনুরোধ করে বলেন-"শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করে তাকে তার সদর দপ্তর চট্টগ্রামে স্থাপন করার অনুরোধ জানাতে

বললাম। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার আড়ালে বাংলাদেশে সৈন্য ও রসদ আনতে থাকে। তাদের কার্যকলাপে সন্দিহান হয়ে মুজিব চিন্তা করতে থাকেন ঢাকার বাইরে কোন গোপন স্থান হতে স্বাধীনতার মন্ত্র ব্রডকাস্ট করে দেশবাসীকে নির্দেশ দেয়া যায় কিনা। এমতাবস্থায় ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণার মোক্ষম সময়ের জন্য ধৈর্য ধারণ করেও তিনি পূর্ব সতর্কতাস্বরূপ ২৪ মার্চ,'-এর রাতেই চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা এম আর সিদ্দিকীকে টেলিফোনে জানিয়ে দিলেন হানাদার বাহিনীর যে কোন সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য।

২৫ মার্চ-এর রাত ১২টার আগে হানাদার পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ঢাকার পিলখানার ইপিআর হেডকোয়ার্টার এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আক্রমণ চালিয়ে বাংলার গণহত্যা শুরু করে। ঢাকা শহরে আগুন লাগিয়ে পোড়াতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে রাত ১২টার পরে অর্থাৎ ২৬ মার্চ, '৭১-এর শুরুতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে বাধ্য হন। স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী ছেড়ে দেবার পর মুহূর্তেই হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যরা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে।

চরম ধৈর্যসহকারে গণতান্ত্রিক পন্থায় বাংলার স্বাধীনতা সূর্যকে বাঙালির হাতের নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছে শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গণতান্ত্রিকতা বজায় রাখতে পেরেছে সেটা মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কৃতিত্ব। আন্তর্জাতিক আইন মোতাবেক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা এবং আওয়ামী লীগ কর্তৃক গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা ছিল সম্পূর্ণ বৈধ। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের মতানুসারে, "যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর না করা হয় এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বাঁধার সৃষ্টি করা হয় তাহলে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল জনগণের ইচ্ছানুসারে ফেডারেশন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে পারে" ।(স্বাধীনতার ঘোষক, কে ইমন সরকার, পৃ. ২৬-২৯)।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও বাংলা একাডেমীর প্রাক্তন মহাপরিচালক ড. মযহারুল ইসলাম "স্থপতি এবং ঘোষক" শীর্ষক এক নিবন্ধে স্বাধীনতা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় ঘোষণার কথা উল্লেখ করেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক সশস্ত্র আক্রমণ শুরু হওয়ার পর এই ঘোষণাটি ইংরেজিতে তৈরি হয়। ঘোষণাটি ওয়্যারলেসে পাঠাবার পর যাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়, তাদের মধ্যে ছিলেন বঙ্গবন্ধুর বিশিষ্ট রাজনৈতিক সহচর ও চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের নেতা জহুর আহমদ চৌধুরী।

ড. মযহারুল ইসলাম বলেন : বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রদত্ত একটি সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেন যে, ঘোষণাটি কেবল প্রেরণ করেই নিশ্চিত হতে পারেনি। তিনি টেলিফোনে জহুর আহমদ চৌধুরীকে এই ঘোষণার কথা ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কী

হবে, তাও জানিয়ে দিয়েছিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে জহুর আহমদ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তিনি এই ঘটনার সত্যতা আমার নিকট স্বীকার করেছিলেন। মরহুম জহুর আহমদ চৌধুরী আমাকে একথাও বলেছিলেন যে, তিনি ঘোষণার একটি কপি জনাব হান্নানকে দিয়েছিলেন এবং হান্নান সাহেব এই ঘোষণাটি বঙ্গানুবাদ করে চট্টগ্রামের বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে পড়ে শুনিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে কাজী ফজলুর রহমান লিখেছেন- গত রাত বারোটায় আতিক টেলিফোন করে বলল, শুনছেন শেখ সাহেব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে, ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় লড়াই চলছে। (দিনলিপি একাত্তর, কাজী ফজলুর রহমান, পৃ.২১)।

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান ও জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা যখন সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন তখন করাচিতে অ্যান্থনি ম্যাসকারেন হাসের পাশে বসা শেখ মুজিব সক্রোধে বলেন আমাদের স্বাধীন হতে হবে। আমাদের স্বাধীন স্থল, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী থাকতে হবে। আমি অবশ্যই এসব দেখব।

দেশবাসী এবং বিশ্ববাসীর কাছে যাতে অসংলগ্ন মনে না হয় সেই দিকে লক্ষ রেখে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হন। ১৯৬৯ সালে সোহরাওয়ার্দী-ফজলুল হক সাহেবের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে শেখ মুজিব বলেছিলেন-"আজ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের নাম হবে বাংলাদেশ। এটা ছিল মুজবের স্বাধীনতাকামী মনের বহিঃপ্রকাশ। (স্বাধীনতার ঘোষক কে, ইমন সরকার, পৃ. ২৮)।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কর্তৃক ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, " ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারিত হলো চট্টগ্রাম রেডিও থেকে। (স্মৃতি অম্লান ১৯৭১, আবুল মাল আবদুল মুহিত পৃ. ৩৫)।

বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গে জাসদ নেতা কাজী আরিফ বলেন, ১৯৭১ সালের ১৮ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান একটি গোপন বৈঠকে শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদকে ডাকেন এবং স্বাধীনতার প্রস্তুতির জন্যে ছাত্র যুবকদের সংগঠিত করার নির্দেশ দেন। ২১ জানুয়ারি উল্লিখিত ৪ জনসহ তাজউদ্দিন আহমদকে নিয়ে শেখ মুজিব দ্বিতীয় বৈঠকে মিলিত হন। শেখ মুজিব বলেন, আমি যদি না থাকতে পারি, তাজউদ্দিন আহমদ সরকার গঠন করবে। তাজউদ্দিন আহমদের সাথে যোগাযোগ রেখে আরো সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তুলবেন।

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের সভায় স্বাধীনতার ঘোষণা, ইশতেহার ও প্রস্তাব পাঠ করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এই সভায় বক্তৃতা করেন। সভার প্রস্তাবে বলা হয়; স্বাধীন বাংলাদেশে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্টা করে

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম করা হবে। স্বাধীন বাংলাদেশের জাতির পিতা হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

অন্যদিকে ইশতেহারে বলা হয় : আজ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করা হলো। ৫৪ হাজার বর্গমাইলে ৭ কোটি মানুষেরে এই আবাসভূমি রাষ্ট্রের নাম বাংলাদেশ। স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্যে স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি ও মুক্তি বাহিনী গঠন করে সশস্ত্র প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেন-বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র আমরাই রচনা করবো। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের আলাদা শাসনতন্ত্র রচনার আহ্বান জানাব। (বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ইতিহাস, একটি অনুসন্ধান, মোহাম্মদ হান্নান. পৃ. ২৯-৩০, ৩১)।

স্বাধীনতার ঘোষণা ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে খন্দকার কামরুল হুদা তাঁর "স্বাধীনতা সংগ্রাম ও শেখ মুজিব" নামক গ্রন্থে ইপিআর-এর ওয়্যারলেসযোগে মধ্যরাতে স্বাধীনতা ঘোষণার কথা উল্লেখ করেন। তিনি লিখেছেন, ২৫ মার্চ মধ্যবর্তী রাত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইপিআরের ওয়্যারলেস যোগে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। খন্দকার কামরুল হুদা তার গ্রন্থের "বীর চট্টলার প্রতিরোধের বীরগাথা" অধ্যায়ে মেজর জিয়ার আগমন অংশে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা সম্পর্কে লেখেন, ২৫ মার্চ রাত ১২টার পর জহুর আহমদ চৌধুরীর বাসভবনের একটা ওয়ারলেস মেসেজ আসে। তাতে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার কথা বলা হয়। বঙ্গবন্ধুর সেই ঘোষণা সেই রাতেই বাংলায় সাইক্লোস্টাইল করে বিলি করা হয়। এ গ্রন্থে আরো লেখেন, আসলে ওটা ছিল ডা. নুরুন্নাহার জহুর কর্তৃক গৃহীত ম্যাসেজ যা তিনি লিখে নিয়ে মধ্যরাতেই একাধিক কপি করে সংগ্রাম পরিষদের নেতাসহ বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করেন। যেহেতু বিপর্যস্ত ও অস্থির অবস্থার কারণে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে ওয়্যারলেস স্টাফদের যোগাযোগ ছিল না কিংবা ডা. নুরুন্নাহার জহুরের সাথে অজানা নেতৃবৃন্দের ঘোষণা সম্পর্কে সরাসরি কথাবার্তা তথা বাণীর আগমন সূত্র সম্পর্কে পরস্পর বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ হয়নি বা এ সবের প্রয়েজনীয়তা তখন কেউ অনুভব করেননি, তাই অনেকেই মনে করেছিলেন এটা ওয়ারলেস স্টাফরাই রাতে জহুর আহমদ চৌধুরীর কাছে পাঠিয়েছেন ওয়্যালেস মেসেজ গ্রহণকারী স্টাফরাই বলেছেন তারা বাণীটির ব্যাপারে রাতে শুনেছেন কিন্তু সকালেই তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হন।

১৯৯৫ সালের ২১ ফেব্রয়ারি ঢাকা থেকে প্রকাশিত সৈয়দ নূর আহমদ লিখিত, "ইতিহাস কথা বলে"। গ্রন্থে স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে অপরদিকে রাতের অন্ধকারে পাকসেনারা বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে চড়াও হয়ে তাঁকে আটক করে। ঐ রাতেই বন্দী হওয়ার পূর্বমুহূর্তে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন ৩২ নং রোড ধানমন্ডি হতে। ২৫ মার্চ রাতেই ওয়্যারলেসে চট্টগ্রামে প্রেরিত এক বাণীতে বলেন, 'পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকা নগরীর নিরীহ মানুষ ইপিআর সেনাবাহিনী ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে হামলা চালিয়েছে। এর প্রেক্ষিতে

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হলো। আপনারা যুদ্ধ চালিয়ে যান। আমরা অবশ্যই জয় লাভ করবো। আল্লাহ্ আমাদের সহায়। জয় বাংলা।

১৯৭৬ সালের ২৬ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত মেজর জিয়ার বাণীর উদ্ধৃতি, আমি মেজর জিয়া বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর অস্থায়ী সেনাপতি শেখ মুজিবের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। আমি আরো ঘোষণা করছি যে, আমরা ইতোমধ্যেই শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীনে একটি সার্বভৌম আইনানুগ সরকার গঠন করেছি যা সংবিধান ও আইন অনুযায়ী কাজ চালাতে প্রতিশ্রুত। সুতরাং আমরা বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক ও শান্তিকামী দেশের প্রতি আইনসঙ্গত ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের প্রতি স্বীকৃতি প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি। (১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষিত) ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের সংবাদ ম্যাগাজিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণা শিরোনামের শেষ প্রচ্ছদে একটি বাণী প্রচারিত হয়। বাণীটি ছিল : পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতে পিলখানা ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরে লোকদের হত্যা করছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের রাস্তায় রাস্তায যুদ্ধ চলছে। আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর ও বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোনো আপস নেই- জয় আমাদের হবেই। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাপ্রিয় লোকদের এই সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।

শেখ মুজিবুর রহমানের উক্ত বাণীটির নীচে লেখা রয়েছে চট্টগ্রাম ইপিআর ওয়্যারলেস ঘাঁটি এবং জহুর আহমদ চৌধুরীকে প্রেরিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক বাণী-যারা এই বাণী গ্রহণে ও প্রেরণে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন এ কে এস এম এ হাকিম, মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন, আবুল ফজল ও সফিকুল ইসলাম। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৯৬ শিক্ষা বছরের জন্য নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক হিসেবে নির্ধারিত "বাংলাদেশের ইতিহাস" পুস্তকের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় শেষ অনুচ্ছেদে স্বাধীনতা ঘোষণা" উপশিরোনামে উল্লেখ করা হয়। বন্দী হওয়ার পূর্বে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণার একটি লিখিত বাণী চট্টগ্রামের জহুর আহমদ চৌধুরীসহ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। চট্টগ্রাম "স্বাধীন বাংলা বেতারে" এটি প্রচার করা হয়। ২৭ মার্চ অষ্টম রেজিমেন্টের মেজর জিয়া স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করেন। তখন থেকে শুরু হয় ব্যাপকভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধ। (স্বাধীনতার ঘোষক বঙ্গবন্ধু প্রামাণ্য দলিল, মুহাম্মদ শামসুল হক-পৃ. ১৯-২৪)।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক এটা জেনারেল ইয়াহিয়া ও জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ পাকিস্তানি বিভিন্ন রাজনীতিবিদ এবং সমর নায়কদের বক্তব্য থেকেও প্রমাণিত হয়েছে। খুনি পাক-চক্রের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ রেডিও পাকিস্তানে জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান তার অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে দেশদ্রোহিতামূলক কাজ করেছেন। তারা একটা সমান্তরাল সরকার চালাতে চেষ্টা করেছেন। শেখ মুজিব যে ঘোষণার প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেটা একটা ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই লোক এবং তার দল পাকিস্তানের শত্রু আর তাঁরা পূর্বপাকিস্তানকে দেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করতে চান। তিনি দেশের ঐক্য ও সংহতিকে আক্রমণ করেছেন এ অপরাধের শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

এরপর ২৮ জুন জেনারেল ইয়াহিয়া খান রেডিওতে আর একটি ভাষণ দেন জাতির উদ্দেশ্যে। ঐ ভাষণে তিনি বলেন : আমি যখন রাজনৈতিক দলগুলোর বৈঠকের জন্য চেষ্টা করলাম তখন একথা স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে মুজিব তার দাবিতে কোনো পরিবর্তন করতে রাজি নন। আর তার দাবিটা ছিল সোজা কথায় বলতে গেলে বিচ্ছিন্নতার দাবি। শেখ মুজিব আগে থেকেই মনস্থির করেছিল যে তিনি দেশকে দুটি অংশে বিভক্ত করবেন। কৌশলে হলে ভালো না হলে বল প্রয়োগ করে একদিকে মুজিব আমাদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল আর অন্যদিকে তিনি ও তার দলের লোকেরা বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্যে গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তারা চেয়েছিল যে এই পরিকল্পনার মাধ্যমে তারা বাংলাদেশ নামে একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন। (বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ইতিহাস ১টি অনুসন্ধান মোহাম্মদ হান্নান, পৃ. ৬৮-৬৯)।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এবং তিনি দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এটা জনাব ভুট্টোর বক্তব্য থেকেও প্রমাণিত হয়। জনাব ভুট্টো বলেন : পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে শেখ মুজিবের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। তিনি জনগণকে ভুল পথে চালিত করেছিলেন এবং প্রকৃতই তিনি পাকিস্তানের সংহতিতে বিশ্বাস করেন না। ২৩ মার্চ চূড়ান্ত খেলা দেখানো হয়। বাংলাদেশের নতুন পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলা হয়। তাছাড়া জাতির পিতার প্রতিকৃতি পদদলিত করা হয়। ১৯৬৬ পূর্ব পাকিস্তানকে দেশের পশ্চিমাঞ্চল থেকে পৃথক করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। জনাব ভুট্টো আরো বলেন : সাথে সাত কোটি লোকের দেশকে বক্তৃতা স্লোগান এবং অন্যভাবে উৎসাহিত করে বিভক্ত এবং ধ্বংস করা যাবে না। তিনি বলেন, যেখানে নাইজেরিয়ার মতো দেশ একটি অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন হতে দিল না সেখানে পাকিস্তানও দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড হতে দিতে পারে না। (স্বাধীনতার ঘোষণা ও বঙ্গবন্ধু, ড. আনোয়ারুল ইসলাম পৃ. ১৯৬)।

কাইয়ুমপন্থী পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট আব্দুল কাইয়ুম খান বলেন যে কেবলমাত্র তার দলই শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার ৬ দফার খোলাখুলি

বিরোধিতা করেছে এবং ৬ দফার সম্পর্কে দেশকে হুশিয়ার করে দিয়েছে। আজ এটি স্পষ্ট হয়েছে যে ৬ দফা আসলে পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন করার কর্মসূচি এবং শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের এজেন্ট। (স্বাধীনতার ঘোষণা ও বঙ্গবন্ধু ডা. আনোয়ারুল ইসলাম, পৃ. ১৯৮)। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর জনসংযোগ অফিসার মেজর সিদ্দিক সালিক তার উইটনেস টু সারেন্ডার বইতে বেতারে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণার কথা উল্লেখ করেন। ভারতে নিয়োজিত দি ডেইলি টেলিগ্রাফ-এর লোশাকের বই পাকিস্তান ক্রাইসিস থেকে তিনি নিম্নে বর্ণিত উদ্ধৃতি দেন :

যখন প্রথম গুলিটি বর্ষিত হলো ঠিক সেই মুহূর্তে সরকারি মালিকানাধীন পাকিস্তান রেডিওর তরঙ্গের কাছাকাছি একটি তরঙ্গের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। শেখ সাহেব পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর বাণী নিশ্চয় ইতোপূর্বে রেকর্ড করা হয়েছিল এবং তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে তাই মনে হয়েছিল। (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়, আব্দুল মতিন, পৃ.১৯)।

বিদেশি পত্রপত্রিকা থেকেও প্রমাণ মিলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছিল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে যে সব খবরা-খবর প্রকাশ হয়েছে তাতে এর একটা পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। ১৯৭১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারিতে "লন্ডন টাইমস" লিখেছেন শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের উদ্দেশে প্রদত্ত বিবৃতিতে পূর্বপাকিস্তানের পরিবর্তে "বাঙালি" জাতির কথা উল্লেখ করেন।

২৪ ফেব্রয়ারি লিভারপুল ডেইলি পোস্ট" মন্তব্য করে এখন আশঙ্কা করা হচ্ছে যে পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ পূর্বপাকিস্তান নিজেকে স্বাধীন বাঙালি মুসলিম প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করবে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি লাভ করে এখন আর পূর্বপাকিস্তানের কথা বলছেন না, বলছেন বাঙালি প্রজাতন্ত্রের কথা। হোয়াইট হলে এটা অনুধাবন করা হচ্ছে যে বৃটিশ সরকার একটি কমনওয়েলথভুক্ত দেশ বিভক্তির মারাত্মক সম্ভাবনার মুখোমুখি হচ্ছেন। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকা ২ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের সাংবাদিক সম্মেলনের খবর প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি তাতে লিখেছেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় তাড়াহুড়ো করে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বলেন, আওয়ামী লীগ মার্চ মাসের ৭ তারিখে একটি জনসভা অনুষ্ঠান করা এবং এই সভায় তিনি বাংলার জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের দাবি প্রদান করবেন। তিনি স্বাধীনতা দাবি করবে কিনা একথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন অপেক্ষা করুন।

১৯৭১ সালের ৯ মার্চ লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাম পত্রিকা মন্তব্য করেন শেখ মুজিবুর রহমান পূর্বপাকিস্তানের স্বাধীনতা একরকম ঘোষণাই করেছেন ২৫ মার্চ

জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদানের পূর্বশর্ত হিসেবে প্রদত্ত ৪ দফা দাবির মধ্যেই এ কথা লুকায়িত রয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব তাঁর আন্দোলনকে স্বাধীনতার আন্দোলন বলে অভিহিত করে জাতীয় পরিষদে সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন শর্ত আরোপ করেন যা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মেনে নিতে পারেন না। একই দিনে ডেইলি টেলিগ্রাফ এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেন আমরা ইতোমধ্যই পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান এর সম্ভাব্য নামকরণ শুনছি যা বাংলাদেশ কিংবা বঙ্গভূমি হতে পারে। এর পতাকাও বানানো হয়েছে।

১৩ মার্চ 'লন্ডন ইকোনমিস্ট লিখেছেন প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ২৫ মার্চ তারিখে গণ-পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের জবাবে শেখ মুজিব চারটি শর্ত আরোপ করেন যা তাঁর এবং আওয়ামী লীগ অধিবেশনে যোগদানের পূর্বেই পূরণ করতে হবে। আওয়ামী লীগের ওই শর্ত প্রেসিডেন্টের মেনে নেওয়া অসম্ভব।

১৪ মার্চ ভারতের স্টেটসম্যান পত্রিকা বঙ্গবন্ধুর নতুন দাবি করা নির্দেশের বরাত দিয়ে মন্তব্য করেন। মিস্টার মুজিবুর বলেছেন যে তিনি বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করেছেন।

১৫ মার্চ নিউইয়র্ক ভিত্তিক "টাইম" সাপ্তাহিক রিপোর্ট করে পাকিস্তানকে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত করার পিছনে যে মানুষটি রয়েছেন তিনি হচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান। গত সপ্তাহে ঢাকায় শেখ মুজিব "টাইম" এর সংবাদাদাতা ডন কার্গিনকে বলেন, বর্তমানে পাকিস্তানের মৃত্যু হয়েছে। সমঝোতার আর কোনো আশা নাই। (স্বাধীনতার ঘোষণা ও বঙ্গবন্ধু ড. আনোয়ারুল ইসলাম, পৃঃ ২১৭-২১৮)।

১৬ মার্চ লণ্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকা তার সংবাদদাতা মার্টিন এডনির পাঠানো প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে জানায় সারা পূর্ব পাকিস্তানের গঠিত অন্যান্য কমিটির মতো সংগ্রাম পরিষদেরও আলোচনার বিষয় ছিল তাদের বিবেচনায় ইতোমধ্যেই স্বাধীন হয়ে যাওয়া পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ বাংলাদেশে তাদের পারবর্তী পদক্ষেপ কী হবে। ৫৮টি গ্রাম থেকে প্রায় শ-তিনেক লোক সংগ্রাম পরিষদের একটি শাখায় একত্রিত হয়েছে। তারা প্রয়োজনবোধে সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করতে প্রস্তুত এবং এর জন্য তারা এমন একজন গ্রামবাসীর কাছে ট্রেনিং নিচ্ছে যুদ্ধবিদ্যা যার একমাত্র অধিকার।

২৪ মার্চ হংকংভিত্তিক ফার ইস্টার্ন ইকনোমিক রিভিউ পত্রিকা লেখে :

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যখন পশ্চিম পাকিস্তানে তার পরবর্তী উদ্যোগের কথা ভাবছিলেন তখন শেখ মুজিবুর রহমান তার ঢাকার বাড়িতে আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, এটাই শেষ দফা। শেখ মুজিবের বাসভবন বাংলাদেশের পতাকা এবং বিভিন্ন প্রতীক দিয়ে সুসজ্জিত ছিল। একথার কী অর্থ তা জিজ্ঞেস করায় তিনি সেই স্লোগানটি দিয়ে তার জবাব দিলেন যে তিনি হাজার হাজার বার জনতার সামনে উচ্চরণ করেছেন জয় স্বাধীন বাংলা, স্বাধীন বাংলা, স্বাধীন বাংলা, দীর্ঘ জীবিত হোক। (বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ইতিহাস একটি অনুসন্ধান, মোহাম্মদ হান্নান, পৃ ৭০-৭০)

মেজর জিয়া কর্তৃক ২৭ মার্চ, '৭১-এর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বঙ্গবন্ধুর পক্ষে প্রচার সম্পর্কে বিবিসি-এর সাংবাদিক এ্যান্তনি ম্যাসকারেন হাস বলেন, জিয়া এমনকি ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাকারী হিসাবেও তার খ্যাতিকে কাজে লাগিয়েছেন। যদিও প্রকৃতপক্ষে এর ত্রিশ ঘন্টা আগেই অন্য একজন স্বাধীনতা ঘোষণা একই বেতার কেন্দ্র থেকে প্রদান করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু যে বাঙালি জাতিকে মুক্ত স্বাধীন করার লক্ষ্যে আগে থেকেই প্রস্তুত করেছিলেন সে বিষয় ওয়াশিংটন ইভিনিং স্টোর পত্রিকায় লেখা হয় শেখ মুজিবুরই হচ্ছেন একমাত্র বাঙালি নেতা যার ইজ্জত ও ব্যক্তিগত বিরাট সমর্থন রয়েছে এবং তিনি দেশকে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের হাত থেকে রাক্ষা করতে পারেন। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবর্তে অন্যকোনো সমাধান তার পক্ষে মানিয়ে নেওয়া খুবই মুশকিল হবে।

স্বাধীনতা ঘোষণার সংবাদ সর্বাগ্রে প্রচার করে বার্তা সংস্থা ইউ এন আই। এই সূত্র থেকে সংবাদটিও ভারতে বিভিন্ন সংবাদপত্র, আকাশবাণী, রেডিও অস্ট্রেলিয়া এবং বহির্বিশ্বের বিভিন্ন বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। সংবাদটি ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ দিল্লিস্থ স্টেটম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

২৫ মার্চ, '৭১-এর শুরুতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ২৩ মার্চ, '৭১-এর প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি বেতারে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ২৫ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করার খবর প্রচার করা হয়। দিল্লির অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের ওয়্যারলেস পাকিস্তানি বেতারের খবর ধরা পড়ার সাথে সাথে উক্ত খবর আমেরিকার নিউইর্য়ক টাইমস পত্রিকায় ওয়্যারলেসে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ২৭ মার্চ, '৭১ তারিখেই উক্ত খবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ছবিসহ প্রকাশিত হয়।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে ২৭ মার্চ, '৭১ তারিখে লন্ডনের দি টাইমস পত্রিকার হেডলাইন ছিল হ্যাভি ফাইটিং অ্যাজ শেখ মুজিব ডিক্লার্স ইস্ট পাকিস্তান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্টস হ্যাভ পুশভ মেক মুজিব টু হিজ ডিক্লারেশন অব ইন্ডিপেডেন্স।

২৫ নভেম্বর, '৭১-এ ওয়াশিংটন পোস্ট লিখলো তবুও পাকিস্তানি সৈন্যরা পূর্ব বাংলার পূর্ণ কর্তৃত্ব করায়ত্ত করতে পারেনি। উপরন্তু বাঙালির প্রধান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করেও পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষ বাঙালিদের স্বাধীনতা আন্দোলন দমিয়ে রাখতে পারেনি।

২৬ মার্চ, '৭১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে বিশিষ্ট সুধী পার্থ চট্টোপধ্যায় তার ডেটলাইন ঢাকা শীর্ষক স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেছেন। সে সময় চট্টগ্রাম রেডিও থেকে ঘোষণা হচ্ছে বাংলাদেশ স্বাধীন-সার্বভৌম। ২৫ মার্চ রাত ১২টার পর অর্থাৎ ২৬ মার্চের শুরুতে বঙ্গবন্ধু তাঁর শেষ নির্দেশ জারি করে দিয়েছিল। বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো। (স্বাধীনতার ঘোষক কে ইমন সরকার, পৃ. ৩৯, ৪৪, ৪৫, ৫৬, ৫৭)।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সন্ধ্যায় বিবিসি থেকে মন্তব্য করা হয় বাংলাদেশে যা কিছুই ঘটুক না কেন মেক মুজিবুর রহমান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন-মানুষ হিসেবে যিনি না হলে বাংলাদেশের জন্মই হত না।

আমরা বাঙালি জাতির সৌভাগ্যবান প্রজন্ম তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ এই প্রজন্মে আবির্ভাব হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মতো এক ক্ষণজন্মা মহানায়ক্ এই মহানায়ক জন্মসূত্রেই বাংলা ভূখণ্ডের বাঙালি জাতিকে সুযোগ্য নেতৃত্বদানের মাধ্যমে স্বশাসিত সার্বভৌম বাংলাদেশে পরিণত করেন।

(স্বাধীনতার ঘোষক কে ইমন সরকার, পৃ. ৫৭

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।
দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা
রক্তগঙ্গা বহমান
তবু নাই ভয় হবে হবে জয়
জয় মুজিবর রহমান।

অন্নদা শঙ্কর রায় ১৯৭১)

স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে অবাঞ্ছিত বিতর্ক

ডা. এম সুলতান উল আলম

সেই কবে, কতকাল আগে চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ বেতার ভবনে প্রবেশের ক্ষণ গত হয়েছে। তবু আজও আক্রান্ত হই নস্টালজিয়ায়। বারে বারে ফিরে যাই অতীতে। ১৯৬৫ সালে আমি তখন চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের এমবিবিএস কোর্সের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান, আবৃত্তি ও নাটক করি আর অনুষ্ঠান উপস্থাপনা তো আছেই। দেশে তখন টেলিভিশন ছিল না। বেতার তখন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ। তখনকার কোনো বেতারশিল্পী সাধারণ মানুষের কাছে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব।

এমন একজন শিল্পী হওয়ার আগ্রহ ছিল মনের কোণায়। তাই গিয়েছিলাম বেতারে অডিশন দিতে।

প্রথম অডিশনে কিছু উচ্চরণ দোষের জন্য পাস করা গেল না।

তিন মাস পর আবার অডিশনের ডাক পড়ল। বেতার স্টুডিওতে লাল বাতির সামনে দুরু দুরু চিত্তে আবার অডিশন দিলাম। সেই দিনের কোনো এক মাহেন্দ্রক্ষণে অনেক ভয়ের সাগর পাড়ি দিয়ে শুনলাম বেতার ঘোষণার অডিশনে পাস করেছি।

সেই থেকে বেতার জীবনের পথচলা শুরু।

অবশেষে হাতে এলো বেতার কর্তৃপক্ষের পাঠানো প্রথম চুক্তিপত্র। তাতে পরের ইংরেজি মাসের সাত দিন আমাকে রেডিও পাকিস্তান চট্টগ্রাম কেন্দ্রে অনুষ্ঠান ঘোষণায় চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। পারিশ্রমিক প্রতিদিন সাত টাকা। তখনকার দিনে সাত টাকা মানে অনেক টাকা।

রেডিওর চুক্তিপত্র পাওয়ায় বন্ধুরা অভিনন্দন জানাল। আমিও আমার নতুন জীবন শুরু করলাম।

রেডিও ভবনে প্রবেশ করা তখনকার সময় এত সহজ ছিল না পুরো এলাকা ছিল সংরক্ষিত। অস্ত্রধারী পুলিশ ২৪ ঘন্টা পাহারা দেয়। বেতারের নিজস্ব সিকিউরিটি তো আছেই। যে কোনো দর্শনার্থী বেতার ভবনে প্রবেশ করতে চাইলে কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতির প্রয়োজন হতো। অনুমতি পাওয়াও এত সহজ ছিল না। অনুমতিপত্র পাওয়ার সাপেক্ষে অভ্যর্থনা কক্ষে অপেক্ষার পালা শেষ করে অধিকর্তার অনুমতি সাপেক্ষে স্টুডিওতে প্রবেশের অনুমতি মিলত।

আমার প্রথম দিন ডিউটি পড়ল রাতের পালায়। বিকেল ৫টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত। সঙ্গে দুজন সিনিয়র অ্যানাউন্সার। যত দূর মনে পড়ে, প্রথম দিন আমার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদর একজন হলেন শিরিনা আপা। অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক মহিলা। যত দিন তাঁর সঙ্গে ডিউটি করেছি, অনুষ্ঠান ঘোষণার প্রশিক্ষণের বেলায় তাঁর আগ্রহের কমতি ছিল না। এ ছাড়া আমার মেডিক্যাল কলেজের পড়াশোনার ব্যাপারেও খোঁজ নিতেন। বলতেন, রেডিওতে এসেছ ভালো করেছ, কিন্তু তোমার আসল কাজ মেডিক্যালের পড়াশোনা। সেটা ঠিক রেখে বাকি সব করতে হবে।

ওই সময় বেতার তরঙ্গে যেসব কণ্ঠশিল্পী তাঁদের মায়াময় সুরের জালে জনগণকে বিমোহিত করতেন তাঁরা হলেন শেফালী ঘোষ, শ্যাম সুন্দর বৈষ্ণব, সৈয়দ আনোয়ার মুফতি, প্রবাল চৌধুরী, জয়ন্তী ভূঁইয়া, কাজী আয়শা আমান, চিত্তরঞ্জন ভূঁইয়াসহ আরো অনেকে। বেতার নাটক প্রযোজনায় যাঁদের অবদান ছিল অসামান্য, তাঁরা হলেন প্রফেসর ডা. সামশুল আজম, মাহবুব হাসান, ডা. কামাল এ খান, অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমদ প্রমুখ। বেতারের স্ক্রিপ্ট লিখতেন কবি আব্দুস সালাম, জনাব বেলাল মোহাম্মদ ও বেগম মোস্তারী সফি। ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত আরো যেসব বেতার ঘোষক-ঘোষিকার সঙ্গে বিভিন্ন শিফটে ডিউটি করেছি, তাঁদের মধ্যে ছিলেন জনাব ফজল হোসেন, আজগরি আপা, কাজী হোসনে আরা, সৈয়দ শওকত আলী, খালেদা ফেরদৌস, জহির শামসেরী, এ কে এম আসাদুজ্জামান, মনোয়ারা হায়দার, মাহবুব হাসান ও খালেদা বেগম।

মহাকালের সাক্ষী হয়ে আজ তাঁরা কে কোথায় কেমন আছেন জানি না। বেতার ভবনের আঙ্গিনার সেগুন, দেবদারুগাছের ঝরাপাতার মতো আমার সেই প্রিয় সহকর্মীরাও ঝরে গেছেন কত আনন্দ-বেদনার স্মৃতি নিয়ে। প্রিয় মুখ শফিক ও রাশেদার মতো হয়তো আরো কেউ পাড়ি দিয়েছেন না-ফেরার দেশে। তাঁদের সবার প্রতি আমার অতল শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা।

বেতার অনুষ্ঠান প্রচার করার জন্য প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলী ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সেই সময়ে যাঁরা এ বিভাগের আমাদের সহকর্মী ছিলেন তাঁরা হলেন-প্রকৌশলী সৈয়দ আব্দুস সাকের, প্রকৌশলী আমিনুর রহমান, জনাব রাশিদুল হাসান, আ ম শারফুজ্জামান ও রেজাউল করিম চৌধুরী। পরে তাঁরা সবাই শব্দসৈনিক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। এ ছাড়া আরো ছিলেন আব্দুস সোবহান, মোসলেম খান, দেলোয়ার হোসেন প্রমুখ।

বেতারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলো 'সংবাদ' বিভাগ। সে সময় এই বিভাগের প্রধান ছিলেন জনাব সুলতান আলী। জনাব আলীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আমার ওই বেতার কেন্দ্রে দীর্ঘ ছয় বছরের বাংলা সংবাদ পাঠের সুযোগ হয়েছিল। আমার সংবাদ পাঠের শিক্ষাগুরু ছিলেন প্রখ্যাত ক্রিকেট ভাষ্যকার মরহুম বদরুল হুদা চৌধুরী। ৭ মার্চ ১৯৭১ থেকে ২৪ মার্চ ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বদরুল ভাই ও আমি যুদ্ধকালীন সময়ে জনাব সুলতান আলীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রাম সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশিত 'সংবাদ বুলেটিন' প্রচার

করতাম। বুলেটিনে থাকত পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে সর্বসাধারণের মধ্যে যুদ্ধ প্রস্তুতির আহ্বান।

চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের মধ্যে প্রয়াত আনোয়ার হোসেনের কথা আজও ভুলতে পারিনি। বেতার ভবনের পেছনের দিকে তাল, তমাল, দেবদারু-ঘেরা আনোয়ার হোসেন পরিচালিত 'লন রেস্টুরেন্টে' দুধের সরের ঘন চা আর চাটগাঁর বিখ্যাত বেলা বিস্কুট যে একবার খেয়েছে তাঁকে বরাবার এখানে আসতেই হবে। বেতারে আগত সব শিল্পী কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য তাঁর ওই চায়ের আড্ডা ছিল মান্নাদের বিখ্যাত 'কফি হাউস'। সেই আড্ডা একসময় যাঁরা মাতিয়ে রাখতেন, তাঁরা কালের প্রবাহে আজ কে কোথায় হারিয়ে গেছেন জানি না।

১৯৭১ সাল। আমার বেতার জীবনের পাশাপাশি মেডিক্যালের পাঁচ বছরের ছাত্রজীবনের শেষ অধ্যায়। সামনে কঠিন এমবিবিএস পরীক্ষা, তাও আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। ৭ মার্চ ১৯৭১ সালে ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু তাঁর বিখ্যাত ভাষণ দিলেন। তাঁর ঢেউ এসে লাগল চট্টগ্রামে। শুরু হলো জনযুদ্ধের প্রস্তুতি। চট্টগ্রামের সর্বস্তরের সাংস্কৃতিক কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন আসহযোগ আন্দোলনে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে শুরু হলো বিদ্রোহী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। জয় বাংলা বাংলার জয়ই ছিল সব কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। চট্টগ্রাম প্যারেড গ্রাউন্ডে অভিনীত হলো স্বাধীনতার বিখ্যাত নাটক 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এতে অভিনয় করলেন অধ্যাপক মমততাজ উদ্দিন আহমেদ, দানিউল হক, মাহবুব হাসান, সুলতান উল আলম, সফিকুল ইসলাম ও এহসানুল গণি মিনার। লাখ লাখ দর্শক এই নাটক দেখে হানাদারদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ল। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চট্টগ্রামে গঠিত হলো সংগ্রাম পরিষদ। পরিষদের নেতৃত্বে থাকলেন এম এ হান্নান।

ওই সংগ্রাম পরিষদ বঙ্গবন্ধুর 'স্বাধীনতার ঘোষণা' বেতারে প্রচারের উদ্যোগ নেয়। জননেতা এম এ মান্নান ২৬ মার্চ ১৯৭১ সাল দুপুর ২টা ২০ মিনিটে কালুরঘাট বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র থেকে তা নিজ কণ্ঠে প্রচার করলেন। সঙ্গে অনুষ্ঠান ঘোষণায় ছিলেন রাখাল চন্দ্র বণিক। বেতারে ওই স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারের সঙ্গে আরো সংশ্লিষ্ট ছিলেন জননেতা এ কে খান, আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, আতাউর রহমান খান কায়সার ও ডা. এম এ হান্নান।

সেদিন ২৬ মার্চ ১৯৭১ সাল সকাল থেকে চট্টগ্রাম বেতারকর্মীদের তখন চলছে রেডিও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহ'। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানের দেওয়া ভাষণ কোনোভাবেই চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হবে না। বেতারকর্মীদের সবাই একযোগে আগ্রাবাদ বেতার সম্প্রচার বন্ধ করে বেতার ভবন ত্যাগ করলেন।

সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে চট্টগ্রাম বেতারের কবি বেলাল মোহাম্মদের নেতৃত্বে কিছু বেতারকর্মী কালুরঘাট সম্প্রচার কেন্দ্রে সমবেত হলেন। সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিলেন এখন থেকে এই কেন্দ্রের নাম হবে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার

কেন্দ্র'। বেলাল ভাই আমাকে এই ঐতিহাসিক বেতারের ওই সন্ধ্যা অধিবেশনে অনুষ্ঠান ঘোষকের দায়িত্ব দিলেন। স্ক্রিপ্ট হাতে অনেক উত্তেজনা এবং দুরু দুরু চিত্তে বেতার মাইক্রোফোনে ঘোষনা দিলাম 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি', এই বিপ্লবী বেতার অনুষ্ঠানে নিজ কণ্ঠে বেতারের নাম ঘোষনা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে আরো যাঁরা অংশ নিলেন তাঁরা হলেন আবুল কাসেম সন্দীপ, আব্দুল্লাহ আল ফারুক ও কবি আব্দুস সালাম। ওই সময় আমাদের সঙ্গে আরো যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন বেতার ঘোষক ফজল হোসেন ও কাজী হোসনে আরা। এই অধিবেশনে দ্বিতীয়বারের মতো বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন জননেতা এম এ হান্নান। সৃষ্টি হলো মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট। খুনি জেনারেল ইয়াহিয়ার দাম্ভিকতা ভেঙ্গে চুরমার করে নিপীড়িত লাখো বাঙালির মনে আশার আলো সঞ্চার করেছিল এই বিপ্লবী অধিবেশন।

ঐতিহাসিক এই বেতার অধিবেশনে বারবার ঘোষণা দেওয়া হলো বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ চলছে, আপনারা আপনাদের যা কিছু আছে তা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। ইনশা আল্লাহ জয় আমাদের অনিবার্য।

২৭ মার্চ ১৯৭১ সাল, জননেতা এম এ হান্নান, আতাউর রহমান খান কায়সার ও কবি বেলাল মোহাম্মদের আমন্ত্রণে বোয়ালখালী করলডাঙ্গায় অবস্থানরত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান সন্ধ্যায় স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে এলেন। তিনিও বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ক্যাপ্টেন অলি আহমদ, ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভূঁইয়া ও লে. শমসের মবিন চৌধুরীসহ তিন লরিভর্তি জওয়ান।

ওই বিপ্লবী বেতার সংগঠন এবং প্রচার আরো যাঁরা সহযোগিতা করেন তাঁরা হলেন অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমদ, মাহবুব হাসান, বেগম মুশতারী সফি ও এম এ হালিম। কালুরঘাটের অধিবাসী সেকান্দার হায়াত খান ও হারুন আর রশিদ খান ওই বেতারের সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক সহযোগিতা করেন।

এই বিপ্লবী বেতারের প্রকৌশলী হিসেবে যাঁরা অনন্য সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং যাঁদের সহযোগিতা ছাড়া এই বেতার অনুষ্ঠান প্রচার সম্ভব ছিল না, তাঁরা হলেন-আব্দুস সোবহান, মোসলেম খান, দেলোয়ার হোসেন ও আব্দুস শুক্কুর। আরো সক্রিয় ভূমিকা নিলেন ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ আব্দুস সাকের, ইঞ্জিনিয়ার আমিনুর রহমান, অ ম শরফুজ্জামান, রাশেদুল হাসান ও রেজাউল করিম চৌধুরী। তখনকার ওই সময়ে রিজিওনাল ইঞ্জিনিয়ারের দায়িত্বরত ছিলেন মির্জা নাসির উদ্দিন।

১৬ ডিসেম্বর যুদ্ধ শেষ। দেশ স্বাধীন হলো।

মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতারের ভূমিকা বাংলাদেশের ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষরে লেখা হলো।

কালের কণ্ঠ
১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪

স্বাধীনতার ঘোষণা এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

ড. এম এ শাহ্ নওয়াজ আলী

স্বাধীনতা মানুষের আজন্ম পিপাসা। আর এ পিপাসা থেকেই জন্ম নেয় সংগ্রামী চেতনার। এ সংগ্রামী চেতনাবোধই মানুষের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথকে সুগম করে স্বাধীনতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি সৃষ্টি হওয়ার পর বাঙালি জাতির ওপর নেমে আসে আরেকটি নব্য উপনিবেশবাদ। দীর্ঘ ২৩ বছর পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের শেষ প্রহর এই অগ্নিঝরা মার্চ। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্স ময়দানে লাখ লাখ জনতার ঐতিহাসিক সমাবেশে স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণার পর শুরু হয় পাকিস্তানি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে এক অনানুষ্ঠানিক যুদ্ধ। এরপর আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ শুরু হয় ২৬ মার্চ। কিন্তু কিভাবে প্রচারিত হয়েছিল সে ঘোষণা? কখন প্রচারিত হয়েছিল সেই ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণার বাণী? কী ভূমিকা ছিল স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রের! কিন্তু কারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেই ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছিল। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করতে যেসব বেতারকর্মী তথা শব্দসৈনিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তারা আজ ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। স্বাধীনতার দীর্ঘ ৪৪ বছর পরও স্বাধীনতা ঘোষণা নিযে মিথ্যার ঝড়ো হাওয়ায় সব কিছু লণ্ডভণ্ড। মিথ্যার চোরাবালিতে একজন সেক্টর কমান্ডারকে বানানো হচ্ছে স্বাধীনতার ঘোষক এমনকি মহানায়ক! যদিও একজন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে স্বাধীনতা যুদ্ধে জিয়াউর রহমানের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। কিন্তু তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় এমন কি রাষ্ট্রপতি থাকাকালীনও কখনো এ রকম হাস্যকর স্বীকৃতি দাবি করেননি। আজকের অদ্ভুত পরিস্থিতিতে তিনি বেঁচে থাকলে লজ্জায় মাথা হেট করতেন! আমাদের মহান মুক্তি সংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতারের কিংবদন্তিতুল্য অবদান আজ নতুন প্রজন্মের কাছে ধূসর হতে চলেছে।

২৫ মার্চ কালরাত রাজধানী ঢাকায় শুরু হয় বর্বরোচিত গণহত্যা। ২৫ মার্চ রাতেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয় পাকিস্তানে। ২৫ মার্চ রাতে রেডিও এবং টেলিভিশন কেন্দ্র দখল করে নেয়ার পর ২৬ মার্চ সকাল থেকেই রেডিও টিভিতে প্রচারিত হতে থাকে সামরিক নীতিমালা। হামলা চালিয়ে রাজধানী ঢাকার সঙ্গে বিদ্যুৎ টেলিফোন, বিমান চলাচল সহ সব ধরনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

করে দেয়া হয়। ২৫ মার্চের মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞের ১৫ ঘন্টার মাথায় চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে একজন বিদ্রোহীর কণ্ঠে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে রুখে দাঁড়ানোর জন্য বাংলাদেশের মানুষকে আহ্বান জানানোর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। এটি ছিল চট্টগ্রামের জনপ্রিয় নেতা আব্দুল হান্নানের কণ্ঠ। কিন্তু স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মোটামুটি সংগঠিত আকারে চট্টগ্রাম কালুরঘাটে ট্রান্সমিটার থেকে যাত্রা করে ২৬ মার্চ সন্ধ্যায়। ২৫ মার্চ গভীর রাতে বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হওয়ার আগে ইপিআরের অয়্যারলেসে স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা পাঠানো হয়েছিল। যা হোক ২৬ মার্চ দুপুরে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নান অনির্ধারিত অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী পাঠের পর চট্টগ্রাম আগ্রাবাদের বেতার ভবনের কর্মীরা দারুণভাবে ভীতসন্ত্রস্ত ও জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক প্রকৌশলী মির্জা নাসিরের পরামর্শে এবং শব্দসৈনিক বেলাল মোহাম্মদের প্রচেষ্টায় আগ্রাবাদ বেতার ভবন থেকে কালুরঘাটের ক্ষুদে স্টুডিওতে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কারণ আগ্রাবাদ বেতার ভবনটি চট্টগ্রাম বন্দরের খুব কাছে। পাকিস্তানিরা যে কোনো সময় বেতার কেন্দ্রটি দখল করে নিতে পারত। ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রের ঐতিহাসিক ও দুর্লভ মুহূর্তটি ঘনিয়ে আসে। ৭.৪০ মিনিটে প্রথম প্রচারিত হলো অধ্যক্ষ আবু কাসেম সন্দ্বীপের বিপ্লবী কণ্ঠস্বর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি। এরপর অনুষ্ঠান প্রয়োজক আবদুল্লাহ আল ফারুক, সুলতানুল আলমের কণ্ঠেও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাটি বারবার প্রচার করা হয়। এর ২০/২৫ মিনিট পরে কালুরঘাট স্টুডিওতে এসে হাজির হন ডা. আবু জাফর এবং আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান। হান্নান সাহেব স্টুডিওতে উপস্থিত হয়ে বেতারকর্মীদের কাছে বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন জানান। কোথায় থেকে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে তা বলা যাবে না এমন আপত্তিও হান্নান সাহেব মেনে নিয়েছিলেন। বেতারকর্মীদের যুক্তি ছিল স্থানের নাম ঘোষণা করা হলে পাকিস্তানি সেনারা অবস্থান জেনে ফেলবে এবং হামলা করবে। এ ছাড়া এটা ছিল গোপন বেতার কেন্দ্রও বটে। যুক্তি মেনে নিয়ে হান্নান সাহেব দ্বিতীয়বার নিজকণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। মুক্তিযুদ্ধের অসংখ্য তথ্য-উপাত্তে হান্নান সাহেবের দ্বিতীয়বার স্বাধীনতার ঘোষণা বাণীতে কি লেখা ছিল সে তথ্য খুঁজেতে গিয়ে পাওয়া যায়- বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক তারবার্তার কথামালার লিখিত বিবরণ 'জরুরি ঘোষণা'- 'গত রাত ১২ টায় বর্বর পাক বাহিনী ঢাকার পিলখানা, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং বিভিন্ন স্থানে অতর্কিত হামলা চালিয়েছে, এতে লাখ লাখ বাঙালি শহীদ হয়েছে। যুদ্ধ চলছে, আমি এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং বিশ্বের স্বাধীনতাকামী দেশগুলোর কাছে সাহয্য প্রার্থনা করছি- জয় বাংলা'। ২৬ মার্চ শুভ সন্ধ্যার সূচনা অধিবেশনের সময় ছিল মাত্র ৩০ মিনিট। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা বাণী পাঠের পর 'আগামীকাল ৭টায় অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে' এমন ঘোষণা দিয়ে

কালুরঘাট রেডিও স্টেশন বন্ধ হয়ে যায়। আওয়ামী লীগ নেতারা নিরাপদ স্থানে চলে যান। আজকের তরুণ প্রজন্ম তথা স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃতকারী ভণ্ড ও মিথ্যাবাদীদের জন্য যে তথ্য জানা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল হান্নান কর্তৃক দুবার বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার পর কেন কিভাবে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে মেজর জিয়ার আগমন ঘটে সে তথ্য জানা। তথ্যবহুল ও ঐতিহাসিক গ্রন্থে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের লেখক বেলাল মোহাম্মদ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন-'কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র চালুর জন্য আমি, আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ও আবদুল্লাহ আল ফারুক চট্টগ্রামের প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহম্মেদ চৌধুরীর দপ্তরে যাই। কিন্তু নেতাদের কাউকে না পেয়ে চলে যাই রেলওয়ে বিল্ডিংয়ের পাহাড়ে। সেখানে ছিলেন ইপিআর কমান্ডার ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম। প্রস্তাব দেওয়া হলো বেতার কেন্দ্র পাহারার ব্যবস্থা করার। তিনি কথা দিলেন এক ঘন্টার মধ্যে ২০ জন জওয়ান পাঠাবেন। কিন্তু বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা এসেছে রাত হয়েছে, অনুষ্ঠান শেষ হয়ে স্টুডিও বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু রফিক তার কথা রাখেননি! কোনো জওয়ানকেও কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে পাঠাননি! এ পরিস্থিতিতে আমি আবুল কাসেম সন্দিপ ও আবদুল্লাহ আল ফারুক প্রচার ভবনে নিরাপত্তা জোরদারের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি এবং বিশেষ সূত্রে জানতে পারলাম একজন বাঙালি মেজর দেড়শ সৈন্য নিয়ে পটিয়ায় অবস্থান করছেন। খবর পেয়ে বন্ধু মাহমুদ হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘ ১৫/১৬ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে মেজর জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সাক্ষাতে মেজর জিয়াকে বেতার ভবনের নিরাপত্তা দিতে অনুরোধ জানাই। মেজর জিয়া সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার অনুগত সৈন্যদের কালুরঘাটে পাঠান এবং তিনি নিজেও আমাদের সঙ্গে বেতার কেন্দ্রে চলে আসেন। আমরা কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে পৌঁছি ২৭ মার্চ বিকেলে ৫টায়। সন্ধ্যায় মেজর জিয়ার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে রেডিওতে জিয়াকে কিছু বলতে অনুরোধ করি এবং এক পৃষ্ঠা সাদা কাগজ এগিয়ে দিই। মেজর জিয়া প্রথমে লেখেন, 'আই এম মেজর জিয়া ডু দেয়ার বাই ডিক্লেয়ার ইনডিপেন্ডেন্স অফ বাংলাদেশ। কিন্তু আমি মেজর জিয়াকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে বলার অনুরোধ করি। জিয়াউর রহমান তাতে রাজি হয়ে আরো লিখেন (On behalf of our great National Leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman). কালুরঘাট ট্রান্সমিটারের মাধ্যম তরঙ্গটি ১০ কিলোওয়াট শক্তি সম্পন্ন। সাধারণভাবে ৫০ মাইল আওতার মধ্যে এর প্রচার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু ২৫ মার্চের পর ঢাকার বাইরে রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও সিলেট কেন্দ্র স্তব্ধ থাকায় মধ্যবর্তী ইন্টারাপশন ছিল না। তাই এখান থেকেই প্রচারিত সব অনুষ্ঠান দেশের সীমানা অতিক্রম করে ভারতের পশ্চিম বাংলা, আসাম এবং ত্রিপুরা থেকেও শোনা যেত। ২৬ মার্চ সন্ধ্যা আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নানের বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে দেয়া স্বাধীনতার ঘোষণা দ্বিতীয়বার এবং ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় মেজর জিয়া কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা (৩য় বার) দেশের লাখো কোটি মানুষ শুনেছে। যদিও চাটুকার নেতা ও ইতিহাস

বিকৃতকারীরা জিয়াকেই স্বাধীনতার একমাত্র ঘোষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চান। তারাও শুনেছেন ২৬ ও ২৭ মার্চে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান এবং স্বাধীনতার ঘোষণা বাণীগুলো। যা হোক আজকে আমার প্রশ্ন কেন সে দিন কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র পাহারার জন্য ক্যাপ্টেন রফিক আসেননি? মেজর রফিক কালুঘাট বেতার কেন্দ্রে এলে ইতিহাস বিকৃতকারীদের সে সুযোগ পাল্টে যেত।

সত্য গোপন থাকে না। জিয়াউর রহমান সেখানে এসেছিলেন, কেনইবা তাকে ডেকে নিয়ে আসা হলো? এসব প্রশ্নের মীমাংসা প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যার পর গত ৪০ বছর মিথ্যার বেসাতি দিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। জিয়াউর রহমান সেদিন কালুরঘাট এসেছিলেন মূলত ২টি কারণে প্রথমত, কালুর ঘাট বেতারের শব্দসৈনিক বেলাল মোহাম্মদ, রেডিও স্টেশনের নিরাপত্তা এবং সামরিক বাহিনীর কোনো বাঙালি অফিসারকে দিয়ে স্বাধীনতার তৃতীয় ঘোষণা দেয়ার ব্যাপারে প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতাকামী ও দেশপ্রেমিক একজন সৈনিক হিসেবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে। ২৭ মার্চের পর ২৮ ও ২৯ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র যথারীতি চলেছে। ৩০ মার্চ ছিল কালুরঘাটের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্য একটি কালো দিন। পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরোচিত বিমান হামলার মধ্য দিয়ে গৌরবোজ্জ্বল এই অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। দুপুরের অধিবেশনের পর দুপুর ২টা ১০ মিনিটে শুরু হয় বোমা বর্ষণ। ফলে স্বাধীন বাংলা বেতারের প্রথম অধ্যায়ের যবনিকাপাত ঘটে। এরপর ২য় পর্যায়ে স্বাধীন বাংলা বেতারের সেই অকুতোভয় শব্দসৈনিকদের প্রচেষ্টায় আবার ভারতের আগরতলায় শুরু হয়। কার্যক্রম চলেছে ২৪ মে পযন্ত। ২৫ মে থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ৩য় পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয় ভারত সরকারের সহায়তায় ৫০ কিলোওয়াট একটি তরঙ্গ দিয়ে। অফিস স্থাপন করা হয় বিএসএফ ৫৭/৮ বালিগঞ্জ সার্ককুলার রোডে। কালুরঘাট থেকে আগরতলা আবার আগরতলা থেকে কলকাতায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গৌরববোজ্জ্বল কর্মকাণ্ড আজ ইতিহাসের সাক্ষী। প্রথমে আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান এবং পরে জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী পাঠের জ্বলন্ত সাক্ষী হয়ে বাঙালিদের কাছে স্মরণীয় বরণীয় হয়ে থাকবেন আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, সৈয়দ আবদুস শাকের, বেলাল মোহাম্মদ, আমিনুর রহমান, এ এম শরিফুজ্জামান, রাশিদুল হাসান, রেজাউল করিম চৌধুরী, কাজী হাবিব উদ্দিন আহম্মেদ মনি, আবদুল্লাহ আল ফারুক এবং মুস্তফা আনোয়ার। স্বাধীন বাংলাবেতারের অকুতোভয় এ ১০ শব্দসৈনিকের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বাঙালিদের হৃদয়ে তারা বেঁচে থাকবেন অনন্তকাল। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মৃত্যুকে সঙ্গী করে তাদের সেদিনের সাহসিকতাপূর্ণ অবদান আমাদের মুক্তিসংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গেছে দূরে বহুদূরে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খবর, গণসঙ্গীত, চরমপত্র, বেঈমানের দলিল, জল্লাদের দরবার প্রভৃতি

অনুষ্ঠান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রক্তাক্ত মার্চের ২৬ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ৭১ পর্যন্ত সাড়ে সাত কোটি মানুষের কাছে এ বিষয়গুলো ছিল একমাত্র সাহসের অবলম্বন, বেঁচে থাকার হাতিয়ার এবং অবসর কাটানোর মাধ্যম। সময় থেমে থাকে না, চলছে চলবেই। অনুরূপভাবে ইতিহাসকে কোনোদিন চাপা দিয়ে রাখা যায় না। প্রকৃত ইতিহাস সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত হবেই। তাই স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে যতই মিথ্যাচার হোক না কেন স্বাধীনতার ঘোষক তথা মহানায়কের নাম কখনই মুছে ফেলা যাবে না। ইতিহাস বিকৃতকারী ভণ্ড ও ক্রীতদাস বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্ট এবং কথিত ঘোষক আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ হবেই। কারণ ৬৬'র ছয় দফা, ৬৯'র সফল গণআন্দোলন এবং ৭০'র নির্বাচনে অভূতপূর্ব বিজয় হলো স্বাধীনতার মূল ভিত্তি। পক্ষান্তরে ছয় দফার নায়ক বঙ্গবন্ধু, গণআন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু বঙ্গবন্ধু এবং '৭০ সালের নির্বাচনের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু।

ভোরের কাগজ
২৬ মার্চ ২০১৫

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ

মাহজাবিন খালেদ এম.পি

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর হানাদার মুক্ত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। তাই দিনটি বাঙালির ইতিহাসে বিজয় দিবস হিসেবে স্বার্ণাক্ষরে লেখা আছে। যদিও মাত্র ৯ মাসের সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় অর্জন হয় কিন্তু এর পেছনে রয়েছে প্রায় দুই যুগের আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাস। এই আন্দোলন সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

সুদীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামে রয়েছে ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৫৪'র যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, ৬২ শরীফ শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, ৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ও ৭০ এর সাধারণ নির্বাচন। এসব আন্দোলন সংগ্রামের সর্বশেষ পরিণতি ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ। এই যুদ্ধের শুরু হয় পাকিস্তানিদের গণহত্যার পর বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্যমে। ২৬ মার্চ গ্রেপ্তারের আগ মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ঘোষণা পাওয়া মাত্রই সারা দেশে বাঙালিরা সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এবং তার নামেই ৯ মাসের সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালিত হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা, ৩রা নভেম্বর জাতীয় চার নেতা হত্যা, ৭ নভেম্বর শহীদ মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ বীর উত্তমকে দুই সহকর্মী সহ অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা হত্যার মাধ্যমে ক্ষমতার পট পরিবর্তন হয়। ক্ষমতা দখল করেই খুনি মোস্তাক ও মেজর জিয়া মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে হত্যার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। তারা পুনরায় পাকিস্তানি চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান ধারণা প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র শুরু করে। মোস্তাক ও জিয়ার অবর্তমানে তাদের অনুসারিরা একই ভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতন ও আদর্শ বিরোধী কর্মকাণ্ডে মেতে ওঠে। তারা শুধু স্বাধীনতা বিরোধী চিন্তা-চেতনা প্রতিষ্ঠাই নয়, তারা স্বাধীনতার ইতিহাসকে পরিবর্তন করার তৎপরতা চালায়। তাই তারা জয় বাংলার পরিবর্তে পাকিস্তানি জামানার জিন্দাবাদ স্লোগান জাতির সামনে হাজির করে। তারা জাতীয় সঙ্গীত এবং জাতীয় পতাকা পরিবর্তনের হীন চক্রান্তে মেতে উঠে। কিন্তু তাদের এসকল চক্রান্ত ভেস্তে যায় বাঙালির আন্দোলন

সংগ্রামের ফলে। সাম্প্রতিক কালে ঐ গোষ্ঠি মাহান স্বাধীনতার নেতৃত্ব ও ঘোষণা নিয়েও বিতর্কের জন্ম দেয়। তারা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বকে ও ঘোষণাকে অস্বীকার করে মেজর জিয়াকে স্বাধীনতার ঘোষক ও প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠার কাল্পনিক বক্তব্য দিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করে। অথচ মেজর জিয়া জীবিত থাকা অবস্থায় কখনো নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক বা প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দাবি করেনি। বরং জীবিত কালে তিনি তার লেখা, বক্তব্যে ও সাক্ষাতকারে বঙ্গবন্ধুকেই তার নেতা এবং স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

শুধু জিয়াই নয় মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দানকারী সমস্ত নেতৃবৃন্দ এবং সেক্টর কমান্ডাররা সবই বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাই মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন বলে স্বীকার করেছেন। যা আমাদের সংবিধানে ও স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রে যুক্ত আছে। স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কিত প্রস্তাবেও স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নাম জাতীয় সংসদে পাশ হয় ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল। এই দিন জাতীয় সংসদে স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে বক্তব্য দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন :

গত বছর নির্বাচন হলো। সেই নির্বাচনের পূর্ব থেকেই আমাদের জানা ছিল যে, বাংলাদেশ জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকা সত্ত্বেও তারা আমাদের কলোনি এবং বাজার করে রাখতে চায়। শুধু তাই নয়, তারা আমাদের সংস্কৃতি ও ভাষার ওপর আঘাত করছিল, আমাদের নাগরিক অধিকারের ওপর আঘাত করে আমাদেরকে কলোনি করে রাখতে চেয়েছিল। আমাদের সংগ্রাম তখন থেকেই চলছিল। আমরা জানতাম সংগ্রামকে ধাপে ধাপে এদিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এভাবে সংগ্রাম এগিয়ে আজ চরম সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। ২৫ মার্চ তারিখের ইতিহাস আপনাদের জানা আছে। সেইদিন বর্বর পাক হানাদার বাহিনী কোনো আইন-কানুন মানে নাই। কোনো সভ্য দেশে তাদের কাজের তুলনা পাওয়া যায় না। প্রত্যেক সভ্য দেশে যুদ্ধের একটা নিয়ম আছে। কোনোরূপ ওয়ার্নিং না দিয়েই অতর্কিত কাপুরুষের মতো বাড়ি-ঘরে আগুন লগিয়ে, দুধের বাচ্চাকে পর্যন্ত হত্যা করে তারা এক জঘন্য লীলায় মেতে উঠেছিল। অর্ডার দিয়েছিল আওয়ামী লীগের লোক, যাকে পাও তাকেই হত্যা করো, কোনোরূপ দয়ামায়া নাই। তাদের জঘন্য কাজ-কারবারের এমন সমস্ত ইতিহাস আমাদের হাতে আছে, যা দেখলে শিউরে উঠতে হয়। আমাদের হাতে একজন জেনারেলের দস্তখত করা কাগজ ধরা পড়েছে। তাতে আছে লুটপাট করো। এমনকি পাশবিক অত্যাচারের কথাও আছে। বর্বর ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীকে অসহায় ও নিরস্ত্র সাত কোটি বাঙালির ওপর কুকুরের মতো লেলিয়ে দেয়া হয়েছিল। সেনাবাহিনী যদি যুদ্ধ ঘোষণা করত, তবে আমরা সে যুদ্ধের মোকাবিলা করতে পারতাম। কিন্তু তারা অতর্কিত ২৫ মার্চ তারিখে আমাদের আক্রমণ করল। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, আমাদের শেষ সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। আমি ওয়ারলেসে চট্টগ্রামে জানালাম বাংলাদেশ আজ

থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই খবর প্রত্যেককে পৌঁছিয়ে দেওয়া হোক, যাতে প্রতিটি থানায়, মহকুমায়, জেলায় প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠতে পারে। সেই জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছিলাম। এই ব্যাপারে আত্মসচেতন হতে হবে। দেশবাসী জানেন এই তারিখে দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এটা হাওয়ার উপর থেকে হয় নাই যদি কোনো নির্দেশ না থাকত, তবে কেমন করে এই সময়ে এই মুহূর্তে সব জায়গায় সংগ্রাম শুরু হলো।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার যে ঘোষণা করেছিলেন এবং যে ঘোষণা মুজিবনগর থেকে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়েছিল এই সঙ্গে গণপরিষদ তাতে একাত্মতা প্রকাশ করেছে ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল।

স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ৭ জুন ৬ দফার বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত এক গণসমাবেশে বক্তব্য দেয়ার সময় বলেন "২৫ মার্চ রাতে ইয়াহিয়ার বর্বরবাহিনী আমার ওপর আক্রমণ চালায়। সেদিন রাতে আমার অবস্থা যে কেমন ছিল, সেটা কেবল আমিই জানি, আমি জানতোম ঘর থেকে বের হলেই আমাকে গুলি করে মারবে। মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুত হয়েইছিলাম। কিন্তু বাংলার মাটিকে আমি ছাড়তে পারি নাই। রাত ১১টার সময় আমার সমস্ত সহকর্মীকে ও আওয়ামী লীগ নেতাদের হুকুম দিলাম বের হয়ে যাও। যেখানে পার এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। খবরদার স্বাধীনতা না আসা পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেয়ো।"

রাতে আমি চট্টগ্রামে নির্দেশ পাঠালাম। আগে যাকে ইপিআর বলা হতো, তাদের সদর দপ্তর ছিল চট্টগ্রামে। পিলখানা হেডকোয়ার্টার্স তখন শত্রুরা দখল করে নিয়েছে। ওদের সাথে আমার যোগাযোগ ছিল। আমি যখন পিলখানায় যোগাযোগ করতে পারলাম না। তখন আমি চট্টগ্রামের সাথে যোগাযোগ করে বললাম, 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন তোমরা বাংলার সব জায়গায় ওয়ারলেসে খবর দিয়ে দাও। পুলিশ হোক, সৈন্যবাহিনী হোক, আওয়ামী লীগ হোক, যে যেখানে আছে। পশ্চিমাদের বাংলা থেকে খতম না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিযে যাও। বাংলাদেশ স্বাধীন। তারা আমার কথা মতো খবর পৌঁছিয়েছিল।

১৯৭৪ সালের ১৮ জানিুয়ারি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন : ২৫শে মার্চ তারিখে আমি যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম, আমি যখন বাংলার মানুষকে ডাক দিলাম, তখন আমি গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম। কিন্তু আমার সহকর্মীরা আমার অনুপস্থিতিতেও সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ যুবক, লক্ষ লক্ষ কৃষক, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক রক্ত দিয়েছে। আর কারো কথায় নয় শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকেই তারা জীবন দিয়েছে। স্বাধীনতার ইতিহাস কোনদিন মিথ্যা হতে পারে না। আমার সহকর্মীরা

যারা এখানে ছিল, তারা সকলে জানতো যে ২৫ মার্চ রাতে কী ঘটবে। তাদের বলেছিলাম, আমি মরি আর বাঁচি সংগ্রাম চালিয়ে যেয়ো। বাংলার মানুষকে মুক্ত করতে হবে। ৭ মার্চ কি স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলা বাকি ছিল? প্রকৃতপক্ষে ৭ মার্চ স্বাধীনতা সংগ্রাম ঘোষণা করা হয়েছিল। সেদিন পরিষ্কার বলা হয়েছিল। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রে উল্লেখ করা হয়-

যেহেতু, সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বচনের জন্য ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭০ হতে ১৭ই জানুয়ারি, ১৯৭১ অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল,

এবং

যেহেতু, এই সমস্ত নির্বাচনে ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে বাংলাদেশের জনসাধারণ আওয়ামী লীগের ১৬৭ জনকে নির্বাচিত করেছিল,

এবং

যেহেতু, সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান এই সকল গণপ্রতিনিধিকে ৩রা মার্চ, ১৯৭১ মিলিত হওয়ার জন্য আহবান করেছিল,

এবং

যেহেতু, উক্ত আহূত সভা, অনিয়মতান্ত্রিক ও বেআইনিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য-স্থগিত রাখা হয়েছিল,

এবং

যেহেতু, বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিগণের সাথে আলোচনারত থাকাকালে পাকিস্তানের কর্মকর্তাগণ তাঁদের প্রতিজ্ঞা পূরণের পরিবর্তে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক অন্যায় যুদ্ধ ঘোষণা করে

এবং

যেহেতু, উপরোক্ত বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্যান্য অনুরূপ ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে, বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনতার অবিসংবাদী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলার মানুষের ন্যায়সংগত স্বাধিকারের জন্য ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ, বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

মুজিব নগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ১৯৭১ সালের ৬ জুলাই বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে বলেন-

১লা মার্চের পর থেকে প্রতিটি ঘটনা যে কত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েছিল আপনারা নিজের চোখে দেখেছেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে- যেদিন ইয়াহিয়া খান সাহেব জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী ঘোষণা

করলেন, সেদিন পূর্বাণী হোটেলে আমরা সম্মেলনে আর একবারের মতো বসেছিলাম। সেখানে বঙ্গবন্ধুকে সামনে রেখে আমি ব্যক্তিগতভাবে একটার পর একটা প্রতিজ্ঞাবাণী উচ্চারণ করেছিলাম। আর আপনারা সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিধ্বনিত করে আবার বলেছিলেন বাংলার মানুষের কাছে-আপনারা বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। দেশবাসী জানে বিশ্বাসঘাতকতা আপনারা করেন নাই। জঙ্গী শাহীর অত্যাচার, ইয়াহিয়ার প্রলোভন কোন কিছুই আপনাদের টলাতে পারে নাই। ইতিহাস এই কাহিনী একদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবে বলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস। সেই ২৫শে মার্চের রাতের আঁধারে এই বীভৎস ঘটনার প্রতিবাদে আপনারা রুখে দাঁড়ালেন। বাংলার নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা মফঃস্বল শহরে, জেলা শহরে, গ্রামে, বন্দরে রাজনৈতিক নেতৃত্বে দেওয়ার জন্য রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করব আমাদের ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের বীরত্ব আজকের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। ই পি আর আমাদের পুলিশ বাহিনী, আমাদের আনছার, আমাদের মোজাহিদরাও বাংলার মানুষের পাশে এসে দাঁড়াল। বন্দুক আর কামান তুলে নিল। আজ তারা সংগ্রামের পুরোভাগে। বাংলার গ্রামে, বন্দরে, গঞ্জে আপনারা দাঁড়ালেন। আমি কিভাবে যে আপনাদের শ্রদ্ধা জানাব তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। যে সমস্ত মিথ্যাবাদী বলে আওয়ামী লীগের নেতারা আর সদস্যরা সংগ্রামের পুরোভাগে ছিল না তাদের আমি জবাব দিতে চাই। বাংলার মানুষ জানে আপনারাই রয়েছেন পুরোভাগে। আমি জানি চট্টগ্রামে, ময়মনসিংহে, যশোরে, রংপুরে, খুলনায়, বরিশালে, ঢাকায়, ফরিদপুরে বাংলার সর্বত্র আপনাদের নেতৃত্বেই সংগ্রাম হয়েছে। নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আপনারা গ্রামে-বন্দরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। বাংলার সৈনিকদের পাশে পাশে আপনারা রয়েছেন। অকুতোভয়ে আপনারা লড়েছেন। বাংলার সৈনিকেরা যখন বুকের তাজা রক্ত মাতৃভূমির জন্য ঢেলে দিচ্ছেন, এর পরে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা না করে আর কি পথ ছিল? স্বাধীনতার জন্য লড়াই না করে কি উপায় ছিল? মূলতঃ এবং বাহ্যত বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হওয়ার মুহূর্তে স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী রেখে যান। আমরা জানতাম বঙ্গবন্ধু যদি গ্রেপ্তার হন, তবে স্বাধীনতা ঘোষণা তিনিই করে যাবেন। আর এই স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যই আমাদের সংগ্রাম করে যেতে হবে।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল সরকার গঠন করার পর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর ভাষণে বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে বলেন-

২৫ মার্চ মাঝরাতে ইয়াহিয়া খান তার রক্তলোলুপ সাঁজোয়া বাহিনীকে বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর লেলিয়ে দিয়ে যে নর-হত্যাযজ্ঞের শুরু করেন তা প্রতিরোধ করবার আহ্বান জানিয়ে আমাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি (সর্বাধিনায়ক নয়। কেননা মুজিবনগরে পঠিত ঘোষণাপত্র যা সরকার গঠনের ভিত্তি, সেখানে রাষ্ট্রপ্রধান সর্বাধিনায়ক

হিসেবে উল্লিখিত) জেনারেল ওসমানীর বক্তব্য, সাক্ষাৎকার এ প্রসঙ্গে উপস্থাপন অত্যন্ত জরুরি। ১৯৭২ সালের স্বাধীনতা দিবসে 'পূর্ব দেশের' সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জেনারেল ওসমানী বলেছেন : "২৫ মার্চ রাত দশটায় বঙ্গবন্ধু আমাকে বলেছিলেন আপনাকে যেন ওরা কোনো অবস্থাতেই ধরতে না পারে। তিনি আমার ওপর যুদ্ধ পরিচালনা করার নির্দেশ প্রদান করেন।" যিনি যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সেনাপতি নিযুক্ত করেন তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেননি এ যুক্তি কোনভাবে গ্রহণীয় নয়। ১৯৮০ সালে জেনারেল এম এ জি ওসমানী বলেন, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেনি। বঙ্গবন্ধুই সেদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৮০ সালের আগস্ট মাসে জাতীয় জনতা পার্টির কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর স্মরণ সভায় জেনারেল ওসমানী বলেন- বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উদাহরণ সৃষ্টিকারী শীর্ষতম ব্যতিক্রম, তিনি একমাত্র মহান বাঙালি যিনি বিবেক ব্যবসা করেনি। জেনারেল ওসমানী জাতীয় সংসদে স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গত বিতর্কে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ১৯৮১ সালে পুনরায় দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, "বঙ্গবন্ধুই, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।"

এ সম্পর্কে মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী ২নং সেক্টর ও কে ফোর্সের অধিনায়ক শহীদ মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম বলেন : "১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি বিদেশে ছিলাম। ওমানের টেলিভিশন পর্দায় দেখেছি ভোটের ছবি। তার আগে ঝড়ের ছবি। দেশে ফিরে দেখলাম আমার দেখা বাংলাদেশের চেহারা পাল্টে গেছে। চারিদিকে দানা বেঁধে উঠেছে। সংগ্রাম, এবার সপ্ন সার্থক হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর হবেন রাষ্ট্রনায়ক।" ক্যান্টমেন্টে এ নিয়ে আলোচনা হতো, মৃদু কণ্ঠে। এ আলোচনায় জাতিভেদ স্পষ্ট ছিল। কেউ প্রাণখুলে আলোচনা করত না।

এ সময় আমার নতুন পদ হলো ব্রিগেড মেজর, ৫৭নং ঢাকা ব্রিগেড মেজর। আমাকে বদলি করা হয়। ১ মার্চ থেকে ২২ মার্চ পর্যন্ত আর্মি মুভমেন্ট সম্পর্কে আমার কিছুটা ধারণা হয়েছিল। যার জন্যে মার্চ মাসের প্রথম দিকে আমি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করি এবং পরে জেনারেল ওসমানীর সঙ্গেও আলোচনা হয়। ২২ মার্চ আমার পোস্টিং হয় কুমিল্লায় ফোর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টে সেকেন্ড ইন-কমান্ডার। এটা আমার অরিজিন্যাল ব্যাটেলিয়ন। ২৪ মার্চ আমি ফোর্থ বেঙ্গলের সে সময়কার পাঞ্জাবি কমান্ডার লে. কর্নেল খিজির হায়াত খানের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিলাম। দায়িত্ব নেবার পর মুহূর্তে একটা অর্ডার ইস্যু হলো আমার নামে, আমাকে তখনই রওয়ানা হতে হবে শমশেরনগর, একটা কোম্পানি নিয়ে। কারণ, হিসেবে বলা হলো ভারত থেকে সশস্ত্র নকশালরা অনুপ্রবেশ করছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলাম ভিন্ন পরিস্থিতি। যার জন্য আমি ব্রাহ্মাণবাড়িয়ার দিকে ফিরে আসি। আসার পথেই সংবাদ পাই ২৫ মার্চ পাকিস্তানিরা ঢাকায় গণহত্যা শুরু করেছে।

তারা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করেছে। বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হওয়ার আগ মুহূর্তে স্বাধীনতার ঘোষণা করেণ এবং পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের বাঙালিদের যুদ্ধের আহ্বান জানান। এ সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থিত আমার অধীনস্থ সৈনিকদের জানিয়ে দেই আমি স্বাধীন বাংলার আনুগত্য স্বীকার করছি। সেই সাথে সৈনিকদের নির্দেশ দেই তোমরাও পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোল। আমার নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে বাঙালি সৈনিক, জিসিও অফিসার জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তারা সেখানে পাকিস্তানিদের হত্যা এবং আটক করে স্বাধীন বাংলার বিজয় পতাকা উত্তোলন করে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাজারবাগ ও পিলখানায় পাকিস্তানি আক্রমণের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন প্রখ্যাত লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ আইনজীবী আবুল মনসুর আহমেদ বলেন, ২৫ মার্চ, '৭১-এ পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের ওপর আক্রমণ করে। আমাদের নেতাকে বন্দি করে তাদের দেশে নিয়ে যায়। কিন্তু তার আগেই আমাদের নেতা ফর্মালি স্বাধীনতা ঘোষণা করে সহকর্মীদের মুজিবনগরে আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশ দেন। ২৬ মার্চ, '৭১-এ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আস্থা স্থাপন করে তাঁর নির্দেশে বাঙালি সৈন্য ও জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অস্ত্রধারণের কথা ঘোষণা করা হয়।

১৯৯২ সালের ৩১ মার্চ ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্রের এক আলোচনা সভায় বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা সাবেক বিমানবাহিনীর প্রধান ও সাবেক মন্ত্রী এ কে খন্দকার বীর উত্তম স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে মন্তব্য করেন। মেজর জিয়া কর্তৃক ২৭ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করার অসঙ্গত দাবি খণ্ডন করে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান ২৬ মার্চ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য দেশব্যাপী তাঁর ঘোষণা শোনা যায়নি।

ড. ওয়াজেদ মিয়া বলেন : বঙ্গবন্ধুর বার্তাটি ছিল টেপকৃত। ঢাকার বলদা গার্ডেন থেকে ঐ টেপকৃত বার্তাটি সম্প্রচারের পর ইপিআর ওই বীর সদস্যটি বঙ্গবন্ধুর বাসায় ফোনে যোগাযোগ করে পরবর্তী নির্দেশ জানতে চান। তখন বঙ্গবন্ধু জনাব গোলাম মোর্শেদের মাধ্যমে ইপিআর-এর ওই সদস্যটিকে সম্প্রচার যন্ত্রটি বলধা গার্ডেনের পুকুরে ফেলে দিয়ে তৎক্ষণাৎ উক্ত স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ দেন।

জননেত্রী শেখ হাসিনার কথা থেকে পাওয়া যায় ইপিআর-এর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে ২৫ মার্চে মধ্যরাতের পর অর্থাৎ ২৬ মার্চ ৩.৩০ মিনিটের চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ সভাপতি জহুর আহমদ চৌধুরী ও সম্পাদক হান্নান সাহেবকে বার্তা পাঠানো হয়। তার জন্য তারা ব্যবস্থা করেছিলেন। (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, ড. ওয়াজেদ মিয়া, পৃ. ৮১)।

এধরনের অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা ও সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর ব্যক্তি আছেন যারা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা শুনেছেন এবং তা বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, সেসব বর্ণনা দিয়ে শেষ করা যাবে না।

দুর্ভাগ্যটা বাংলাদেশের, বাঙালি জাতির এবং মুক্তিযুদ্ধের লাখো শহীদের, লাখো আহত মানুষের, লাখো নির্যাতিত নারীর। সেই সঙ্গে দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের ইতিহাসের। দুর্ভাগ্য এ কারণেই বলি, পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রায় চার যুগের মাথায় দেশের শীর্ষ আদালতকে রায় দিয়ে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করতে হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, মেজর জিয়াউর রহমান বা আর কেউ নন।

২০০৯ সালের ২১ জুন সে কারণেই বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য দিন। হাইকোর্টের এক ঐতিহাসিক রায়ে সেদিন নতুন করে ইতিহাসের সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এ রায়ে বলা হয়েছে, মেজর জিয়াউর রহমান নন : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক এবং তারই নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে।

৭, ১৭ ও ২৬ মার্চ
সময়ের প্রয়োজনে
ডা. এস এ মালেক

মার্চ বিদ্রোহের মাস। বিপ্লবের মাস। আত্মোপলব্ধির মাস। ১৯৭১-এর এই মাসেই বাঙালি জাতির জনক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। '৭০-এর নির্বাচনে একচ্ছত্রভাবে পূর্ববাংলায় বিজয় লাভ করে পাকিস্তানের পার্লমেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে গোটা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার যোগ্যতা তিনি অর্জন করেছিলেন। পাকিস্তানের কোনো কোনো নেতা তাকে সেই মর্মে আহ্বানও জানিয়েছিলেন। '৭০-এর নির্বাচনে পূর্ববাংলার ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন পেয়ে বঙ্গবন্ধু প্রামাণ করেছিলেন তিনি হচ্ছেন পূর্ববাংলার জনগণের একমাত্র নেতা। '৭০-এর নির্বাচন হয়েছিল ৬ দফা ভিত্তিক গণম্যান্ডেট হিসেবে। '৬৬ সালে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে তিনি ৬ দফা ঘোষণা করেছিলেন। ঘোষণার পর থেকেই তিনি পূর্ববাংলার জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে যে গণঅভ্যুত্থান ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন, তার প্রভাবে ৭০-এর নির্বাচন, পাকিস্তানের সামরিক সরকার নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। ওই নির্বাচনের একচ্ছত্রভাবে বিজয়ী হওয়ার অর্থই ছিল ৬ দফার প্রতি পূর্ববাংলার জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন। তাই নির্বাচনে বিজয়ী হবার পর যখন জাতীয় সংসদের অধিবেশনের ঘোষণা দিয়েও তা বাতিল করা হলো, তখন অসহযোগ আন্দোলন করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। এই অসহযোগ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল গোটা বিশ্বের কাছে প্রমাণ করা যে, পূর্ববাংলার জনগণকে শাসন করবার কোনো আইনগত বা নৈতিক অধিকার পাকিস্তানি শাসকদের নেই। পহেলা মার্চ জাতীয় সংসদের অধিবেশন বাতিল করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেশব্যাপী ধর্মঘটের আহ্বান জানালেন। সেই থেকে শুরু হলো তার অসহযোগ আন্দোলন। প্রায় ২৫ দিন ধরে সে আন্দোলন অব্যাহত ছিল। বঙ্গবন্ধু ঘোষিত নির্দেশনা মোতাবেক পূর্ববাংলার শাসন ব্যবস্থা চলতে থাকলো। কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনের কোনো চিহ্ন কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না। একমাত্র ক্যান্টনমেন্টে ৯৩ হাজার দখলদার বাহিনীর সৈন্যরা অবস্থান করছিল। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলার জনগণ তাদের সকল প্রকার সরবরাহ বন্ধ করে দিলো এমনকি বাঙালি বাবুর্চিরা তাদের জন্য রান্না করতেও রাজি ছিল না।

পূর্ববাংলার বেতার কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রচার বন্ধ করে দিলো। বঙ্গবন্ধু যা ঘোষণা দিলেন তাই প্রচার হতে লাগলো। অফিস আদালত সকল স্থানে বাঙালিরা তাদের কাজকর্ম বন্ধ করে দিলো। হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনে চলা শুরু করলো। নির্বাচনে জয়ী হলে ভোটের অধিকার যে কি মারাত্মক শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়, তা পূর্ববাংলার মাটিতে বঙ্গবন্ধু প্রমাণ করলেন।

তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের একজন নেতা এয়ার মার্শাল আজগার খান বাংলাদেশে এসে সব কিছু দেখে মন্তব্য করেছিলেন, শেখ মুজিব ছাড়া আর কেউই পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করতে সক্ষম নন। পাকিস্তানি শাসকরা জনাব ভুট্টোকে সঙ্গে নিয়ে আলোচনার ভান করলেন। বেশ কিছু সময়ক্ষেপণ করলেন। আর সেই সুবাদে পাকিস্তান থেকে হাজার হাজার সৈন্য, গোলা-বারুদ ও অস্ত্র পূর্ববাংলায় নিয়ে আসা হয়। তখন পাকিস্তানি শাসকবর্গ স্পষ্ট অনুধাবন করতে পারলো, বিশেষ করে যখন বঙ্গবন্ধু স্পষ্টতই জানিয়ে দিলেন ৬ দফা জনগণের ম্যান্ডেট, জনগণের ভোটে সে ম্যান্ডেট প্রতিষ্ঠিত। তাই ৬ দফার প্রশ্নে কোনো আপোস করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তখনই ভুট্টো ও পাকিস্তানের শাসকবৃন্দ পূর্ববাংলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নির্দেশ দেন। শুরু করা হয় সার্চলাইট অপরেশন ২৫ মার্চের কালরাতে। পাকিস্তান কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। হানাদার বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে স্বগৃহে ২৫ মার্চ গ্রেপ্তার করে এবং পাকিস্তানের কারাগারে রাখে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অসহযোগ আন্দোলন এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। একচ্ছত্রভাবে নির্বাচনে বিজয়ী হবার কারণে একটা দেশের নিয়মিত সরকার গঠন করবার পূর্বেই যে একজন জননেতার নির্দেশ কি করে সমান্তরাল সরকার কার্যকর হতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখতে পারেন বঙ্গবন্ধু। বিশ্বে সে এক নজিরবিহীন ঘটনা। পাকিস্তানের ২৩ বছর গণতন্ত্র ও ভোটের অধিকারের জন্যই বঙ্গবন্ধু সংগ্রাম করেছিলেন। '৭১-এর মার্চ মাসে সেই ভোটের অধিকার প্রয়োগ করেই তিনি বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিলেন বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম। জনগণ তাকে ম্যান্ডেট দিয়েছে বাংলাদেশ শাসন করবার। পাকিস্তানি শাসকদের পূর্ববাংলা শাসন করবার কোন নৈতিক বা আইনগত অধিকার নেই। একটা জনগোষ্ঠীর ভোটের অধিকার যে কিভাবে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন বঙ্গবন্ধু। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন মুক্তিযুদ্ধের সকল দিকনির্দেশনা তার ভেতর পাওয়া যায়। বিশ্ব রাজনৈতিক ইতিহাসে সে এক অপূর্ব ভাষণ। একজন সিভিলিয়ান নেতা কি করে এই গেরিলাযুদ্ধের নিখুঁত নির্দেশ দিতে পারেন, তা ভাবতেও অবাক লাগে। ওই ভাষণের প্রতিটি স্তর এবং প্রতিটি বাক্যই ছিল দিকনিদের্শনামূলক। অনেকে বলেন ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। তিনি এমন আহ্বান জানালেন, (এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম)। এমন ঘোষণার পর স্বাধীনতা ঘোষণার আর কি বাকি থাকে?

ওই আহ্বানের পর স্বাধীনতা ঘোষণার আর কোনো প্রয়োজন ছিল না। পরবর্তীতে স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে অনেক বিতর্ক তোলা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন একটাই বঙ্গবন্ধু ছাড়া আর কোনো নেতার পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়ার সুযোগ বা অধিকার ছিল কি? ২৩ বছরের সংগ্রাম সফল করেই তো তিনি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ৭ মার্চের ভাষণ দিতে উপনীত হয়েছিলেন। 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ'। 'আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়া রাখতে পারবে না।' এরূপ মন্তব্য কি আর কারো পক্ষে করা সম্ভব ছিল?

বাংলাদেশের বিপ্লবে ১৯৭১-এর মার্চ সবচেয়ে ঘটনাবহুল অধ্যয়। এই মার্চের ১৭ তারিখে বঙ্গবন্ধুর বাংলার মাটিতে আবির্ভাব ঘটে। ৭ মার্চের খোকা শেখ মুজিব, বঙ্গবন্ধু, জাতির জনক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হবার কারণেই কিন্তু তিনি ৭ মার্চের ভাষণ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৭ মার্চের কারণেই কিন্তু ৭ এবং ২৬ মার্চ হয়েছিল। এখন স্পষ্ট করে বলা যায় বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে এ দেশ কখনো স্বাধীন হতো না। আমাদের স্বাধীনতার পটভূমি স্বাধীনতার স্বশস্ত্র সংগ্রামের আধ্যায়ের চেয়ে কোনো অংশে কম গুরুত্ববহ নহে।

সেই '৫২ ভাষা আন্দোলন থেকে তারই ধারাবাহিকতায়' ৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮-এর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন '৬২-এর শিক্ষা কমিশন আন্দোলন, ৬৪-এর মৌলিক গণতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন, ৬৬-এর ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন, তারপর '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এই গোটা সংগ্রামের নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু।

তার অনেক রাজনৈতিক সাথী ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেননি। বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন থেকে ঝরে পড়েছেন। বঙ্গবন্ধু হচ্ছেন একমাত্র নেতা যিনি তার অঙ্গীকারকে নিজের জীবনে সত্য ও বাস্তব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। জাতীয়তাবাদী চেতনাকে জাতিসত্তায় রূপান্তরিত করে জাতিসত্তার প্রতিষ্ঠা করবার একমাত্র কৃতিত্ব তারই। এ কারণেই তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক, বঙ্গবন্ধু। কারো কারো মতে মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে অনেকে অনেক কথা বলে থাকেন। কারো কারো মতে মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র লক্ষ্য নাকি গণতন্ত্র। বৈদেশিক শত্রুদের তাড়িয়ে দিয়ে বাংলার জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর। ক্ষমতা কাদের হাতে হস্তান্তরিত হলো এবং তারা জনগণের জন্য কি করলেন এই নিয়ে ওদের কোনো মাথাব্যথা নেই। বঙ্গবন্ধু স্পষ্টভাবে সুদীর্ঘ সময় ধরে বলে আসছিলেন যে স্বাধীনতার লক্ষ্য হচ্ছে বাঙালির দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। একটা শোষণমুক্ত সমাজ। সর্বকালের সর্বপ্রকারের শোষণের আহ্বান। বঙ্গবন্ধুর ভাষায় শোষিতের গণতন্ত্র। এ কারণেই তিনি আওয়ামী লীগের নাম বদলে নতুন দল করেছিলেন কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ। এই নামকরণের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলার জনগণের জন্য কি প্রত্যাশা করেছিলেন। ১৯৭২ সালে গণপরিষদের সংসদ সদস্যদের দিয়ে তিনি যে সংবিধান

প্রণয়ন করেন তার মূলনীতিসমূহ পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায় আমাদের মহান স্বাধীনতার লক্ষ্য কি ছিল? বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যার পর জাতিকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করবার জন্যই সুদীর্ঘ দিন ধরে স্বৈরশাসকরা বিপরীত ধারায় দেশ পরিচালনা করে। জিয়া, সাত্তার, এরশাদ ও খালেদা জিয়া সকলেই এক পথের পথিক। বাংলাদেশের রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার আগমন এই প্রতিক্রিয়ার ধারার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। সুদীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায় ফিরিয়ে আনেন। তিনি কখনো বিরোধী দলের থেকে কখনো ক্ষমতায় থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সংরক্ষণ করেছেন।

দেশ আজ দু'ভাগে বিভক্ত। স্বাধীনতার সপক্ষে রয়েছে শেখ হাসিনা, আর স্বাধীনতার শত্রু মৌলবাদী, জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীর নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। দেখেশুনে মনে হয় স্বাধীনতার পর এই ৪২ বছরে তারা প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করেছে। যে কারণে শেখ হাসিনার পক্ষে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়া বেশ কিছুটা দুরূহ হয়ে পড়েছে। স্বৈরাচারী সাম্প্রদায়িক জঙ্গিবাদী শক্তিকে মোকাবেলা করবার প্রয়োজনে শেখ হাসিনা রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে কখনো কখনো গণতান্ত্রিক রীতিনীতি সঠিকভাবে মানতে পারেননি। গণতন্ত্র জঙ্গিবাদ কি একসঙ্গে চলতে পারে? জঙ্গিবাদী স্বৈরাচারীরা যখন গণতন্ত্রের বিপক্ষে দাঁড়ান তখন তাদের মোকাবেলায় কঠোর হবার প্রয়োজন পরে। এটা একটা গণতান্ত্রিক সরকারের কৌশল হতে পারে, কখনো নীতি হতে পারে না। এটাই হচ্ছে আজকের বাস্তবতা। যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, সংবিধান মানে না, আইনের শাসন মানেন না, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধে বিশ্বাস করে না, সামাজিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী না, শোষিত মানুষের কল্যাণ করেন না, তারা যদি নিজেরা নিজেদের গণতন্ত্র রক্ষাকবজ হিসেবে দাবি করেন এবং স্বাধীনতার শত্রুদের নিবিড় সম্পর্কে দেখা যায় তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে, তা এখন একেবারেই স্বচ্ছ।

স্বাধীনতার সর্বাত্মক শক্তির ঐক্যই পারে এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে। যারা বলছেন, একটা অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তাদের কাছে প্রশ্ন নির্বাচন হলেই কি জঙ্গিবাদের অবসান হবে? তালেবান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি থেকে কি তারা সরে আসবে? জামাত ও হেফাজতের ১৩ দফা দাবি কি তারা তুলে নেবে? বাংলাদেশকে একটা মৌলবাদী, তালেবানি, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা থেকে তারা কি পিছু পা হবে? যারা সমঝোতার কথা বলেন, তাদের কাছে প্রশ্ন, মৌলবাদ সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদের পেছনে প্রতিপক্ষ সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করতে রাজি আছে কি? এই সব অপশক্তিকে সক্রিয় রেখে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। একটা দুষ্ট ক্ষতের ওপর প্রলেপ দিলেই কি ক্ষত শুকিয়ে যায়। তাই জনগণকে গভীরভাবে ভাবতে ও বুঝতে হবে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করতে হবে।

দৈনিক ভোরের কাগজ
৭ মার্চ ২০১৪

৭ মার্চের ভাষণ ও স্বাধীনতার ঘোষণা

নুরুর রহমান সেলিম

আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জল অধ্যায় ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ। ঐদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসমুদ্রে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। যে ভাষণটিকে বিশ্বের দু'তিনটি ভাষণের একটি বলে মন্তব্য করেন বহু পন্ডিত ব্যক্তিরা। তারা অনেকেই ভাষণটিকে তুলনা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের গ্রেটিসবার্গ ভাষণ এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে দেয়া ভাষণের সাথে। কেউ কেউ আবার মন্তব্য করেন উক্ত ২টি ভাষণের চেয়েও বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব বা তাৎপর্য কিছুটা বেশি। কারণ এ ভাষণে একটি দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা এবং মুক্তিযুদ্ধের দিক নির্দেশনা রয়েছে। আমিও অবশ্য উক্ত মন্তব্যের সাথে একমত পোষণ করি। সেদিনের ঐতিহাসিক জনসভায় উপস্থিত থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

আবেগে আপ্লুত হয়ে নয়, স্বাধীনতার ঘোষণা শুনতেই সেদিন রেসকোর্স ময়দানে ছুটে গিয়েছিল মুক্তিকামী লাখ লাখ জনতা। সেদিন কত লোক সমবেত হয়েছিল তা সঠিক বলা মুশকিল। উপস্থিত জনতার হাতে বাঁশের লাঠি আর মুখে ছিল স্লোগান। বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের এক টুকুও খালি ছিল না। মাঠের চারি দিকের সকল রাস্তা কানায় কানায় পূর্ণ, স্লোগানে মুখরিত ঢাকা শহর।

ঢাকা তখন এত বড় শহর এবং জনসংখ্যাও এত ছিল না। যানবাহন ছিল নিতান্তই কম, গোনা কিছু রেল, বাস, ট্রাক, ট্যাক্সি, রিক্সা, ঘোড়ারগাড়ী। এ নিয়ে মানুষ সভাতে সমাবেত হয়নি, হেটেই আসে বেশী, প্রাণের আকুতি যেতেই হবে। শুনতেই হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের ভাষণ। তিনি আজ ঐতিহাসিক দিক নির্দেশনা দিবেন। বাঙালিদের জন্য আজ ঠিক হবে ভাগ্য নির্ধারণের ঘোষণা, "হয় রবে জান নয় দিব প্রাণ" এ শপথ গ্রহণ হবে আজ, তাইতো এত সাহস ও শক্তি, বজ্র কন্ঠে ভাষণ শোনার আগ্রহ প্রতিটি মুক্তিকামী বাঙালির।

ভোর থেকেই রেসকোর্স ময়দানে মানুষের ঢল নামে, ঠিক জায়গা পেতেই হবে, শেখ মুজিবকে সামনে থেকে দেখতেই হবে, শুনতেই হবে তাঁর সম্পূর্ণ ভাষণ। কিছু অতি উৎসাহী ব্যক্তি যেপথে তিনি আসবেন সেপথের ধারে শুয়ে, বসে, দাড়িয়ে কাটিয়ে দিচ্ছিলেন সময়, যদি নেতার সাথে একটু হাত মেলানো

যায়, যদি একটু কথা বলা যায় সামনা সামনি একটু দেখা যায়, হাত নেরে নিজেকে চেনানো যায়, এ ধরনের আবেগ নিয়েই একদল জনতা পথে পথে জটলা করছিল। সময় বাড়ার সাথে সাথে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল জনসমাগম, দূর থেকে মাইকের অস্পষ্ট আওয়াজ কানে যেতেই দ্রুত চলার হুইসেলের মত আরও দ্রুত হেটে চলছে মানুষের ঢল।

এ ধরনের বিশাল জনসমুদ্র কমই দেখেছি। অবশ্য আরো একটি জনসভা দেখেছিলাম সেটিও বঙ্গবন্ধুর। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পূর্বে বঙ্গবন্ধু নির্বাচনী প্রচারণার জন্য করাচীর নিস্তার পার্কে জনসভায় বক্তব্য দিতে গিয়েছিলেন। ঐ দিন আমি করাচীতে থাকার কারণে নিস্তার পার্কে যাওয়ার এবং ভাষণ শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। মাঠটি কানায় কানায় পূর্ণই নয় উপচে পড়েছিল জনতার ঢল, মানুষের ভীরের জন্য আশে পাশের সকল পথ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল প্রশাসন। আমাদের বহুদুর হেঁটে যেতে হয়েছিল সভাস্থলে। এত জন সমাগম ইতিপূর্বে আর কখনো দেখি নাই। এসভা দেখে আমার ধারণা হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানেও আওয়ামী লীগ বহু আসনে জয়ী হবে। এ ধারণার সাথে পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসরত বাঙালিরাও অনেকে এক মত পোষণ করেছিলেন। কারণ পিপলস্ পার্টি ও মুসলীম লীগ এর বহুগ্রুপ এবং বাঙালিরাও অনেকে মত পোষণ করেছিলেন। কারণ পিপলস্ পার্টি ও মুসলীম লীগ এর বহুগ্রুপ এবং ওয়ালীন্যাপসহ বেশ কয়েকটি পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে বহুমুখি লড়াই এ লিপ্ত। কাজেই আওয়ামী লীগ ও ওয়ালী ন্যাপ বেড়িয়ে আসবে বেশ কিছু আসনে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে আসন না পেলেও পূর্ব পাকিস্তানের ২টি বাদে সকল আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ মেজরিটি লাভ করে।

আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ মেজরিটি লাভ করলেও পাকিস্তানিরা ক্ষমতা ছাড়তে নানা ষড়যন্ত্র শুরু করে। কারণ সাময়িক জংলীগোষ্ঠীসহ ভুট্টো ও আমলা-প্রশাসন, তাদের সিদ্ধান্ত বাঙালিদের কোন অবস্থাতেই ক্ষমতা দেওয়া যাবে না। অখন্ড পাকিস্তান রাখতে মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী করা যাবে না।

মেজরিটি পার্টি হলেও আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা দেয়া পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ক্ষতিকর হবে। এটা ভুল চিন্তা নয়, তা প্রমাণের সক্ষম হয়েছিলেন। ৭০ এর নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের পরাজিত জামাত, মুসলিম লীগসহ সকল দক্ষিণপন্থি দলের নেতৃবৃন্দ দেশ ও জাতির সাথে বেঈমানী করে পাকিস্তানিদের সাথে হাত গলা-বুক ও সুর মিলিয়ে চক্রান্তে লিপ্ত হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত সকল অবাঙালি এবং রিফুজিরা (ওপার থেকে আগত) প্রায় সবাই বাঙালি বিরোধী জোট গঠন করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়। বিহারিরাই বাঙালিদের উপর প্রথম আক্রমণ শুরু করে। ছুরি মারা, লাঠি পেটা করাসহ হত্যা শুরু করে তাঁরা। বিহারী এলাকায় বাঙালি পেলে ধাওয়া মারপিট করার মত বিচ্ছিন্ন ঘটনাও তখন বিশেষ লোক জনের ইসারায় হচ্ছিল। অন্যদিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকাসহ অনেক জেলায় গুলি চালিয়ে হত্যা ও নির্যাতন চালাচ্ছিল। এ সকল ঘটনার প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু ৩রা মার্চ ৮ দফা ঘোষণা দেন।

বৃহত্তর স্বার্থে সকল উস্কানী ও নির্যাতন সহ্য করে আন্দোলনে এগিয়ে নেয়ার দুর্বার সংকল্প বাঙালি বীর জনতার। প্রতিদিন সভা সমাবেশ চলছে। ছাত্রলীগ, ডাকসু, প্রগতিশীল ছাত্র সমাজ, যুব সমাজ, শ্রমিক, কৃষক, সরকারী, আধাসরকারী, বেসরকারী সকল কর্মচারী কর্মকর্তা এক মন প্রাণ। ৬ দফা, ১১ দফা নয় এক দফায় চলে গেছে বাঙালি মাত্রই। আর শোষণ নির্যাতন নয়, আর সুযোগ দেওয়া ঠিক হবেনা, ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতির মনের কথা বঙ্গবন্ধুসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ যেমন বুঝতে পেরেছিল ঠিক তেমনি বুঝতে পেরেছিল তাদের বিরোধী পাকিস্তানের শাসকবর্গ ভুট্টো চক্র। এ দেশে তাদের দালাল মুসলিম লীগ, জামাত, পি ডি পি ও বাম নাম ধারী প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার ধারক বাহক কিছু নেতা এবং আমেরিকা চীনসহ বেশ কিছু রাষ্ট্রের প্রধান পাকিস্তানের সামরিক সরকারকে সমর্থন দিয়ে নানা কুটু কৌশল চালাতে থাকে। পাকিস্তানের স্বৈরশাসক বাঙালিদের উপর তাদের সকল প্রকার ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে থাকে, চলতে থাকে আওয়ামী লীগের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তার সহকর্মীদের সাথে আলোচনার নামে কালক্ষেপন ও চক্রান্ত। পরিকল্পনা চলে পাকিস্তানে ও মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তাদের। একই সাথে ষড়যন্ত্র চলতে থাকে এদেশের নির্বাচনে হেরে যাওয়া পার্টি সমূহের নেতাদের সাথে ছলে বলে কৌশলে বাঙালি জাতির ঐক্য ভেঙ্গে দালাল তৈরী করা যা সর্ব কালে সকল দেশে যুদ্ধের সময় হয়েছে। সে সময় আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে মীরজাফররাও বাসা বেধে ছিল।

৭ মার্চের পূর্বে মুখ খুলতে পারে এমন সাহস তখন কারোও ছিল না। ঐক্যবদ্ধ বাঙালিরা খুবই দৃঢ় মনোবল নিয়ে সুসংগঠিত। যেহেতু চীন মুক্তিকামী বাঙালির বিরুদ্ধে তাই জামাত মুসলীম লীগ এর মত চীনপন্থি কিছু গ্রুপ ৬ দফা, স্বাধীনতা অথবা আওয়ামী লীগের ক্ষমতা গ্রহণের বিরুদ্ধে ছিল। তারা ছাড়া পূর্ব বাঙলার সকল বাঙ্গালি ঐক্যবদ্ধ ছিল। এটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর শক্তি, আওয়ামী লীগের মনোবল।

প্রতারণার বেড়াজাল টপকিয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতার ও বাঙ্গালি জাতির মুক্তির জন্য কৌশল গ্রহণ করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করা ছাড়া সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে বলে বিবেচনায় আনেন। চলতে থাকে আলোচনা পাক সরকারের সাথে। তলে তলে চলতে থাকে প্রগতীশীল পার্টির নেতা কর্মীদের সাথে। ছাত্র-যুবক কৃষক শ্রমিক জনতা শুধু নির্দেশ চাচ্ছে। এমনই এক মুহূর্তে ৭ মার্চ তদানিন্তন রেসকোর্স ময়দানে জনসভা করার ঘোষণা, রেডিওতে সরাসরি প্রচার করার কথাও শোনা গেল।

বেতার টিভির কর্মীরা প্রস্তুত, নির্দেশ পেলেই ছুটে যাবে রেকর্ড করতে। এখনকার মত এত মিডিয়া ক্যামেরা তখন ছিল না। পত্রিকা ছিল হাতে গুনা কয়েকটি। তাও আবার পাকিস্তানপন্থি ছিল বেশী। সরকারের পক্ষে পত্রিকার মালিকরা ছিল জামাত ও মুসলীম লীগের। দৈনিক সংবাদ ও ইত্তেফাক ছিল মূল

ভরসা। এ পত্রিকা গুলির সাংবাধিক রিপোটারও ছিল খুবই কম। কিন্তু তাদের লেখনি ছিল তীব্র শাণিত, জ্ঞান প্রজ্ঞা দূরদর্শীতার ভরপুর। ৭ মার্চ জনসভায় ব্যক্তিগতভাবে অতি উৎসাহি কিছু ব্যক্তি নানা ধরনের ক্যামেরা নিয়ে উপস্থিত হয়ে ছিলেন।

আয়োজন সকল সমাপ্ত। জনসভার স্থল কানায় পূর্ণ, প্রায় ১০/১৫ লাখ লোকের সমাগম, আশে পাশে শুধুই মানুষ আর মানুষ, আনুমানিক বেলা ৩টায় সভাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ধীরে ধীরে মঞ্চে উঠলেন, মুহুর মুহুর স্লোগান আর স্লোগানে লাখো মানুষের আওয়াজ সে এক অন্য তাল ও লয়। যা আর হবার নয়, আবেগে আপ্লুত শ্রোতারা মুখে যে যা বলে সেটাই হয়ে যায় স্লোগান। নেতাকে একটু দেখার জন্য কতইনা আকুতি, লাফ দিয়ে, বুড়ো আঙ্গুলের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে অথবা দু তিন জনের সহায়তার কোলে চড়ে, দূরে গাছে চড়ে উঁচু একটু ভূমির উপর দাঁড়িয়ে নানাভাবে নানা কায়দায় একটু দেখা। এরই মধ্যে ভায়েরা আমার বলে বজ্রধনী, শুরু হল ঐতিহাসিক বজ্র ভাষণ।

প্রতিটা বাক্যের পর সমর্থসূচক আওয়াজ দিচ্ছে জনতা, এক পর্যায়ে মহাকাব্যের পংক্তি "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তিগ্রাম সংগ্রাম, এবারের স্বাধীনতার সংগ্রাম" সুস্পষ্ট স্বাধীনতার ঘোষণা। এরপর তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোল, আমি যদি হুকুম দিতে নাও পারি প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। শেষ বাংলার ও বাঙালির মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর মহাকাব্য ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ।

চোখে দেখেনি যে জন তাকে বোঝানো যাবে না সে দৃশ্য। দূর দূরদুরান্তে থেকে আসা জনতার স্রোত, ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে মুখে জয় বাংলা স্লোগান সহ দেশ স্বাধীন করার স্লোগান দিতে দিতে। চলে যাচ্ছে, ক্লান্তি নেই কষ্ট নেই, যা আশা করে এসেছিল তা যেন ১৬ আনাই প্রাপ্তি। আনন্দ উচ্ছাস দৃঢ় মন বজ্র কণ্ঠের ধ্বনি প্রতিধ্বনি এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

কি হয়েছিল সেদিন বাংলার জনগণ? এ প্রশ্ন থাকতেই পারে। নতুন প্রজন্মের কাছে নানা প্রশ্ন নানা উত্তর আছে, কিছু কাল্পনিক কিছু শোনা কথা। সঠিক ইতিহাস আজ অনুপস্থিত, দীর্ঘ দিনের বিকৃতি অসত্য মিথ্যা তথ্য দিয়ে জাতিকে বেশী দিন অন্ধকারে রাখা যায় না। ৭ মার্চের ভাষণ এবং ঐ অবস্থার প্রেক্ষাপট, ভাষণের মর্ম কথা আজও সঠিকভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে না। দা'য়ের চেয়ে বাট বড় অথবা কুমড়ের চেয়ে বিচি বড় এমন সব তথ্য শেখানো হচ্ছে।

১৯৪৭ সালের বিভাজন ছিল দরিদ্র মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তের জনসাধারণের অভিশাপ, লাভ হয়েছে ব্যবসায়ী মহাজন ধনিক শ্রেনীর ও কিছু লোভী রাজনীতিবিদদের। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল সাধারণ দেশবাসী। কিন্তু কুচক্রি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, অপরাজনীতি, ধর্মান্ধ রাজনীতি ব্যবসায়ীরা,

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ৫৪ এর বিজয়ীদের বেশি দিন ক্ষমতায় থাকতে দেয়নি। ক্ষমতাচ্যুত করে সেই কুচক্রি পরাজিত জনবিরোধী শক্তিকে বসিয়ে ছিল ক্ষমতায়। পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ লুটপাট করা, নির্যাতন শোষণনের মাধ্যমের বাঙালি জাতিকে পরাধীন এবং দ্বিতীয় শ্রেনীর নাগরিক করে শিক্ষা চাকরী সেনা বাহিনীসহ সকল পর্যায়ে বৈষম্য ও দাবিয়ে রাখার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠি। পাঞ্জাবি ও রিফুজিরাই ছিল বাঙ্গালি বিরোধী, তারা যে শুধু বাঙালি বিরোধীই ছিল তা নয়। তারা বেলুচিস্তান, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও আজাদ কাশ্মীরেরও বিরোধী ছিল। কারণ তারাও স্বাধীনতার দাবী করে। আজাদ কাশ্মীরও পাকিস্তানের মুঠো থেকে বেড়িয়ে স্বাধীন হবার সংগ্রাম করেছে। করাচি সহ সিন্ধু জঙ্গী বিরোধী শান্তিতে থাকতে চায়। কওমী মুভমেন্ট জীবন দিয়ে জঙ্গীবাদ থামিয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝেই তাদের উপর হামলা করেছে।

সে যাই হোক আমরা দেখা ৭ মার্চ একটু লেখলাম, বয়স কম ছিল, আবেগ যেটুকু ছিল তার চেয়ে বাস্তব অবস্থার চিন্তা, ভবিষ্যত প্রজন্মের চিন্তা, নিজের দেখা পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন পূর্ব পাকিস্তানের শোষণ নির্যাতন বিশেষ করে সব ক্ষেত্রে বৈষম্য পাকিস্তানিদের কাছে বাঙালি হবার কারণে নানা কটুক্তি শুনতে হয়েছে, বেইজ্জত হতে হয়েছে রুনা লায়লার মত গায়িকা এবং জেনারেল খাজ ওয়াসি উদ্দিন এর মত সেনা কর্মকর্তাকেও।

৭ মার্চ সম্পর্কে আমি শুরুতেই লেখেছি বঙ্গবন্ধুর সে ভাষণটি ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুস্পষ্ট ঘোষণা। এর আগের ও পরে কোন কথা চলে না। আস্‌সালামুআলাইকুম বলে অথবা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ঘোষণা পাঠ করলেই ৭ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণার মূল্য একটু নাড়ানো বা কমানো যাবে না।

যুদ্ধ শুরু সত্যিকার অর্থে ৭ মার্চ থেকেই মানুষিক শক্তি বৃদ্ধি করে, যুদ্ধের প্রস্তুতি, প্রশিক্ষণ শুরু, অফিস আদালত কার্যত বন্ধ, ব্যাংক অচল, আক্রমণের প্রতিরোধ করার প্রস্তুতি, সমস্ত বাঙালি ঐক্যবদ্ধ রাখা।

ছাত্রদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। যৌবন যার যুদ্ধে যাবার সময় তার কবির এই পংক্তি সঠিক প্রমান করে ছিল দেশের ছাত্র যুবসমাজ। অনেক কট্টর মুসলীম লীগ পরিবারের সন্তানরাও বাবার আর্শিবাদ পেয়ে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ডাকে সাড়া দিয়েছিল। যেমনটি দিয়েছিল ভাষা আন্দোলনে মায়ের মুখের ভাষার জন্য, বাঙলা ভাষা রক্ষায় বহু রক্ষণশীল মুসলীম পরিবার ও মুসলীম লীগ নেতা কর্মীরা বাংলা ভাষার পক্ষে অবস্থান নিয়ে ছিলেন" কারণ মায়ের ভাষা, মুখের ভাষা, বাংলা ভাষা।

মাঝে মাঝে ভাবতে অবাক লাগে ব্যক্তি পার্টি বা দলের বিরুদ্ধে থাকলেই দেশের স্বাধীনতার ও মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে থাকতে হবে এমনটি হওয়া উচিৎ নয়। কিছু বাম দাবীদার বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাহিত্যিক ধর্মীয় মৌলবাদ ও মার্কসবাদ একই ফর্মুলায় ফেলে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে তত্ত্ব ও তথ্য আওড়িয়ে থাকেন। আজও সাম্প্রদায়িক শক্তির হাতকে

শক্তিশালী করতে ব্যস্ত তাঁরা। যুদ্ধপরাধীদের পক্ষ হয়ে তাঁরা দালাল আইনের বিরুদ্ধে মিছিল করে ছিলেন, কেউ কেউ নেপথ্যে গুরু সেজে বসে ছিলেন। আজ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যখন শুরু হয়েছে তখন দেশবাসীকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার কাজে অত্যন্ত সুকৌশলে লিপ্ত রয়েছেন তাঁরা। কেউ না জানলে জামাতের নেতারা ঠিকই জানে কে কি করেছে ও করছে। তাদের কেউ আবার অর্থ সাহায্য নিয়ে আন্দোলন জমানোর চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এদের হতে সাবধান, এরা কোমড়ের ছুরি, এরাই বিশ্বাসঘাতক।

৭ মার্চ এর বিষয়ে উপরোক্ত বিষয়টি একটুও অপ্রাসঙ্গিক নয়। এদেশের সকল সুবিধা নিয়ে যারা দেশের মঙ্গল চান না তাদের একটা বড় অংশ ৭ মার্চের ভাষণ ও স্বাধীনতার ঘোষণা বাঙালির মুক্তির সনদ সম্পর্কে বিকৃত তথ্য হাজির করেন। তাদের বাংলাদেশে থাকতে ভাল লাগে, ভোগ-বিলাস, ব্যবসা বানিজ্য, এনজিওর পক্ষে বিবৃতি দিয়ে টাকার প্যাকেট গ্রহণ সবই ভাল লাগে। শুধু ভাল লাগেনা মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা বাংলা ভাষা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, জয় বাংলা ধ্বনি, বঙ্গবন্ধু শব্দ। জাতির জনক ভাল লাগে না। ভাল লাগে জিন্দাবাদ, ভাল লাগে পাকিস্তান, আমেরিকা, ভালো লাগে ৭১ এ চীনের ভূমিকা আফগানিস্তানে আমেরিকার আক্রমণ ভাল লাগে প্যালেস্টাইনের উপর ইহুদী ও ইসরাইলী আক্রমণ, ইহুদীদের পণ্য ভাল লাগে, পাকিস্তানে তালেবানদের উপর আমেরিকার আক্রমণ, মোসরেকদের কাপড়, গাড়ী ব্যবহার করতে ভাল লাগে, মদসহ নেসা আমদানী ভাল লাগে একটু খেতেও ভাল লাগে।

৭ মার্চ আমাদের দৃষ্টিশক্তি দিয়ে ছিল। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হয়ে জয়ী হতে শিখিয়েছিল, ভাল মন্দ চিনতে এবং ভুল মিথ্যা অসত্যকে প্রত্যাখ্যান করা, শিখিয়েছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের পক্ষে থাকা, শত্রুর বিরুদ্ধে শতর্ক থাকতে, জালেমের অত্যাচারে বঞ্চনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ। ন্যায় নিষ্ঠা সৎ সত্য পথ অবলম্বন করাই ৭ মার্চের মর্ম কথা। এই ভাষণেই ছিল স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা।

আসুন আমরা ৭ মার্চের ভাষণ বার বার পড়ি ও শুনি। এর মর্ম বাণী উপলব্ধি করি। অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করি বঙ্গবন্ধুকে। জয় হোক বাঙালি ও বঙ্গবন্ধুর। বাংলাদেশ দীর্ঘজীবি হোক।

ইতিহাসের ইতিহাস

মুহাম্মদ জাফর ইকবাল

মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সব সময়েই আমার বুকের মাঝে এক ধরনের গভীর শ্রদ্ধাবোধ এবং ভালোবাসা কাজ করে। মাঝে মাঝেই পথে-ঘাটে, রেল স্টেশনে কিংবা কোন অনুষ্ঠানে আমার হয়তো একজন মাঝবয়সী কিংবা বৃদ্ধ মানুষের সঙ্গে দেখা হয়। টুকটাক কথার পর হঠাৎ করে সেই মানুষটি বলেন, 'আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা!' আমি তখন সব সময়েই দ্বিতীয়বার তার হাত স্পর্শ করি এবং সেই মাঝবয়সী কিংবা বৃদ্ধ মানুষটির মাঝে আমি টগবগে তেজস্বী একজন তরুণকে খুঁজে পাই। আমি জানি সেই তরুণটি কিন্তু নিজের জীবনকে দেশের জন্যে উৎসর্গ করতেই যুদ্ধে গিয়েছিল। এখন আমরা সবাই জানি কাপুরুষ পাকিস্তান সেনাবাহিনী মাত্র ৯ মাসের ভেতর আত্মসমর্পণ করেছিল, একাত্তরে যারা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে গিয়েছিল তারা কিন্তু তখন সেটি জানতো না। তারা সবাই কিন্তু বছরের পর বছর যুদ্ধ করার জন্যেই গিয়েছিল। তাই সবসময়েই আমি মুক্তিযোদ্ধা মানুষটির হাত স্পর্শ করে বলি, 'থ্যাংকু! আমাদের একটি দেশ উপহার দেয়ার জন্য।'

মাঝে মাঝে কোন তরুণ কিংবা তরুণীর সঙ্গে আমার দেখা হয়। সে লাজুক মুখে আমাকে বলে, 'আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা' আমি তখন আবার তার মুখের দিকে তাকাই। তার লাজুক মুখের পেছনে তখন আমি তার মুক্তিযোদ্ধা বাবাকে নিয়ে গর্ব আর গৌরবের আলোটুকু খুঁজে পাই । আমি তখন তার বাবার খোঁজ-খবর নেই। বেশিরভাগ সময় আবিষ্কার করি তিনি আর বেঁচে নেই। যদি বেঁচে থাকেন তাহলে আমি সেই তরুণ কিংবা তরুণীকে বলি তার কাছে আমার শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা পৌঁছে দিতে।

একাত্তর সালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হয়েছে তখন আমার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবরা যারা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল তারাও ক্লাসে ফিরে আসতে শুরু করেছে। কমবয়সী তরুণ কিন্তু এর মাঝে তাদের ভেতর কী বিস্ময়কর দেশের জন্য যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা। আমি তাদের দেখি এবং হিংসায় জ্বলেপুড়ে যাই! একাত্তরের ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য আমি কম চেষ্টা করিনি-পিরোজপুরে মাঠে দুই-একদিন লেফট-রাইট করা

ছাড়া খুব লাভ হয়নি। আমার বাবাকে মেরে ফেলার পর পুরো পরিবারকে নিয়ে একেবারে বনের পশুর মতো দীর্ঘদীন দেশের আনাচে-কানাচে ছুটে বেড়াতে হয়েছে। একটু স্থিতু হয়ে যখন বর্ডার পার হওয়ার পরিকল্পনা করছি তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী মাত্র ১৩ দিনের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গেল- আমার মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার স্বপ্ন আর পূরণ হলো না। সেই নিয়ে আমার ভেতরে বহুদিন একটা দুঃখবোধ কাজ করতো এবং আমার বয়সী মুক্তিযোদ্ধা দেখলেই আমি হিংসায় জর্জরিত হতাম।

খুব ধীরে ধীরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমার সেই (হাস্যকর এবং ছেলেমানুষী) হিংসাটুকু গভীর শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসায় পাল্টে গেছে। আমি বুঝতে শিখেছি দেশের জন্যে যুদ্ধ করার সেই অবিশ্বাস্য গৌরব সবার জন্য নয়, সৃষ্টিকর্তা অনেক যত্ন করে সৌভাগ্যবান কিছু মানুষকে তার জন্যে বেছে নিয়েছেন। বাংলাদেশে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী এবং সাহিত্যিক হবে, ফিল্ড মেডেল বিজয়ী গণিতবিদ হবে, অস্কার বিজয়ী চিত্র পরিচালক হবে, আলম্পির্কে স্বর্ণ বিজয়ী দৌড়বিদ হবে, ওর্য়াল্ডকাপে বিজয়ী ক্রিকেট টিম হবে এমন কী মহাকাশ বিজয়ী মহাকাশচারী হবে কিন্তু আর কখনোই মুক্তিযোদ্ধা হবে না! এই সম্মানটুকু সৃষ্টিকর্তা যাদের জন্যে আলাদা করে রেখেছেন শুধু তারাই তার প্রাপ্য, অন্যের নয়। (তাই আমি যখন দেখি অল্প কিছু সুযোগ-সুবিধার জন্যে কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধার ভুয়া সনদ বের করে ফেলছে তখন আমার মনে হয় গলায় আঙুল ঢুকিয়ে তাদের ওপর হড় হড় করে বমি করে দিই!)

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমার ভেতরে এখন গভীর ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা। আমি সব সময় চেষ্টা করে এসেছি নূতন প্রজন্মের ভেতর সেই অনুভূতিটুকু সঞ্চারিত করতে যেভাবে সম্ভব মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে তাদের প্রাপ্য সম্মানটুকু পৌঁছে দিতে। একটি সময় ছিল যখন এই দেশে রাজাকারদের গাড়িতে জাতীয় পতাকা উড়তো, মুক্তিযোদ্ধাকে খাটো করে দেখানো হতো, মুক্তিযোদ্ধাদের অবমাননা করা হতো-তখন এই দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের বুকের ভেতর যে গভীর অভিমান জমা হয়েছিল আমি সেই কথা কখনও ভুলতে পারব না। আমাদের খুব সৌভাগ্য আমরা সেই সময়টি পেছনে ফেলে এসেছি। এই দেশের মাটিতে আমরা আর কখনও কোন মুক্তিযোদ্ধাকে অবমাননা করতে চাই না।

তাই যখন আমি আবিষ্কার করেছি একটি বইয়ের বিষয়বস্তুর কারণে এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দকারকে অপমান করার চেষ্টা করা হচ্ছে তখন বিষয়টি আমাকে গভীরভাবে আহত করেছে। একে খন্দকার শুধু একজন মুক্তিযোদ্ধা নন তিনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ডেপুটি চিপ অব স্টাফ। ষোলোই ডিসেম্বর যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আত্মসর্মণ করে তখন তিনি আমাদের বাংলাদেশের প্রতিনিধি ছিলেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টা তিনি এবং তার সহযোদ্ধারা মিলে সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম তৈরি করে নূতনভাবে আমাদের সামনে নিয়ে এসেছিলেন এবং আমদের তরুণরা সেটা সাগ্রহে গ্রহণ

করেছে এবং মুক্তিযুদ্ধের জন্যে ভালোবাসা এ দেশে আবার নূতন করে প্লাবিত হয়েছে। এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দকার তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে দেশের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছেন, দেশের মানুষকে সংগঠিত করেছেন। মনে আছে, তিনি এবং তার সহযোদ্ধারা একবার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন এবং এয়ারপোর্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পর্যন্ত পথটুকু আমি গাড়িতে তার পাশে বসে এসেছিলাম। মুক্তিযুদ্ধের এরকম একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের পাশে বসে আছি চিন্তা করেই আমি শিহরিত হয়েছিলাম। তিনি এবং তার সহযোদ্ধারা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তাদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন। আমরা তাদের নিয়ে আমাদের একটা খোলা চত্বরে তাদের হাতে কিছু গাছ লাগিয়েছিলাম, এতদিনে গাছগুলো বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি নিয়ে অনেক বড় হয়েছে। আমরা সেই চত্বরদিকে সেক্টর কমান্ডারস চত্বর বলে ডাকি।

সে কারণে যখন আমি দেখি এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দকারকে তীব্র ভাষায় শুধু সমালোচনা নয় অপমান করার চেষ্টা করা হচ্ছে তখন সেটি আমাকে তীব্রভাবে আহত করে। যারা তাকে নানাভাবে অপমান করার চেষ্টা করছেন তারা কী বুঝতে পারছেন না তাকে এভাবে আসলে আমরা শুধু আমাদের নিজেদেরকেই না আমরা মুক্তিযুদ্ধকেও অপমান করছি? তার অবদানকে খাটো করে দেখার চেষ্টা করছি? খবরের কগজে দেখিছি বার্ধক্যের কথা বলে তিনি সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের নেতৃত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন, কাউকে নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না তাকে নিযে তীব্র সমালোচনা, বিতর্ক এবং অপমানই হচ্ছে মূল কারণ। আমরা আমাদের দেশে একজন মানুষকে তার নিজের মত প্রকাশের জন্যে এভাবে অসম্মান করব আমি সেটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।

২.

এটি অবিশ্য কেউ অস্বীকার করবে না যে এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দকারের বইটি পড়ে আমাদের সবারই কম-বেশি মন খারাপ হয়েছে। আমরা সবাই আশা করেছিলাম তিনি মুক্তিযুদ্ধচলাকালীন সময়ে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখবেন, সেটি ইতহাসের অংশ হয়ে থাকবে। কিন্তু তিনি যেটুকু নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন তার থেকে বেশি ইতিহাসকে নিজের মতো করে বিশ্লেষণ করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি একজন সৈনিক, তার বিশ্লেষণ হয়েছে সৈনিকের চোখে, ইতিহাসবিদ সাধারণ মানুষ কিংবা রাজনৈতিক মানুষের সঙ্গে তার বিশ্লেষণ মিলবে তার গ্যারান্টি কোথায়? সবচেযে বড় কথা এই বইয়ে তিনি যা লিখেছেন সেখানে তার নিজের অভিজ্ঞতার কথাগুলো ছাড়া অন্য সব কথা কিন্তু আমরা সবাই অন্য জায়গায় শুনেছি! আমার দুঃখ হয় অন্য মানুষের মুখে আগে শুনে থাকা কথাগুলোর জন্যে আজকে তার মতো একজন মানুষেকে এত অপমান করা হলো।

আমি মোটেই বইটি নিয়ে আলোচনা করব না, শুধু বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় নিয়ে কথা বলব। এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দকার লিখেছেন, ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তার ভাষণটি শেষ করেছেন 'জয় পাকিস্তান' বলে। হুবহু এই বিষয়টি লিখেছিলেন বিচারপতি মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান তাঁর 'বাংলাদেশের তারিখ' বইটিতে। তিনি অবশ্যি 'জয় পাকিস্তান' লেখেননি তিনি লিখেছিলেন 'জিয়ে পাকিস্তান।' পরে কোন একটি সংস্করণে তিনি বই থেকে এই কথাটি সরিয়ে দিয়েছিলেন, আমি ধরে নিচ্ছি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তার এই তথ্যটি ভুল ছিল, তিনি ভুল সংশোধন করেছেন। এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দকার যেহেতু দাবি করেননি তিনি নিজের কানে বঙ্গবন্ধুকে জয় পাকিস্তান বলতে শুনেছেন তাই আমি ধরে নিচ্ছি বিচারপতি মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, যেখান থেকে এই তথ্যটি পেয়েছেন তিনিও সম্ভবত একই জায়গায় সেটি পেয়েছেন। এই বিচিত্র তথ্য সূত্রটি কী? আমার মনে হয় এর সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন সৈয়দ বদরুল আহসান ডেইলি স্টার পত্রিকায়। তিনি লিখেছেন, ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর দেয়া ভাষণটি যখন পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচার করা হয় তখন স্থানীয় পত্রিকাগুলো তাদের দেশের মানুষ যেন বিচলিত না হয় সেজন্যে বক্তৃতার শেষে এই কথাটুকু ছুড়ে দিয়েছিল। সেই কথাটিই এখনও নানা জনের কথায় চলে এসেছে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, নানাভাবে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে। তিনি লিখেছেন তাজউদ্দীন আহমদের অনুরোধের পরও তিনি একটি স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে রাজি হননি। আমি ইতিহাসবিদ নই, আমি নির্মোহভাবে চিন্তা করতে পারি না কিন্তু আমার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আগ্রহ আছে, ছোটদের জন্যে ২২ পৃষ্ঠার একটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখার জন্যে আমাকে অনেক বই পড়তে হয়েছিল! আমি পাকিস্তানি মিলিটারি অফিসার সিদ্দিক সালিকের বইয়ে দেখেছি তিনি লিখেছেন ২৫ মার্চ রাতে খুবই ক্ষীণভাবে একটি স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারিত হয়েছিল। ঘোষণাটি কোথা থেকে এসেছিল তার একটি ব্যাখ্যা তাজউদ্দীন আহমদের বড় মেয়ে শারমিন আহমদের বইটিতে (তাজউদ্দীন আহমদ নেতা ও পিতা. পৃষ্ঠা ১৪৬-১৪৭) দেয়া আছে। ট্রান্সমিটার বানানোতে পারদর্শী ইঞ্জিনিয়ার নূরুল হক ঘোষণাটি প্রচার করেছিলেন বলেই হয়তো পাকিস্তান মিলিটারির হাতে তাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

যাই হোক, আমি আগেই বলেছি আমি আসলে এই বইটির বিষয়বস্তু নিয়েছিল লিখতে বসিনি, অনেকেই সেটা লিখছেন। সবচেয়ে বড় কথা একাত্তরে বাংলাদেশ আর বঙ্গবন্ধু সমার্থক দুটি শব্দ দিছ, এতদিন পর দুটি শব্দকে আলাদা করে দেখার সুযোগ কোথায়? বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে কী বাংলাদেশের জন্ম হতো?

৩.

আগেই বলেছি এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দকারের বইটি পড়ে আমার একটু মন খারাপ হয়েছে। শুধু আমার নয়-আমার মতো অনেকেরই। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে

আমাদের মতো যেসব মানুষের এক ধরনের ছেলেমানুষী উচ্ছ্বাস রয়েছে তারা সবচেয়ে বেশি মনে কষ্ট পেয়েছে। তবে আমার ধারণা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দকারের, যে ভাষায় এবং যে প্রক্রিয়ায় তাকে অসম্মান করা হয়েছে সেটা মেনে নেয়া কঠিন। আমার ধারণা তিনি নিজেও নিশ্চয়ই ভাবছেন, যে কথাগুলো ইতিহাসের সত্য বলে প্রকাশ করতে চাইছি সেই কথাগুলো তো বঙ্গবন্ধুকে খাটো করে দেখানোর জন্যে আরও অনেকেই আগে এভাবে বলেছে-তাহলে এই বইয়ে সেটি লিখে কার লাভ হলো?

আমিও ভাবছিলাম, কার লাভ হলো, তখন হঠাৎ করে উপলব্ধি করেছি যে লাভ হয়েছে বই প্রকাশকের! বইটি প্রকাশ করেছে প্রথম আলোর প্রকাশনা সংস্থা এবং তারা একটু পরে পরে বইটির বিজ্ঞাপন দিয়ে বইটি বিক্রি বাড়ানোর চেষ্টা করছে। খুবই স্থূলভাবে বলা যায় একটি করে বই বিক্রি হচ্ছে একজন সেই বই কিনছে, সেই বই পড়ছে আর মন খারাপ করছে আর প্রথমা প্রকাশনীর ক্যাশ বাক্সে একটু করে অর্থ যুক্ত হচ্ছে। আমি যদি একজন প্রকাশক হতাম তাহলে কী শুধু কিছু অর্থ উপার্জন করার জন্যে এরকম একটি বই প্রকাশ করে এই দেশের সবচেয়ে সম্মানী মানুষটিকে এরকম অসম্মানের দিকে ঠেলে দিতাম? কিছুতেই দিতাম না। মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলে একটা কথা আছে, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও তার মত প্রকাশ করার জন্যে 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' নামে একটা বই লিখেছিলেন। সেই বইয়ের সংক্ষিপ্ত একটা রূপ ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। পুরো বইটি পড়ে অনেকে মনে কষ্টে পেতে পারে বলে তিনি বলেছিলেন তার মৃত্যুর ৫০ বছর পর যেন পুরো বইটি প্রকাশ করা হয়। তার মৃত্যুর ৫০ বছর পর আমরা সেই বইটি পড়ার সুযোগ পেয়েছি। কাজেই ইতিহাসে সত্য যুক্ত করার জন্যে সময় নেয়ার উদাহরণ পৃথিবীতে আছে- একজন মানুষকে অসম্মান করা হবে জানলে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। দ্রুত অর্থ উপর্জন পৃথিবীর একমাত্র পথ নয়।

বইটি পড়ে আমার ভেতরে এক ধরনের অস্বস্তি খচখচ করছিল, বারবার মনে হচ্ছিল, সত্যিই কী বীর মুক্তিযোদ্ধা একে খন্দকার এই বইটি নিজের হাতে কাগজের ওপর কলম ঘষে ঘষে লিখেছেন? আমার কৌতুহল মেটানোর জন্যে আমি প্রথম আলোর প্রকাশনা সংস্থা 'প্রথমা'কে ফোন করলাম, তাদের কাছে অনুরোধ করলাম তার হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিটি কী আমি এক নজর দেখতে পারি? তারা একটু ইতস্তত করে আমাকে জানালেন, সেভাবে হাতে লেখা পুরো পাণ্ডুলিপি তাদের কাছে নেই। কিছু আছে। তার সঙ্গে আলাপ- আলোচনা করেই পুরোটা প্রস্তুত করা আছে এবং সেই বইয়ের পুরো বিষয়বস্তুর সঙ্গে তিনি পুরোপুরি একমত সে রকম সাক্ষ্যপ্রমাণ তাদের কাছে আছে।

আমি লেখালেখি করি তাই এই উত্তর শুনে আমি কেমন যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলাম। আমার মনে হতে লাগল এই বইটি কেমন করে লেখা হয়েছে কিংবা 'প্রস্তুত' করা হয়েছে সেটা খুব কৌতূহল উদ্দীপক একটা বিষয় হতে পারে।

বই লেখা আর বই প্রস্তুত করার মাঝে অনেক পার্থক্য। আমরা কি প্রথমা প্রকাশনীর কাছ থেকে এই বই প্রস্তুত করা সংক্রান্ত একটা পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেতে পারি? আমাদের মনের সান্ত্বনার জন্যে?

৪.

আমরা সবাই জানি, এই বইটি লেখার জন্যে এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দকারকে সম্ভবত তার জীবনের সবচেয়ে কষ্টকর একটা সময়ের ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে। তিনি সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের নেতৃত্ব দেবেন না আমি সেটা কল্পনাও করতে পারি না। তার বই পোড়ানো হয়েছে, খন্দকার মুশতাকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে-ব্যক্তিগত পর্যায়ে কী বলা হচ্ছে সেগুলোর কথা তো ছেড়েই দিলাম।

কিন্তু সবার কাছে আমার খুব সোজা একটি প্রশ্ন। এই বইটি লেখার দায়ভার কী শুধু লেখকের? প্রকাশককেও কী খানিকটা দায়ভার নিতে হবে না? আপত্তিকর কিংবা বিতর্কিত কিছু লিখে একজন লেখক সমালোচনা আর অসম্মান সহ্য করবেন এবং সেই সমালোচনা আর অসম্মান বিক্রি করে প্রকাশক অর্থ উপার্জন করবেন সেটি কেমন কথা? আমরা কী কোনভাবে প্রকাশকেও দায়ী করতে পারি?

হুবহু এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের দেশে এর একটি 'ক্লাসিক' উদাহরণ আছে এবং আমাদের অনেকেরই নিশ্চয়ই ঘটনাটি মনে আছে। ২০০৭ সালে প্রথম আলোর রম্য সাপ্তাহিক আলপিনে একটা অত্যন্ত নিরীহ কার্টুন ছাপা হয়েছিল। এই দেশের ধর্মান্ধ গোষ্ঠী সেই নিরীহ কার্টুনটিকে একটা ইসলাম বিরোধী রূপ দিয়ে হাঙ্গামা শুরু করে দেয় এবং আমরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করি অত্যন্ত দ্রুততায় সঙ্গে কার্টুনিস্টকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হলো। শুধু তাই নয় এটা প্রকাশ করার অপরাধে আলপিনের সম্পাদক সুমন্ত আসলামকে বরখাস্ত করা হলো। এখানেই শেষ নয় আমরা দেখলাম প্রথম আলোর সম্পদক জনাব মতিউর রহমান স্বাধীনতাবিরোধী হিসেবে পরিচিত বায়তুল মোকাররমের খতিবের কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে নিষ্কৃতি পেলেন। (আমার ধারণা ছিল সংবাদপত্র আদর্শ এবং নীতির কাছে কখনও মাথা নত করে না সেদিন আমার সেই ধারণাটিতে চোট খেয়েছিল!)।

এই অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং নাটকীয় ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারলাম কোন কিছু বিতর্কিত বা আপত্তিকর ছাপানো হলে লেখকের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশকদেরও সেই দায় গ্রহণ করতে হয়। আগে গ্রহণ করেছে।

আমার খুব ইচ্ছে আমাদের সবার কাছে সম্মানিত বীর মুক্তিযোদ্ধা একে খন্দকারের বক্তব্যের দায়ভার প্রকাশক খানিকটা হলেও গ্রহণ করে তাকে যেন তার সম্মানটুকু ফিরিয়ে দেয়।

দৈনিক সংবাদ
২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫

‘১৯৭১ : ভেতরে বাইরে’ এক অনৈতিক উপাখ্যান

মেজর জেনারেল এটিএম আব্দুল ওয়াহাব (অব.)

সম্প্রতি এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকারের একটি বই প্রকাশ হয়েছে ‘১৯৭১: ভেতরে বাইরে’। বইটির মূল উপজীব্য আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। এ বইয়ের লেখক মুক্তিযুদ্ধের ডেপুটি চিফ অব স্টাফ ছিলেন। তার বইটি ইতিমধ্যে দেশবাসীর কাছে তুমুল বিতর্কে সৃষ্টি করেছে। আমি নিজেও ১৯৭১ সালে ৮ নম্বর সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। মাঠ পর্যায়ে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমি দর্শনা (পাকসেনা নিহত ৩৪), খৈরী (পাকসেনা নিহত ৯) শত্রু ঘাঁটি দখল করি ও মাগুরা, ঝিনাইদহ, রাজবাড়ি এলাকায় শত্রু নিয়ন্ত্রিত এলাকায অবস্থান করে যুদ্ধ পরিচালনা করি ও বেতার যন্ত্রে মাধ্যমে বেরাপুরে মিত্র বাহিনীকে শত্রুর গতিবিধির সংবাদ প্রেরণ করি। মিত্র বাহিনীর যুদ্ধবিমান দ্বারা শত্রুর মাগুরা ও কামারখালী অবস্থানে বোমাবর্ষণ করাই ও যুদ্ধে আমাদের জয় ত্বরান্বিত করি। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে খন্দকারের বই সম্পর্কে আমার কিছু মতপার্থক্য রয়েছে। আমার জন্ম মাগুরায়। ১৯৬৭ সালে আমি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করি। পরের বছর পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত হই। ১৯৭১ সালে আমি যশোরে কর্মরত অবস্থায় পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসি। এরপর মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেই। আমার আজও স্পষ্ট মনে পড়ে, ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু যখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যোনে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন ওই মুহূর্তে আমি স্টেজের পাশে ছিলাম। তার ১৮ মিনিটের বক্তব্য আমি মনোযোগ দিয়েই শুনেছি। ওই ভাষণ তিনি শেষ করেছিলেন ‘জয় বাংলা’ শব্দটি উচ্চারণ করে। সেখানে ‘জয় পাকিস্তান’ ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ শব্দ আমি শুনিনি। এ কে খন্দকার এসব শব্দ কোথা থেকে পেলেন তা আমি জানি না। বঙ্গবন্ধু যদি বলেও থাকেন, কারণ তখন পাকিস্তান ছিল এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনা চলছিল, এ অবস্থায় যদি ‘জয় পাকিস্তান’ বলেও থাকেন তাতে আসে যায় না।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণই মহান মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক নির্দেশনা। তার ভাষণে তিনি উল্লেখ করেছেন, ‘আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বা।...এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।... রক্ত

যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব....’ ইত্যাদি। এরপর ঘোষণার আর কিছু বাকি থাকে না। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের পতাকা, জাতীয় সংগীত হয়ে গেছে। বুদ্ধিমানের জন্য ইশারাই যথেষ্ট। এগুলো তো স্বাধীনতার ঘোষণাই। আর কি বাকি রইল? অথচ এ কে খন্দকার তার বইতে উল্লেখ করেছেন, বঙ্গবন্ধুর যুদ্ধের জন্য কোন প্রস্তুতি ছিল না। এ কথা তিনি কীভাবে বলেন? পাকিস্তান প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ২৪ মার্চ পর্যন্ত আলোচনা চলে। সবার ধারণা ছিল আলোচনার মধ্যে একটা মীমাংসা হবে। কিন্তু পাকিস্তান নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে বসবে এটা ছিল কল্পনার বাইরে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সিদ্দিক সালেকের বইতে আমরা একটি তথ্য পেয়েছি, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। পরের দিন আমেরিকা, লন্ডনসহ বিভিন্ন দেশের পত্রপত্রিকায় খবর প্রচার হয় বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। এমনকি দেশের বিভিন্ন জেলার কর্মরত সব ডিসির কাছে ফ্যাক্স মারফত স্বাধীনতার মেসেজ চলে যায়। আমার বন্ধু চট্টগ্রামের ডিসি মীর মোস্তাফিজুর রহমানও ফ্যাক্স মেসেজ পেয়েছিলেন। সুতরাং এ কে খন্দকারের যুক্তি নির্ভরযোগ্য নয়।

বঙ্গবন্ধুর একক নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পন্ন হয়। এর আগে আমরা শেরে বাংলাকে দেখেছি, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দেখেছি তারা যে কাজটি পারেনি বঙ্গবন্ধু সেই কাজটি করেছেন। তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ট সন্তান। এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ কে খন্দকার তার বইতে মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নানাবিধ অযৌক্তিক তথ্য দিয়েছেন। তিনি জেনারেল ওসমানী, জেনারেল খালেদ মোশাররফ, জেনারেল শফিউল্লাহ, জেনারেল জিয়াসহ অনেককেই বিতর্কিত করেছেন। তিনি মুক্তিবাহিনী, মুজিব বাহনী সম্পর্কেও বিতর্ক ছড়িয়েছেন। তার মনে কষ্ট এই জন্য যে, জেনারেল ওসমানী কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি হলেন। তিনি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল। অন্যদিকে এ কে খন্দকার ছিলেন কর্মরত গ্রুপ ক্যাপ্টেন। দুটোই একই র‍্যাঙ্কের। আবার লে. কর্নেল (অব.) আবদুর রবকে করা হয় চিফ অব আর্মি স্টাফ। তিনি মেম্বার অব পার্লামেন্টে ছিলেন। রব পেশাগত জীবনে এ কে খন্দকারের নিচের র‍্যাঙ্কে ছিলেন।তাকে করা হলো চিফ অব আর্মি স্টাফ, অন্যদিকে এ কে খন্দকারকে করা হলো ডেপুটি চিফ অব স্টাফ। ‘৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ। আমরা যখন দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করেছি তখন সাধারণ নারী-পুরুষ আমাদের থাকা-খাওয়া, শত্রুর গতিবিধি, পথপ্রদর্শন, নৌকা ইত্যাদি সরঞ্জাম দিয়ে সাহয্য করেছে। জনগণের-সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া একদিনও আমরা শত্রুবেষ্টিত বাংলাদেশে টিকতে পারতাম না।

এ কে খন্দকার বাংলাদেশ প্রকৌশল বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। শুনেছি তিনি অটোমশন পেয়েছিলেন। অটোমশন মানে এক ক্লাসে দুবার ফেল করলে তাকে বের করে দেওয়া হয়। হতে পারে তিনি অটোমশন পেয়ে এয়ারফোর্সে চলে গিয়েছিলেন। সবচেয়ে বড় বিষয় জেনারেল ওসমানী ঠিক করলেন, মুক্তিযুদ্ধে যারা বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখবে তাদের পুরস্কৃত করা হবে। বীরত্বপূর্ণ খেতাব পাওয়ার

জন্য একটা criteria ছিল। যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জীবন বিপন্ন করেও যুদ্ধ করা, শত্রুর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করা- এ ধরনের বিরাট সাফল্য রাখতে হবে। যারা মাঠ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে তাদের এ পুরস্কার দেওয়া হবে। এ কে খন্দকার কলকাতায় বসে থেকে বীরউত্তম পদক নিলেন। তিনি একটি গুলির আওয়াজও না শুনে এ বীরত্বসূচক পদক কীভাবে নেন? কারণ তিনি ওই কমিটির চেয়ারম্যান পদের অধিষ্ঠিত হয়ে নিজেই পদক নিয়েছেন। এখানেই প্রমাণ হয়ে যায় তিনি একজন নৈতিকতাহীন ব্যক্তিত্ব। তার সাইটেশন কে লিখেছেন? তার কোনো সাইটেশন নেই। আমার দাবি থাকবে একটি তদন্তের মাধ্যমে তার বীরত্বসূচক পদক ফিরিয়ে নেওয়া হোক। আমি সরকারের কাছে এ দাবি জানাই। এ কে খন্দকার সিভিল অ্যাওয়ার্ড স্বাধীনতা পদক পেয়েছে। অনেক মুক্তিযোদ্ধা আছেন যারা শহীদ হয়েছেন তারাও অ্যাওয়ার্ড পাননি। এ কে খন্দকার তার বইতে যে অনৈতিক তথ্য দিয়েছেন তা সংশোধিত হোক।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪

'১৯৭১ ॥ ভেতরে বাইরে' এবং কিছু কথা

অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী

বিগত ২ সেপ্টেম্বর এ কে খন্দকারের '১৯৭১ : ভিতরে-বাইরে' বইটির প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সে উৎসবে উপস্থিত ছিলাম। সঠিক সময়ের আগেই পৌঁছে দেখলাম বড় যোদ্ধারা ও লেখকগণ সামনের সব ক'টি আসন দখল করে কিংবা সতীর্থদের জন্য সংরক্ষণ করে বসে আছেন। বেশ একটু পেছনে বসে আলোচনা শুনতে শুরু করলাম। স্বভাবতই এই আলোচনায় এ কে খন্দকার একজন বক্তা থাকবেন, কিন্তু তিনি যে প্রথম বক্তা হবেন তা অবশ্যই আশা করিনি। তিনি বক্তব্য রাখলেন এবং সব বিচারে তাঁর বক্তব্যটি সংক্ষিপ্ত ছিল। তাঁর বক্তব্যের অংশবিশেষ কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা পরদিন তুলে ধরেছে। বক্তৃতা শোনার পূর্বেই আমি সুলভ মূল্যে বইটি কিনে নিয়েছিলাম এবং পড়তে শুরু করেছিলাম। পড়তে গিয়েই আমার চোখ এক জায়গায় থেমে গেল। খন্দকার সাহেব লিখেছেন, 'আমি এই বই লেখার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছি মূলত তরুণ প্রজন্মের ইতিহাস জানার আগ্রহ থেকে। তারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে চায়, অথচ সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে তারা বিভ্রান্তিতে পড়ে যাচ্ছে। সত্য ও মিথ্যাকে তারা আলাদা করতে পারছে না। আমার এই বই তাদের জন্য (পৃষ্ঠা-১১)। অর্থাৎ নতুন প্রজন্মের বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য মুক্তিযুদ্ধের ৪৩ বছর পর তাঁর এই বই। তিনি মুক্তিযুদ্ধে ২৮ মে ১৯৭১ সাল থেকে অংশ নিয়েছেন। ডেপুটি চীফ অব স্টাফের পদমর্যাদা লাভ করেছেন। এই ডেপুটি চীফ অব স্টাফের বঙ্গনুবাদ হচ্ছে উপপ্রধান সেনাপতি। তাহলে ওসমানী ছিলেন চীফ অব স্টাফ। বাস্তাবে কিন্তু তা নয়। ওসমানীকে কেউ কেউ আজও সর্বাধিনায়ক হিসেবে উল্লেখ করে আনন্দ পান কিংবা নিজের অবস্থানকে উচ্চতর করেন। কিন্তু খন্দকার সাহেব তাঁর গ্রন্থে কর্নেল বা জেনারেল পদবীসহ ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি বলে সর্বত্র উল্লেখ করেন। তাঁর পরের অবস্থানে রইলেন কর্নেল রব যিনি একজন গণপ্রতিনিধিও ছিলেন। কর্নেল রবের সামরিক মর্যাদা খন্দকার সাহেবের থেকে কম থাকলেও তাঁকে টপকিয়ে রব সাহেব চীফ অব স্টাফের পদটি পেয়ে যায়। খন্দকারের লেখায় মনে হয়েছে এ ব্যাপারে তিনি বরাবরই বিক্ষুব্ধ ছিলেন। মনে হয়েছে যে, কর্নেল রব ছিলেন ঢাকের বায়া আর পুরো যুদ্ধকালে অর্থাৎ ২৮ মে থেকে যুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত তিনি কর্নেল রবের সব কাজই করেছেন। সে সুবাদে তিনি নিজকে উপপ্রধান

সেনাপতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং এ যাবত লেখালেখিতে তাঁর নাম কখনও ডেপুটি চীফ আব স্টাফ বা কখনও উপপ্রধান সেনাপতি হিসেবে দেখে এসেছি।

বইটিতে এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ১৯৪৭ সালে ম্যাট্রিক পাস করে সে সালে রাজশাহী সরকারী কলেজে ভর্তি হন। ১৯৬৩ সারে তিনি ৩৪ বছর বয়সে উইং কমান্ডার সাইফুর মীর্জার ছোট বোন ফরিদা মীর্জার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পাকিস্তানে চাকরি করেন এবং পাকিস্তানে অবস্থানকালে পাকিস্তানি কর্মকর্তা ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পেয়েছেন (পৃষ্ঠা ২০)। মুক্তিযুদ্ধে উপপ্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করলে পাকিস্তানিরা তাঁরা ভাইদের ধরে নিয়ে যায়। তাদের কাছ থেকে তাঁর খোঁজ খবর নিলেও তাঁদের কোন ক্ষতি বা তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেননি, এমনকি তাঁকে কাজে দ্রুত পুনঃ যোগদানের তাগিদ নিয়ে তাঁদের ভাইদের বাড়ি পাঠিয়ে দেন (পৃষ্ঠা-২১৩)। সেদিক দিয়ে তিনি সৌভাগ্যবান কেননা মুক্তিযুদ্ধে আমাদের জানমাল, সহায় সম্বল, ইজ্জত সম্ভ্রমের প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল।

খন্দকার সাহেব ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে এলেও সে সময় গণঅভ্যুত্থান বা বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা তাঁর ছিল না। এমনকি ছাত্রাবস্থায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ লগ্ন ও সূতিকাগার ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল বলে মনে হয় না। পাকিস্তান আমলে তিনি ও তাওয়াব পূর্ব পাকিস্তানের জ্যেষ্ঠ বৈমানিক ছিলেন। এই তাওয়াবই বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর চাঁদতারা মার্কা পতাকা চেয়েছিলেন যদিও তাঁর পত্নী ছিলেন জার্মান। খন্দকার সাহেব ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারতের যুদ্ধে সার্বক্ষণিক ককফিটে অবস্থান করেন, বীরত্বপূর্ণ অপরেশনের অংশ নেন কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে কোন একটি অপারেশনে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অংশ নেননি। তাঁর মূল দায়িত্বটা ছিল প্রশাসনিক, পরামর্শমূলক, সংযোগ সমন্বয়কারী ও প্রশিক্ষণদাতার। এমন দায়িত্ব আমি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুজিব বাহিনীর হয়ে পালন করি। প্রতিরোধ যুদ্ধে যোগ দিয়ে ৭ এপ্রিল থেকেই পূর্বে গঠিত বিএলএফ বা শ্রদ্ধাভরে নামাঙ্কিত মুজিব বাহিনীর পনর্গঠন শুরুর কাজে আত্মনিয়োগ করি। খন্দকার সাহেব মুজিব বাহিনীর নামকরণে জেনারেল এসএস ওবানের ভূমিকা দেখেছেন।

এবারে মূল প্রসঙ্গের অবতারণা করছি যদিও খন্দকার সাহেবের প্রদত্ত বক্তব্যের অংশবিশেষ পত্রিকায় এসেছে। সহৃদয় পাঠক তা দেখে নিতে পারেন (৩ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোসহ আরও কিছু পত্রিকা)।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন-'সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিযোগিতা এখনও চলছে। বিষয়টি মাথায় রেখে প্রকৃত ঘটনা লেখার চেষ্টা তিনি করেছেন। তিনি বলেন, 'যে জাতি সত্যকে লালন করতে পারে না, প্রকৃত ইতিহাসকে যারা বিকৃত করে সেখানে সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না' (প্রথম আলো, ৩ সেপ্টেম্বর)। তাই তিনি সত্য প্রকাশে অনড় থাকার পরামর্শ দেন এবং কোন রকম ভণ্ডামি, অতিরঞ্জনকরণ বা প্রকৃত ঘটনার বিকৃতি কখনও ক্ষমার

যোগ্য হবে না বলেও উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্যে তুমুল করতালির সঙ্গে আমিও হাত সংযোজিত করি। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার সারোয়ার আলীর বক্তব্যে আমার সত্য নিয়ে খটকা বাঁধে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ খন্দকার সাহেব ক্যান্টনমেন্টে বসে শুনেছেন। তিনি লিখেছেন : '৭ মার্চের ভাষণের দিন ক্যান্টনমেন্টের ভেতরের পরিস্থিতি বেশ স্বাভাবিক ছিল-সবাই ব্যস্ত ছিল নিজ নিজ কাজে' (পৃষ্ঠা-৩১)। লক্ষণীয় যে এই নিজ নিজ কাজে ব্যস্তদের নিয়ে তিনি অতর্কিত হামলা করে বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা অজর্নে প্রত্যাশী ছিলেন।তিনি ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে বলেন যে, 'বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণেই মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল তা আমি মনে করি না। এই ভাষণের শেষ শব্দ ছিল 'জয় পাকিস্তান।' সত্যি কথা কি সেখানে দুটো শব্দ ছিল। তিনি যদি একই সঙ্গে জয় বাংলা ও জয় পাকিস্তান শব্দ গুচ্ছ ব্যবহার করতেন তা হলে তাঁর পেশাজীবীর সততা, সৈনিকের সততা, যোদ্ধার সততা ও একজন নির্মোহ রাজনৈতিক ব্যক্তির সততা কিছুটা হলেও প্রকাশ পেত, কারণ তাঁর দু'জন সহযোগী আগে এমন কথা বলেছেন। তবে মনে হয় তাঁর আসল মতলব ছিল ঐসব মুক্তিযোদ্ধা ও বুদ্ধিজীবীর বক্তব্যে খণ্ডন যারা ৭ মার্চের ভাষণেই প্রকারান্তরে স্বাধীনতার আহ্বান ছিল বলে নিশ্চিত। আসলে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, যে বক্তব্য 'জয় বাংলা' দিয়ে শেষ হয়, তাতে কি স্বাধীনতার আহ্বান না পাকিস্তান রক্ষার অভিপ্রায় ব্যক্ত থাক? যাঁরা বঙ্গবন্ধুর ভাষণে জয় বাংলা ও জয় পাকিস্তান শুনেছেন তাঁরা হলেন বিচারপতি হাবিবুর রহমান ও শাজাহান সিরাজ। এই দু'জন ছাড়া ১০ লাখ শ্রোতার কেউই এমন শব্দগুচ্ছ শুনেননি; তাঁরা শুধু জয় বাংলা শুনেছেন। শাজাহান সিরাজ রেসকোর্সে উপস্থিত হয়ে শুনলেন যে, বঙ্গবন্ধু জয় বাংলা-জয় পাকিস্তান বলে তাঁর ৭ মার্চের ভাষণ শেষ করেন। তাঁর এমন উচ্চারণের প্রয়োজন ছিল। কেননা সেটা তাঁর মন্ত্রী হবার কাজে লেগেছে।

এই সমালোচনা আমার ছিল, কেউ পড়েছেন কিনা জানি না। হাবিবুর রহমানের বক্তব্যের সমালোচনাও আমি সহ অনেকে করেছেন। একথার প্রতিধ্বনি সারোয়ার আলীর বক্তব্যে অর্থাৎ খন্দকার সাহেবের বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে শুনেছি। সারোয়ার আলী যুক্তি ও দালিলিক প্রমাণ দিয়ে বলতে চেয়েছেন খন্দকারের এই বক্তব্যটি বিতর্কের সূচনা করবে। একই কথা দু'একজন আলোচক অতি দুর্বলভাবে উত্থাপন করার প্রয়াস যে পাননি তা নয়। সামনের সারিতে উপবিষ্ট একজন শ্রোতা এ ব্যাপারে কিছু বলতে গিয়ে বসে যেতে বাধ্য হন এবং আসন ছেড়ে চলে যান। আমরা কয়েকজনও ওসমানীর নামের সঙ্গে 'সর্বাধিনায়ক' শব্দটি উচ্চারিত হলে মৃদু প্রতিবাদ করি এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে উপস্থিত থেকে ৭ মার্চে শুনেছিলাম তা বলতে সুযোগ খুঁজেছিলাম।

তারপরের আলোচক ছিলেন অধ্যাপক আলী রিয়াজ। তাঁর বক্তব্য পরদিনের প্রথম আলো পত্রিকায় নিবন্ধ আকারে এসেছে এবং বিদগ্ধ পাঠক হয়ত তা পড়েছেন। তবে তাঁদের কারও বক্তব্যে খন্দকার সহেব উত্থাপিত প্রসঙ্গগুলো ছিল

বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে স্বাধীনতার কথা বলেননি, তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা বা অর্জনের কোন লক্ষ্য, কৌশল বা কর্মসূচী গ্রহণ করেননি; তিনি ২৬ মার্চ কস্মিনকালেও স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি, যুদ্ধকালে তাজউদ্দীন আহমদ ছাড়া অন্যরা ছিলেন নিষ্কর্মা, কলহে বা বিলাসে ব্যস্ত; যুদ্ধের ব্যাপারে অনিবেদিত ও অজ্ঞাত, ভারতীয়দের অনীহা দোদুল্যমানতা, যোদ্ধা সংগ্রহে আওয়ামী লীগের প্রাধান্য, মুজিব বাহিনীর দৌরাত্ম্য, তাঁকে টপকিয়ে জেনারেল রবকে চীফ অব স্টাফ নিয়োগ বা তাঁকে সমর কাউন্সিলের প্রধানের পদ না দেয়া। প্রসঙ্গত তিনি চীফ অব স্টাফের দায়-দায়িত্ব বর্ণনা করেন এবং যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত সে দায়িত্ব পালন করেই সম্ভবত তিনি উপপ্রধান সেনাপতি অভিধা গ্রহণ করেন।

মুজিব বাহিনী সম্পর্কে মিথ্যা, কল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কথা থাকলেও যুদ্ধকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকাবস্থায় মুজিব বাহিনীর একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে উসখুস ছাড়া টু-শব্দটি করার আমার অবকাশ ছিল না। তবে আলী রিয়াজ যখন তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করলেন যে, মুজিব বাহিনী নিয়ে বহু কথা হলেও তা নিয়ে শীর্ষ নেতারা কোন ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ লেখেননি। এ কথা শুনে আমি আলী রিয়াজকে সাবেক সহকর্মীর দাবি নিয়ে একটি চিরকুট পাঠাই এবং তাতে উল্লেখ করি যে, মুজিব বাহিনীর ওপর ১৯৯৭ সালে মুদ্রিত আমার লেখা একটি গ্রন্থ আছে। তিনি চাইলে আমি তাঁকে বইটি দিতে পারি। তিনি মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিলে আমি বইটি বাসা থেকে আনিয়ে তাঁকে দেই। ভুল সংশোধন করে বলছি বইটি ১৯৯৮ সালে বই আকারে প্রকাশিত হলেও তার অনেক কিছু প্রবন্ধ বা নিবন্ধ আকারে এর আগ থেকে প্রকাশিত হয়। আমি আশা করেছিলাম যে তিনি অনুষ্ঠানের মাঝেই তাঁর এই ভুলটা সংশোধন করবেন। তিনি তা করেননি। পরের দিন তাঁর নিবন্ধে তা খুঁজে বেড়াই; কিন্তু তাঁর কিছু খুঁজে পাইনি। তবে তাঁর নিবন্ধে কতিপয় মূল্যবান কথা এসেছে। তিনি খন্দকারের বইটিকে আকর গ্রন্থ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। শেখ মুজিব যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন খন্দকারের মতো তিনিও দালিলিক প্রমাণ দাবি করেন ও মুক্তিযোদ্ধা এবং নেতৃত্বের অনৈক্য, কোন্দল ও ভেতরকার দ্বন্দ্ব বিষয়ে খন্দকারের ভাষ্যের সঙ্গে একমত প্রকাশ করেন। তাজউদ্দীন আহমদের বদলে অন্য নেতৃত্ব হলে বাংলাদেশ স্বাধীনই হতো না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের বক্তব্যের অনুরণন আমার কানে আগেও বেজেছে। তিনি শারমিন আহমদ প্রণীত তাজউদ্দীন : নেতা ও পিতা (২০১৪) গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে যা বলেছেন তার কিছুটা পুনরাবৃত্তি এখানে ঘটেছে। তবে শারমিনের বইয়ের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তিনি পিতার স্বকণ্ঠ কথা বা বক্তব্যের চেয়ে চাচাদের উপর বড্ড নির্ভর করেছেন। রাত নয়টায় তাজউদ্দীন সাহেব চলে আসার পর স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া যেতে পারে কিংবা বিভিন্ন মাধ্যমে দেয়া হয়েছে তার উল্লেখও শারমিনের বইতে আছে। ৭ মার্চের ভাষণ বা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে পরিমিত আলোচনাসহ প্রফেসর

আনিসুজ্জামান মুজিব বাহিনীর প্রসঙ্গেও কথা বলেছেন। এসব আগেও তিনি উদ্ধৃত আকারে মইদুল হাসান বা অন্যদের বই থেকে তুলে ধরেছেন। তবে তিনি একটি নতুন তথ্যের অবতারণ করেছেন যা ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। তিনি বলেছেন, '১৯৭১-এর আক্টোবর মাসে আগরতলা গিয়ে তিনি একটি লিফলেট পান। মুজিব বাহিনীর নামে প্রচারিত এই লিফলেট পাকিস্তানকে এক নম্বর, বামপন্থীদের দুই নম্বর ও তাজউদ্দীন সরকারকে তিন নম্বর শত্রু উল্লেখ করে সবাইকে উৎখাতের আহ্বান ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। মুজিব বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তা ও নীতিনির্ধারক হিসেবে অতি কাছে এই আগরতলায় থেকেও আমি এ ব্যাপারে অবগত ছিলাম না; যদিও বামপন্থীদের সঙ্গে দু'একটি সংঘাত ও সংঘর্ষ এবং তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে মুজিব বাহিনীর শীর্ষ কয়েকজনের মন কষাকষির কথা আমার জানা ছিল। এই সব প্রসঙ্গে আমি 'মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিব বাহিনীর' গ্রন্থে কিংবা 'এক দেহ দুই প্রাণ' (২০০৬) গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অনেকেই অনেকভাবে দিয়েছেন, আমিও দিয়েছি। ১৯৭১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের সঙ্গে প্রথম মুখোমুখি আলোচনা ও পরে টেলিফোনে আলোচনার পর বঙ্গবন্ধু সশস্ত্রও যুদ্ধে দেশ স্বাধীন করার সিদ্ধান্ত আমার এবং শেখ ফজলুল হক মণির কাছে ব্যক্ত করেন। ভারতে যে তিনি ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা আগেই রেখেছিলেন তাও আমাদের জানালেন। খন্দাকার সাহেবও এমন ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা ছিল বলে মেনে নিয়েছেন। তাজউদ্দীন সাহেব যে তথ্য-বিভ্রান্তির কারণে চিত্ত সুতারের সঙ্গে প্রথমবার দেখা করতে না পারলেও দ্বিতীয় দফায় বঙ্গবন্ধু মনোনীত সেই চিত্ত সুতারের সঙ্গে মুজিব বাহিনীর নেতাদের নিয়ে একত্রে বসেছিলেন সে কথা অনেক গ্রন্থে আছে। আমি এই তথ্য বহু লেখায় ও বক্তব্যে উপস্থাপন করেছি। বঙ্গবন্ধু ট্রেনিং, অর্থায়ন ও সার্বিক ব্যবস্থার জন্য চিত্ত সুতারের কথা উল্লেখ করে ইতোমধ্যে কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার উল্লেখ করেন। বঙ্গবন্ধুর কথার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ৩ মার্চ পূর্বাহ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সভা মোজাফফর চৌধুরীকে দিয়ে আহ্বান করিয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমি স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন শিক্ষক সমর্থন করলে তারস্বরে আমি তা ঘোষণা করি। এ দু'জন শিক্ষক উপাচার্য হিসেবে অবসর নিয়েছেন এবং বর্তমানে বেঁচে আছেন। তাঁদের নাম দুর্গাদাস ভট্টাচার্য ও শহীদ উদ্দিন আহমদ। আর একটি প্রশ্ন তাজউদ্দীন সাহেব কোন ভিত্তিতে দিল্লী যাবার আগেই চিত্ত সুতারের বাড়ি খুঁজতে গিয়েছিলেন। কোন আলোচনা না হলে বা সিদ্ধান্ত না থাকলে তিনি তাঁকে খুঁজতে যাবেন কেন? চিত্ত সুতার নাম বদলিয়ে ভারতে অবস্থান করছিলেন বলে তিনি প্রতিবেশীদের কাছে জিজ্ঞেসা করে প্রথম দফায় তাঁর খোঁজ পাননি। আগেই বলেছি পরবর্তীতে তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে চিত্ত সুতারসহ মুজিব বাহিনীর নেতাদের সাক্ষাত পান। প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ডাক্তার আবু হেনাও পূর্বাহ্নে এই ট্রেনিংয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই ট্রেনিং প্রাপ্তির ব্যবস্থা যে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধের

সিদ্ধান্ত ও প্রস্তুতি ছাড়াই রেখেছিলেন তা কোন অবস্থাতেই মনে করার সঙ্গত কারণ নেই।

প্রকাশনা অনুষ্ঠানের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম বইটির লেখক হিসেবে মইদুল ইসলামকে চিহ্নিত করেছিলেন। আমরা তার ভুলটির ইঙ্গিত করলে তিনি তা সংশোধন করেন। তবে তিনি যে মইদুল হাসান দ্বারা আক্রান্ত ও আপ্লুত তা বোঝা গেল। তিনি আরও লিখবেন বলে জানান দিয়ে গেছেন। তাঁর লেখার অপেক্ষায় রইলাম। তিনিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন এবং আমি তাঁর অধীনে কিছুদিন সহকারী প্রক্টরের দায়িত্ব পালন করি। যুদ্ধকালে তিনি কোন ভূমিকা পালন করেছেন বলে আমার জানা নেই।

প্রকাশিত গ্রন্থের বিস্তারিত রিপোর্ট প্রথম আলোতে থাকলে তার ওপর প্রথম লিখিত প্রতিক্রিয়াটি হচ্ছে জনকণ্ঠের। জনকণ্ঠের সংবাদ শিরোনামটি ছিল 'এ কে খন্দকারের বই নতুন অস্ত্র হিসেবে হাতে নিচ্ছে শিবির-বিএনপি।' এমন একটি বোধ আমার মনেও জাগ্রত হয়েছিল ২ তারিখ রাতেই। সেই রাতেই বইটি সম্পূর্ণ পড়ি। আমার তাৎক্ষণিক মনে হলো 'মানুষ ভাবে এক, করে ভিন্ন জিনিস, আর ফলাফল হয় আরও ভিন্নতর'। খন্দকার সাহেব নতুন প্রজন্মের হাতে সঠিক, নির্ভেজাল, অতিরঞ্জনবিহীন, খাঁটি ইতিহাস তুলে দেবার প্রয়াসে যা তুলে দিলেন তা 'কানার হাতে কুড়াল' বই আর কি? তিনি জাতির অপকার করলেন; কিন্তু আমার অশেষ উপকার করলেন।

তিনি মুক্তিযুদ্ধে কেন এলেন, কবে এলেন, কি ভূমিকা পালন করলেন তা তাঁর লেখায় জানতে পেরে আমি তাৎক্ষণিক একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমি বীর উত্তম উপাধি ও স্বাধীনতা পদকের জন্য আবেদন জানাব। কেননা, স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতার সংগ্রাম বা স্বাধীনতা আন্দোলন বাদ দিলেও মুক্তিযুদ্ধে খন্দকার সাহেব যে ভূমিকা পালন করেছেন আমার ভূমিকা তার চেয়ে বেশি। তদুপরি আমি ২৮ মে পর্যন্ত অপেক্ষা না করে, পিছুটানে আক্রান্ত না হযে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকাবস্থায় প্রথমে প্রতিরোধ যুদ্ধ, পরে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের কোন প্রতিদান ছাড়াই নিরন্তর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে জড়িত আছি। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে আস্ত্রের আগেই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে পত্রিকার সম্পদনা করেছি। এ সব করেছি বেতন-ভাতা ছাড়া, জীর্ণ-শীর্ণ বস্ত্র পরে, হাতের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে কিংবা অনাহারে বা অর্ধাহারে কাটিয়ে।

পূর্বে বলেছি, খন্দকার সাহেব তাঁর বইতে কর্নেল রবকে অথর্ব ছাড়া অন্য কিছু বলতে বাকি রাখেননি। অর্থব রব সাহেব বীর উত্তম খেতাব পেয়েছেন? খেতাবপ্রাপ্তদের নির্বাচন ও সর্বশেষ পর্যালোচনা কমিটির প্রধানও খন্দকার সাহেব ছিলেন। তিনি রব সাহেবকে কি বীরত্বের কারণে আর নিজে কোন বীরত্বের কারণে বীরউত্তম খেতাব নিলেন, সে প্রশ্ন জাতি করবেই। তিনি বিমানবাহিনী প্রধান ছিলেন, রাষ্ট্রদূত ছিলেন, মন্ত্রী ছিলেন, স্বাধীনতা পদক পেয়েছেন। সবই

পেয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে আমার চেয়ে কম ভূমিকার জন্য। আমাকে এ পর্যায়ে এসে তো আর কোন বাহিনী প্রধান করা যাবে না কিংবা মন্ত্রিত্বও দেয়া যাবে না, তবে ১৯৭৩ সালে বীরউত্তম খেতাব দেয়া গেলে কিংবা ২০১১ সালে স্বাধীনতা পদক দেয়া গেলে আমাকে কেন এ সব এখন দেয়া যাবে না? আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, ৪৩ বছর পর বক্তৃতা, বিবৃতি বা লেখায় মিথ্যা, বানোয়াট, কল্পিত ও অতিরঞ্জিত তথ্য দিয়ে ইতিহাস বিকৃতি করব না, বঙ্গবন্ধুকে অবমাননা বা অবমূল্যায়ন করব না, মুক্তিযুদ্ধে রজনীতিকদের অবদান কিঞ্চিতকর করব না, অবমূল্যায়ন করব না বা আমাদের যোদ্ধাদের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শ্রেণীতে টেনে নামাব না, মীমাংসিত বিষয়াদি নিয়ে বিতর্কের সূচনা করে কানার হাতে সময়ে কিংবা অসময়ে কুড়াল তুলে দেব না।

খন্দকার সাহেবের বইটি না পড়েই সংসদে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। আমি বইটি আাগাগোড়া পড়ে ও সংসদে প্রতিক্রিয়া দেখে তাৎক্ষণিক লিখতে বসলাম। এসব প্রতিক্রিয়া দানকারী অনেকের সঙ্গে আন্দোলন, সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের কাজে ছিলাম। বিনীতভাবে বলতে চাই এমন সব কথা শুধু খন্দকার সাহেব এই প্রথম বলেননি। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর কথোপকথনে' (২০০৯) এমন কথা পূর্বেও বলেছেন। আমরা তা এড়িয়ে গেছি। এড়িয়ে যাবার ফলাফল হচ্ছে সুচ থেকে ফাল। আমি এ যাবত এমন কিছু গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি যাদের কাজই হলো বঙ্গবন্ধুকে কিঞ্চিতকর করা, মুক্তিযুদ্ধকে বিতর্কিত করা, যোদ্ধাদের ভূমিককে খাটো করা, মিত্রদের বিরুদ্ধে তিক্ততা ও ভিত্তিহীন বক্তব্য প্রকাশ করা এবং নিজেকে জাহির করা। এই সব গ্রন্থ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে লাভ হবে না। এ কথা অর্থমন্ত্রী মহোদয় বলার আগেই আমি লিখেছি। আপনারা আপনাদের কথা গুছিয়ে বলুন, অন্যদের সঙ্গে তথ্য আদান প্রদান করুন, থিংক ট্যাংক গঠনে নেতৃত্ব দিন; জাতির কাছে মিথ্যা মিথ্যাচারিতা বা ইতিহাস বিকৃতির যথোপযুক্ত জবাব দিন। আমি এ ব্যাপারে প্রস্তুত। আমার হাতে জয় বাংলা-জয় পাকিস্তান প্রসঙ্গ, মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা ও মুজিব বাহিনী নিয়ে বেশকিছু তথ্য রয়েছে। অচিরেই আমি সেগুলো গুছিয়ে প্রকাশের জন্য দেব। সত্যি কথা কি এ কে খন্দকারের বইটি আমাকে জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪

এ কে খন্দকারের ১৯৭১ : ভেতরে বাইরে এবং কিছু প্রশ্ন

এম. শাহ আলম

মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ বাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ এ কে খন্দকার ১৯৭১ সালের জানুয়ারি-মার্চে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে যা লিখেছেন, তা পড়ার পরে তাৎক্ষণিকভাবে একটি প্রতিক্রিয়া লেখার ইচ্ছে হয়েছিল। পরে ভাবলাম, না, পুরো, বইটি আগে ভালোভাবে পড়ি, তারপর লেখা যাবে। এ কে খন্দকারের বইটি স্মৃতিচারণমূলক এবং ডেপুটি চিফ অব স্টাফ হিসেবে তাঁর বড় ভূমিকা বিষয়ক। বাংলাদেশ বাহিনীর অনেক বিরোচিত কাহিনী এই বইয়ে স্থান পেয়েছে। বাঙালির বীরত্বগাথার বর্ণনা পড়লে গর্বে বুক ভরে যায়। তবে আমার মনে হয়েছে, তিনি তাঁর মুক্তিযুদ্ধে যোগদান, নেতৃত্ব লাভ, অভিজ্ঞতা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কাহিনী বর্ণনায়ই তাঁর লেখা সীমিত রাখলে ভালো করতেন।

এ কে খন্দকার পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একজন উচ্চ পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা থাকা অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। এর আগে প্রায় ২০ বছর পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন। তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনীতি, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ তথা বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি ও তাঁর রাজনৈতিক কৌশল, পদ্ধতি, দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তাঁর সঠিক ধারণা থাকার কথা নয়। জানুয়ারি-মার্চের রাজনীতি ও শেখ মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনার প্রেক্ষাপটে তাঁর বক্তব্য আমার খুবই আনাড়ি বা কাঁচা (native) মনে হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। সারা বিশ্ব তাকিয়ে আছে কী প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা হস্তান্তর হয় তা দেখার জন্য। ভুট্টো ও সামরিক চক্রের ক্ষমতা হস্তান্তরে অনীহার কারণে পুরো ফেব্রুয়ারি-মার্চই নানামুখী আলোচনা হয়, যার চূড়ান্ত পর্যায় ছিল ১৫ মার্চ থেকে আরম্ভ হওয়া ঢাকায় শেরাটনে মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টোর আলোচনা। এটা সত্য যে ইয়াহিয়া আলোচনায় আন্তরিক ছিলেন না, কিন্তু যেখানে মূলত সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা চলছে, অন্তত আওয়ামী লীগ সেটায়ই জোর দিচ্ছিল, সেখানে খন্দকার মাহেবের পরামর্শমতো তখন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের

সৈনিকদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ কিভাবে যুদ্ধ পরিকল্পনার কন্টাক্ট আসবে? যতই গোপনীয়তা অবলম্বন করা হোক না কেন, সে গোপনীয়তা কি রক্ষা করা সম্ভব হতো? হয়তো পাকিস্তানিরা সেটাই চাচ্ছিল। সেই উছিলায় তারা আগেই আঘাত করে বিশ্ববাসীকে বলতে পারত তাদের নিজস্ব ভাষ্য। খন্দকার সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী আমরা যদি সংঘবদ্ধ হয়ে আগেই আক্রমণ করতাম, তাহলে ফলাফল কী হতে পারত? এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার (অব.) যে সময়ে বাঙালি সৈনিকদের সংঘবদ্ধ করে আগেই পাকিস্তানি বাহিনীকে আক্রমণ করার কথা বলেছেন, তার আগেই পাকিস্তানিরা তাদের সৈন্য ও অস্ত্র ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে ফেলেছিল। আমরা আগে আক্রমণ করলেও প্রচণ্ড যুদ্ধ হতো। বিশ্ববাসী সেটা কিভাবে দেখতো? আমরা কি সে রকম সহানুভূতি ও সাহায্য পেতাম? সে ক্ষেত্রে কি সব বাঙালি সৈনিকের মুক্তিযুদ্ধে যোগদান নিশ্চিত করা যেত? ৭ মার্চের ভাষণ শুধু মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীনতার আহ্বানই নয়, আলোচনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে বাধ্য করারও প্রচেষ্টা ও হুঁশিয়ারি। এ কে খন্দকার একাধিকবার তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন, ইয়াহিয়া সাহেব বঙ্গবন্ধুকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন ৭ মার্চের ভাষণে এমন কিছু না বলেন, যাতে আলোচনার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এই ভাষণে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি, স্বাধীনতার ডাক, যুদ্ধ প্রস্তুতি, আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য সমাধানে না পৌঁছার পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ারি-সবই ছিল।

জয় পাকিস্তান বলে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণ শেষ করেছেন-খন্দকার সাহেবের এই উক্তি সবার বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। ওই দিন লাখ লাখ জনতার মধ্যে রেসকোর্স ময়দানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। আমার পরম সৌভাগ্য, ময়দানের মাঝামাঝি স্থানে উপবিষ্ট থেকেই বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি ভাষণ শুনেছিলাম। ভাষণের ধারাবাহিকতায় সব শেষে বঙ্গবন্ধু উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন, জয় বাংলা। জয় পাকিস্তান বলেছেন-এমন কথা আমি শুনেছি বলে মনে পড়ে না। তাহলে কি বঙ্গবন্ধু আস্তে করে জয় পাকিস্তান বা পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলেছেন, যা তাঁর কালজয়ী বলিষ্ঠ বক্তৃতা এবং উচ্চ স্বরে জয় বাংলা উচ্চরণে হারিয়ে গেছে, যা কেউ আমরা শুনতে পাইনি। তাও তো মনে হয় না।

যদিও আমি বিশ্বাস করি, বঙ্গবন্ধু কোন পাকিস্তান ধ্বনি দেননি, তবু বলছি, তিনি যদি তা বলেও থাকেন সমস্যা কোথায়? তখন তো পাকিস্তান ছিল। বঙ্গবন্ধু চাইছিলেন পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যেই সমস্যার সমাধান। তিনি বলতেন, আমি পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, আমার দল সরকার গঠনের অধিকারী, আমি কেন পাকিস্তান ভাঙব! উল্লেখ্য, চল্লিশের দশকে বাঙালি মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটেই পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল। খন্দকার সাহেবের ভাষ্য অনুযায়ী ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধুকে আলোচনার পথ খোলা রাখতে অনুরোধ করেছিলেন। তাই বঙ্গবন্ধু যদি জয় বাংলার পাশাপাশি জয় পাকিস্তান বলে থাকেন, সমস্যা কোথায়? এ কে খন্দকারের এই বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করারই প্রয়োজন কেন হলো?

তিনি কী প্রমাণ করতে চাইছেন! এবার আসা যাক স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গে। খন্দকার সাহেব এ প্রসঙ্গে সঠিক কথা বলেননি বা ঘোষণার প্রেক্ষাপট, পদ্ধতি, আকস্মিকতা বা ব্যতিক্রমধর্মিতা বুঝতে পারেননি। ওই সময় তাঁর বুঝতে পারার কথাও নয়। ১৯৯৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুষদ বাংলাদেশের সংবিধানিক ইতিহাস ও সংবিধানের সহজপাঠ নামে আমার একটি বই প্রকাশ করে। সেখানে আমি এক জায়গায় লিখেছিলাম, 'বিশ্বে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা একটি বিরল ব্যতিক্রমী ঘটনা এবং তা আপন মহিমায় ভাস্বর। এই ঘোষণা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ও পরিস্থিতিতে আসেনি। তদানীন্তন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা ও তৎকর্তৃক আকস্মিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া পরিস্থিতির ফল আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা। এই ঘোষণাটি অপরিহার্য কিন্তু তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে এসেছিল...অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতিতে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক গ্রেপ্তার হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে তাঁর রেখে যাওয়া বাণী ও নির্দেশই স্বাধীনতার ঘোষণার মূল কথা, যা বিভিন্নভাবে প্রচারমাধ্যম ও ওয়ারলেসে প্রচারিত হয়েছে। আনুষ্ঠানিকতার কোনো সুযোগ সেখানে ছিল না...স্বাধীনতার যে বাণী, নির্দেশ ও আহ্বান বঙ্গবন্ধু তখন রেখেছিলেন, তাতে স্বচ্ছতা আনায়ন করে তাকে স্থির সত্য ও নির্দিষ্ট দলিল হিসেবে জাতির সামনে উপস্থাপন করার কাজটি জরুরি বলে মনে করি...' (পৃষ্ঠা ১-২), যা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে পরে করা হয়েছে।

২৫ মার্চ সন্ধ্যায় বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ লিখিত স্বাধীনতার ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু স্বাক্ষর করেননি বা তা রেকর্ডও করাননি।

বঙ্গবন্ধুর মতো নেতৃত্বের অনেক বিকল্প থাকে। তিনি চেয়েছিলেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে এবং তাঁর মতো করেই স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা প্রেরণ করতে। তাই তিনি করেছিলেন এবং তাঁর বার্তা বিভিন্নভাবে তাঁর নামে ঘোষণা করা হয়েছে। সারা বিশ্ব এটা জেনেছে এবং তাঁর নামেই প্রচার করা হয়েছে। এ কে খন্দকার ঠিকই লিখেছেন, আগস্ট '৭৫-এর আগে এ নিয়ে কেউ কোন প্রশ্নও তোলেননি। বঙ্গবন্ধু সবাইকে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে বলেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে ৩২ নম্বরের বাসা ত্যাগ করেননি। এভাবেই যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল, মাত্র ৯ মাসে যার সফল সমাপ্তি হয়েছে। অন্যথায় কী হতো বা হতে পারত তার আন্দাজ কেন করতে যাব?

সবশেষে এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন, ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান, '৭১-এর ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার কর্তৃক জারীকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও বাংলাদেশ সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত এবং সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলভুক্ত। এর সপক্ষে উচ্চ আদালতের রায়ও রয়েছে। এর পরও জনাব এ কে খন্দকার স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে এমন কথা কেন লিখলেন তা বোধগম্য নয়।

কালের কণ্ঠ
১২ সেপ্টেম্বর ২০১৪

ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ স্বাধীনতার আহ্বান

কামরুজ্জামান ননী

মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে বিজয় অর্জন এবং স্বাধীনতা লাভ। আর তা যদি হয় একটি ভাষণের মূল কারণ, তবে অবশ্যই তা হলো বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ। ১৯৭১ সালের ওইদিনে বিক্ষুব্ধ বাঙালি, উত্তাল পূর্ব বাংলা। ফুঁসে ওঠা গোটা দেশ ছুটছে লড়ছে জ্বলে উঠছে মিছিলে ময়দানে স্লোগানে রাজপথে। বঙ্গবন্ধুর ডাকে চলছে ঘরহারা মানুষের রাজপথের শ্রোত। মানুষ ঘরে ফিরতে চায় না। অন্যদিকে তখন চলছে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী নির্বাচিত আওয়ামী লীগ এর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা করছে। তৎকালীন পাকিস্তানি সামরিক শাসকচক্র এবং পশ্চিম পাকিস্তানের পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ দেশ নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ওই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম, নিজামে ইসলাম একজোট হয়ে সামরিক জনতা ও শাসকগোষ্ঠীকে মদদ দিতে থাকে।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহীসহ দেশের বড় বড় শহরে চলছিল গুলি। শিল্পাঞ্চলসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমৃদ্ধ শহরগুলিতে পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলন ছিল তুঙ্গে। বাঁধভাঙ্গা জনস্রোত রাস্তায়, অলিতে, গলিতে। হাট-বাজার ঘাট, শহর-বন্দর গ্রামে মানুষের এক অন্যরকম আর্জি, আকাঙ্ক্ষা আর চাওয়া। আর তা শুধু মাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কাছে। তখন গোটা জাতির সামনে একজনই নেতা শেখ মুজিবুর রহমান।

তখন লেখাপড়ার স্থল হিসেবে খুলনায় আমার অবস্থান। খুলনা বিভাগীয় শহর এবং অন্যদিকে শিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসেবে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার সমষ্টিবদ্ধ আন্দোলন ছিল তুঙ্গে। আমি তখন ছাত্র ইউনিয়ন করি। জেলা ছাত্র নেতৃবৃন্দের একজন। আমাদের খুব নৈকট্য ছিল ছাত্রলীগের সাথে। পৃথকভাবে হলেও অভিন্ন কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করতাম। খুলনার শহর-বন্দর গ্রাম-গঞ্জ সর্বত্রই আমরা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলাম। প্রায় প্রতিটি স্কুল-কলেজ-হাট-বাজার-ঘাট পাড়া মহল্লায় আমরা সভা সমাবেশ করেছি।

দিন যায় দিন আসে। কিন্তু আন্দোলন কোন পথে, কী যেন নাই? ঠিক এই সময় ঘনিয়ে আসে ৭ মার্চ। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন স্বাধীনতার ঘোষণা "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার

সংগ্রাম।" সমগ্র জাতি একটা দিকনির্দেশনা পেল। বারুদে আগুন লাগার মতো স্বাধীনতা সংগ্রামে ফেটে পড়ল গোটা জাতি। আন্দোলনের সকল স্রোতধারা জোটবদ্ধ হলো একটি আকাঙ্ক্ষায়। বঙ্গবন্ধুর গোটা ভাষণ জুড়েছিল জাদুর ছোঁয়া। বঙ্গবন্ধু এক একটা বাক্য উচ্চারণ করেন, আর শ্রোতার লক্ষ্য করতালিতে মুখরিত হতে থাকে। এ যেন বক্তৃতার এক বিপ্লবী পংক্তিমালা। সংগ্রামের এক মহাকাব্য। এমন উজ্জীবনী ভাষণ আজ অবধি কেউ শোনেনি বোধহয়। রক্তে আগুন প্রবাহের মন্ত্রমুগ্ধ এক ভাষণ। ছাত্র বই ছেড়ে রাজপথে, শ্রমিক কারখানা ছেড়ে সভা-সমাবেশে, মাঝি বৈঠা ফেলে সংগ্রামে। ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-মুঠে-মজুর মাঝি-মাল্লা, কর্মজীবী শিক্ষক কবি শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সব এক কাতারে। শামিল মুক্তিযুদ্ধে। শুরু হয়ে যায় ট্রেনিং। প্রকাশ্যে এবং গোপনে। সংগ্রহ অভিযান চলতে থাকে অস্ত্রের। একদিকে ট্রেনিং অন্যদিকে অস্ত্র সংগ্রহ।

বঙ্গবন্ধুর সমগ্র ভাষণ জুড়েছিল স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। বাঙালি জাতি অসহযোগ আন্দোলনে একাট্টা। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের প্রতিটি উক্তি বঙালি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলছে। সব নদীর প্রবাহ যেমন একটাই- সাগর, তেমনি বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের সমগ্র ভাষণের একটাই দিকনির্দেশনা স্বাধীনতা। নিরস্ত্র বাঙালি সশস্ত্র হতে পারার একটা মূলমন্ত্র ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ। একটা ভাষণ একটা জাতিকে কতটা উদ্বুদ্ধ করতে পারে তার প্রকৃষ্ট এবং একমাত্র উদাহরণ ৭ মার্চের ভাষণ। এর আগে পরে এমনটা আর ঘটে নাই।

খুলনা মুসলিম লীগ সমৃদ্ধ অঞ্চল হলেও আমি দেখেছি অনেক মুসলিম লীগ পরিবারের যুবক স্বাধীনতা যুদ্ধে শামিল হয়েছে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে। বহুপরিবার পাকিস্তানি পক্ষ ত্যাগ করে জয়বাংলা অর্থাৎ বাঙালির পক্ষ নিয়েছে।

৭ মার্চের ভাষণের পর আমরা প্রকাশ্যে ট্রেনিং নিয়েছি। মানুষ দর্শক হয়ে করতালি দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে। থানার বাঙালি কর্মকর্তরা অস্ত্র গোলাবারুদ সংগ্রহে সহায়তা করেছে। বাঙালি যেখানেই কর্মরত ছিলেন সবাই এক মন্ত্রে মুদ্ধ। এমনিতেই গোটা জাতি ফুঁসেছিল, তারপর বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ। ঘৃতাহুতির মতো গোটা জাতি জ্বলে ওঠে। কণ্ঠে সবার জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, তোমার আমার ঠিকানা- পদ্মা, মেঘনা, যমুনা। তোমার দেশ, আমার দেশ- বাংলাদেশ, বাংলাদেশ। বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো-বাংলাদেশ স্বাধীন করো। তোমার নেতা আমার নেতা-শেখ মুজিব, শেখ মুজিব। এক নেতা এক দেশ- বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ। এই সব স্লোগানে মুখর ছিল সেই সময়টা।

১৯৭১-এর ২রা মার্চ খুলনা শহীদ হাদিস পার্কে ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতিত্ব করার গৌরব হয়েছিল আমার। ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ এটি এম খালিদ হোসেন, নুরুজ্জামান বাচ্চু, আঃ রশিদ, প্রমুখ সহ ছাত্রলীগের ওই সময়কার তুখোর ছাত্র নেতা নজরুল ইসলাম বক্তৃতা করেছিলেন। ওই সভা থেকেও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু যেন জাতিকে অচিরেই মুক্তির একটা যৌক্তিক

নির্দেশনা দেন। গোটা জাতির এমনতর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন বঙ্গবন্ধু ঘটিয়েছিলেন ৭ মার্চের ভাষণে। মুক্তিযুদ্ধের সবরকমের নির্দেশনা ছিল ওই ভাষণে।

খুলনার তৎকালীন ন্যাপ, ছাত্র ইউনিয়ন, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের পরামর্শে ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দসহ সমমনা অনেককে নিয়ে গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলি। খুলনাতে খালিদভাই, জাহাঙ্গীর ভাই, মোতাহার ভাই, বাচ্চু ভাই, রশিদ ভাই, মনির ভাইসহ এদের নেতৃত্বে আমরা দুধের "ল্যাকটোজেন" কৌটা গুলিকে মাইন-বোমায় পরিণত করতাম। কিছু রাইফেল, বন্দুক, রিভলবার ইতোমধ্যে সংগ্রহ হয়ে গেল। প্রয়োজনের তুলনায় এগুলি সামান্য এবং তুচ্ছ হলেও তখন আমরা এতেই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলাম। পিকচার প্যালেসের মোড়, বৈকালী সিনেমা হলের সম্মুখে রাস্তায় এবং খালিশপুর দৌলতপুর সড়কে টহলকৃত পাক বাহিনীর ওপর আমরা এগুলি প্রয়োগও করেছিলাম।

১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারির শেষ দিক থেকে এবং মার্চ মাসের শুরুতেই গোটা বাঙালি জাতি লড়াই সংগ্রামে উত্তাল হয়েছিল। আন্দোলন সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১-এর ৭ মার্চের রেসকোর্সে-এর ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালি জাতিকে মুক্তির নির্দেশনায় সামিল করায় এবং এই ভাষণই ছিল স্বাধীনতার আবাহন, স্বাধীনতার ঘোষণা।

বঙ্গবন্ধু 'জয় বাংলা' বলেই ভাষণটি শেষ করেছিলেন

শিবলী নোমান

সম্প্রতি মহান মক্তিযুদ্ধের উপ-প্রধান সেনাপতি এ. কে খন্দকার তাঁর বই '১৯৭১: ভেতরে বাইরে'-তে বলেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণের শেষে 'জয় পাকিস্তান' বলেছিলেন। আরো বলা হয়েছে- বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনা করে সমঝোতার পথ খুঁজছিলেন এবং যুদ্ধের কোনো প্রস্তুতি তৎকালীন আওয়ামী লীগের ছিল না। এ. কে খন্দকার কেন এসব তথ্য এতদিন পর দিলেন জানি না বা কেন তিনি এসব তথ্যের সূত্র উল্লেখ করেননি তাও জানি না। তবে আজ আবারও সেই কথাটি বারবার মনে পড়ছে যে রাজাকার চিরদিনই রাজাকার কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা চিরদিন মুক্তিযোদ্ধা নয়।

যাই হোক, এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐ ভাষণের গুরুত্ব অপরিসীম। ভাষণটিকে আব্রাহাম লিঙ্কনের গেটিসবার্গ ভাষণ-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়। কেউ কেউ একে লিঙ্কনের ভাষণের থেকেও গুরুত্ব দেন এই কারণে যে, লিঙ্কনের ভাষণটি লিঙ্কন সময় নিয়ে লিখেছেন-কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ভাষণটির কোনো লিখিত রূপ ছিল না। বঙ্গবন্ধু মঞ্চে উঠে স্বতঃস্ফূর্ত বলে গিয়েছিলেন সেদিন।

সময়ে সময়ে বেশ কয়েকবার এই ভাষণ নিয়ে অনেকের সঙ্গে কথা হয়েছে। কোনো বইতে আমি এখনো পাইনি কিন্তু হাতেগোনা কিছু মানুষের কাছে একটি বিষয় শুনেছিলাম যে, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ভাষণের শেষে জয় বাংলা বলার পরই নাকি বঙ্গবন্ধু 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলে তাঁর ভাষণ শেষ করেছিলেন। বিষয়টা নিয়ে নিজের চিন্তায় যতটুকু সম্ভব ভেবেছিলাম কয়েকবার। তখন বেশ কিছু ব্যাপার খেয়াল করেছিলাম। প্রথম কথা হলো, যে সময়ে ভাষণটি প্রদান করা হলো ঠিক সেই সময় শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত নেতা এবং প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণের একমাত্র দাবিদার দলের নেতা। খেয়াল রাখা দরকার যে তখনও পর্যন্ত তিনি পাকিস্তান আওয়ামী লীগ- এর নেতা, পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের বাঙালি নেতা। আর তখন পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধাবস্থাও শুরু হয়নি যে পাকিস্তানের নাম মুখেও আনা যাবে না। ভাষণটি লক্ষ করলে দেখা যাবে বঙ্গবন্ধু সেদিন ৪ দফা দাবি উত্থাপন করেছিলেন।

সেই দাবিগুলোর একটি নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। এই নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা তো পাকিস্তানের জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদেরই নেতা। তাহলে যেখানে নির্বাচিতদের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার দাবি আসছে সেখানে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলে ভাষণ শেষ করতে কোনো সুবিধাবাদিতা খুঁজে পাই না। বরং এখানে যেটি খুঁজে পাই তা হলো, একটি গভীর সংকট থেকে তৎকালীন বাঙালিদের যতটা সম্ভব দূরে রাখার প্রচেষ্টা।

বঙ্গবন্ধুর ওপর ছাত্রনেতাদের প্রবল চাপ ছিল ঐদিনই স্বাধীনতা ঘোষণা করার। কিন্তু তিনি যদি তা করতেন তাহলে বিশ্ববাসীর কাছে পশ্চিমা শাসকরা বাঙালি আর বঙ্গবন্ধু উভয়কে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে প্রমাণ করতে পারতো অনায়াসেই। বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির সংগ্রাম তখন সবার কাছে পরিচিত হতো সন্ত্রাসী কার্যক্রম হিসেবে। তাই একদিকে বঙ্গবন্ধু বলে দিলেন ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে, আবার আরেকদিকে দাবি করলেন ক্ষমতা হস্তান্তরের। সব শেষে বলেও দিলেন এই সংগ্রাম হবে মুক্তির সংগ্রাম। ছাত্র-জনতার কাছে নির্দেশও পৌঁছে দিতে পারলেন আবার আন্দোলনকে বিকৃত করে উপস্থাপনের সুযোগটাও রাখলেন।

২০১২ সালে আমার পরিচয় হয় খোরশেদ আলম চৌধুরীর সঙ্গে। বাংলাদেশ বিমানের সাবেক রিজিওনাল অফিসার ছিলেন তিনি। বর্তমানে ক্যান্সার রোগী ও স্বজন সমাজ ফাউন্ডেশন-এর সভাপতি। এই সংগঠন করতে গিয়েই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় আমার। তার এই পরিচয়ের সূত্রে জানতে পারি ১৯৪৭ সারে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে গড়ে ওঠা সংগঠন তমদ্দুন মজলিস করেছেন একদম উঠতি বয়সে। বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ শুনেছেন রেসকোর্স ময়দানে নিজে উপস্থিত থেকে। এই কথা শুনেই তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম বঙ্গবন্ধু কি ভাষণের শেষে আসলেই 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলেছিলেন কিনা। তিনি সরাসরি আমাকে বলেছিলেন সেদিন বঙ্গবন্ধু একবারও এই কথা বলেননি। সাতই মার্চের ভাষণ সরাসরি শোনা অগ্রজ এই মানুষটার এই সরল কিন্তু তীব্র ঘোষণায় আমার মনটা ভরে গিয়েছিল সেদিন। সেদিন তাঁর কাছ থেকে এটি জানার পর আমার এই ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ নেই যে বঙ্গবন্ধু 'জয় বাংলা' বলেই ভাষটি শেষ করেছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪

‘১৯৭১ : ভেতরে বাইরে’ নিয়ে তিন প্রশ্ন

ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ

শেখ হাসিনা সরকারের সদ্য সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী, সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম নেতা এবং মুক্তিযুদ্ধের ডেপুটি চিফ আব স্টাফ ও পরবর্তীকালে এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ কে খন্দকারের সম্প্রতি প্রকাশিত বই ‘১৯৭১ : ভেতরে বাইরে নিয়ে বেশ আলোচনা শুরু হয়েছে। এর একটি কারণ, প্রায় শেষ জীবনে এসে লেখা এ বইয়ে তিনি অনেক বিতর্কিত বক্তব্য দিয়েছেন। এই বই অনেকটা তার নিজের জন্যও ‘ইউ টার্ন’। স্বভাবতই আওয়ামী লীগবিরোধী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমালোচনাকারীরা এতে উৎসাহ পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অবদান ও নেতৃত্বকে যারা খাটো করতে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পর থেকেই প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে এসেছে, তারা এ কে খন্দকার সাহেবের বইটিকে অস্ত্র হিসেবে পেয়েছে। জনাব খন্দকার কেন এত দিন পরে এসে এমন বিতর্কের জন্ম দিলেন, সেটা তিনিই ভালো জানেন। তার পূর্ণাঙ্গ বইয়ের মূল্যায়ন সময়ে অবশ্যই হবে। আমার এই লেখার কারণ এই যে, মুক্তিযুদ্ধের যেসব ঘটনার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ তিনি বইটিতে দিয়েছেন, সেগুলোর অনেকটাই কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। এ কে খন্দকার সাহেবকেও কর্মক্ষেত্রে আমি বিভিন্ন সময়ে কাছ থেকে দেখেছি। দীর্ঘ দিন বিআইডিএস-এ কাজ করার সময় শেষদিকে তাকে আমি এরশাদ সরকারের পরিকল্পনামন্ত্রী হিসেবে দেখেছি। শেখ হাসিনার দ্বিতীয় সরকারের সময়ও পরিকল্পনামন্ত্রী হিসেবে তার সঙ্গে আমার নানা ক্ষেত্রে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ে না গিয়ে আমি শুধু বইটিতে বর্ণিত মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি ঘটনাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে চাই। এ ক্ষেত্রে আমি তিনটি প্রশ্ন তুলব।

প্রথমত, এই বইয়ের ৩২ নম্বর পৃষ্ঠায় ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন- এই ভাষণের শেষ শব্দ ছিল ‘জয় পাকিস্তান’। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি এটা কোথা থেকে ‘আবিষ্কার’ করলেন? বইয়ের কোথাও তিনি বলেননি যে, বাঙালির ম্যাগনাকার্টা ওই ভাষণের সময় তিনি তৎকালিন রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে উপস্থিত ছিলেন। তাহলে কিসের ভিত্তিতে তার এই বক্তব্য? একটি ভিত্তিহীন বিষয় তার মতো লোক কেন লিখিত বইয়ে স্থান দিলেন- আমার বোধগম্য নয়।

আমি নিজে তখন রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত ছিলাম। ছিলাম মঞ্চের কাছাকাছিই। আমি তো বটেই; আমার ধারণা উপস্থিত গোটা জনসমুদ্র মন্ত্রমুগ্ধের মতো বঙ্গবন্ধুর সেই বজ্রনিনাদের প্রতিটি শব্দ শুনছিল। আমরা হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম ওই দিনের পরিস্থিতি। ভাষণের সময় উপস্থিত সব মানুষের মনে এখনও সেই ভাষণ গেঁথে আছে। আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে, বঙ্গবন্ধু তার ভাষণ শেষ করেছিলেন ‘জয় বাংলা’ বলে। তিনি যেখানে বলছেন ‘এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম’ সেখানে জয় পাকিস্তান কেন বলতে যাবেন- এটা তো কাণ্ডজ্ঞান দিয়েই বোঝা যায়!

এ কে খন্দকার সাহেবের বইটি প্রকাশের পর একটি টেলিভিশন টক শোতে বঙ্গবন্ধুর ওই ভাষণের সময় মঞ্চে উপস্থিত থাকা বর্তমানে জাসদ নেতা আ স ম আবদুর রবকে বলতে শুনেছি, ৭ মার্চের ভাষণের শেষ শব্দ ছিল ‘জয় বাংলা’। এ কে খন্দকার সাহেব কিন্তু তার বইয়ে বলেননি যে, তিনি নিজে না শুনলেও প্রত্যক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য শ্রোতা কেউ তার কাছে ‘জয় পাকিস্তান’ সম্পর্কে বলেছেন। তারপরও তিনি কেন বিষয়টি বইয়ে লিখলেন-ব্যাখ্যার দাবি রাখে। আমি মনে করি, তিনি একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। এখন তার উচিত হবে তার এই বক্তব্য প্রমাণ করা। যদি সেটা না করেন, তাহলে জাতিকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করেছেন-এ কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করা উচিত তার।

দ্বিতীয়ত, এ কে খন্দকার সাহেব তার বইয়ের ৫২ নম্বর পৃষ্ঠায় বলেছেন- অসহযোগ আন্দোলন রাজনৈতিক নেতারা ‘মোটামুটি’ সফল হয়েছিল। এই জাতির রাজনৈতিক পরিক্রমার নানা সন্ধিক্ষণ নিয়ে কারও ব্যক্তিগত মতামত থাকতেই পারে। কিন্তু একাত্তরের মার্চের অসহযোগ আন্দোলনকে মোটামোটি সফল বলা আমার কাছে বাতুলতা ছাড়া কিছু মনে হয় না। ওই আন্দোলনের সময় জনাব খন্দকার কোথায়, কীভাবে ছিলেন আমি জানি না! তবে আমি নিজে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলাম। বস্তুত আপামর জনসাধারণ ওই আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিল। কৃষক, ছাত্র, জনতা, পেশাজীবী-সবাই সেদিন রাজপথে নেমে এসেছিল। ‘যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে, শত্রুর মোকাবেলায় প্রস্তুত ছিল। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, এমন অসহযোগ আন্দোলন বিশ্বের আর কোথাও হয়েছে বলে আমার জানা নেই। গোটা পূর্ব পাকিস্তান তখন বঙ্গবন্ধুর অঙ্গুলি হেলনে চলেছে। তিনি যা-ই বলেছেন, মানুষ প্রাণপণে তা-ই করেছেন। পাকিস্তানের এই অংশের জনসাধারণ শুধু নয়, প্রশাসন পর্যন্ত চলেছে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায়। আর এ কে খন্দকার সাহেব সেই আন্দোলনকে বলছেন ‘মোটামোটি’! তার এই বক্তব্যের অর্থ দাঁড়ায় এই- তিনি জনগণের অসহযোগ আন্দোলনটি সম্পর্কে কিছুই জানেন না, অথবা জেনেশুনে বাঙালি জাতির একটি মহৎ অর্জনকে খাটো করতে চাচ্ছেন। জাতীয় আন্দোলকে এভাবে খাটো করার কোনো অধিকার তার নেই। এ কে খন্দকার সাহেবের কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে-একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন যদি ‘মোটামোটি সফল’ হয়, তাহলে পুরোপুরি সফল আন্দোলন তিনি বিশ্বের কোথায় দেখেছেন?

তৃতীয় প্রশ্নটি তুলেতে চাই জনাব এ কে খন্দকারের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে সীমান্ত পাড়ি দেওয়া নিয়ে। তার বইয়ের ৭৪, ৭৫, ও ৭৭ নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। প্রথম তিনি ২৮ বা ২৯ মার্চ পুরো পরিবারসহ সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার জন্য ডেমরা থেকে শীতলক্ষ্যা নদ ধরে ময়মনসিংহের দিকে রওনা দেন। কিন্তু গফরগাঁও থেকে আবার ফিরে আসেন। 'পালানোর চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর' ১৮ বা ১৯ এপ্রিল ঢাকায় 'অফিসে এসে যোগদান করেন। দ্বিতীয়বার তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করেন এপ্রিলের শেষদিকে। সেবার আরিচার দিকে গিয়ে লোকজনের 'সাবধানবাণী' শুনে ফিরে আসেন। তৃতীয় ও শেষ চেষ্টা করেন মে মাসে এবং ১২ মে আগরতলার দিকে রওনা হন ঢাকা থেকে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তিন দফায় তিনি সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করলেন এবং প্রথম দুই দফায় ফিরে এলেন কর্মস্থলে, তাও বিমানবাহিনীর মতো সুরক্ষিত স্থানে যোগ দিলেন আর পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী তাকে কিছুই করল না? যেখানে ২৫ মার্চের পর থেকে সমস্ত বাঙালির এবং বাঙালি অফিসারদের জীবন হুমকির মুখে ছিল, সেখানে তিনি বারবার পালানোর চেষ্টা করলেন এবং দু'বার ফিরে এসে নির্বিঘ্নে অফিস করে যেতে পারলেন কীভাবে!

আমি তখন তরুণ অর্থনীতিবিদ এবং ঢাকায় তদানীন্তন পিআইডিতে (পরবর্তীকারে বিআইডিএস) কর্মরত। ২৫ মার্চের গণতহ্যার পর কারফিউ শিথিল হওয়ার প্রথম সুযোগেই ২৭ মার্চ বাসা ত্যাগ করি এবং কিছুদিন পর সুযোগ বুঝে ঝুঁকি নিয়ে সিলেটের দিকে চলে যাই এবং পরে জকিগঞ্জ হয়ে ভারতে প্রবেশ করি। আমি পরিবার নিয়ে এলিফ্যান্ট রোডের বাসা ত্যাগ করার পরদিনই পাকিস্তানি সেনারা আমার বাসায় হানা দিয়েছিল। তার মানে, আমি তাদের নজরদারিতে ছিলাম। আর এ কে খন্দকার সাহেবের মতো উচ্চপদস্থ বিমানবাহিনী কর্মকর্তা কোনো নজরদারি ছাড়াই বারবার সীমান্তের দিকে গেলেন আর ফিরে এলেন- এটা কেউ কি বিশ্বাস করবে? শুধু সীমান্তের দিকে যাতায়াত নয়; তিনি অফিসও করে যেতে থাকলেন! সত্যিই অবিশ্বাস্য! আমার বিশ্বাস, ইতিহাস একদিন এসব রহস্য জাতির সামনে তুলে ধরবে।

এ কে খন্দকার সাহেব তার বইয়ে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয়ে এমন নানা অবিশ্বাস্য বিষয়ের সমাহার ঘটিয়েছেন। তাই কয়েকটি বিষয়ে দ্রুত প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত একজন হিসেবে আমার মনে হয়েছে, ভিত্তিহীন বিতর্কটি সম্পর্কে আমার প্রশ্নগুলো তোলা দরকার। এই লেখাটি জনাব খন্দকার সাহেবের বইয়ের বিষয়ে আমার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া মাত্র। আমি বিশ্বাস করি, অসহযোগ আন্দোলনকারী রাজনীতিকরা, মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণকারী সামরিক কর্মকর্তারা, ইতিহাসবিদরা এই বইয়ের বর্ণনায় আরও অনেক গুরুতর ফাঁক খুঁজে পাবেন এবং ধীরে ধীরে তা জাতির সামনে প্রকাশিত হবে একজন প্রায় নির্ভাষী, কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে খুবই অনাগ্রহী, বর্ষীয়ান ব্যক্তি কেন হঠাৎ সক্রিয় হলেন এবং একটি বই-ই লিখে ফেললেন।

দৈনিক সমকাল
১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪

মুরুব্বী বৈমানিকের ইতিহাস-অ্যাম্বুশ!

হিলাল ফয়েজী

'অ্যাম্বুশ' শব্দটি বিশেষশতঃ গেরিলা যুদ্ধের একটি প্রচলিত কৌশল, 'বুশ' মানে জঙ্গলে ওঁৎ পেতে থেকে হঠাৎ চলমান শত্রুপক্ষের উপর সশস্ত্র হামলা চালানোর নাম 'অ্যাম্বুশ' প্রতিপক্ষকে সারপ্রাইজ তথা হতচকিত করে দেয়াটা 'অ্যাম্বুশ' কৌশলটির লক্ষ্য। মুক্তিযুদ্ধে প্রশিক্ষণের সময় আমাদের সামরিক গুরুরা বলতেন, যখনই তোমরা কোন 'অ্যাম্বুশের ফাঁদে পড়ে যাবে, ঠিক তক্ষুণি প্রাণ বাঁচাতে দৌড় দেবে, মনে রাখবে 'অ্যাম্বুশে পড়ে 'প্রাণে রক্ষা' পাওয়াটাই হচ্ছে বিজয়ের সমান। ১৯৭১ সনে পাক হানাদারদের একটি ভয়ঙ্কর 'অ্যাম্বুশ' থেকে প্রাণে বাঁচার অভিজ্ঞতা হয়েছে এই কলম-ব্যায়ামবীরের।

১৯৯১ সনে যখন উপকুলে মহাঝড়ে লাখ লাখ মানুষ নিমেষে লাশ হয়ে গেল, তখন হঠাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুশ প্রশাসন রিলিফ প্রদানের নামে ভারত মহাসাগরে মোতায়েন রণতরীকে চট্টগ্রাম বন্দরের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল অভাবনীয় দ্রুতগতিতে সেই অপারেশনটির নাম দিয়েছিলাম বুশের 'রিলিফ-অ্যাম্বুশ'।

সেই থেকে ২৪ বছর পেরিয়ে গেছে, ১৯৭১ সনে রণক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী গঠিত হবার পর যিনি সবচেয়ে মুরুব্বী-বৈমানিক হলেন অর্থাৎ বিমান বাহিনী প্রধান হলেন, ২০১৪ সনের তিনি হয়ে গেলেন হঠাৎ ইতিহাসবিদ। হঠাৎ ইতিহাস-অ্যাম্বুশে হতচকিত করে দিলেন বাংলাদেশের রাজনীতির মূল কেন্দ্রে। মুরুব্বী বৈমানিক আবার দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর প্রবীণ ন্যুজ বয়সে ২০১৪ সনের নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত শেখ হাসিনা সরকারের পরিকল্পনামন্ত্রী হিসেবে কাজ করছিলেন। কয়েক বছর ধরেই তিনি "সেক্টর কমান্ডা'স ফোরম"-এর প্রধান ছিলেন।

মুরুব্বী প্রকৃত অর্থেই সুশীল, নির্ঝঞ্ঝাট, নিরালা ধরনের পরিকল্পনামন্ত্রী হয়ে ও বকবক সংস্কৃতি পরিহার করে চলেছেন। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর উপপ্রধান ছিলেন। সে অর্থে কখনই বিতর্কিত ছিলেন না। পাবনার সন্তান পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে যোগদান করা আবদুল করিম খোন্দকার নামের তরুণ এক বৈমানিক কত দ্রুত অ্যাম্বুশ মানে যদি হয় সারপ্রাইজ তথা চমকে দেয়া, তাতে তিনি সফল হয়েছেন শতভাগ। কেউ ভুলেও ভাবতে

পারেনি ইতিহাসের ওপর হামলাটি আসবে এমন নিরাপদ-পরীক্ষিত বন্ধুর হাতের অঙ্গলীচালনায়, মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু করে দিয়েছেন তার মুক্তিযুদ্ধের একান্ত সহযোগীরা!

এই শেষ বয়সে এসে এমনটা করিলেন তিনি ক্যানে! কার্যকর ভেবে ভেবে অনেকে ক্লান্ত ব্যকুল! মুরুব্বী-বৈমানিক ইতিহাস-অ্যাম্বুশ করেছেন মনের সাধে। এই অ্যাম্বুশ কাজে তাকে যারা মদত যুগিয়েছেন, তারা বাংলাদেশের একনম্বর মিডিয়া-বুদ্ধিমান তীক্ষ্ণ-প্রচারণা কুশলী। জ্যেতিতে জ্যেতিতে তারা অতিভস্বর। সবকিছুতেই তারা প্রথম প্রকাশনাতেও। ইতিহাস-অ্যাম্বুশেও।

১৯৭১ সনে যে এর রাষ্ট্র মানচিত্রটি পৃথিবীতে গড়ে উঠল, সেখানে আত্মত্যাগের রক্তপ্লাবণ ছিল ইতিহাস চমকানো। সেই মহাসংগ্রামের মহানায়ক ছিলেন টুঙ্গীপাড়া নামের একটি গ্রাম থেকে উঠে আসা এক মানবসিংহ। পূর্ব পাকিস্তানের এলিট বড়লাট-মাঝারি লাট-ছোট লাট। এমন এক 'মানবসিংহ-এর নেতৃত্ব মেনে নিতে কখনোই প্রস্তুত ছিল না। তাদের অনেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি প্রভুদের পদতল চেটে চেটে চটকদার জীবনযাপন করবেন। অনেকে বাংলাদেশ মেনে নিলেও কোনক্রমেই টুঙ্গীপাড়ার মানবসিংহকে মেনে নিতে পারছেন না। আমাদের আলোকিত প্রোজ্জ্বল জনাবেরা সদা মনে মনে ভাবেন, 'মুজিব আবার ক্যাঠা! তাদের এই চিন্তন পদ্ধতির জ্বালা-যন্ত্রণার কথা খুব একটা অজানা নয়। মুরুব্বী বৈমানিক যে ঐ আলো ঝলমল পার্টির ফাঁদে এভাবে পদতল সমর্পণ করবেন, এ ঘটানাটির জন্য কেউ প্রস্তুত ছিলেন না দেশের ভিতরে, দেশের বাইরে।

মুরুব্বী বৈমানিক জীবনের শেষে এসে 'ভিতরে বাইরে' পুস্তকটি রচনা করে ১৯৭১ সনের বঙ্গবন্ধু-নেতৃত্বের যোগ্যতার উপর তীব্র বোমাবর্ষণ করেছেন পাকিস্তানি যুদ্ধবিমানের মতো। পুস্তকটির প্রথম সংস্করণে বলেছিলেন, ১৯৭১ সনের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক মহাসমাবেশ লাখ লাখ মানুষের সামনে বঙ্গবন্ধু 'জয় পাকিস্তান' বলে শেষ করেছিলেন। অতি দ্রুত ফুরিয়ে যাওয়া প্রথম সংস্করণের পর প্রকাশিত হয়েছে পুস্তকটির দ্বিতয় সংস্করণ, সেখানে তিনি অতীব দয়া প্রদর্শন করে বলেছেন, 'জয় পাকিস্তানের' পূর্বে বক্তা 'জয় বাংলা' ও বলেছিলেন।

ইতিহাসের কী অভাবনীয় দ্রুতগতিতে একটি দেশে বিমানবাহিনীর প্রধান পদে আসীন হলেন, একবার কী সে কথাটি ভেবেছেন!

না, করিম মিয়া সেকথা ভাবার ফুরসৎই পাননি জীবনের কোন পর্বেই। কেননা বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্র যে হঠাৎ করে পৃথিবী মানচিত্রে আবির্ভূত হবে ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বরে, সেটা ৭১ এর ২৬ মার্চ তারিখেও এ পৃথিবীর কেউ ভবিষ্যদ্বানী করতে পারেনি। করিম সাহেবও ভুলেও ভাবেননি একটি জাতীয় বিমানবাহিনী হবে পূর্ব বাংলায় এবং তিনি তার প্রধান হবেন, মুক্তিযুদ্ধের একটি রাষ্ট্রের সম্মিলিত প্রতিরক্ষা বাহিনীর তিনি উপ-প্রধান হবেন, মাত্র কয়েক মাসে, সেটাও ইতিহাসের এক বিশাল সারপ্রাইজ বটে।

বঙ্গবন্ধু নিয়ে কোনো বির্তক নয়

মেজর (অব) সুধীর সাহা

ভারতে গান্ধি একজনই এসেছিলেন। পাকিস্তানেও জিন্নাহ একজনই ছিলেন। এমন করে অনেক দেশ ও জাতির কোনো ক্রান্তিলগ্নে গণ্ডি ছাড়িয়ে যাওয়া কোনো কোনো মহামানব আমাদের পৃথিবীতে আসেন। তাদের মধ্যে কেউ দেশ ও জাতির ভেতরে সীমাবদ্ধ, আবার কেউ-বা দেশ ও জাতির গণ্ডি ছাপিয়ে সারা পৃথিবীতেই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেন। তাদের বেশিরভাগই যে কোনো বিতর্কের উর্ধ্বে। অবশ্য কোনো কোনো বিখ্যাত ব্যক্তিদের আবার কুখ্যাতির বদনামও থাকে। সারা পৃথিবীতে হিটলার নিযে বিতর্কের শেষ নেই আজ অবধি। কিন্তু তাই বলে দেশ ও জাতির গণ্ডি পেরিয়ে যাওয়া বিশ্ববিখ্যাত এরিস্টোটল, স্যার আইজ্যাক নিউটন, উইলিয়াম শেকসপিয়ার, আব্রাহাম লিংকন, নেলসন ম্যান্ডেলা, মহাত্মা গান্ধি, মাদার তেরেসা নিয়ে কখনো কোনো বিতর্কের সৃষ্টি হয়নি কোথাও। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তাদের শুধু ভক্ত আছে তা-ই নয়, যারা ভক্ত নয় তাদের মধ্যেও এদের নিয়ে কোনো বিতর্ক অবতারণার সুযোগ নেই। দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা, যুক্তরাজ্যের উইনস্টর চার্চিল, ভারতের মহাত্মা গান্ধি, কিউবার ফিদেল ক্যাস্ট্রো, যুক্তরাষ্ট্রের আব্রাহাম লিংকন, বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিজ নিজ দেশের ক্ষেত্রে শুধু অবিসংবাদিত নেতাই ছিলেন না, তারা নিজ দেশের সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে ছিলেন, এখনো আছেন এবং ভষ্যিতেও থাকবেন। তাদের মতাদর্শের বাইরে যাদের অবস্থান, তেমন লোকও তাদের দেশের এই মহামানবদের নিয়ে কোনো বিতর্কের অবতারণা করার সুযোগ পায়নি। তবে তাদের পাশাপাশি আরও অনেক নেতা আছেন, যাদের ভালো-মন্দ নিয়ে বিতর্কও হতে পারে। ভারতের জওহরলাল নেহরু কিংবা ইন্দিরা গান্ধি, পাকিস্তানের বেনজির ভুট্টো কিংবা বাংলাদেশের জিয়াউর রহমান-এমন নেতারাও নিজ নিজ দেশে জনপ্রিয় ছিলেন এবং তাদেরও মতাদর্শগত অনুসারী আছে। কিন্তু পার্থক্যটা হলো-এমন নেতারা বিতর্কের ঊর্ধ্বে নন। তাদের ভক্ত থাকবে, আবার তাদের নিয়ে বিতর্কও থাকবে- এটিই স্বাভাবিক।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭০ সালে ছিলেন শুধুই আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিব। ১৯৭১-এ এসে বিশেষ করে ৭ মার্চের পর থেকে বঙ্গবন্ধু হয়ে যান স্বাধীনতা কিংবা মুক্তির প্রতীক। বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে, তার নামকে ঘিরে, তার বাঙালি আদর্শকে

ঘিরে পুরো পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ এক হয়ে যেতে পেরেছিল ১৯৭১-এ। গুটিকতক স্বাধীনতাবিরোধী ব্যক্তি ও শক্তি ছাড়া সব বাঙালির একমাত্র নেতা হয়ে উঠেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। বঙ্গবন্ধু, জয় বাংলা এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একবারেই মিশে গিয়েছিল এক প্ল্যাটফর্মে। এখান থেকে কাউকে আলাদা করার কোনো সুযোগ ছিল না। সেই বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে 'জয় বঙ্গবন্ধু', 'জয় বাংলা' স্লোগান দেয়নি এমন কোনো মুক্তিযোদ্ধার অস্তিত্ব ১৯৭১ সালের বাংলাদেশে ছিল না। এর বিপক্ষে যারা ছিল তারা রাজাকার, আলবদর, আলশামস, যারা বাঙালির বিরুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সপক্ষে ছিল। তাই বাঙালিকে যদি স্বীকার করে নিতে হয়, তবে বঙ্গবন্ধুকে স্বীকার করে নিতেই হবে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭১-এর মার্চের পর আর আওয়ামী লীগের সম্পদ ছিলেন না- তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাংলাদেশের, বাঙালির সম্পদ। তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির জাতীয় সম্পদ। এক বঙ্গবন্ধুই ৭ মার্চের জনসভায় বলতে পেরেছিলেন- 'আর যদি আমার লোকের ওপর একটি গুলি চলে....।' অর্থাৎ পুরো বাঙালি জাতিকে যিনি 'আমার লোক, বলতে পেরেছিলেন, তিনিই বাঙালির প্রাণের নেতা, বাঙালির বঙ্গবন্ধু। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যে বঙ্গবন্ধুকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল, তার মূলে কাজ করেছিল বঙ্গবন্ধুর বাঙালি জাতির একচ্ছত্র নেতা হওয়ার বিষয়টিই। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল এ দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, রাজনৈতিক কর্মী, বাঙালি ইপিআর সদস্য, বাঙালি সেনাসদস্যসহ আপামর বাঙালি জনতা। সেদিনের মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, কণ্ঠে ছিল 'জয় বাংলা' আর হৃদয়ে ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা। বঙ্গবন্ধু সেদিন দল-মতের উর্ধ্বে উঠে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা হয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ, ভাসানী ন্যাপ, আওয়ামী লীগসহ সব রাজনৈতিক দলের কাছেই তখন জয় বাংলা এবং বঙ্গবন্ধু জাতীয় সম্পদে পরিণত হয়েছিলেন। জয় বাংলা বা বঙ্গবন্ধু নিয়ে কোনো বিতর্ক করার কিংবা ভিন্নমত প্রকাশ করার কোনো আগ্রহই কোনো মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে দেখা যায়নি।

বঙ্গবন্ধুর আবেদন বাঙালির কাছ থেকে কখনো হারিয়ে যায়নি অথবা এতটুকুও ম্লান হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিরোধিতাকারী কিছু মানুষ ছাড়া অবশিষ্ট সব বাঙালির কাছেই বঙ্গবন্ধু তাদের প্রাণের নেতা ছিলেন। সময় ও কর্মের সিঁড়ি বেয়ে একসময় বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন বাঙালি জাতির পিতা। বঙ্গবন্ধু এবং জাতির পিতা-এ দুটি পরিচয়ের সূত্রে এ দেশের হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান শেখ মুজিব বাঙালি জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়ে পড়েছেন। তাকে অস্বীকার করা কিংবা তাকে নিয়ে বিতর্ক করার অর্থই হচ্ছে বাঙালি জাতিকে নিয়ে বিতর্ক করা, বাংলাদেশের অস্তিত্বকে নিয়ে বিতর্ক করা। এ সূত্রের ভিত্তি ধরে এটুকু বলা যায়, যারা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিতর্ক করছেন কিংবা যারা বঙ্গবন্ধুকে বিতর্কিত করার সুযোগ করে দিচ্ছেন-তারা সবাই বড় একটি ভুল করছেন এ দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে বিতর্ক করা যায়, ভারতের জওহরলাল নেহারু কিংবা ইন্দিরা

গান্ধিকে নিয়ে বিতর্ক করা যায়, পাকিস্তানের বেনজির ভুট্টোকে নিয়ে বিতর্ক করা যায়, দেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কিংবা খালেদা জিয়াকে নিয়ে বিতর্ক করা যায়, কিন্তু জিন্নাহকে নিয়ে পাকিস্তানে কিংবা মহাত্মা গান্ধিকে নিয়ে ভারতে কিংবা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বাংলাদেশে বিতর্কের কোনো সুযোগ নেই। নিজ নিজ দেশে তারা সব বিতর্কের উর্ধ্বে। বঙ্গবন্ধু নিয়ে কোনো বাঙালির বিতর্ক ছড়ানো মানে, বাংলাদেশের মূল ভিত্তির ওপর বিতর্ক সৃষ্টি করা। বঙ্গবন্ধ দলীয় সংকীর্ণতার অনেক উর্ধ্বে। তিনি জাতির পিতা। আওয়ামী লীগের বঙ্গবন্ধুকে দলে টানার যেমন কোন সুযোগ নেই, তেমনি অন্য কোনো দলের কারও পক্ষেই বঙ্গবন্ধুকে কটাক্ষ করার সুযোগ নেই। বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগ হলেও আওয়ামী লীগের বঙ্গবন্ধু নয়। কেননা বঙ্গবন্ধু সেই ১৯৭১ সালেই একটি দলের উর্ধ্বে উঠে পুরো জাতির বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এ কথা কেন লিখলাম তা একটু ব্যাখ্যা করছি। বাংলাদেশের শহর-বন্দর-গ্রাম এখন নানা পোস্টারে সুশোভিত। বিভিন্ন ধরনের পোস্টার রাজনীতির বড় নেতা, ছোট নেতা-এমনকি কর্মীদেরও বড় বড় পোস্টার। আওয়ামী লীগের পোস্টারগুলোতে বঙ্গবন্ধুর ছবি ব্যবহার করা হয়, যার নিচে থাকে কোনো জেলা কিংবা থানা কিংবা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ছোট-বড় কোনো নেতার ছবি ও শুভেচ্ছা। বঙ্গবন্ধুর ছবিকে এতখানি সহজলভ্য করার কাজটি কী শোভাণীয়? বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া মাঝেমধ্যেই বিতর্কের সূত্রপাত করেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তিনি সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের তুলনা করে ফেলেন প্রায়ই জিয়াউর রহমান বাঙালির মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন কালুরঘাট রেডিও থেকে। তাই মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের একটি বিশেষ স্থান স্বীকার করে নিতে হবে। জিয়াউর রহমান একজন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন এবং বীরউত্তম খেতাবপ্রাপ্ত। কিন্তু তাই বলে তার তুলনা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে করা যায় না। বঙ্গবন্ধুর অবস্থান বাঙালি জাতির জীবনে অনেক, অনেক ওপরে। তার ছেলে তারেক রহমান আরও এক ডিগ্রি বেশি। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে তারেক রহমান এমন বাক্য উচ্চারণ করেন, যা বাঙালি জাতিই লজ্জায় পড়ে যায়। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিতর্ক ছড়ানোর আগে প্রত্যেকের বোঝা উচিত একটি দেশে শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া, বেনজির ভুট্টো, ইন্দিরা গান্ধি, জিয়াউর রহমান অনেক আসেন এবং বারবার আসেন; কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, নেলসন ম্যান্ডেলা একটি জাতির জন্য বারবার নয়, হাজার বছরে হয়তো একবারই আসেন। তেমন একজন জাতির বিবেকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে তাকে বিতর্কের মধ্যে ফেলে দেওয়ার অর্থ নিজের অস্তিত্বকেই অপমান করা, অসম্মান করা। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে আজ থেকে এমনটিই হোক- ক্ষমতা, দল নির্বিশেষে বঙ্গবন্ধুর স্থানটি বিতর্কের উর্ধ্বে থাকুক।

আমাদের সময়
২৮ ডিসেম্বর ২০১৪

‘১৯৭১ : ভেতরে বাইরে’ মুক্তিযুদ্ধের আজন্ম শত্রুদের জন্য মোক্ষম অস্ত্র

শাহরিয়ার কবির

মুক্তিযুদ্ধের উপপ্রধান সেনাপতি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান, ‘সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম’-এর সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মহাজোট সরকারের প্রাক্তন পরিকল্পনামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ কে খন্দকার বীরউত্তম মুক্তিযুদ্ধের ৪৩ বছর পর ‘১৯৭১ : ভেতরে বাইরে’ লিখে যেভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ শিবিরে নিন্দিত ও নন্দিত হয়েছেন বাংলাদেশে এর আগে অন্য কোন গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে এমনটি হয়নি। তাঁর এই স্মৃতিকথা নিয়ে গত এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। তিন দিনে বইয়ের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে দ্বিতীয় সংস্করণও শেষ হতে চলেছে। একই সঙ্গে শেষ হয়ে যাচ্ছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একজন তারকা অধিনায়কের যাবতীয় গৌরবময় অর্জন।

প্রথমে বলা প্রয়োজন, জাতীয় সংসদে এই গ্রন্থটি সম্পর্কে যে ভাষায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে এবং কয়েকজন মন্ত্রী যেভাবে এ কে খন্দকারের সমালোচনা করেছেন আমি তা সমর্থন করি না। এ ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিতের বক্তব্য আমার কাছে যথাযথ মনে হয়েছে। আমাদের জানা প্রয়োজন, এ কে খন্দকারের আলোচ্য গ্রন্থটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নয়, নিছক স্মৃতিকথা। আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথায় লেখন নিজেকে বা প্রিয়জনদের কল্পনারাজ্যের মহানায়কে পরিণত করেন, একইভাবে অপছন্দের নায়কদের পরিণত করেন খলনায়কে। এতে ইতিহাসের কোন ক্ষতি হয় না, বরং কিছু সময়ের জন্য কিছু মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায়। তবে স্মৃতিকথা, গল্প, উপন্যাস বা নাটকেও যদি এমন কোন বিষয়ের অবতারণা করা হয় যা রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে আঘাত করে, জাতির গৌরব ও অর্জনকে হেয় করে এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তখন সে বিষয়টি হালকাভাবে দেখা উচিত নয়।

আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথা ইতিহাস না হলেও বরেণ্য ঐতিহাসিক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব বাংলার সামাজিক ইতিহাস লিখতে গিয়ে সংবাদপত্র ও সাময়িকীর পাশাপাশি সাহিত্য এবং স্মৃতিকথা থেকেও তথ্যসংগ্রহ

করেছেন। তার গবেষণায় ব্যবহৃত আত্মজীবনীর তালিকায় বিখ্যাত জনের পাশাপাশি অখ্যাত বীরাঙ্গনার নামও আছে। আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথাকে ইতিহাসের অন্যতম উৎস হিসেবে ব্যবহার করে মুনতাসীর মামুন ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছেন। আমাদের আশংকা হচ্ছে কিছু মৌলিক বিষয় যদি খন্দকার সাহেব তার বহুল আলোচিত গ্রন্থ সংশোধন না করেন শুধু ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সৃষ্টিতত্ত্ব অস্বীকার করবার জন্য তাকে ইতিহাসের কাঠগড়ায়ও দাঁড়াতে হবে।

এই গ্রন্থের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করলে লেখকের অনেক স্ববিরোধিতা যেমন ধরা পড়ে, তেমনি তার রাজনীতি, সমাজ, ইতিহাস, দর্শন, কূটনীতি এমনকি সমরনীতি সম্পর্কেও দীনতা ও অজ্ঞতা প্রকট হয়ে ওঠে। প্রতিটি বিষয় নিয়ে লিখতে গেলে দীর্ঘ পরিসর প্রয়োজন। আমি নির্দিষ্টভাবে দুটি গুরুতর ত্রুটি সম্পর্কে উল্লেখ করতে চাই। এ ত্রুটি ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত সে আলোচনায় না গিয়েও বলতে পারি এসব তার কষ্টকল্পনাপ্রসূত অভিব্যক্তি বা ‘উইশফুল থিংকিং’ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃত বাংলায় একটি প্রবাদ আছে-‘হাতে পাঁজি মঙ্গলবার!’ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না এমন কথা পাকিস্তানিরাও বলে না, বলে বাংলাদেশে পাকিস্তানি মানসিকতাসম্পন্ন কিছু ব্যক্তি, কিংবা চরম বঙ্গবন্ধুবিদ্বেষীরা। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে তার ভ্রান্তি নিরসন করতে গিয়ে দ্বিতীয় সংস্করণে তা তিনি সংশোধন করে ‘জয় পাকিস্তান’-এর আগে ‘জয় বাংলা’ যুক্ত করেছেন সম্ভবত অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের পরামর্শে বা বিচারপতি হাবিবুর রহমানের প্রভাবে। তিনি যদি কষ্ট করে ‘৭১-এর দৈনিক পত্রিকা দেখতেন, কিংবা স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র দেখতেন তাহলে জানতে পারতেন বঙ্গবন্ধু ‘জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান’ বলেছিলেন ৭১-এর ৩ জানুয়ারি ভাষণে। ৭ মার্চের ভাষণে তিনি শুধু ‘জয় বাংলা’ বলেছেন। বঙ্গবন্ধুর দুটি ভাষণের পূর্ণ বিবরণ তখনকার সংবাদপত্রে আছে, স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্রেও আছে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে শত শত লেখা আছে দেশে ও বিদেশে। রাজনৈতিক ভাষণের ইতিহাসে আমার বিবেচনায় এটি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণের অন্যতম। ৭ মার্চের ভাষণ স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছিল না, ছিল স্বাধীনতার প্রস্তুতি ও দিক নিদের্শনা। বঙ্গবন্ধুকে হেয় করার জন্য যারা বলেন বঙ্গবন্ধু একটি জাতিকে কোন দিক নির্দেশনা না দিয়ে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেছিলেন-তাদের নেতা জিয়াউর রহমান স্বয়ং বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে ‘স্বাধীনতার সবুজ সংকেত’ বলেছেন, যার ভিত্তিতে সামরিক বাহিনী স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। জিয়াউর রহমান তার জীবদ্দশায় কখনও দাবি করেননি বঙ্গবন্ধু নয়, তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।

স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে এ কে খন্দকার বলেছেন, ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষনা করেছেন এমন প্রমাণ তিনি কোথাও পাননি। আবার জিয়াউর রহমান সম্পর্কেও বলেছেন, স্বাধীনতা ঘোষণার কোন এখতিয়ার বা যোগ্যতা

জিয়াউর রহমানের ছিল না। তাহলে কি ২৬ মার্চ আসমান থেকে ফেরেশতা বা জিন-ভূত নেমে এসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন? যারা ঐতিহাসিক কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে স্মৃতিকথা লেখেন তারা কখনও শুধু নিজের স্মৃতির ওপর নির্ভর করেন না, অন্যের স্মৃতির ওপরও নয়। সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের জন্য তাদের নির্ভর করতে হয় সংবাদপত্র, সাময়িকী, রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত দলিলপত্র ও প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থের ওপর।

২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এই তথ্য আমাদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে, ২৭ ও ২৮ মার্চ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সকল দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে, বিভিন্ন দেশে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনে সংরক্ষিত রয়েছে এবং সর্বোপরি উল্লেখিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে। আমি ১৮ বছর আগে কলকাতায় আনন্দবাজার পত্রিকার সিনিয়র সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্তের কাছ থেকে ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার সংবাদ টেলিপ্রিন্টারে প্রেরিত প্রিন্ট শিট থেকে সংগ্রহ করেছিলাম। এই বার্তাটি ২৬ মার্চ বিশ্বের সকল গণমাধ্যমে টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে প্রেরণ করেছিল ৫টি আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা- বিবিসি, ইউএনআই, পিটিআই, এনডিপি ও টিএসএ। এই টেলিপ্রিন্টার বার্তার প্রথম বাক্যটি ছিল- 'SHEIKH MUJIBUR RAHMAN TONIGHT PROCLAIMED EAST PAKISTAN A SOVEREIGN INDEPENDENT PEOPLES REPUBLEC OF BANGLADESH.'

১৯৭১-এর ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে স্বাধীন বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণার মাধ্যমে। কোন প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন তার বর্ণনা রয়েছে এর ১৫ দিন পর ১০ এপ্রিল মুজিবনগর থেকে প্রচারিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার কর্তৃক ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে। বাংলাদেশের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিগণ কর্তৃক জারিকৃত স্বাধীনতা এই ঘোষণাপত্রের বয়ান আরম্ভ হয়েছে এইভাবে- 'যেহেতু একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জনকে নির্বাচিত করেন, এবং

যেহেতু সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ তারিখে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করেন, এবং

যেহেতু এই আহূত পরিষদ-সভা স্বেচ্ছাচারী ও বেআইনীভাবে অর্নিদিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়, এবং

যেহেতু পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা অব্যাহত থাকা অবস্থায় একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে, এবং

যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতাকে রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান,...।

'১০ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে proclamation of Independence' মুজিবনগরে প্রণীত হয়েছে প্রথমে ইংরেজিতে, যার খসড়া প্রণয়ন করেছেন ১৯৭০-এর নির্বাচনে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সাংসদ ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, যা অনুমোদন করেছেন পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিগণ। এই ঘোষণাপত্র অনুযায়ী গঠিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার ও মন্ত্রিসভা, যাঁরা ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে শপথ গ্রহণ করেন। স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র ২৩ মে ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশের গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং সংবিধান প্রণয়নের পর এর অংশে পরিণত হয়।

'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' হচ্ছে স্বাধীনতাকামী কোন দেশের স্বাধীনতার পক্ষে দৃঢ়োক্তি বা দাবি। এই ঘোষণাপত্র আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা তখনই বৈধতা লাভ করে যখন তা প্রদান করেন দেশের বা জাতির নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বা স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদী নেতৃত্ব। ২০০৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি জারিকৃত কসোভোর একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণা সার্বিয়া যখন আন্তর্জাতিক আদালতে চ্যালেঞ্জ করে তখন (জুলাই ২০১০) আদালতের রায়ে এই নিরিখে বলা হয় 'কসোভোর স্বাধীনতার ঘোষণা আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করেনি।' ২০১১-এর ১৭ ফেব্রুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা কসোভোর স্বাধীনতার ৩য় বার্ষিকীতে প্রদত্ত এক বাণীতে দুই দেশের সম্পর্কোন্নয়ন সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করে কসোভোর আর্থসামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন।

বহু দেশ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান ছাড়াই ঔপনিবেশিক প্রভুদের সঙ্গে দেনদরবার ও সমঝোতা করে স্বাধীন হয়েছে। পাকিস্তানের জাতির জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যেমন বলেছেন তিনি একটি টাইপ রাইটারের সাহায্যে পাকিস্তান স্বাধীন করেছেন। স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীকে লড়াই করতে হয়েছে প্রায় ১৫০ বছর। তারপরও ভারত স্বাধীন হয়েছে সমঝোতার মাধ্যমে। সমঝোতার স্মরক হিসেবে শেষ ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন কিছুকাল স্বাধীন ভারতের গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা এবং স্বাধীনতা লাভের ঘটনার সঙ্গে মিল পাওয়া যাবে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে। তবে একটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অন্য যে কোন দেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের তুলনায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ দাবি করতে পারে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধসহ সরকার কিভাবে পরিচালিত হবে, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কী হবে তা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে যেভাবে বলা হয়েছে বিশ্বের অন্য

কোন দেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে সেভাবে বলা হয়নি। যে কারণে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসিত হয়েছে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের দ্বারা। এই ঘোষণাপত্রে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২-এর ১১ জানুয়ারি বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন। এই ঘোষণাপত্র একধারে ছিল মুক্তিযুদ্ধকালীন সংবিধান এবং বাংলাদেশের মূল সংবিধানের 'জেনেসিস' বা 'সৃষ্টিতত্ত্ব'। বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হওয়ার পর চতুর্থ তফসিলের ১৫০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বাংলাদেশের সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

বঙ্গবন্ধু কোন পরিস্থিতিতে ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন সে বিষয়টি যেমন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে এবং এর সঙ্গে আরও বলা হয়েছে- 'আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থ, নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি গণপরিষদরূপে গঠন করিলাম এবং পারস্পরিক আলোচনা করিয়া এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থ, সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র রূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং তদ্দ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম।'

যেহেতু বঙ্গবন্ধু ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এবং যেহেতু এই ঘোষণা নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে অনুমোদন করেছেন সেহেতু ঘোষণাপত্রের শেষে বলা হয়েছে- 'আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।' স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ১০ এপ্রিল জারি করা হলেও এই ঘোষণাপত্র এবং বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী ২৬ মার্চ ১৯৭১ থেকে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এই দিন থেকে বাংলাদেশে অবস্থানকারী পাকিস্তানী সামরিক জান্তা পরিণিত হয়েছে দখলদার বাহিনীতে, যাদের দখলদারিত্ব রক্ষার জন্য গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করেছে জামায়াত এবং তাদের সহযোগীরা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রথম কে ঘোষণা করেছেন এ নিয়ে ২০০৯ সালে হাইকোর্টে একটি মামলা হয়েছিল। ড. এম এ সালাম বনাম বাংলাদেশ সরকার....'-এর মামলায় বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক যে যুগান্তকারী রায় প্রদান করেছেন সেখানে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের উল্লেখ ছাড়াও ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিভাবে বাঙালি জাতিকে ধাপে ধাপে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন বিভিন্ন সরকরি নথিপত্র, সংবাদপত্রে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর ভাষণ এবং ঐতিহাসিকদের রচনাবলীর ওপর ভিত্তি করে।

বিচারপতি খায়রুল হক তাঁর রায়ে ১৯৬৪ সালে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর একটি ভাষণ উল্লেখ করে লিখেছেন–

'১৯৬৪ সনের ১২ই জুলাই তারিখে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে আইউব সরকারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালিত হয়। ঐদিন পল্টন ময়দানে শেখ মুজিব একটি অসাধারণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতার প্রারম্ভে বলেন–

'সোনার বাংলার ভাইয়েরা আমার! স্বাধীনতার ১৭ বছর পরে আবার জনগণের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে নামতে হবে, ১৭ বছর পরে আবার ভোটের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করতে হবে, ১৭ বছর পরে আবার রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য আন্দোলন করতে হবে-একথা কোন দিন ভাবিনি। নিজ দেশে নিজেদের সরকারের বিরুদ্ধেও ব্রিটিশ আমলের মতো জনগণের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে হবে ভাবলে মন আমার শিউরে ওঠে।'

বিচারপতি খায়রুল হকের এই রায়ে বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্র, সরকারি দলিলপত্র, এমনকি পাকিস্তানের যাবতীয় প্রকাশ্য ও গোপন নথিপত্রের তথ্য উদ্ধৃত করে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা প্রদান সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। ২৬ মার্চ পাকিস্তানের সামরিক জান্তাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান স্বাধীনতার ঘোষণার জন্যই বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক বলেছিলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধীরা সব সময় 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' অস্বীকার করেছে। কারণ এটা মানতে গেলে ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র এবং বাংলাদেশে অবস্থানকারী পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ও সামরিক বাহিনী অবৈধ ও দখলদার সরকার ও হানাদার বাহিনীতে রূপান্তরিত হবে। ১৯৭২-এর ৪ জুন পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত জামায়াতে ইসলামীর দলীয় মুখপত্র 'সাপ্তাহিক এশিয়া'য় জামায়াত এক বিকৃতিতে বাংলাদেশকে স্বীকৃত না দেয়ার জন্য তাদের সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে বলেছিল–স্বীকৃতি দেয়া হলে ১৯৭১-এর যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ ছিল এটা মেনে নেয়া হবে, পাকিস্তানী সৈন্যরা দখলদার বাহিনীতে রূপান্তরিত হবে, বাংলাদেশ তাদের যুদ্ধাপরাধের দায়ে বিচারের সুযোগ পাবে এবং এই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির জন্য বাংলাদেশ পাকিস্তানের কাছে ক্ষতিপূরণ চাইতে পারে।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র চ্যালেঞ্জ করে এ বছরের শুরুতে খালেদা জিয়া তনয় তারেক রহমান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ থেকে আরম্ভ করে '৭২-এর ১৬ ডিসেম্বর সংবিধান কার্যকর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধসহ সরকারের যাবতীয় কার্যক্রমের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেছেন। এ কে খন্দকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অস্বীকার করে নিজেকে তারেক রহমানের স্তরে নামিয়ে এনেছেন, যে তারেক জামায়াতকে সহোদর বিবেচনা করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সম্পর্কে মুক্তিযুদ্ধের উপ-সেনাপ্রধান সেনাপতি এ কে খন্দকারের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না, এবং পরবর্তী ৪৩ বছরেও তিনি জানবার চেষ্টা করেননি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের কোন দলিলের অস্তিত্ব ছিল।

খন্দকার সাহেব লিখেছেন, বাংলাদেশ স্বাধীন করবার জন্য বঙ্গবন্ধুর কোন প্রস্তুতি ছিল না; থাকলে নয় মাসের অনেক আগেই নাকি দেশ স্বাধীন হয়ে যেত।

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু কিভাবে জাতিকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেছেন এ বিষয়ে শত শত প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, প্রামাণ্য গ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়। আমি ও মুনতাসীর মামুনসহ অনেকে লিখেছেন ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার জন্য কিভাবে গোপনে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পশ্চাদভূমি হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র প্রদানের জন্য কিভাবে ভারতকে রাজি করিয়েছেন। একই সঙ্গে প্রকাশ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গেছেন তিনি। তিনি জানতেন কখন ছয় দফার কথা বলতে হবে, কখন এক দফার কথা বলতে হবে। আমরা বরং বলতে পারি বাংলাদেশকে স্বাধীন করবার জন্য বঙ্গবন্ধু বারবার মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে যেভাবে গোপনে ও প্রকাশ্যে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন পৃথিবীর অন্য কোন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়করা তা করতে সক্ষম হননি। এ কারণেই স্বাধীনতা ঘোষণার ১৫ দিনের ভেতর সরকার গঠন, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আনুষ্ঠানিক বৈঠক, মুক্তিযুদ্ধের সূচনা-সবই সম্ভব হয়েছিল এবং মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীনও হয়েছিল। এত সংক্ষিপ্ত সময়ে সরকার গঠন, সার্বিক মুক্তযুদ্ধ সংগঠন এবং বিজয় অর্জনের ঘটনা বিশ্বের অন্য কোন দেশের ক্ষেত্রে ঘটেনি। পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া তিব্বতের দালাইলামা ৫৫ বছর আগে ৫০ হাজার তিব্বতী নিয়ে ভারতে এসেছেন, এখনও তিব্বত স্বাধীন করতে পারেননি। স্বাধীনতার জন্য ফিলিস্তিনীরা গত ৬৬ বছর ধরে লড়াই করছেন, এখনও তা অর্জিত হয়নি। এ কে খন্দকারের লেখায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাল্টে যাবে না, ইতিহাস নির্ধারিত স্থান থেকে বঙ্গবন্ধুও বিচ্যুত হবেন না। তবে যাদের উৎসাহ বা প্ররোচনায় তিনি এই স্মৃতিকথা লিখেছেন তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের আজন্ম শত্রু জামায়াত তাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসবিনাশী ষড়যন্ত্রে একটি মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে এ কে খন্দকারের স্মৃতিকথাকে। তার মতো একজন বীরউত্তম মুক্তিযোদ্ধাকে নিজেদের শিবিরে আনতে পেরে জামায়াত কী পরিমাণ উল্লসিত হয়েছে তাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিদিন তার বিবরণ আমরা প্রত্যেক্ষ করছি। তার এই অপমান ও অধঃপতন আমাদের বেদনাহত করেছে। অজ্ঞনতা অপরাধ নয়। তিনি যদি অজ্ঞানতাবশত এসব লিখে থাকেন আমরা আশা করব দ্বিতীয় সংস্করণের মতো তৃতীয় বা চতুর্থ সংস্করণে তা সংশোধন করবেন। যদি না করেন তাহলে এটাই প্রতীয়মান হবে বঙ্গবন্ধুর ঘাতকদের মতো বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন। পার্থক্য এটুকুই-ডালিম, রশীদ, নূররা তাদের কাজ সম্পন্ন করেছেন সাড়ে তিন বছরে, এ কে খন্দকার করছেন সাড়ে তেতাল্লিশ বছর পর।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪

ইতিহাস নিয়ে মিথ্যাচার

নাসির উদ্দিন সিকদার

এ. কে খন্দাকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে মিথ্যাচার সংবলিত বইটি যখন প্রকাশিত হয়েছে, তখন আমি কানাডায় ছিলাম। আমি খুবই উদগ্রীব ছিলাম। ঐ বইটিতে এ, কে খন্দকার কি কি মিথ্যাচার করেছেন তা জানার জন্য। আমি কানাডাতেও বাংলাদেশের কয়েকটি টিভি চ্যানেল দেখতাম। টিভি চ্যানেলের টকশোর মাধ্যমে আমি কিছু কিছু মিথ্যাচারের বিষয়ে জানতে পারলাম। ইচ্ছা ছিল বাংলাদেশে এসে ঐ বইটি কিনে পড়ে বিস্তারিত জানব।কিন্তু দেশে এসে তীব্র ঘৃণায় আমি ঐ বইটি সংগ্রহ করিনি। এ. কে খন্দকারকে আমি খুবই শ্রদ্ধা করতাম, এখন আমি তাকে আর সেভাবে শ্রদ্ধা করতে পারছি না।

স্বাধীনতার ৪৩ বৎসরের মাথায় এসে উনি মিথ্যাচার করেছেন বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সনের ঐতিহাসিক ৭ মার্চ "জয় বাংলা" বলে পরে "জয় পাকিস্তান" বলেছেন। এতবড় মিথ্যাচার পৃথিবীতে কেউ কোনদিন করেছেন কি না আমার জানা নেই। শত শতবার আমি ৭ মার্চের ভাষণ শুনেছি, বঙ্গবন্ধু "জয় বাংলা" বলে ভাষণ শেষ করেছেন। বঙ্গবন্ধু ভাষণে বলেছেন "তোমাদের যা কিছু আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করবে"। তিনি যেখানে পাকিস্তানকে শত্রু আখ্যায়িত করেছেন, সেখানে জয় পাকিস্তান বলার কোনো প্রশ্নই ছিল না, তা একটি শিশুও বুঝবে। এ,কে খন্দকার লিখেছেন, মুক্তিবাহিনী কোথাও কোথাও নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এটা একটি ডাহা মিথ্যাচার। মুক্তিযোদ্ধারা যদি নিজেরা নিজেরা কলহ করত, তবে মুক্তিযুদ্ধ সফল হত না, বাংলাদেশ স্বাধীন হত না। আর একথাও সত্য যে, বঙ্গবন্ধু যদি জয় বাংলা বলে বলার পর জয় পাকিস্তান বলেন, তাহলেও মুক্তিযুদ্ধ হয়ত হত না। বাংলাদেশ হয়ত স্বাধীন হত না। বাংলাদেশে চরম বিদ্রোহ দেখা দিত, স্বাধীনতা ব্যাহত হত। তিনি লিখেছেন, রাজনৈতিক নেতারা সঠিকভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন নাই। মুজিবনগর সরকার যদি সফলভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা না করতেন, তবে ৯ মাসে সফলভাবে মুক্তিযুদ্ধ করে মুক্তিবাহিনী দেশটাকে স্বাধীন করতে পারত না। আমার প্রশ্ন, এ,কে খন্দকার ৪৩ বছর পর মুক্তিযুদ্ধ নিযে মিথ্যাচার করছেন কেন?

তাঁর এই মিথ্যাচারে মুক্তিযোদ্ধারা মর্মাহত হয়েছেন, স্বাধীনতার পক্ষের জনতা মর্মাহত হয়েছেন। আর খুশী হয়েছেন স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকাররা; তারা

এই মিথ্যাচারকে স্বাগত জানিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি নিয়মিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দু'টি অধিবেশন শুনতাম, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের খবর শুনতাম, বজ্রকণ্ঠ শুনতাম, এম আর আখতারের চরমপত্র শুনতাম, আমি নিয়মিত বিবিসি শুনতাম এবং নিয়মিত ভয়েস আব আমেরিকা শুনতাম। সবাই মুক্তিবাহিনীর ঐক্যবদ্ধ গৌরবময় বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের খবর প্রচার করেছেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বা বিশ্বের কোনো প্রচার মাধ্যমে মুক্তিবাহিনীর অনৈক্যের খবর প্রচার করে নাই। বাংলাদেশে ৭১ সনের ঐক্যবদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ ছিল গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। এ ইতিহাস বিশ্ব স্বীকৃত। বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বাস করে যে, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুজিবনগর সরকারের সফল পরিচালনায় মুক্তিবাহিনী প্রাণ বাজি রেখে বীরত্বপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে পাকিস্তান বাহিনীকে পরাজিত করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে। তাদের মুখে ছিল জয় বাংলা ও জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগান।

এ, কে খন্দকার তার বইতে লিখেছেন যে, ২৫ মার্চ রাত্রে যখন পাকিস্তান বাহিনী বাঙালিদের উপর আক্রমণ চালায় ঐসময় আমাদের পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না। তিনি এই অবান্তর কথাটা কিভাবে লিখলেন? পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে হয়েছে বাংলাদেশের জনগণের। দেশের জনগণের হাতে তো ট্যাংক, সাজোয়া বাহিনীর মত কামান গোলা বারুদ থাকার কথা নয়। পৃথিবীতে যে সমস্তদেশে জনগণের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ চলেছে সবদেশেই একটি সুসজ্জিত সশস্ত্র বাহিনীকে মোকাবিলা করতে হয়েছে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে একটু একটু করে শত্রু বাহিনীকে পদে পদে ঘায়েল করার মাধ্যমে। বাংলাদেশেরও সেই একই পদ্ধতিতে গেরিলা যুদ্ধ করে পাকিস্তানি বাহিনীকে ধীরে ধীরে ঘায়েল করতে হয়েছে। তবে মানসিকভাবে একটি জনযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধু দেশবাসীকে দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন। সময়ের ব্যবধানে বাঙালি মুক্তিবাহিনী ভারী অস্ত্র হাতে পেয়েছিল। এখানে একটি কথা আমি উল্লেখ করতে চাই যে, এ,কে খন্দকার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। তিনি কোনো সেক্টর কমান্ডার ছিলেন না। তিনি মে মাসের শেষের দিকে মুজিবনগর যান এবং ঐখানেই অর্থাৎ ভারতেই মুক্তিযুদ্ধের মে মাস হতে শেষ পর্যন্ত বসে বসে সময় কাটান। তাকে মুজিবনগর সরকার একটা সম্মানী পদ দিয়েছিলেন। সে পদটি হল মুক্তিবাহিনীর উপ-প্রধান। মুক্তিবাহিনীর প্রধন এম এ জি ওসমানি খুবই সচল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দৈনন্দিন প্রত্যেকটি সেক্টরের যুদ্ধের খবর নিতেন, মুক্তিযোদ্ধারা কেমন আছেন সে খবর নিতেন। কিন্তু এ,কে খন্দকার ছিলেন একেবারে নির্বিকার। যুদ্ধের মাঠে তার কখনোই উপস্থিতি ছিল না। তিনি যখন দেখলেন ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানিদের ঢাকায় কোণঠাসা করে ফেলেছে, ঐ সময় এ, কে খন্দকার ঢাকায় এসে উপস্থিত। অর্থাৎ শেষ খেলাটায় তিনি খুব কৌশলে অংশগ্রহণ করলেন। যার জন্যে পাকিস্তানি বাহিনী ভারতীয় বাহিনী প্রধান জগজিৎ সিং আরোর এবং মুক্তিবাহিনীর উপ-প্রধান এ, কে খন্দকারের হাতে আত্মসমর্পণ

করেছে। যে দেশে জনগণ যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করে সে দেশে জনগণ যে ট্যাংক কমান নিয়ে শুরুতে শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে না এ সামান্য জ্ঞানটুকুও খন্দকার সাহেবের নেই।

৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু দেশের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত দিক-নির্দেশনা দিয়েছেলেন। তাই একটি মুক্তিযুদ্ধ করতে জনগণকে যে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে হবে, সে মানসিক প্রস্তুতি বাংলাদেশের জনগণের ছিল। ছিল বলেই মাত্র ৯ মাসে জনগণ শত্রুকে পরাজিত করে বাংলাদেশ স্বাধীন করতে সক্ষম হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১০ ডিসেম্বর ২০১৪

ইতিহাস লেখক ও প্রকাশকের দায় প্রসঙ্গ : এ কে খন্দকার ও প্রথমা প্রকাশনী

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

সাধারণত লেখক পাণ্ডুলিপি রচনা করেন, কোনো বিশেষ প্রকাশনী সংস্থা তা প্রকাশ করে থাকে। তবে লেখক যা খুশি তা লিখলেই প্রকাশক তা ছাপাতে রাজি হবেন- এমনটি ভাবার কারণ নেই। লেখালেখি এবং প্রকাশনার জগৎটাই আলাদা। এটি আলু-পটোল তরকারির মতো ব্যবসার জায়গা নয়। এখানে লেখক ও প্রকাশকের সামাজিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় মূল্যবোধসহ নানা মাত্রিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। কোনোকালেই লেখালেখি এবং প্রকাশনাকে এসব দায় এড়িয়ে চলার কোনো সুযোগ ছিল না, এখনো নেই। রাষ্ট্র তাই প্রকাশনার বিষয়টিকে সবসময়ই বিশেষ নজরদারিতে রাখে। কেউ ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে কিছু লিখে তা প্রকাশ করলে রাষ্ট্র লেখক এবং প্রকাশককে সমানভাবে দায়ী করে আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। পত্র-পত্রিকার বেলায়ও এ নিয়ম সব দেশেই কমবেশি প্রযোজ্য। শুধু ধর্মীয় বিষয়েই নয়, জাতীয়, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে লেখালেখি এবং গবেষণাও তথ্যবিকৃতি বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত লেখা বইপুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলার বিষয়টি অনস্বীকার্য। ইতিহাসের প্রতিষ্ঠিত সত্যকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা, বানোয়াট তথ্য দিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনাকে বিকৃত করা ইত্যাদি বিষয় কোনো সভ্য দেশে ঐতিহাসিক ও প্রকাশক মহলে খুব একটা সমর্থিত হয় না। জাতীয় ইতিহাসের কোনো অধ্যায়কে নিয়ে লেখা যে কোনো সাধারণ বই প্রকাশক কর্তৃপক্ষ সম্পাদনার রীতিনীতি ভঙ্গ করে প্রকাশ করেন এমনটি শোনা যায় না। নতুন কোনো তথ্য-উপাত্ত পাওয়া গেলে তা যাচাই-বাছাই না করে কোনো লেখক, গবেষক বা ইতিহাসবেত্তাই সরাসরি ছেড়ে দেবেন কোনো প্রকাশনা সংস্থা তা বিশেষজ্ঞের মতামত ছাড়া ছাপিয়ে দেবেন, তা খুব একটা চোখে পড়ে না। প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত নিয়ে কেউ বিতর্ক করে না, করে ঘটনার নানা মাত্রিকতাকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে। নতুন নতুন তথ্য-উপাত্ত পাওয়া গেলে তা বিশেষজ্ঞ দিয়ে যাচাই-বাছাই করে এর প্রয়োগ ও ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। নিকট অতীতের ঐতিহাসিক ঘটনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত সত্যের সরকারি, বেসরকারি

লিখিত দলিল, অডিও, ভিডিও ও সাক্ষ্য-প্রমাণের এতটাই ব্যবস্থা থাকে যে, এখানে ইতিহাস রচনায় মৌলিক সত্যকে বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই, বানোয়াট তথ্যযুক্ত করে কিছু লেখার উপায় নেই। প্রকাশককেও তাই বিষয় বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে খুব একটা বেগ পেতে হয় না। তারপরও প্রকাশনা সংস্থাগুলোর মধ্যে যেটি অনেকটা লঙ্ঘনীয় নিয়ম হিসেবে কার্যকর রয়েছে তা হচ্ছে যদি কোনো তথ্যগত ভুল বইয়ে ছাপা হয়ে যায়, তাহলে পরবর্তী সংস্করণেই শুধু নয়, প্রয়োজনে সংশোধিত বিশেষ পৃষ্ঠা ছাপিয়ে তা পুস্তকের সঙ্গে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, মারাত্মক কোনো নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলে লেখক ও প্রকাশক মহল থেকে দুঃখ প্রকাশ করে বিবৃতি প্রদান করা হয়, প্রয়োজনে বাজার থেকে বই তুলে নেওয়ার ঘটনাও ঘটে থাকে। ইতিহাস সচেতন কোনো লেখক বা প্রকাশনা সংস্থা বই বাজেয়াপ্ত করার মতো ঘোষণার অপেক্ষা করে না। এটা হচ্ছে সভ্য দুনিয়ায় লেখালেখি ও প্রকাশনা জগতের সভ্য দায়িত্বশীল লেখক ও প্রকাশক বই রচনা ও প্রকাশনায় নিজেদের দায়কে কতটা উচ্চতায় নিচ্ছেন, তা আমাদের একেবারে অজানা নয়। দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হচ্ছে, আমাদের দেশে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখার বিষয়ে কেউ কেউ ইতিহাস রচনার পদ্ধতি ও পদ্ধতি তত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখেন না। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ নিয়ে লেখা বই ইতিহাস রচনায় সহায়ক হতে পারে যদি বইটির উপস্থাপনায় লেখক বস্তুনিষ্ঠতার যথার্থ পরিচয় দিতে পারেন। না পারলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় এ ধরনের বইয়ের কানাকড়ি মূল্য মুক্তিযুদ্ধের গবেষক ও ইতিহাসবেত্তার কাছে থাকার কোনো কারণ নেই। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, মুক্তযুদ্ধকে কেন্দ্র করে অসংখ্য স্মৃতিচারণমূলক বই লেখা হয়েছে। এগুলোর গুরুত্ব মুক্তিযুদ্ধের বিশাল পরিসর উপস্থাপন করে লেখা ইতিহাস কতটা স্থান পাবে-তা কেবল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গবেষক এবং রচনাকারীরা নির্ধারণ করবেন। এ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয়নি। বাংলাদেশ বোধ হয় সেই ইতিহাস রচানার জন্য এখনো পুরোপুরি প্রশিক্ষিত হতে পারেনি। তবে প্রায় তিন দশক ধরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে কাড়াকাড়ি, দখল-বেদখলের হীন প্রতিযোগিতা চলতে দেখা যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তথা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্ঠা পরিলক্ষিত হচ্ছে! রাজনৈতিক একটি মহলে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিষ্ঠিত সত্যকে উপেক্ষা করে বানোয়াট তথ্য-উপাত্ত দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা এবং ঘোষক তৈরির একটি বড় ধরনের উদ্যোগ রাষ্ট্রীয়ভাবে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস তৃতীয় খণ্ডে তেমন একটি বানোয়াট ঘোষণাপত্র সংযুক্ত করা হয়েছিল ২০০৪ সালে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের এমন বিকৃত ইতিহাস পটনপাঠন ও রচনার মালমসলা বোধ হয় এরই মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। তারপরও মহলবিশেষ হাল ছেড়ে দেয়নি। লন্ডনে বসে বিএনপি নেতা তারেক রহমান প্রায়শই মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক সত্যকে নিজের বাকশক্তিতে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছেন। জিয়াউর রহমানকে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি, বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে নানা

ধরনের মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়ে তিনি যে বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন তা হলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ১৯৭১ সালের বাস্তবতায় নয়। বিএনপির রাজনৈতিক স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় তৈরি করার অবস্থান থেকে বিএনপি একপাও নড়ছে না, নড়বে না। সে কারণেই তিনি লন্ডনে বসে প্রায়ই মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক সত্যকে বাদ দিয়ে তার মতো করে বানোয়াট তথ্য দিয়ে কিছু কিছু বিষয়ে কথা বলার চেষ্টা করছেন, যা দেশে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-সচেতন মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে প্রথমা প্রকাশনা সংস্থা বাজারজাত করল সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং মুক্তিযুদ্ধকালের ডেপুটি চিফ আব স্টাফ এ কে খন্দকারের লেখা '১৯৭১ : ভেতরে-বাইরে' নামক একটি বই। বইটি অংশত স্মৃতিচারণমূলক। তবে ১৯৭১-এর রাজনৈতিক ইতিহাস স্পর্শ করতে গিয়ে লেখক যা লিখেছেন তা দেশবাসীকে বিস্মিত করেছে। তিনি এ বইয়ে যা লিখেছেন তার বিরুদ্ধে অনেকেই পত্রপত্রিকায় কলম ধরেছেন। আমি নিজেও এ নিয়ে চারটি লেখা লিখেছি। ৮ সেপ্টম্বর দৈনিক বর্তমান, ১০ সেপ্টেম্বর সৈনিক মানবকণ্ঠে প্রকাশিত পৃথক পৃথক লেখায় আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম, বইটি প্রকাশ করে প্রথমা প্রকাশনা সংস্থাও দায় এড়াতে পারে কি? সম্প্রতি জনপ্রিয় লেখক জাফর ইকবালের লেখা 'ইতিহাসের ইতিহাস' লেখাটিতে প্রথমা প্রকাশনার বিরুদ্ধে তিনি যে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন সেটি বেশ গুরুত্ব বহন করে। তিনি লিখেছেন, 'বইটি পড়ে আমার ভেতরে এক ধরনের অস্বস্তি খচখচ করছিল। বার বার মনে হচ্ছিল সত্যি কি বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে খন্দকার এই বইটি নিজের হাতে কাগজের উপর কলম ঘষে ঘষে লিখেছেন? আমার কৌতূহলটি মেটানোর জন্য আমি প্রথম আলোর প্রকাশনা সংস্থা 'প্রথমা'কে ফোন করলাম, তাদের কাছে অনুরোধ করলাম তার হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিটি কি আমি এক নজর দেখতে পারি? তারা একটু ইতস্তত করে আমাকে জানালেন, সেভাবে হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি তাদের কাছে নেই। কিছু আছে, তবে তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেই পুরোটা প্রস্তুত করা আছে এবং এই বইয়ের বিষয়বস্তুর সঙ্গে তিনি পুরোপুরি একমত সে রকম সাক্ষ্য-প্রমাণ তাদের কাছে আছে।

আমি লেখালেখি করি, তাই এই উত্তর শুনে আমি কেমন যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলাম। আমার মনে হতে লাগল এ বইটি কেমন করে লেখা হয়েছে কিংবা প্রস্তুত করা হয়েছে সেটা খুব কৌতূহলোদ্দীপক একটা বিষয় হতে পারে। বই লেখা আর বই প্রস্তুত করার মাঝে অনেক বড় পার্থক্য। আমরা কি প্রথমা প্রকাশনীর কাছ থেকে এ বই প্রস্তুত করা সংক্রান্ত একটা পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেতে পারি?

অধ্যাপক জাফর ইকবালের লেখা উপরের বৃত্তান্ত বেশ গুরুতর। বইটি রচনার বিষয়ে মস্তবড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসিয়েছে। প্রথমা প্রকাশনী সংস্থা এ পর্যন্ত অধ্যাপক জাফর ইকবালের তোলা গুরুতর এসব অভিযোগের কোনো জবাব দিয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। প্রথমা প্রকাশী সংস্থা নতুন হলেও গত কয়েক

বছরে তারা বেশ কিছু বই প্রকাশ করেছে। আমরা জানি না, তারা গুরুত্বপূর্ণ বইগুলোর ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মতামত বা রিভ্যু করায় কিনা। বাংলাদেশের কয়েকটি প্রকাশনা সংস্থা কিন্তু তা করে থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রথমার ভূমিকা প্রথমাকেই স্পষ্ট করা উচিত। এ কে খন্দকার যদি তার বইয়ে স্মৃতিচারণমূলক অধ্যায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতেন, তাহলে বিষয়টি মুক্তিযুদ্ধে তার ভূমিকার বর্ণনার মধ্যে হয়তো সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু তার ব্যক্তিগত অংশগ্রহণের চেয়েও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে নিয়েই তিনি বেশি নাড়াচাড়া করেছেন। করতে গিয়ে তিনি ইতিহাস বিকৃতকারীদের মতোই প্রতিষ্ঠিত অনেক সত্যের বিরুদ্ধে বক্তব্য তুলে ধরেছেন। এসব বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত তথ্য-প্রমাণ দ্বারা উপস্থাপিত না হয়ে তার ধারণা ও অনুমানকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর দায় তো প্রকাশনা হিসেবে প্রথমাকেই নিতে হচ্ছে। প্রথমা প্রকাশনী মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে যারা দেশে ইতিহাস বিকৃতির সঙ্গে দীর্ঘদিন থেকে জড়িত, সেটিকে পুঁজি করে যারা রাজনীতি করছে, তরুণ প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করছে তাদের সহায়ক শক্তিতে পরিণত হয়েছে এমনটি দাবি করা হলে খুবই বাড়িয়ে কিছু বলা হবে? আমার মনে হয়, না, মোটেও বাড়িয়ে বলা হবে না। এ পর্যন্ত প্রথম বইটির বিরুদ্ধে যেসব তথ্য বিকৃতির অভিযোগ স্পষ্টভাবে তোলা হয়েছে সেগুলো নিয়ে দেশে আলোড়ন সৃষ্টির পরও নতুন নতুন সংস্করণ ছাপিয়ে তা বাজারজাত করছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাদের দায় কতটা সেটিও বোঝা যাচ্ছে। অধ্যাপক জাফর ইকবালের বর্ণনা যদি সত্য হয়, তাহলে বলতে হবে এটি একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বই, যা লেখানো বা প্রাস্তুত করা হয়েছে। খন্দকার সাহেবের সায় বা সমর্থন তাতে থাকতে পারে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রসার বা প্রচারের স্বার্থে নয়, বিকৃত করার উদ্দেশ্যেই। এই উদ্দেশ্য মুক্তিযুদ্ধের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে নয়, পাণ্ডিত্যের দিকে থেকেও নয়। এটি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ১৯৭১ এবং ১৯৭৫-পরবর্তী সময়ে চলে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে, তথা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাধীনতারই বিরুদ্ধে। এ এক গভীর ষড়যন্ত্র। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী মানুষকে এবং রাষ্ট্রকে এসব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
৪ অক্টোবর ২০১৪

তারেক রহমান সুস্থ হবেন কবে?

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

৫ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে তারেক রহমান ওরফে তারেক জিয়া যখন নির্বাচন বানচাল ও সরকার উৎখাতের ডাক দিয়ে দেশবাসীর জন্য তাঁর বাণী বিবৃতির ভিডিও টেপ দেশে পাঠাচ্ছিলেন তার আগে ঢাকার এবং লন্ডনের বাংলা কাজগুলোতে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে খবর প্রচারিত হয়েছিল যে- তারেক তাঁর দলের যুবনেতা ও কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করার জন্য দেশে ফিরছেন। এমন কথাও প্রচার করা হয়েছিল যে, গত বছর নভেম্বর অথবা ডিসেম্বর মাসেই তিনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব ফখর মির্জাও তখন অত্যন্ত ফখর করেই কথাটা প্রচার করেছিলেন।

আমার মনে তখনই বন্ধ লেগেছিল যে, জিয়াপুত্র তারেক কি এতই সাহসী হবেন যে, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের এতগুলো অভিযোগ ও মামলা মাথায় নিয়ে তিনি দেশে ফিরতে সাহসী হবেন? যদি হন এবং শেখ হাসিনার মতো সকল দুর্নীতির মামলা, ওয়ারেন্ট, হুলিয়া ইত্যাদি অগ্রাহ্য করে সত্যি দেশের মাটিতে পা রাখেন, তাহলে তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্বটি পাকা হয়ে যাবে। দেশের মানুষ তাঁর অপরাধগুলো মনে না রেখে তাঁর সাহসের তারিফ করবে এবং তাঁর দলও মনোবল ফিরে পেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

কিন্তু সে সাহস তারেক রহমান দেখাতে পারেনি। তিনি দেখাতে পারবেন কিনা, সে সন্দেহ আমার মনে ছিল। কারণ, প্রকৃতপক্ষে তারেক কোন রাজনৈতিক চরিত্রের মানুষ নন। তিনি একজন স্বভাব দুর্বৃত্ত। ফৌজি পিতার অবৈধভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সুবাদে এবং মায়ের প্রধানমন্ত্রিত্বের সুযোগে তাঁর রাজনীতিতে প্রবেশ নয়, অনুপ্রবেশ এবং তাঁর রাজনৈতিক দুর্বৃত্তপানা ও সন্ত্রাস সকল সীমা অতিক্রম করেছিল। এ জন্যই রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা লাভের আগেই তাঁর লজ্জাকর পতন এবং সেনা তাবেদার সাবেক এক সরকারের কৃপায় দেশত্যাগের সুযোগ লাভ।

স্বভাব দুর্বৃত্তরা আবার ভীরু প্রকৃতির হয়। এদিক থেকে তারেক রহমান পিতা জেনারেল জিয়াউর রহমানের স্বভাবপ্রাপ্ত। 'লাইক ফাদার লাইক সান।' মুক্তিযুদ্ধের সময় কিছু দিনের জন্য ইস্টর্ন রণাঙ্গনের সিভিল এ্যাডমিনিস্ট্রের এম আর সিদ্দিকীর নির্দেশে আমি সাংবাদিক হিসেবে সাবরুম সেক্টরে জিয়াউর

রহমানের সাথে ছিলাম। তাঁর 'বীরত্ব' তখন আমি দেখিছি। তিনি ছিলেন তথাকথিত জেড ফোর্সের অধিনায়ক। কিন্তু রণাঙ্গনের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। ক্যাম্পে বসে কী করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানী সেনাদের হাতে আটকেপড়া বেগম খালেদাকে উদ্ধার করবেন এবং জেনারেল ওসমানীকে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে সরাবেন-এই চিন্তাতেই মশগুল থাকতেন।

মুক্তিযুদ্ধে তাঁর নিষ্ক্রিয়তা এবং অন্যান্য কার্যকলাপে বিরক্ত হয়ে মুজিবনগর সরকার তাঁর জেড ফোর্স ভেঙ্গে দেন এবং তখনকার মেজর জিয়ার কোর্ট মার্শালের ব্যবস্থা করেছিলেন জেনারেল ওসমানী। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের হস্তক্ষেপে তিনি বেঁচে যান। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তাঁকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়।

মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমান কোনপ্রকার সাহসেরই পরিচয় দেননি। বরং তাঁর ভীরুতা ও চক্রান্তপ্রবণ চরিত্রের প্রকাশ বহুবার ঘটেছে। সে ইতিহাস তাঁর সহকর্মী অনেক মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতি কথাতেই আছে। সেই চর্বিত চর্বনে আজ আর যাব না। শুধু বলব, এই বীর পিতারই 'বীর' পুত্র তারেক রহমান। ভীরুতা ও চক্রান্ত করা যার স্বভাব বৈশিষ্ট্য, তাঁকে যখন বাংলার তারুণ্যের গর্ব ও ভবিষ্যত' আখ্যা দিয়ে লাখ লাখ রঙিন পোস্টারে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরের দেয়াল ঢেকে ফেলতে দেখি, তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবী বাঙালির ললাট থেকে এই লজ্জাকর কলঙ্কচিহ্ন কবে লুপ্ত হবে?

৫ জানুয়ারির নির্বাচনের পর তারেক রহমানের অপরাধী মনের ভীরুতা সম্পর্কে আমার মনের সব সংশয় দূর হয়। লন্ডনের বাংলা কাগজেই খবর দেখলাম তারেক রহমান এখন আর দেশে ফিরবেন না। অজুহাত দেখানো হয়েছে, তাঁর ভাঙ্গা হাড়ের চিকিৎসা এখনও চলছে। এক এগারোর সময় গ্রেফতারের পর তাঁকে যে সামান্য 'ধোলাই' দেয়া হয়েছিল, বিদেশে তাঁর চিকিৎসা দীর্ঘ ছ'সাত বছরেও শেষ হয় না-এ এক আজব ব্যাপার। স্পষ্টই বোঝা যায়, হাসিনা সরকার ক্ষমতায় থাকা পর্যন্ত তাঁর অসুস্থতা সারবে না। তাঁর দেশে ফেরার সাহসও হবে না। 'যঃ পলায়েতে স জীবতি' তাহলে লন্ডনে বসে তিনি কী করবেন? কাগজেই খবর বেরিয়েছে, এখানে বসেই তিনি দেশের সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্তের জাল ছড়াবেন। এই উদ্দেশ্যে দুবাই ও সিঙ্গাপুরেও তিনি দুটি দফতর খুলেছেন।

আমার পাঠকরা শুনলে আশ্চার্য হবেন, আমি বহু আগে দেশে থাকাকালে একবার মাত্র তারেক রহমানকে দেখিছি। তখন তাঁর কিশোর বয়স। মুক্তিযুদ্ধের ন'মাসের ওপর একটি প্রতিবেদন লেখার কাজে একটা তথ্যের জন্য ক্যান্টনমেন্টে জিয়াউর রহমানের সঙ্গে পূর্ব পরিচয়ের ভিত্তিতে আগে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে পরনের প্যান্টের কোমরের শক্ত বেল্ট খুলে পুত্র তারেককে বেদম পেটাচ্ছেন। আশপাশে কেউ নেই। তারেক কঁকিয়ে কঁকিয়ে কাঁদছেন। আমি জিয়াউর রহমানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, আপনি করছেন কী, ছেলেকে তো মেরে ফেলবেন? আমাকে দেখে জিয়াউর রহমান পেটানো থামালেন। বললেন, 'আমি ওকে মেরে ফেলতে চাই। কী সব দুষ্কার্যের জন্য ওকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, তার চিঠি দেখবেন?'

এখন স্মৃতিমন্থন করে মনে হচ্ছে, তখন তারেক রহমান সম্ভবত ক্যান্টনমেন্টের শাহীন স্কুলে পড়তেন। পড়াশোনায় লবডঙ্ক এবং শিক্ষকদের অবাধ্যতা এবং নানাবিধ দুষ্কার্যের জন্য কয়েকবার ওয়ার্নিং দেয়ার পর স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে বহিষ্কার করেন। জিয়াউর রহমান আমাকে চিঠিটা দেখিয়ে বললেন, 'এই ছেলে নিজে আরেক বখাটে মামা এসকেন্দারের পাল্লায় এই সাইদ এসকান্দার খালেদা জিয়ার ভাই, তারেক রহমানের মামা। এখন প্রয়াত। ব্যবসার নামে নানা রকম দুষ্কর্ম ও দুর্নীতিতে তারেকের হাতেখড়ি এই মামার কাছে। সামরিক বাহিনীতেও এদের দুর্বৃত্তপনার অন্ত ছিল না। জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর এই 'প্রিয় শ্যালককে' সেনাবাহিনীর থেকে বহিষ্কার করে ছিলেন। জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর বেগম খালেদা জিয়া নিজে ক্ষমতায় বসার পর এই সাইদ এসকেন্দারকে সেনাবাহিনীতে ফিরিয়ে আনতে না পারলেও সেনাবাহিনীর খবরদারিত্বে ফিরিয়ে আনেন। শুরু হয়েছে সেনাবাহিনীতে ব্যবসা-বাণিজ্যে, মামা ভাগ্নের দৌরাত্ম্য। দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের হেড কোয়ার্টার হাওয়া ভবন গড়ে ওঠে বেগম জিয়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বসলেও দেশের সমান্তরাল প্রশাসন গড়ে উঠেছিল হাওয়া ভবনকে ঘিরে। যার পরিণতিতে এক এগারোর সময় তারেকতন্ত্রের পতন, জেলে কিছু ধোলাই লাভ এবং পরিশেষে দেশবাসীর কাছে মাফ চেয়ে এবং রাজনীতি ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করে বিদেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য চলে যাওয়া।

কিন্তু তারেক রহমান এখনও সত্যই অসুস্থ কি? তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল থেকেই জেনেছি তিনি এখন মোটেই অসুস্থ নন। তিনি সুস্থ। বিদেশে বসেও রাজনীতির নামে নানা চক্রান্তে জড়িত; তিনি মায়ের প্রধান উপদেষ্টা। তাঁর নির্দেশেই তাঁর মা এবং দল চলে। জামায়াত এবং পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা চক্র আইএসআইয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিবিড়। কাগজেই খবর বেরিয়েছে ভারতের দুর্ধর্ষ মাফিয়া সরদার দাউদ ইব্রাহীমের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল অথবা আছে। তিনি টাকার পাহাড়ের ওপর বসে আছেন বলে নানা সূত্রের খবর। লন্ডনেও একটি নিজস্ব মাফিয়া চক্র তিনি গড়ে তুলেছেন। দেশবিরোধী চক্রান্তে বিশেষ করে হাসিনা সরকারের উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রে সকল তালমন্ত্র তাঁর। তিনি বিদেশে বসে মাকে হুকুম দেন এবং মা সেই হুকুম তামিল করেন।

৫ জানুয়ারির নির্বাচনে যোগ দিতে বেগম জিয়া একেবারে অনিচ্ছুক ছিলেন না। দলের নেতাকর্মীদের সংখ্যাগুরু অংশও ছিল নির্বাচনে যোগ দেয়ার পক্ষে। জামায়াত ও আইএসআইয়ের সঙ্গে জোট পাকিয়ে এবং একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ভন্ডুল করার লক্ষ্যে জামায়াতী সন্ত্রাসের সাহায্যে সরকার উচ্ছেদের পরিকল্পনায় অটল থাকতে তারেক তাঁর মাকে বাধ্য করেন।

নির্বাচন বানচাল করা এবং সরকার উচ্ছেদের চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ার পর তারেক নিষ্ক্রিয় হয়েছেন এ কথা ভাবলে ভুল করা হবে। কচ্ছপের মতো বিপদ দেখে আপাতত খোলসের মধ্যে মাথা গুটিয়ে নিলেও তিনি তা আবার বের করার অপেক্ষায় আছেন। দুবাই ও সিঙ্গপুরে তাঁর আরও দুটি অফিস স্থাপনের খবর ইতোমধ্যেই সংবাদপত্রে বেরিয়েছে। লন্ডনে সপরিবারে শপিংয়ে বেরুলে পরিচিত

বাংলাদেশীদের দেখলে তিনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, কখনও লাঠি ভর দিয়ে হাঁটেন। তাঁর ঘনিষ্ঠজনের অনেকের মতেই এটা তাঁর অভিনয়।

বর্তমান হাসিনা সরকার দেশকে সন্ত্রাস ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি থেকে উদ্ধার করতে চান। তা করতে হলে এই সন্ত্রাস ও ষড়যন্ত্রের উৎসমুখ বন্ধ করার জন্য সর্বাগ্রে সরকারকে চেষ্টিত হতে হবে। তারেক রহমান বিদেশে বসেও দেশে ঘুড়ি ওড়ানোর কতটা ক্ষমতা রাখেন তার প্রমাণ মানিলন্ডারিংয়ের দুর্নীতির মামলায় তাঁর সহকারীর দণ্ড; কিন্তু তাঁর খালাস পাওয়া। অভিযোগ উঠেছে বিপুল অর্থ দ্বারা নাকি এই বিচারকে প্রভাবিত করা হয়েছে। নইলে অপকর্মের সহকারী দণ্ড পান আর মূল আসামি খালাস পেতে পারেন? সংবাদপত্রের খবর, সংশ্লিষ্ট বিচারক নাকি বিদেশে পালিয়ে গেছেন। বাংলাদেশ সরকারের উচিত তারেক রহমানের এই অঢেল টাকার উৎস কোথায় এবং এই উৎস বন্ধ করার উপায় খুঁজে বের করা।

বর্তমান সরকারের উচিত দেশের বৃহত্তর স্বার্থে দুটি বিচারকার্য ত্বরান্বিত করা। একটি' ৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং অন্যটি তারেক ও কোকোর বিরুদ্ধে গুরুতর দুর্নীতি, সন্ত্রাস এবং অন্যান্য অপরাধের বিভিন্ন মামলা। তারেক রহমানকে দীর্ঘকাল বিচার এড়িয়ে বিদেশে পালিযে থাকার সুযোগ দেয়া ঠিক হবে না। বিদেশে বসে ষড়যন্ত্রের জাল তিনি বুনতেই থাকবেন। তাঁর প্রভাবশালী বিদেশী পৃষ্ঠপোষক আছে। তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না গেলে তাঁর নিজের সুস্থতা যেমন ফিরে আসবে না; তেমনি দেশের রাজনীতির সুস্থতা ফিরিয়ে আনা যাবে না।

এই প্রসঙ্গে হাসিনা সরকারের জন্য একটি উদাহরণ তুলে ধরছি। আর্জেন্টিনার বেনোভলেন্ট ডিক্টেটর পেরনের প্রথম স্ত্রী ইভাপেরন ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী ইসাবেলা পেরন ছিলেন ক্ষমতালোভী, অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ। তিনি ক্ষমতায় বসে আর্জেন্টিনায় সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও ভীতির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর গণঅসন্তোষের মুখে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন ও দেশ ছেড়ে পালান। কিন্তু বিদেশে বসে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা থেকে নিবৃত্ত হননি। তারও বিদেশ বাসের অজুহাত ছিল অসুস্থতা। অতঃপর আর্জেন্টিনার একটি গণতান্ত্রিক সরকার ইসাবেলা পেরনের বিভিন্ন অপরাধের বিচার শুরু করেন এবং দীর্ঘকালের জন্য তাঁর কারাদণ্ড হয়। ইসারেলা এই দণ্ড এড়িয়ে অসুস্থতার অজুহাতে বিদেশে বসে দেশবিরোধী চক্রান্ত চালাতে থাকেন। আর্জেন্টিনার সরকার চৌদ্দ বছর চেষ্টার পর ইসাবেলাকে স্বদেশে ধরে আনতে সক্ষম হন। তাঁকে শেষ পর্যন্ত কারাগারে যেতে হয়। তাঁর ষড়যন্ত্র থেকে আর্জেন্টেনা মুক্ত হয়।

ইসাবেলা পেরন ছিলেন আর্জেন্টিনার ভাগ্যাকাশের এক দুষ্টগ্রহ। বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশেও একই দুষ্টগ্রহ তারেক রহমান। তাকেও দেশে ফিরিয়ে এনে তাঁর গুরুতর সব অপরাধের জন্য বিচারের রায় মানতে বাধ্য করা ছাড়া বাংলাদেশের রাজনীতি অস্থিরতা ও পঙ্কিলতা মুক্ত হবে না।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২৯ জানুয়ারি ২০১৪

বঙ্গবন্ধু শক্তির উৎস

প্রফেসর ড. মুহম্মদ মাহবুব আলী

বঙ্গবন্ধু বাঙালির স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন সুদীর্ঘকাল ধরে। এ জন্য তাঁকে বার বার পাকিস্তানি ও তার দোসরদের দ্বারা অত্যাচারিত হতে হয়েছে। অথচ কোন ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিততেও বঙ্গবন্ধু পিছপা হননি। তিনি আপোস করেননি বাঙালির ওপর পাকিস্তানিদের অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতনের বিরুদ্ধে। তথাকথিত দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে যখন ব্রিটিশরা পাকিস্তান সৃষ্টি করে গেল, তখন তারা ইচ্ছে করেই বাংলাদেশকে পাকিস্তানের অর্ন্তভুক্ত করে গেছে। এ এক গর্হিত অপরাধ। বাঙালির আত্মোন্নয়ন রুদ্ধ হয়ে গেল। নেমে এলো পাক শহীদের খড়গহস্ত। সেই রক্তচক্ষু বঙ্গবন্ধু বার বার উপেক্ষা করেছেন। আর তাই তো ১৯৪৮ থেকে এ বাংলায় বঙ্গবন্ধু তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বগুণে নিজেকে বিকশিত করেছেন। সুভাষচন্দ্র বসু যেখানে একটি স্বাধীন বাংলাদেশ উপহার দিতে পারেননি সেখানে বঙ্গবন্ধু এ জাতিকে স্বাধীন রাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন।

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানীর মতো নেতাদের টপকে গেছেন নিজের বিচক্ষণতা, ধীশক্তির গুনে- এখানেই বঙ্গবন্ধুর মানসিক ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক। বঙ্গবন্ধু সব সময় জনগণের কল্যাণ প্রত্যাশা করতেন। ভাষা আন্দোলনের সময়ে কারাগারে থেকে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন নির্দেশ পাঠাতেন। আবার যখন ছয় দফা আন্দোলনের সূচনা করেন তখন বঙ্গবন্ধুর মূলমন্ত্র ছিল বাঙালির উন্নয়ন সাধন করা। কোন ধরনের হটকারিতা নয় বরং পাকিস্তানিদের কাছ থেকে বাঙালির ন্যায্য অধিকার আদায় করার উদগ্র ইচ্ছে তাঁকে সব সময় তাড়িত করে বেড়াত। সে সময়ের হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাকিস্তানিরা ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৮-৬৯ পর্যন্ত ৩১১২ কোটি টাকা পাচার করেছে। এ জন্যই জাস্ট ফালর্ল্যান্ড এবং পাকিস্তানের ভাষায় ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত সময়কালকে বলা হয়েছে দ্বিতীয় ঔপনিবেশিক আমল।

ভাষাসৈনিকেরা বাংলা ভাষাকে বিশ্বের বুকে অমরত্ব দান করেছেন। জননেত্রী শেখ হাসিনার মাঝে এ দেশের জনগণ বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, ন্যায়নিষ্ঠা এবং সাধারণ জনমানুষের প্রতি মমত্ববোধ খুঁজে ফেরে। এখানেই যোগ্য স্টেটম্যান বঙ্গবন্ধুর কন্যাও পরিণত হোন স্টেটম্যান হিসেবে।

পাকিস্তানি বাহিনী সব সময়ে বঙ্গবন্ধুর অবিচল চিন্তা-চেতনা ও বাঙালি প্রীতিকে ভয় করতেন। তাই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দিয়ে তাঁকে কাবু করতে চেয়েছিল। অবিচল বঙ্গবন্ধু সেদিন দৃঢ়চেতার সঙ্গে সকল পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছেন। জাতীয় অধ্যাপক মরহুম ডাঃ নূরুল ইসলাম মন্তব্য করেছেন যে, বঙ্গবন্ধুর এই অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের পেছনে শক্তির আধার হিসেবে ছিলেন শেখ ফজিলাতুন্নেসা। এ জন্যই ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে যে, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির জীবনে একজন মহিলা থাকেন-আর বঙ্গবন্ধুর জীবনে ছিলেন আমাদের শেখ ফজিলাতুন্নেছা। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে যে নৈতিকহীনতার সূচনা তা ক্রমেই পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে। আদর্শহীনতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়েছে।

১৯৬৬ সালের ৫ জানুয়ারি ঐতিহাসিক ৬ দফা পেশ করেন। ১৯৬৮ তো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দেয়। ছাত্রদের এগারো দফা দাবির মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু একটি আলোচনায় মন্তব্য করেন যে পূর্ব পাকিস্তানের বদলে বাংলাদেশ উল্লেখ করা হবে। ১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি হন। ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয়ভাবে ১৬৯টির মধ্যে ১৬৭টি এবং প্রাদেশিকভাবে ৩১০টির মধ্যে ৩০৫টি সিটে বিজয়ী হন।

বাঙালির জীবনে মুক্তির সনদ হিসেবে বিবেচিত হয় ৭ মার্চের ভাষণ। এই ভাষণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকনির্দেশ। স্বাধীনতার এই ভাষণটি বাঙালি জাতির জন্য ম্যাগনাকার্টাস্বরূপ। পাক শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুর প্রতি বাঙালির ভালবাসা এবং আস্থাকে মেনে নিতে পারেনি। তারা ভীত ছিল, বাংলাদেশে পৃথক রাষ্ট্র হয়ে গেলে ওদেশ থেকে অর্থ পাচার ও পুঁজি পাচার করা সম্ভব হবে না। বাঙালিদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখা যাবে না। এ জন্যই ২৫ মার্চের কালরাতে বঙ্গবন্ধুকে তারা গ্রেফতারের পাশাপাশি সাত কোটি বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যান।

পুরো মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তান কারাগারে কাটাতে হয়েছে। ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র থেকে রেহাই পায়নি। পাশাপাশি এ দেশে তাদের দোসররা বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং পাকিস্তানীদের ওপর স্বজাতি হয়ে সমভাবে হত্যাযজ্ঞ, জখম, ধর্ষণ, ধ্বংসযজ্ঞে লিপ্ত হয়। বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী চিন্তা-চেতনার আলোকে এ দেশের মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে ফিরে আসেন। তিনি রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে দায়িত্ব নেন। তিনি সংবিধান প্রস্তুতের উদ্যোগ নেন এবং সংসদে এটি পাশ হয়। ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ আবার বিজয়ী হয়। চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ তিনি পুনরায় রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। বঙ্গবন্ধু তাঁর সমগ্র জীবনে বাঙালির উন্নয়নে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু বাঙালির গর্ব। বাঙালিদের জন্য আমৃত্যু উন্নয়ন প্রয়াসে তিনি ব্রতী ছিলেন। তিনি ৭ মার্চ ভাষণে যেভাবে বাঙালিকে মাথা উঁচু করে বাঁচার দীক্ষা দিয়েছিলেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই।এ জন্যই বলদৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চরণ করেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।' আসলে তিনি এক ট্র্যাজিক হিরো। সমস্ত বাঙালি তাঁর জন্য হৃদয়ে আসন পেতে রেখেছিল। মীরজাফর ও ঘসেটি বেগমদের মতো প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে বঙ্গবন্ধুকে কেবল একা নয় পরিবার পরিজন, আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে জীবন দিতে হলো। বঙ্গবন্ধু সারা জীবন অসাম্প্রাদায়িকতার রাজনীতি করেছেন। তাই বলে তিনি কখনও ধর্মহীনতাকে বরদাস্ত করতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন যার যার ধর্ম তার তার কাছে। বঙ্গবন্ধু ঔদার্য কেবল তাঁর দলের প্রতি নয় বরং ভিন্ন দলের অনুসারীদেরও আকৃষ্ট করত। তিনি সত্যের প্রতি যেমন অবিচল ছিলেন তেমনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।

বঙ্গবন্ধু এমন এক মহৎপ্রাণ ব্যক্তি যিনি সকল বিতর্কের উর্ধ্বে। কালের নিয়ম হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে অনেক সত্য উদ্ঘাটিত হয় না। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আজ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সমস্ত ঘাতক বিদেশী মদদপুষ্ট হয়ে তাঁকে ও তাঁর নিকটজনদের হত্যা করেছে তাদের দুরভিসন্ধি। অমরত্বের প্রতীক বঙ্গবন্ধু আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর ক্ষুরধারা আদর্শ আজও আমাদের উজ্জীবিত করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১ সেপ্টেম্বর ২০১৪

রাজনীতির দার্শনিক

অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত

গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪-এর জনকণ্ঠে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও এগিয়ে যেতে হবে' এ মর্মে একটি নিবন্ধে আমি লিখেছিলাম-'রাজনীতির দার্শনিক' জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কীভাবে জাতীয় অধ্যাপক প্রয়াত নূরুল ইসলাম স্যারকে ৯ মার্চ ১৯৭৩ বলেছিলেন 'প্রফেসর সাহেব, আপনি পিজিটাকে শাহবাগ হোটেল থেকে সরিয়ে মহাখালী, সোহরাওয়ার্দী কমপ্লেক্স বা সাভারে কয়েকশ বিঘা জায়গা নিয়ে গড়ে তোলেন, আপনি দেখেননি? জিন্নাহ পোস্টগ্রাজুয়েট ইনস্টিটিউট কত বিশাল জায়গায় গড়ে তোলা হয়েছে? আমি যখন জেলে যেতাম, কোনো অসুবিধা হলে আমাকেও জিন্নাহ পোস্টগ্রাজুয়েটে নেওয়া হতো। আজকে আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি, সম্প্রসারণ করতে গিয়ে। তবুও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যিনি ২০০০ সালে শেরাটনের সামনের ০৮ বিঘা জায়গা দিয়েছিলেন, ২০১০ সালে আবারও কেবিন ব্লক সংলগ্ন ১২ বিঘা জয়গা দিয়েছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়কে, এখন এটা সুন্দর ক্যাম্পাসে রূপান্তরিত হবে।

রাজনীতির দার্শনিক, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ইতিহাসের মহানায়ক, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফার একটি দফাও যদি যুবসমাজ বা ছাত্রসমাজ এক নিঃশ্বাসে বলতে পারেন, তাহলে ভবিষ্যতে আমি আর শখের বসেও লেখাপড়া করব না। বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘদিনের রাজনীতিতে এবং আন্দোলনে পাকিস্তান সরকার কোনো নির্বাচনে, সেই ১৯৫৪ থেকে শুরু করে '৭০ পর্যন্ত সামরিক শাসনের মধ্যেও জাতির জনক এবং তার দলকে হারাতে পারেনি। ২০০১ সালের নির্বাচনের পরে বিএনপি নামক রাজনৈতিক ক্লাবের সদস্যরা এ দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠনের কর্মীদের ওপর যে নির্যাতন চালিয়েছিল তা কোনো আবস্থাতেই ভোলা যায় না এবং সেটা ছিল ইতিহাসের একটা কালো অধ্যায়। সেই নির্যাতন এবং ১৯৭১ সালের নির্যাতনের আনেক জায়গায়ই মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এটাই হলে অপরিপক্ক রাজনীতির উদাহরণ। কেন বললাম, আমাদের যুবসমাজ বা ছাত্রসমাজ ছয় দফা দাবি বলতে পারবে না, তার কারণ ইতিহাসকে জানার আগ্রহ তাদের একবারেই নেই। যেই ইতিহাসই হলো কালের সাক্ষী। অবশ্য এ দেশে '৭৫-পরবর্তী সময়ে যেভাবে ইতিহাস বিকৃত হয়েছে, সংবিধান পরিবর্তিত হয়েছে, তাতে ছাত্র-যুবসমাজের আগ্রহ কমে যাওয়ার কথা।

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান যার নেতৃত্বে হয়েছিল যার ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির হৃৎকম্পন শুরু হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু যদি অখণ্ড পাকিস্তান চাইতেন তাহলে তার বিরুদ্ধে কেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হলো? অনেকেই বিএনপিকে অপরিপক্ক বলেন, আমি একজন চিকিৎসক হিসেবে বলব এ দলটি Premature baby, যাদের সব কিছুই দেরিতে develop করে, অনেক ক্ষেত্রে বেশ কিছু system-এ disability থেকে যায়। এই disability- গুলো বিভিন্ন থেরাপি দিয়েও সঠিক পথে আনা যায় না। যেমন ধরুন, স্পিচ থেরাপির কথা। স্পিচ থেরাপি দিয়ে যাদের কথা শিখানো হয় তাদের অনেকেই Lip reading করেন। আমার মনে হচ্ছে তিনি আইএসআই নামক সংস্থাটির Lip reading নিয়ে কথা বলছেন, তাই শেখানো বুলির মতোই বলছেন।

শুনে ভালোই লাগল, এ কারণে যে বিএনপি বিজয় দিবস পালন করেছে। জামায়ত যে এতে বাঁধা দেয়নি, এটাই তাদের ভাগ্য। কারণ জামায়াত এখনো বাংলাদেশকে বিশ্বাস করে, আমি তা বিশ্বাস করি না। ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের 'আমি যদি হুকুম দেবার না-ও পারি তাহলে তোমরা প্রতিরোধ গড়ে তুল এবং যার যা আছে কিছু তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করো।'

এখান থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান তিনি তার শেষ নির্দেশনা ও সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দিয়ে গেলেন। আর 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম' তা স্বাধীনতা ঘোষণারই শামিল। ৭ মার্চের ভাষণ এবং রাজনৈতিক দর্শন, যা বিশ্লেষণে স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুই বোঝা না। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সম্পন্ন দার্শনিকদের বক্তব্য বোঝার জন্য শুধু দক্ষ, শিক্ষিত ও ত্যাগী রাজনৈতিক কর্মীর দরকার।

'৬৯-এ ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র হিসেবে যথাক্রমে গণঅভ্যুত্থান ও স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান ছিল শুধু বঙ্গবন্ধু নামক সিংহ পুরুষের নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং অবিচল আস্থা। আরবি প্রবাদ : 'একটি সিংহের নেতৃত্বে একদল ভেড়া, একটি ভেড়ার অধীনস্থ একদল সিংহকে হত্যা করতে পারে।' সু-প্রশিক্ষিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আমরা বাঙালিরা ২ সপ্তাহ থেকে ৮ সপ্তাহ প্রশিক্ষণ নিয়ে, পাকিস্তানি সিংহীদের পরাস্ত করতে পেরেছিলাম, শুধু নেতৃত্বে ছিলেন সিংহপুরুষ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু। ভেড়া বলে আমি মুক্তিযোদ্ধাদের খাটো করতে চাইনি, শুধু আমাদের প্রশিক্ষণের মাত্রাকে তুলে ধরেছি। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের সঙ্গে তুলনা করেছি। ছাত্র-যুবসমাজের প্রতি অনুরোধ, ইংরেজি প্রবাদ 'প্রথমে যোগ্য হও তারপর আশা কর'। তবে আমার প্রথম অংশটির প্রতি যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কেননা বর্তমান যুবসমাজ প্রাপ্তির নেশায় বেশি আকৃষ্ট, যোগ্যতর হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে কেমন যেন অনীহা।

আমার একটা বিশাল প্রশ্ন, যে প্রশ্নর জবাব বিশ্বের রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের পরে দুনিয়াজুড়ে সব প্রিন্ট এবং তৎকালীন ইলেকট্রিক মিডিয়াতে তার বিশ্লেষণ দিয়েছিলেন। প্রশ্নটি ছিল, বঙ্গবন্ধু পালিয়ে গেলে কি হতো? ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি সময়ে (সম্ভবত জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে) বিবিসি থেকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলেছিলেন এক বাক্যে 'শেখ মুজিব পালিয়ে গেলে পুরো ঢাকা শহর ইপিআর, রাজারবাগ পুলিশ লাইন বা ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল কিংবা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের মতো হতো। বীরের বেশে সবাইকে যুদ্ধ করার প্রস্তুত নিতে বলে বীরের বেশে ধরা দেন। রোগের যন্ত্রণায় যে ডাক্তার নিজে ভোগেননি বা তার নিকটআত্মীয় ভোগেনি, সে কখনো ভালো ডাক্তার হতে পারে না। তেমনি কোনো রাজনৈতিক নেতা জেলে না গেলে, রাজনীতিতে পরিপক্কতা আসে না। বঙ্গবন্ধু তার জীবনের ১৪টি বসন্ত জেলে কাটিয়েছিলেন এবং লেখাপড়া করে কাটিয়েছিলেন। আজকের অসমাপ্ত আত্মজীবনী যে কি মূল্যবান দলিল তিনি এ প্রজন্মের জন্য রেখে গেছেন তা পণ্ডিত ব্যক্তিরাই উপলব্ধি করতে পারবেন।

দোহাই আপনাদের, '৭১-পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি অনুরোধ, আপনারা আর যাই বলুন না কেন জাতির পিতার নামটা শ্রদ্ধার সঙ্গে মুখে আনবেন। বঙ্গবন্ধু হলেন মহাত্ম গান্ধী, নেলসন ম্যান্ডেলা, স্টালিন, থিওডোর রুজভেল্ট বা চার্চিলের মতো। বঙ্গবন্ধু এ দেশের মাটি ও মানুষের সম্পদ, তা বার বার প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৭৫-এর ১৮ আগস্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বলেন, গত সপ্তাহে সংঘটিত বাংলাদেশের ঘটনাবলি তার সরকার আকস্মিক আঘাত বলে গণ্য করে। শেখ মুজিবের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য আয়োজিত এক জনসভায় মিসেস গান্ধী তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সারা বিশ্বে শেখ মুজিব একজন মহান জাতীয় নেতা এবং 'স্টেটসম্যান' হিসেবে স্বীকৃত। তিনি অসাধারণ সাহস ও দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে তার জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। ভারতের জনগণ তাকে এ দেশের বন্ধু এবং উপমহাদেশে শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার উৎসাহী সমর্থক হিসেবে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির দৃষ্টিতে দেখেন। (দি গার্ডিয়ান, লন্ডন, ১৯ আগস্ট, ১৯৭৫)। ১৯৭৫ সালে জনাব জিয়াউর রহমান সাহেব যখন ক্ষমতায় তখন তিনজনের একটা আন্তর্জাতিক সাংবাদিকের টিম বাংলাদেশে এসেছিলেন। তাদের একজন ব্র্যায়ন ব্যারন। যাদের তিন দিন শেরাটনে আটকিয়ে রেখে স্বৈরশাসক সরাসরি বিমানবন্দর দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। দেশেফিরে ব্যারন লিখেছিলেন- '১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে লিখিত তার সংবাদ বিবরণীতে বলা হয়, শেখ মুজিব সরকারিভাবে বাংলাদেশের ইতিহাসে এবং জনসাধারণের হৃদয়ে উচ্চতম আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবেন। এটা শুধু সময়ের ব্যাপার। এটা যখন ঘটবে, তখন নিঃসন্দেহে তার বুলেট-বিক্ষত বাসগৃত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্মারক-চিহ্ন এবং তার কবরস্থান পুণ্য তীর্থে পরিণত হবে।' (দি লিস্নার, লন্ডন, ২৮ আগস্ট, ১৯৭৫)।

মরহুম মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীও বলেছিলেন, 'টুঙ্গিপাড়ার শেখ মুজিবের কবর একদিন সমাধিস্থলে রূপান্তরিত হবে এবং বাঙালির তীর্থস্থানের মতো রূপলাভ করবে'।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
১ মার্চ ২০১৫

এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে

আবেদ খান

বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সেই কাজটিই শেষ পর্যন্ত করলেন, যার জন্য বাংলাদেশের সবাইকে দীর্ঘ ৪৩ বছর অন্ধকারে থাকতে হয়েছে। তিনি যে বিষয়গুলোর অবতারণা করেছেন সেগুলো অবশ্যই গভীরভাবে চিন্তাভাবনার দাবি রাখে। একটি ধন্যবাদ তিনি পেতেই পারেন তাঁর স্পষ্ট মন্তব্যের জন্য। তাঁকে তাঁর অনুসারীরা 'দেশনেত্রী' বলে সম্বোধন করেন তাঁর উপস্থিতিতে। একটু দূরে গেলে 'ম্যাডাম' বলেন, একটু বেশি দূরে গেলে 'বেগম সাহেবা' বলে ডাকেন আরও একটু বেশি দূরে গেলে কি কি বলেন অবশ্য সেটা এ লেখার জন্য প্রয়োজনীয় নয় বিধায় উল্লেখ করা হলো না। এবার আসা যাক তাঁর কথায়। কী বলেছিলেন তিনি? বলেছিলেন-

১. বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি;

২. আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তি নয়, ওরা সেসময় দেশছেড়ে পালিয়েছে, লুটপাট করেছে, ফুর্তি করেছে। আর যাঁরা দেশে ছিল তাঁরা যথার্থভাবে মুক্তিযুদ্ধ করেছে;

৩. তিনি দেশত্যাগ করেননি, ক্যান্টনমেন্টেই ছিলেন এবং তাঁকে নির্যাতন করা হয়েছে;

৪. জিয়াউর রহমান নিয়মিত ক্যান্টমেন্টে চিঠি দিয়ে তাঁর খোঁজখবর নিতেন;

৫. জিয়াউর রহমানের স্ত্রী হিসেবে তিনি গর্বিত।

বেগম খালেদা জিয়াকে অবশ্যই সাধুবাদ দিতে হয়, ৪৩ বছর পর হলেও একাত্তর সালে তাঁর অবস্থান নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলার জন্য। জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি কিনা সে সম্পর্কে আলোচনা করা বাতুলতা মাত্র এবং এজন্য বেগম খালেদা জিয়ার উক্তিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া যাবে না তিনটি কারণে।

প্রথমত, রাষ্ট্রধারণা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারণা কিংবা রাষ্ট্রপতি বিষয়ক ধারণা তাঁর থাকার কথা নয়। কারণ পুঁথিগত জ্ঞানের ওই পরিমণ্ডলে পদচারণা করার সুযোগ হয়ত তিনি পাননি।

দ্বিতীয়ত, তাঁর পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা, আনুপূর্বিক ইতিহাস, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ, উত্তাল মার্চ সম্পর্কে কিছুই জানা সম্ভব নয়। কারণ পাকিস্তানি

সেনাবাহিনীতে কর্মরত সেনা অফিসারের স্ত্রীদের রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে চিন্তাভাবনা, এমনকি কথাবার্তা বলা পর্যন্ত নিয়মবদ্ধভাবে নিষিদ্ধ ছিল। নিছক রং করা পুতুলের মতো সেনা অফিসারের পত্নীদের মুখস্থ পরিবেশ, মুখস্থ কথাবার্তা, মুখস্থ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হতে হতো।

তৃতীয়ত, তিনি তোতাপাখির মতো সেই কথা উচ্চারণ করেছেন, যা তাঁকে বলতে বলা হয়েছে।

কে বা করা এসব বলেছে? লন্ডনে স্বেচ্ছানির্বাসনে থাকা তাঁর পুত্র? সেই পুত্র কাদের মুখপাত্র। তাঁর কিংবা তাঁদের কণ্ঠনিঃসৃত যেসব বক্তব্য বেরিয়ে আসে মাঝে মধ্যে, তাতে তো প্রতিধ্বনিত হয় পাকিস্তানি সামরিক জান্তার কণ্ঠস্বর। তবে কি তাঁর কণ্ঠ থেকে সেইসব পক্ষশক্তির বাণীই বেরিয়ে আসছে-যা তাঁর ভাবাদর্শের মূল নিয়ন্ত্রক আইএসআই-জামায়াত পক্ষশক্তি?

বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি নিয়ে যে নোংরা বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করাটাও এক ধরনের রুচিবিকৃতি। জিয়াউর রহমানের জীবদ্দশায় কখনই এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি। এমনকি তিনি নিজেও পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, বাঙালির নির্বাচিত প্রতিনিধি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বধীনতার ঘোষণাকারী, একমাত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি, যাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েই সবাই মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। জিয়ার এ বক্তব্যের পরও যারা জিয়াকে বঙ্গবন্ধু এবং জাতির জনকের বিকল্প হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন তাদের পরিষ্কার উদ্দেশ্যটিই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করা, বাংলাদেশের অস্তিত্বের বিরোধিতা করা, '৭১-পূর্ববর্তী রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রবর্তন করা। এটা যে সুস্পষ্টভাবে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, চেতনার দ্রোহিতা-তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এ ধরনের অপরাধের যে শাস্তি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সেই শাস্তিই তাদের প্রাপ্য। এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত হিসেবে মিসরের বিষয়টি উল্লেখ করতে চাই। আমি সেনাশাসনের ঘোরবিরোধি, গণতন্ত্র এবং মানবিক সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধের নিঃশর্ত এবং নিঃস্বার্থ সমর্থক। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে যারা ধর্মীয় স্বৈরতন্ত্র কায়েম করার ষড়যন্ত্র করে, তাদের পক্ষাবলম্বন করব। যে মুসলিম ব্রাদারহুড মধ্যপ্রাচ্যে চক্রান্ত এবং ধ্বংসাত্মক ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল তার ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করা হয় বিশেষ করে ১৯২৮ সাল থেকে, যার প্রতিষ্ঠাতা স্কুলশিক্ষক হাসান আল-বান্না, তারই দর্শন যদি যথাযথভাবে পাঠ করা হয়-তাহলে আর বুঝতে কষ্ট হবে না যে, কেন মিসরে মুসলিম ব্রাদারহুডের উত্থান রোধ করা এবং প্রয়োজনে সেখানে প্রচণ্ড কঠোরতা প্রদর্শন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীতে মুসলিম ব্রাদারহুডের উত্থান, কার্যক্রম, ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত লেখা যাবে। সেখানে পরিষ্কারভাবে উঠে আসবে জামায়াতের সঙ্গে ওই সংগঠনের দর্শনগত, কার্যক্রমগত এবং কাঠামোগত সাদৃশ্য। এখানে শুধু এটুকু বলি, মিসরে মোহাম্মদ মুরসিকে সামগ্রিকভাবে দমনের ভেতর দিয়ে যেভাবে ধর্মীয় জঙ্গি ফ্যাসিবাদের উত্থানকে রুখে দেয়া হয়েছে সেটা যদি না করা হতো তা হলে

গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল বিশ্ব আর এক হিটলার কিংবা লাদেনের উত্থান প্রত্যক্ষ করত।

এবার আসি বেগম জিয়ার অন্যান্য বক্তব্য সম্পর্কে। তিনি বলেছেন, তিনি দেশত্যাগ করেননি। ক্যান্টনমেন্টেই ছিলেন এবং ক্যান্টনমেন্টে তাঁকে নির্যাতন করা হয়েছে। অবশ্যই সত্য ভাষণ করেছেন বেগম জিয়া। অবশ্যই তিনি দেশত্যাগ করেননি। জিয়া তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য একাধিকবার চেষ্টা করেছেন, এমনকি বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাঠানো হয়েছে তিনি অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায়। তিনি তাঁদের সঙ্গে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। আগরতলায় বেগম জিয়ার অস্বীকৃতির সংবাদ যখন জিয়াকে দেয়া হয় তখন তাঁর কি অভিব্যক্তি ছিল, তা জানানোর মতো ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন। যাঁকে জিয়া দায়িত্ব দিয়েছিলেন, বেঁচে আছেন তিনিও। আমি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলে তাঁর নাম প্রকাশ করলাম না। তবে আশা করব, এই পরিস্থিতিতে ইতিহাসের প্রয়োজনে ন্যায় এবং সত্যের স্বার্থে তিনি নিজেই তা জানাবেন। তিনি আরও জানাতে পারেন, এ কাজের জন্য ক'জন মুক্তিযোদ্ধাকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। যেহেতু তিনি প্রত্যক্ষ সাক্ষী, তিনি জিয়াউর রহমানকে সেসময় অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সঙ্গ দিয়েছেন, সেই সত্য প্রকাশের অসঙ্কোচ সাহস প্রদর্শনের শেষ সুযোগ তিনি নিতে পারেন। বেগম জিয়ার ওপর নির্যাতন করা হয়েছে সেই অবরুদ্ধ সময়ে এই তথ্যটি প্রকাশের মাধ্যমে বেগম জিয়া অবশ্যই এই সম্মানের অধিকারী হলেন- যে সম্মান বাঙালি জাতি একাত্তরে তিন লাখ মা-বোনকে দিয়েছে। কিন্তু এরই পাশাপাশি অনেক প্রশ্ন চলে আসে। তাহলে কেন তাঁকে উদ্ধার করার জন্য যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের তিনি বিমুখ করলেন? কেন একাধিকবার সুযোগ পেয়েও তিনি সেই সুযোগ গ্রহণ করলেন না? কেন তাঁর উপর ক্রমাগত নির্যাতনের তথ্যটি এতকাল জাতির কাছে আড়াল করলেন? তিনি জানেন কিনা জানি না, তবে একাত্তরের পাক-বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দালালরা একাত্তরে তাঁর ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক ছিল। কারণ মুক্তিযুদ্ধের একজন সক্রিয় সামরিক কর্মকর্তার স্ত্রীকে নিজেদের কব্জায় রাখা তাদের জন্য অনেক বড় ব্যাপার ছিল। অতএব তাঁকে কোথায় রাখা হয়েছিল, কোথায় কোথায় তিনি গিয়েছেন, কার কার সঙ্গে কথা বলেছেন, কিংবা চলাফেরা করেছেন- এই সবকিছুরই হিসেব তাদের কাছে জমা আছে। এমনকি একাত্তরের ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখে যদি যৌথবাহিনীর হাতে পাক বিমানশক্তি পুরোপুরি বিধ্বস্ত না হতো, তাহলে ৭ ডিসেম্বর তারিখে বেগম জিয়াকে যারা 'সসম্মানে' পাকিস্তানে নিয়ে যেতেন, সেই তথ্যও তারা সংরক্ষণ করে রেখেছেন। অতএব ম্যাডাম খালোদ জিয়া ৪৩ বছর পর সেসময়ের কথা বলে নিজেকে যতই মুক্তিযুদ্ধের পাদপ্রদীপে আনার চেষ্টা করুন না কেন-তাতে খুব একটা লাভ হবে বলে মনে হয় না।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জিয়াউর রহমান তাঁকে ক্যান্টনমেন্টে চিঠি পাঠিয়ে নিয়মিত খোঁজখবর নিতেন বলে বেগম জিয়া যে দাবি করেছেন, তা কতখানি সত্য

পাঠক বুঝে নেবেন। যাঁকে তিনি বলেন- বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি, স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণাটি তিনি কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে সেই একাত্তরে আর্মি ক্র্যাকডাউনের পর দিয়েছিলেন বলে দাবি করা হয়, যাঁকে তিনি স্বাধীনতার ঘোষক প্রমাণ করার জন্য মুখে ফেনা তুলে ফেলেছেন, যাঁকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে পাক বাহিনীর সর্বত্র খুঁজে বেড়ানোর কথা- সেই জিয়াউর রহমান সেই অবরুদ্ধ সময়ে পাকিস্তানিদের দুর্গ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আটক থাকা তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন, এটা কি খুব বিশ্বাসযোগ্য কথা হতে পারে? আর তাঁর এ কথা সত্য হলে তো অন্যরকম সন্দেহ দানা বাঁধে।

তিনি বলেছেন, জিয়াউর রহমানের স্ত্রী হিসেবে তিনি গর্বিত। এমন বীর স্বামীর জন্য স্ত্রী গর্বিত হবেন-এ তো স্বাভাবিক কথা। কিন্তু তিনি কেন সুযোগ থাকা সত্ত্বেও স্বামীর কাছে যেতে অস্বীকার করলেন? কেন একজন বিশেষ পাক জেনারেলের মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান হয়ে তিনি উদ্ভ্রান্তের মতো সরকারের সমস্ত প্রটোকল উপেক্ষা করে পাকিস্তানে ছুটে গিয়েছিলেন? কেন দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জিয়াউর রহমান তাঁর স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন? সেসময় তো এজন্য জিয়াউর রহমানকে বঙ্গবন্ধু ডেকে ভর্ৎসনা করে খালেদাকে তাঁর কন্যাসম বলে সম্বোধনও করেছিলেন। এবং জিয়াউর রহমানকে বঙ্গবন্ধু স্ত্রী পরিত্যাগে নিবৃত করেছিলেন। এসব ঘটনার সাক্ষী তো অনেকেই আছেন। তবে সবচাইতে বেশি যিনি জানেন তিনি তো স্বয়ং বেগম খালেদা জিয়াই। আর জিয়াউর রহমান '৮১-এর মে মাসের ৩০ তারিখে নিহত হওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করতেন, সেটাও কি বেগম সাহেবের চেয়ে বেশি আর কেউ জানেন?

আমি দুঃখিত এভাবে লেখার জন্য। একাত্তরকে নিয়ে যখন বারবার ধূম্রজাল সৃষ্টি করা হয়, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কিংবা স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে যখন অহেতুক বিতর্ক তোলা হয়, তখনও যুক্তি কিংবা তথ্য দিয়ে সেসব খণ্ডনের চেষ্টা করি। কিন্তু যখন বিতর্ক উত্তাপিত হয় এমন কারও কাছ থেকে, যিনি তাঁর সংসারজীবনের জন্য, সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থানের জন্য, ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে উপবেশনের জন্য, তাবৎ জাগতিক সমৃদ্ধির জন্য সেই মহান মানুষটির কাছে, সেই পরিবারের সদস্যদের কাছে চিরঋণী থাকার কথা-তখন সত্যিই খুব খারাপ লাগে। অকৃজ্ঞতারও একটা সীমারেখা থাকে, যখন সেই সীমারেখাটি বার বার লঙ্ঘিত হয়, যখন অরুচিকর কুৎসিত আক্রমণে বিদ্ধ করা হয় এমন একজন মানুষকে, যাঁর কর্ম ও চেতনায় বাঙালির মক্তিসংগ্রাম ছাড়া আর কিছু ছিল না, তখন সত্যিই ক্ষুব্ধ হতে হয়।

আমি আওয়ামী লীগের রাজনীতি করি না। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আমার অনেক সমালোচনাও রয়েছে। অনেক অপরিপক্ব পদক্ষেপে আমিও বিরক্ত হয়েছি, কিন্তু যে মানুষটির একনিষ্ঠ অবদানের জন্য আমরা আজ সহস্র বছর পরে একটি স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছি, একটি পতাকা

পেয়েছি-সেই মানুষটিকে এত অশ্রদ্ধা করা যায়! এত অসম্মান করা যায়! যে নিজের পিতৃপরিচয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করে সে কী দেবে তার নিজের পরিচয়? কী হবে তার অস্তিত্বের ঠিকানা?

আমার অবাক লাগে, স্বয়ং জিয়াউর রহমান যেখানে তাঁর জীবদ্দশায় বঙ্গবন্ধুকে সামান্যতম অসম্মান করেননি। অবশ্য বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের বিপরীতে তিনি তাঁর রাজনীতি পরিচালনা করতে গিয়ে স্বাধীনতা বিরোধীদের খাঁচায় ঢুকে পড়েছিলেন বলে একপর্যায়ে তাঁকে চরম মূল্যও দিতে হয়েছিল বটে। কিন্তু তিনি কখনও নিজেকে বঙ্গবন্ধুর স্থলে কল্পনা করেননি। সেখানে তাঁর স্ত্রী এবং মত ও পথভ্রষ্ট পুত্র কীভাবে এত বিবেকবর্জিত কথাবার্তা বলতে পারলেন? যারা এভাবে কথা বলতে পারেন, এভাবে ভাবতে পারেন, তাদের ব্যাপারে শুধু এটুকুই বলা যায় যে, তারা বিধাতার সৃষ্টির চরম অপচয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৮ এপ্রিল ২০১৪

বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা এবং জনৈক খলনায়ক

সুজাত মনসুর

বিএনপি-জামায়াত জোটের বর্তমান পেট্রোলবোমা-ককটেল অবরোধ-হরতালের জন্য সরকার বা সরকারি দল কর্তৃক খালেদা জিয়াকে প্রথমে গাজীপুরে এবং পরে ৫ জানুয়ারি ২০১৫-তে ঢাকায় সমাবেশ করতে না দেয়াই একমাত্র কারণ বলে কতিপয় নিরপেক্ষ ভেকধারী নাগরিক সমাজ, কতিপয় রাজনীতিক, সাংবাদিক, কলাম লেখক এবং মধ্যরাতের টকশোওয়ালারা (মাহমুদুর রহমান মান্নার ভাষ্যে যাদের তারা তৈরি করে পাঠান সরকারের বিপক্ষে এবং বিএনপি-জামায়াতের পক্ষে বলার জন্য) ডুগডুগি বাজিয়েই চলেছেন। যদিও এটিই মূল কারণ নয়, এটি একটি অজুহাত মাত্র। বর্তমান মানুষ পুড়িয়ে মারার অবরোধ-হরতালের অন্তর্নিহিত কারণ আরো গভীরে প্রোথিত, যা ইতোমধ্যেই মুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন অনেক সাংবাদিক ও কলাম লেখক বা বুদ্ধিজীবী বিভিন্ন গণমাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আমার আলোচনার বিষয় কিন্তু তা নয়।

তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেই, এটাই মূল কারণ তাহলে বলতেই হয় বিএনপি তার ফল ভোগ করছে। কেননা, প্রতিটি ক্রিয়ারই একটি প্রতিক্রিয়া আছে। বাংলাদেশের ইতিহাসের খলনায়ক জেনারেল জিয়াউর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিগত প্রায় বছর দুয়েক ধরে লন্ডনে বসে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশে স্বাধীনতা নিয়ে মনগড়া সব বক্তব্য দিয়ে দেশে-বিদেশে বঙ্গবন্ধুকে অপমান ও ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সর্বশেষ সম্ভবত গত বছরের ডিসেম্বরে সে জাতির জনককে এমন একটি শব্দে ভূষিত করে, যা গত ৪৪ বছর ধরে বাংলাদেশের মানুষের কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত একটি শব্দ। ফলে দেশে-বিদেশে, বিশেষ করে দেশের অভ্যন্তরে এ নিয়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়। স্বয়ং বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন, যা হওয়াটাই স্বাভাবিক। ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের অন্য সহযোগী সংগঠন যতদিন পর্যন্ত তারেক রহমান তার বক্তব্য প্রত্যাহার করে জাতির কাছে ক্ষমা না চাইবে, ততদিন পর্যন্ত দেশের যে কোনো জায়গায় খালেদা জিয়ার কোনো ধরনের সমাবেশ করতে না দেয়ার ঘোষণা দেয় এবং গাজীপুরের জনসভা প্রতিহত করা হয় ও ঢাকায় ৫ জানুয়ারির সমাবেশে সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করে। অবশ্য ঢাকার সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণ হিসেবে গোয়েন্দারা ব্যাপক নাশকতা, এমনকি হেফাজতি কায়দায়

বিএনপি-জামায়াতের আরেকটি ধ্বংসাত্মক ঘটনার আশঙ্কা প্রকাশ করে। গাজীপুরের আগে কিন্তু খালেদা জিয়া সারা দেশে দশটিরও অধিক জনসভা করেছেন সরকার বা সরকারি দল কোনো ধরনের বাঁধা প্রদান করেনি।

বঙ্গবন্ধুকে কটাক্ষ করে তারেকের বক্তব্যকে অনেকেই বিশেষ করে নাগরিক সমাজের একাংশ ও কতিপয় সাংবাদিক-কলামিস্ট একজন অর্বাচীন বালকের উক্তি বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। কেউ কেউ এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বা আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের কথা বলা সমীচীন নয় অথবা তাকে কেন্দ্র করে খালেদা জিয়াকে সভা-সমাবেশ করতে না দেয়া গর্হিত কাজ এবং গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করার শামিল বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এটি যে শুধু একজন অর্বাচীন বালকের উক্তি নয়, বিএনপি-জামায়াতের মূল রাজনৈতিক এজেন্ডা, তাই প্রমাণিত হয়েছে খালেদা জিয়ার ৩১ ডিসেম্বরের (২০১৪) সংবাদ সম্মেলনে তারেকের বক্তব্যকে সমর্থনদানের মাধ্যমে। বিএনপি-জামায়াত তাদের সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই, নিরাপদ দূরত্বে অবস্থানকারী তারেককে দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে খাটো ও বিতর্কিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আর এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত আন্তর্জাতিক শক্তি।

বাংলা, বাঙালি এবং বঙ্গবন্ধু এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তিও এটা ভালো করে জানে, তাই বঙ্গবন্ধুকে যদি বিতর্কিত করা যায়, যদি তার অস্তিত্বে আঘাত করা যায়, তাহলে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির অস্তিত্বেই আঘাত করা হবে। অর্থাৎ বাংলা এবং বাঙালির কাছে থেকে যদি বঙ্গবন্ধুকে পৃথক করা যায় তাহলে, বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের আদলে নব্য পাকিস্তান বানানো সম্ভব হবে। সম্ভব হবে ইতিহাসের খলনায়ক জিয়াউর রহমানকে নায়কের আসনে অধিষ্ঠিত করা। জিয়াউর রহমান অনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরুর দিন থেকেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এক নম্বর হওয়ার চেষ্টা করেছেন। কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংগঠকদের অনেকেই পরবর্তিতে বলেছেন, তাকে (জিয়া) যখন স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠের জন্য নিয়ে আসা হয় তখন সে প্রথম যে ঘোষণাপত্রটি তৈরি করে সেখানে নিজেকে দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে উল্লেখ করেন। কিন্তু ওইখানে অবস্থানরত চট্টগ্রামের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং বেতার কেন্দ্রের সংগঠকদের আপত্তির কারণে তা সংশোধন করে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠে বাধ্য হন। কিন্তু তার এক নম্বর হওয়ার খায়েশ তখনো রয়ে গিয়েছিল। তাই পাঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের খুনিরা যখন তার সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ স্থাপন করে, তখন তিনি সম্মতি জানিয়েছিলেন এবং একই বছরের ৭ নভেম্বর তথাকথিত সিপাহি-জনতার বিপ্লবকে কাজে লাগিয়ে নিজের ইচ্ছা পূরণের সুযোগ নিয়েছেন।

আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃতি শুরু হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে। জিয়াউর রহমান কখনো নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে দাবি না করলেও, মুক্তিযুদ্ধের যে মূল চেতনা জাতীয়তাবাদ সেখানেই আঘাত করেন।

মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত রাজনৈতিক শক্তিকে পুনর্বাসনের নিমিত্তে প্রবর্তন করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বদলে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ। 'জয় বাংলা'র বদলে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ', 'বাংলাদেশ বেতার'-এর বদলে 'রেডিও বাংলাদেশ' এবং 'ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রকে সংবিধান থেকে বাদ দেয়া হয়। জিয়াউর রহমান নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে দাবি না করলে পাঠ্যপুস্তকে কিন্তু স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসের বদলে একটি অদ্ভুত ইতিহাস সন্নিবেশিত করা হয় নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করার জন্য। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পেছনে যে একটি সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে এবং সে ইতিহাসের একজন মহানায়ক রয়েছেন তার কোনো অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হবে আমাদের স্বাধীনতা একটি গায়েবি স্বাধীনতা। এই ইতিহাস বিকৃতি চলেছে দীর্ঘ একুশটি বছর, পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছে স্বাধীনতার ঘোষক বিতর্ক। এই বিতর্কের অবতারণাকারীরা যে বিষয়টির ওপর ভিত্তি করে যুক্তি দাঁড় করাতে চায় তাহলো, ২৬ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা, তাঁর গ্রেফতার হওয়া এবং ২৭ মার্চ জিয়াউর রহমানের বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ। এ নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। এটাই ঠিক স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি ২১ বছরে যা করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও তা পারবে না। কেননা ইতিহাস তার আপন গতিতে এগিয়ে চলে, কারো কথায় বা হুকুমে ইতিহাসের গতি পরিবর্তিত হয় না। আর হয় না বলেই আজ সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে। নতুন প্রজন্ম আজ স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারছে। ২৬ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু আত্মগোপনে না গিয়ে গ্রেপ্তার হলেন এবং গ্রেপ্তার হওয়ার আগে যে তিনি স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে যান সে ব্যাপারে অধ্যাপক-লেখক মযহারুল ইসলামের লেখা 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি এবং আমার ব্যক্তিগত একটি স্মৃতিচারণ করে লেখাটি শেষ করতে চাই।

তিনি লিখেছেন, 'বঙ্গবন্ধুর আমার পাশে এসে বসলেন। রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে ১০টা। ইতোমধ্যে বাংলা ও ইংরেজিতে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটির মুসাবিদা সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে ছিলেন তাজউদ্দীন আহমেদ, জেনারেল ওসমানী, তাঁদের সঙ্গে ছিলাম আমি। বঙ্গবন্ধু স্বয়ং ডিকটেশন দেন, কলম ছিল জেনারেল ওসমানীর হাতে। তাঁকে তখন বেশ পরিশ্রান্ত অথচ প্রশান্ত দেখাচ্ছিল।' (পৃষ্ঠা ৩৩ এবং ৩৪)। মযহারুল ইসলাম আরো লিখেছেন তিনিও বঙ্গবন্ধুকে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলে বঙ্গবন্ধু বলেন,..... আপনারা আশ্রয় পাবেন, অস্ত্রও পাবেন। সে ব্যবস্থা আমি সম্পন্ন করে রেখেছি। কিন্তু আমি নিজে যদি চলে যাই, কাল দেশ স্বাধীন হলে পর যখন বাংলার মাটিতে ফিরে আসব, আমার হাজার হাজার মা-বোন-ভাইয়েরা এসে যখন বলবে, মুজিব তুমি তো নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে সংগ্রাম করে জীবন রক্ষা করেছ- কিন্তু আমার স্বামী, আমার পিতা-মাতা, আমার ভাই, আমার বোন, এদের তুমি কি আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলে, ফিরিয়ে দাও, তাদের তুমি ফিরিয়ে দাও- তখন আমি তাদের কী জবাব দেব, বলুন। না,

না আমি পারি না। আমি যেতে পারি না। মরতে হয় মরব। মৃত্যুকে তো কোনোদিন আমি ভয় করিনি। কিন্তু আই মাস্ট শেয়ার দ্য সাফারিংস অফ মাই পিপল এ্যালংউইথ দেম। আই মাস্ট শেয়ার। আই কান্ট লিভ দেম অন দ্য ফেইস অফ ফায়ার। আমি পারি না।' (পৃষ্ঠা ৩৪ এবং ৩৫)। দেশ ও জাতির প্রতি কতটুকু দরদ, আবেগ, অনুভূতি, মায়া এবং দায়িত্ববোধ থাকলে একজন মানুষ মৃত্যুকেও তুচ্ছ করতে পারে, এটাই কি তার জ্বলন্ত প্রমাণ নয়। এরপরও যদি কোনো রাজনৈতিক শক্তি, তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শঠতা বা মিথ্যা আশ্রয় নেয় এবং বঙ্গবন্ধুর মতো ইতিহাসের মহানায়কের ভূমিকাকে হীন করার মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে চায় তাদের কি ছেড়ে দেয়া যায়, না ক্ষমা করা যায়? বরং যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির অস্তিত্বকেই প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়, অর্থাৎ যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বেই বিশ্বাস করে না, বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে না, সভা-সমাবেশ তো দূরে থাক, বাংলাদেশে তাদের রাজনীতি করার অধিকার নেই।

২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা সংক্রান্ত আমার একটি ব্যক্তিগত স্মৃতি আছে। আমার তখন শৈশবকাল। বয়সে ছোট হলেও, জ্ঞান ঠনঠনে। ছাত্রলীগের ক্ষুদে কর্মী, কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকলেই ছুটে যাই। ২৬ মার্চ সকালে শুনতে পাই আমাদের স্থানীয় বাজারে (বর্তমানে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলা) আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সমবেত হয়েছেন, চরম উত্তেজনা নিয়ে আমিও ছুটে যাই সেখানে। গিয়ে দেখি থানা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুসের হাতে একটি টেলিগ্রামের কপি আর সেটাই হলো বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার দলিল, যা ওয়্যারলেসের মাধ্যমে এসে পৌঁছেছে। সেখানে আলোচনা চলছে কিভাবে আমাদের অঞ্চলে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি নেয়া যায়। পরদিন (২৭ মার্চ) স্বকর্ণে শুনি বঙ্গবন্ধুর পক্ষে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান সংবলিত মেজর জিয়ার সেই ঘোষণাটি, যা আজো কানে বাজে।

ভাষা আন্দোলন, ৬ দফা ও ১১ দফা ভিত্তিক উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, ৭ মার্চের ভাষণ এবং সর্বশেষ ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে গত চার দশকেরও অধিক সময় ধরে অনেক বই, অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, কলাম, উপন্যাস, কবিতা লেখা হয়েছে। নতুন করে লেখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না, তবুও লিখতে হয়, লিখতে হবে বিবেকের তাড়নায়, ফি বছর বিভিন্ন দিবসগুলোতে।

ভোরের কাগজ
২৯ মার্চ ২০১৫

বিশ্বাসের দৃঢ়তার অভাব না স্মৃতিলোপ?

মোজাম্মেল খান

যে কোন জাতি, একটি সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই হোক অথবা একটি রাজনৈতিক আলপ-আলোচনার মাধ্যমেই হোক, বিদেশী আধিপত্যের জোয়াল থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে, সে জাতি তার নাগরিকদের বেশিরভাগের সমর্থনেই সেটা করে থাকে, যদিও তার প্রতিটি সন্তানের সমর্থন কোন সময়ই সে বহন করে না। সব সময়ই সব দেশেই দখলদার বা ঔপনিবেশিক শাসকদের সহযোগী ছিল। এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালপর্বে এশিয়া ও ইউরোপের দেশগুলোতে জাপানী ও জার্মান দখলদারিত্বের সময় ঐ দেশসমূহের কিছু মানুষ দখলদার বাহিনীকে সহযোগিতা করেছিল। তবে তাদের সংখ্যা, যারা এ দখলদারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, তাদের তুলনায় এতই নগণ্য ছিল যে সেটাকে জাতির স্বাধীনতার জন্য বা দখলদারমুক্ত করার সংগ্রামে জাতি বিভক্ত ছিল বলে মনে করা হয় না। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তান সৃষ্টি করার জন্য মুসলিম লীগ শুধুমাত্র বাংলা প্রদেশেই অধিকাংশ সমর্থন পেয়েছিল। তথাপি, একটি নতুন স্বদেশের জন্য বা একটা নবনির্মিত রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রদেশসমূহের মানুষ দ্বিধাবিভক্ত ছিল সেটা কখনও মনে কর হয়নি।

সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনকারী সব দেশেই দখলদারবাহিনীর সহযোগীরা কমবেশি মুক্তির পরবর্তীকালে একই ধরনের ভাগ্য বরণ করেছে। চীনে তাদের অনেককেই সংক্ষিপ্ত বিচারের পর ফায়ারিং স্কোয়াডের সম্মুখীন হতে হয়েছে। সিঙ্গপুরে, যাদের অপেক্ষাকৃত হাল্কা অপরাধের জন্য ক্ষমা করা হয় তাদের কে মুক্ত দেশে কোন সরকারী দায়িত্ব দেয়া হয়নি। বর্তমান প্রজন্মের উদ্দেশে দেয়া এক বক্তৃতায় সিঙ্গাপুর প্রতিষ্ঠাতা প্রধানমন্ত্রী লি কুয়ান ইউ বলেছিলেন, মাত্র ত্রিশ বছর সময়ে একটি অনুন্নত দেশ থেকে একটি আধুনিক উন্নত জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার প্রধান শক্তি ছিল এক নির্ধারিত নীতি-আর সেটা হলো রাষ্ট্রের সঙ্গে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের রাষ্ট্রের কোন ব্যাপারে জড়িত না করা, মন্ত্রী, সাংসদ বা সচিব হওয়া তো অনেক দূরের কথা। ইউরাপ এবং উত্তর আমেরিকায় নাৎসি সহযোগীদের এখনও খুঁজে বের করা হচ্ছে এবং তারা যে কোন দেশেই আশ্রয় নিন না কেন, তাদেরকে বিচারের জন্য ফেরত পাঠানো হচ্ছে সে সব দেশে, যেখানে অপরাধ সংগঠিত হয়েছে। এই সেদিনও

৯৭ বছর বয়স্ক এক সন্দেহভাজন যুদ্ধাপরাধীকে ৭০ বছর আগে সংগঠিত অপরাধের বিচারের জন্য কানাডিয়ান নাগরিকত্ব বাতিল করে হাঙ্গেরীতে ফেরত পাঠালো কানডিয়ার সরকার।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে কত শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দখলদার বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল সেটার অনুমান নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। পাকিস্তানি জেনারেল রাও ফরমান আলীর ভাষায়, বাংলাদেশের জনগণের ৯০% শেখ মুজিবের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল এবং তারা বাংলাদেশ নির্মাণের জন্য তাদের জীবন বলিদানে প্রস্তুত ছিল।' এই বক্তব্য যদি গ্রহণ করা হয়, তাহলে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে কমবেশি ১০ শতাংশ মানুষ সহযোগিতা করেছে। এর মধ্যে একমাত্র জামায়াতে ইসলামীই প্রকাশ্যে তাদের অপকর্মকে 'সঠিক' ছিল বলে দাবি করেছে; এর জন্য ক্ষমা চাওয়া তো দূরের কথা। কয়েক বছর আগে বিএনপির একজন সিনিয়র মন্ত্রী এই বলে সার্টিফিকেট দিলেন যে জামায়াত বাংলাদেশ সৃষ্টিতে তাদের সক্রিয় বিরোধিতা দ্বারা কোন ভুল করেনি। অন্যদিকে, অনেক ব্যক্তি, যারা ১৯৭১ সালে হয় দখলদারবাহিনীর সহযোগী ছিলেন নয় নির্বিকার ছিলেন, তারা আজকে তাদের নৈতিক অবস্থান বৃদ্ধির জন্য প্রায়ই বলে থাকেন, 'আমরা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে এদেশের স্বাধীনতা এনেছি। 'টিভি টকশোতে অনেককে গর্বভরে বলতে শোনা যায়, 'আমরা বিদেশী শাসন থেকে এ দেশকে মুক্ত করেছি অন্য আর এক দেশের নির্দেশ মেনে চলার জন্য নয়,' সোজাসুজি ভারতের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করে, যে দেশের সাহায্যের জন্য আমরা শুধু বিজয়ই অর্জন করিনি, জাতি হিসেবে সুনিশ্চিত নিশ্চিহ্ন হওয়ার হাত থেকে যে দেশের সাহায্য আমাদের রক্ষাও করেছে। অবশ্য এদের অনেককেই আমি জানি ১৯৭১ সালের পরাজয়ের বিড়ম্বনার কারণেই তাদের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থান, আর সে বিড়ম্বনা তাদের ভাগ্যে নেমে এসেছিল মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগের সফল নেতৃত্ব- যেটাও সম্ভব হয়েছিল অপরিহার্য ভারতীয় সাহায্য আর সমর্থনের কারণেই। স্বভাবতই আমাদের দেশের মানুষের স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার কারণেই হয়ত তারা এ বাগাড়ম্বর করার সুযোগ পেয়েছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অপরিহার্য সাহায্যকে যারা ছোট করে দেখেন বা বলেন, ভারতের সাহায্য ছাড়াও আমরা জয়ী হতাম- এ কথা বলেন, তারা হয় ইতিহাসের বিপরীত দিকে ছিলেন, নয় শখের বিপ্লবী বা মুক্তিযুদ্ধের বিভীষিকাময় বাস্তবতা সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্রও ধারণা নেই।

আজকে যদি আমরা ঔপনিবেশিক শাসন থেকে যারা নিজেদের মুক্ত করেছে সেই সমস্ত জাতির ইতিহাসের দিকে নজর দেই তাহলে দেখতে পাবো খুব কম দেশের সংগ্রামই বাংলাদেশ সৃষ্টির আন্দোলনের মতো মানুষের ব্যাপক সমর্থন লাভের সমান্তরাল ছিল। এক্ষেত্রে মৌলিক পার্থক্য হলো-অন্যান্য দেশ স্বাধীনতার অর্জনের নীতি পথনির্দেশক শক্তি হিসেবে কাজ করে যে সব মূল্যবোধ ও গুণাবলী সেগুলো ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে, বাংলাদেশ যেটা ধরে রাখতে মর্মান্তিকভাবে

ব্যর্থ হয়েছে। এর সন্ধিক্ষণ হলো ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে ঘটে যাওয়া বিয়োগান্তক ঘটনা, যেখানে দেশের স্বাধীনতার প্রধান স্থপতিকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো এবং একই সঙ্গে নিহত হলো সে সমস্ত বিশ্বাস এবং গুণাবলী, যা প্রতিষ্ঠিত করার ব্রত নিয়ে এই নবনির্মিত রাষ্ট্রের সূচনা হয়েছিল। সেই থেকেই শুরু হলো দুঃখজনক পিছনের দিকে যাত্রা। পরবর্তী দু'দশক ধরে বিকৃতি, ছলচাতুরি, ধ্বংস, বিচ্যুতি ও বৈপরীত্য জাতীয় জীবনের প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে স্থান করে নিয়েছিল। ৩০ লাখ শহীদের রক্তের পথ ধরে অর্জিত একটি দেশে স্বাধীনতার নেতৃত্ব দানকারী শক্তিকে বলা হবে 'মুক্তিযুদ্ধের যার অর্থ হলো 'মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি' ও থাকবে আমাদের দেশ তথা রাজনৈতিক অঙ্গনে- এটা কি ১৯৭১ সালে কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল?

অনেকে প্রশ্ন করেন, মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তিটা আবার কি? কেনই বা তাদের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি হিসেবে অভিহিত করা হয়? মুক্তিযুদ্ধ এক আদর্শবাদিক যুদ্ধ। অনেকেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে কথিত 'মুসলিম সৈনিকদের আত্মসমর্পনের' স্মৃতি মুছে ফেলতে যিনি শিশু পার্ক নির্মাণ করেছিলেন তিনি 'স্বাধীনতার ঘোষক' হলেও কি তাকে 'মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তি' বলা যায়?

দৈনিক জনকণ্ঠ
২৭ মার্চ ২০১৪

বাঙালি জাতি-ইতিহাসে নতুন মতিউর রহমান রেন্টুর সংযোজন

মাসুদা ভাট্টি

দেশে ইতিহাসের রাহাজানি চলছে। যে যেভাবে পারছেন ইতিহাস লিখতে বসেছেন, যেন এ ছাড়া দেশে আর কোন সমস্যা নেই এবং তাঁদের আর কোনই কাজ নেই। ইতিহাস লেখাটা খুব খারাপ কিছু নয়, বিশেষ করে মানুষ চাইলেই আত্মজীবনী জাতীয় কিছু প্রসব করতেই পারেন। এ দেশে তো আবার কাগজের মূল্য কিংবা বই বিক্রি হলো কি হলো না তা নিয়ে কেউই মাথা ঘামান না। যে কারণে এক মাসের বই মেলাকে কেন্দ্র করে এ দেশে লাখ লাখ বই ছাপানো হয়। অন্য অনেক দেশই হয়ত এক বছরেও যে পরিমাণ কাগজের শ্রাদ্ধ করে না, এ দেশে এক মাসেই তার চেয়ে বেশি পরিমাণ কাগজের শ্রাদ্ধ হয়। গাছপালা বা পরিবেশ নিয়ে আমরা যথার্থই চিন্তিত; কিন্তু বছরের এই মাসে আমরা সেটা ভুলে যাই, আমরা মেতে উঠি কাগজ-উৎসবে। দুঃখিত, এর মধ্যে যে পড়ার মতো কিংবা উল্লেখ করার মতো কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয় না তা নয়; কিন্তু সে সবও বিপুল কাগজের স্তূপের ভেতর চাপা পড়ে যায় বা অনুল্লেখ্যই থেকে যায়। সে বিতর্ক আজকের জন্য নয়, আজকে যে কথা বলতে বসেছি তা নিয়েই সীমাবদ্ধ থাকি।

প্রকাশনা সংস্থা ও পর্যাপ্ত অর্থ থাকলেই যে যা-তা ছাপিয়ে ফেলা যায় তার উদাহরণ বাংলাদেশেই বোধ করি রয়েছে। নইলে ইতিহাসের নামে আজকাল যা বাজারে ছাড়ার চেষ্টা চলছে তা আসলে কতটা ইতিহাস আর কতটা আমাদের জাতি ইতিহাস হননের সামগ্রিক প্রচেষ্টা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলাই যেতে পারে। এ কে খন্দকারের যে বইটি বাজারে শোরগোল তুলেছে তা কতটা ইতিহাস আর ইতিহাস-হননের ধারাবাহিক প্রকল্পের অংশ তা বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। বিশেষ করে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কী বলেননি বা কী চাননি তা নিয়ে যখন তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই বিতর্ক তোলা হচ্ছে এবং এ কে খন্দকারের মতো 'মুক্তিযোদ্ধা'র বই এই বিতর্কে যখন নতুন মাত্রাও যোগ করছে তখন এসব নিয়ে আলোচনা না হলে সামনের দিনগুলোতে যে আরও অসংখ্য গোয়েবলস আমাদের বহুবিধ গপ্প শোনানোর জন্য তৈরি হচ্ছেন তাঁরাও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবেন, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

১৯৭৫-এর আগ পর্যন্ত এ দেশ মোটামুটি দু'টি বড় দাগেই বিভক্ত ছিল, স্বাধীনতাপন্থী এবং স্বাধীনতাবিরোধী। মাঝে যাঁরা প্রাপ্ত স্বাধীনতাকে 'পড়ে পাওয়া চৌদ্দ-আনা' মনে করেন তাঁরা আসলে ছাগলের তিনি নম্বর বাচ্চার মতো কিছুকাল লাফিয়েছিলেন; কিন্তু হালে পানি পাননি। তাঁদের মানুষ বড়জোর ষাড়শ-বাহিনী হিসেবে ক্ষমা-ঘেন্না করে দিয়েছিল। কিন্তু' ৭৫-এ বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর থেকে এ দেশে মুক্তিযুদ্ধপন্থী শিবিরে কারও কারও মনে সংশয় দেখা দেয় যে, বঙ্গবন্ধু যেহেতু নেই, সেহেতু আওয়ামী লীগ আর ইহ জনমে ক্ষমতায় আসতে পারবে না। ফলে এই ক্ষমতায় না আসতে পারা দলের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে রেখে আর কী বা হবে? সেনা শাসকের দেখানো লোভ-লালসার শিকারে পরিণত হন অনেক বুদ্ধিব্যবসায়ী। শুরু হন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করার প্রকল্প। তখনও বঙ্গবন্ধুকে আঘাত করার সাহস দেখাতে পারেননি অনেকেই। কিন্তু তাঁরা সামগ্রিকভাবে মুক্তিযুদ্ধকে আঘাত করেছেন। বিখ্যাত হওয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে উপন্যাস লিখতে দিয়ে কলকাতায় ৯ মাস ধরে থাকা যুদ্ধাশ্রয়ীদের চরিত্র হননমূলক ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন এমন বুদ্ধিজীবীও বিদগ্ধের মর্যদা লাভ করেছেন এবং হয়েছেন আমাদের তরুণ প্রজন্মের জ্ঞাত ইতিহাসের সেরা চিন্তক। তিনি আবার একটি পুরোপুরি সমর্থকগোষ্ঠী বা ফলোয়ারও তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ রকম কিছু বিকৃতমনা মানুষের চিন্তা থেকেই বের হয় যে, মুক্তিযুদ্ধকে বিতর্কিত করতে হলে প্রথমে বঙ্গবন্ধুকে আঘাত হানতে হবে। এমন কিছু বক্তব্য হাজির করতে হবে, যাতে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি তাঁদের মধ্যে যেন বিভ্রান্তি তৈরি হয়। তাহলে কী করা যায়? প্রথমেই বলা যায় যে, শেখ মুজিব স্বাধীনতা চাননি, তিনি চেয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে। প্রাথমিকভাবে এই বক্তব্যকে খুব নিরীহ মনে হতে পারে; কিন্তু এই বাক্যটি আসলে একটি শক্তিশালী বোমা। কারণ, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্বের কাছে বাঙালির স্বাধীনতা যে কিছুই নয়, এ কথা প্রমাণ করতে পারলে তাতে শেখ মুজিবকে জাতির পিতার জায়গা থেকে সরানো সহজ হয়ে পড়ে। এখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বাধীন বাংলাদেশ 'না-চাওয়া' প্রমাণ করা গেলেই মুক্তিযুদ্ধকে ছিনিয়ে নেয়া যায় বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের হাতে থেকে।

দ্বিতীয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি সেটি প্রমাণ করা জরুরী হয়ে পড়ে এই শ্রেনীটির। এটি প্রমাণ করতে হলে তাঁদের শুরু করতে হবে ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ থেকে। এই ভাষণের আগে বঙ্গবন্ধু বা তাঁর দল আওয়ামী লীগ যা করেছে তা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলে; অর্থাৎ ৬ দফা বা ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ইত্যাদি এড়িয়ে গেলেও ৭ মার্চের ভাষণকে এড়িয়ে যাওয়া সহজ কোন ব্যাপার নয়। তাই এ ভাষণকে যতটা বিকৃত ও মিথ্যা তথ্য দিয়ে উপস্থাপন করা যায় ততই মঙ্গল। তাহলে কী করা যায়? পাকিস্তানের একটি পত্রিকায় যেহেতু ৭ মার্চের এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব 'জিঁয়ে পাকিস্তান' কেন বলেননি, তা নিয়ে বিশ্লেষণমূলক খবর প্রকাশিত হয়েছে, সেহেতু এখান থেকেই শুরু করা যায়।

সমস্বরে বলা প্রয়োজন যে, এদিন বঙ্গবন্ধু বক্তব্য শেষ করেন 'জিঁয়ে পাকিস্তান' দিয়ে। কিন্তু মিথ্যা সমস্বরে বলতে গেলেও যে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে তা যেহেতু ভুলে গেছে তাঁরা সেহেতু দেখা গেল কেউ কেউ 'জিঁয়ে পাকিস্তানের' জায়গায় বলতে শুরু করেছেন 'জয় পাকিস্তান' শব্দদ্বয়। ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কী বলেছেন কী বলেননি তা নিয়ে এখন আর প্রমাণ হাজিরের প্রয়োজন দেখছি না। মুজিববিরোধী শিবিরের গুরুস্থানীয় আবুল মুনসুর আহমদ তাঁর 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' গ্রন্থে স্পষ্টই বলে গেছেন যে, "এদিন মুজিব তাহার বক্তব্য শেষ করিলেন জয় বাংলা বলিয়া"। বিষয় সেটি নয়, বিষয় হচ্ছে, শেখ মুজিব যা বলেননি তা তাঁর মুখ দিয়ে বের করাতে পারলে পরবর্তীতে একজন মেজরের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠকে বৈধ করা যায় এবং অনায়াসে তাঁকে বঙ্গবন্ধুর কাতারে তুলে আলোচনায় আনা যায়। অন্য কোনভাবেই কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে জিয়াউর রহমানকে কোন প্রসঙ্গেই একত্রে আলোচনায় আনা সম্ভব হয়ে ওঠে না, কেবলমাত্র এই স্বাধীনতার ঘোষণা-বিতর্কে খুব সহজেই দু'জনকে টেনে আনা যায় একসঙ্গে। ইতোমধ্যেই জিয়াউর রহমানের ঘোষণার তারিখ বদলে গেছে, এখন শুধু সুবিধামতো তাঁকে 'স্বাধীনতার পিতা' বা এই জাতীয় কোন অভিধায় ডাকলেই কাজ শেষ!

কথা হলো, কেবলমাত্র বঙ্গবন্ধু বা আওয়ামী লীগ বিরোধীদের দিয়ে এ রকম বিতর্ক তুলে তো কাজ হচ্ছে না, প্রয়োজন আওয়ামী লীগ বা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ লোকজন। কারণ, মিথ্যেকে সত্য বানানোর জন্য মতিউর রহমান রেন্টুর মতো লেখক তৈরি করা না গেলে কি আর জনগণ খায়? এ দেশের জনগণও মিথ্যে শুনতে শুনতে অভ্যস্ত, তাই এখন আর সত্য-মিথ্যের পার্থক্য ধরতে পারে না। এদিকে তরুণ প্রজন্ম আরেক কাঠি সরেস, তাঁদের যেহেতু শিক্ষাভিত্তি দুর্বল সেহেতু তাঁদের ভেতরে প্রশ্ন তৈরি করে দিয়ে নিজেদের পক্ষে টেনে আনার মতো সহজ রাজনীতি আর দু'টি নেই। এবং সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা শাখা থেকে রাজনীতিবিদ হওয়া জেনারেলের জন্য এই চালাকির রাজনীতিই সহজতর। ফলে মতিউর রহমান রেন্টুরা হয়ে উঠেন এ দেশের ইতিহাসবিদ এবং তাঁদের লেখা বই (আমি বলি কাগজের শ্রাদ্ধ)ই হয়ে 'ইতিহাসের আকরগ্রন্থ।' অবিশ্বাস্য লাগে যে, এ সবের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে আমাদের বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ দিয়ে আবার সার্টিফিকেট ফেরি করেন। এর চেয়ে দুঃখজনক পরিণতি বোধ করি পৃথিবীর আর কোন জাতি ভোগ করেনি।

যা হোক, আমরা দেখতে পাই যে, খুব সহজেই বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে এই শিবির থেকে দীর্ঘকাল 'তোলা' তুলে এক সময় গিয়ে ঠিক মতিউর রহমান রেন্টু হয়ে যায়। মজার ব্যাপার হলো, এরই মধ্যে আবার তৃতীয় একটি গোষ্ঠী দাঁড়িয়ে গেছে এ দেশে যাঁরা বঙ্গবন্ধু এবং জিয়াউর রহমানের মাঝামাঝি মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব পালনকারী তাজউদ্দীন আহমদকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ইতিহাসের 'মোড়' ঘুরিয়ে দিতে চান। এই তৃতীয়পক্ষ একের

পর এক বই লিখে এটাই বোঝাতে চান যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তো বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাননি, তিনি পাকিস্তানের কারাগারে 'আরাম-আয়েশে' ছিলেন, যত যুদ্ধ, যত ঝুঁকি নিয়েছেন তাজউদ্দীন আহমদ। যে কথা তাজউদ্দীন আহমদ বলেননি সে কথা বলেন তাঁর কন্যা, তাজউদ্দীনের সহকারী এবং অন্যরা। এবং এরা সবাই সেসব বলেছেন কারাগারে তাজউদ্দীন আহমদের মৃত্যুর পর। এমনকি তাজউদ্দীন-জায়া জোহ্‌রা তাজউদ্দীনের মৃত্যুর আগে তাঁর কন্যা শারমিন আহমদ বই লেখার সাহস করেননি, সম্প্রতি তিনি একটি পুস্তক রচনা করেছেন এবং তা নিয়ে দেশের ইতিহাসের 'মোড়' ঘোরানোর চেষ্টা চলছে। কোন আগ্রহী গবেষক যদি চান তাহলে মূলধারা-৭১, শারমিন আহমদ ও এ কে খন্দকারের বই তিনটি পাশাপাশি রেখে পড়ে দেখার চেষ্টা করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, ইতিহাসের উপাত্ত খুঁজতে এদের খুব বেশিদূর যেতে হয়নি। তাঁরা একে অপরকে 'শুনেছেন' এবং 'দেখেছেন।' আরও একটু লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো, শারমিন আহমদ ও খন্দকার সাহেবের বই দু'টির লেখকও কখনও কখনও একজন বলেই মনে হয়- যদিও এটা ধারণা মাত্রই।

বলছিলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব 'কী বলেননি, কী করেননি, কী বলতে পারতেন, কী করতে পারতেন' তা নিয়ে আমরা আলোচনা করতেই পারি; কিন্তু তা তো আর ইতিহাস হতে পারে না, পারে ইতিহাসের ব্যাখ্যা হতে। কিন্তু আমাদের মতিউর রহমান রেন্টুরা ইতিহাসের ব্যাখ্যা আর ইতিহাসকে একত্রে গুলিয়ে ফেলেন এবং তা জাতিকে গেলানোর চেষ্টা করে যায় দেশের গণমাধ্যমের শক্তিশালী খেলোয়াড়রা। শ্রদ্ধেয় মুনতাসীর মামুন বলেছেন, 'বঙ্গবন্ধু একটি অনিচ্ছুক জাতিকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন', তিনি যে যথার্থই বলেছেন তার প্রমাণ হলো, তাঁকে হত্যা করেও যাঁরা শান্তি পায়নি তাঁরা এখন তাঁর না-বলা ও না-চাওয়ার মিথ্যের ঝাঁপি মাথায় নিয়ে নেমেছেন। আমরা কাকে দুর্ভাগা বলব, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে? নাকি বাঙালি জাতিকে? তাঁকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারিনি, সেই দুর্ভাগ্যের বোঝা আমাদের এখনও বইতে হচ্ছে, এখন মতিউর রহমান রেন্টুদের দিয়ে তাঁকে আবারও হত্যা করার মাধ্যমে যে আমরা নিজেই কত বড় ক্ষতির শিকার হচ্ছি সে কথা কি আমাদের এই সার্টিফিকেট দেয়া পণ্ডিতগণ বুঝতে পারেন না? নাকি বুঝেও না বোঝার ভান করেন? এই ভান আর কতকাল?

দৈনিক জনকণ্ঠ
৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪

স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে বিএনপির কয়েকজন নেতার বক্তব্য

তপন কুমার দে

স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে মুক্তিযোদ্ধা ও বিএনপি নেতা লে. জেনারেল (অব.) মীর শওকত আলী (বীরউত্তম) বলেন, আমার জানামতে সবচাইতে প্রথম বোধহয় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে হান্নান ভাই-এর কণ্ঠই লোকে প্রথম শুনেছিলেন। এটা ২৬ মার্চ, '৭১ দুপুর দুটার দিকে হতে পারে। কিন্তু যেহেতু চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের প্রেরক যন্ত্র খুব কম শক্তিসম্পন্ন ছিল, সেহেতু পুরো দেশবাসী সে কণ্ঠ শুনতে পাননি। কাজেই যদি বলা হয়, প্রথম বেতারে কার বিদ্রোহী কণ্ঠে স্বাধীনতার কথা উচ্চারিত হয়েছিল, তাহলে আমি বলব যে চট্টগ্রামের হান্নান ভাই এর সেই বিদ্রোহী কণ্ঠ। তবে এটা সত্য যে পরদিন অর্থাৎ ২৭ মার্চ, '৭১ মেজর জিয়ার ঘোষণার পরই স্বাধীনতা যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ মোড় নেয়।

মীর শওকত আলী আরো বলেন, এটা অনস্বীকার্য যে ২৫ এবং ২৬ মার্চ, '৭১-এর চরম মুহূর্তে প্রতিটি বাঙালি সেদিন হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতার এক একজন ঘোষক্ কিন্তু কে সেই মহান নেতা যিনি সেদিন অন্তরালে থেকেও প্রতিটি বাঙালিকে যুগিয়েছিলেন এই সাহস? কার আহ্বানে বাঙালি সেদিন পেয়েছিল স্বাধীনতার ঘোষণা? ২৬ মার্চ, '৭১ সন্ধ্যা হতে পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রামের মূল বেতার কেন্দ্র থেকে নিরাপদ দূরত্বে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে অবস্থান করে যারা স্বাধীনতার কথা বলেন, বিভিন্ন ঘোষণা প্রচার করলেন কে তাদের প্রেরণার উৎস ছিল? কার পক্ষে তারা প্রচার করেছিলেন সে সব ঘোষণা, স্বাধীনতার কথা? কাজেই বলুন, কে আমাদের স্বাধীনতার স্থপতি? কে বা কারা ঘোষক ছিলেন, সেটা কি কেবল আনুষ্ঠানিকতার বিতর্কে আমি জড়িয়ে পড়তে চাই না। (একাত্তরের রণাঙ্গন, শামসুল হুদা চৌধুরী, পৃ.১৬৬-১৬৭)।

১৯৭২ সালে "একটি জাতির জন্ম" শীর্ষক এক নিবন্ধে মেজর জিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বারবার জাতির পিতা বলে উল্লেখ করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর স্টাফ একাডেমীতে শিক্ষা লাভকালে বাঙালি অফিসার ও সৈনিকদের অবহেলা ও অসম্মানের কথা উল্লেখ করে মেজর জিয়া বলেন : এমন কি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ক্যাডেড শেখানো হতো আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমান হচ্ছে ওদের রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শত্রু। মেজর জিয়া আরো বলেন: এরপর এলো ১লা মার্চ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সারাদেশে শুরু হলো ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রীন সিগনাল বলে মনে হলো। এই নিবন্ধের কোথাও মেজর জিয়া ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন বলে দাবি করেনি। ২৫ মার্চ রাত্রি ১১টায় তার অবাঙালি কমান্ডিং অফিসার কর্নেল জানজুয়া তাকে নৌবাহিনীর ট্রাকে করে চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়ে জেনারেল আনসারীর কাছে রিপোর্ট করার নির্দেশ দেন। বন্দরে যাওয়ার পথে মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরী তাকে ক্যান্টনমেন্টে শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু হওয়ার সংবাদ দেয়। জিয়া তখন ফিরে গিয়ে কর্নেল জানজুয়াকে গ্রেপ্তার করে। তারপর ব্যাটালিয়নে ফিরে গিয়ে সে লেঃ কর্নেল এম আর চৌধুরী ও মেজর রফিকের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যর্থ চেষ্টা করে। অতঃপর যে বেসামরিক বিভাগের টেলিফোন কমিশনার ডিআইডি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের ওই ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৮ম ব্যাটালিয়ান কর্তৃক বিদ্রোহীদের খবর দেয়ার অনুরোধ জানায়। তারপর সে জে সি ও এবং জওয়ানদের ডেকে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়। তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট, ২৬ মার্চ, ১৯৭১ সাল।

মেজর জিয়া অপর একটি নিবন্ধে বলেন : ২৫ মার্চ রাত ১১টায় কমান্ডিং অফিসার জানজুয়া তাকে এক কোম্পানি সৈন্য নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে যাওয়ার নির্দেশ পাঠায়। রাত প্রায় সাড়ে ১১টার সময় জানজুয়া নিজে এসে তাকে সেনাবাহিনীর একটি ট্রাকে তুলে ষোলশহর ক্যান্টনমেন্টে থেকে শহরের দিকে রওয়ানা করে দেয়। আগ্রাবাদ একটা বড় ব্যারিকেডের সামনে বাঁধা পেয়ে তার ট্রাক থামার পর ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান তার 'ডজ" গাড়ি থেকে নেমে এসে জিয়াকে টানতে টানতে রাস্তার একপাশে নিয়ে যান। তিনি জিয়াকে বলেন- পশ্চিমারা গোলাগুলি শুরু করেছে। শহরে বহু লোক হতাহত হয়েছে। জিয়া তখনই বিদ্রোহ করবে বলে ঘোষণা করেন। রাত দুটার সময় ৮ম ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন-এর আড়াইশর মতো বাঙালি সৈন্যকে একত্রিত করে জিয়া তাদের সব বুঝিয়ে বলে। সবাই একবাক্যে এই বিদ্রোহের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থনের কথা ঘোষণা করে। ২৭ মার্চ সকালে বিমান বোঝাই হয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসে গেল পুরো দ্বিতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়ন। নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ 'বাবর' কে নিয়ে আসা হয় বন্দরে। এতে ছিল দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য। ড্রেস্ট্রয়ার এবং এক স্কোয়াড্রন ট্যাংক ও নিয়োজিত হয়েছে এই যুদ্ধে।

পাক বাহিনীর বিরাট শক্তির কাছে মোকাবিলায় বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব হবে না একথা বাঙলি সৈন্যরা বুঝেছিল। তাই শহরে ছেড়ে যাবার আগেই বিশ্ববাসীর কাছে কথাটা জানিয়ে যাওয়ার জন্য মেজর জিয়া ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে যান। প্রায় দেড় ঘন্টা মুসাবিদার পর তিনি তৈরি করেন তার সেই ঐতিহাসিক ভাষণ। নিজেই সেটা বাংলা ও ইংরেজিতে পাঠ করেন। ৩০ মার্চ সকালে মেজর জিয়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আর এক ঐতিহাসিক

ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ কমান্ডার হিসাবে ঘোষণা করেন।

মেজর জিয়ার ডায়েরীতে নিম্নে প্রদত্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে-২৭ মার্চ, ১৯৭১ সাল চট্টগ্রাম শহরের চারিদিকে তখন বিক্ষিপ্ত লড়াই চলছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় রেডিও স্টেশনে এলাম। এক টুকরা কাগজ খুঁজছিলাম। হাতের কাছে একটা এক্সারসাইজ খাতা পাওয়া গেল। তার একটা পৃষ্ঠায় দ্রুত হাতে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম ঘোষণা লিখলাম। স্বাধীন-স্বার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব নিয়েছি সে কথাও লেখা হলো সেই প্রথম ঘোষণায়। কিছুক্ষণের মধ্যে সে ঘোষণা বেতারে প্রচার করলাম। ২৮ মার্চ সকাল থেকে পনের মিনিট পর পর ঘোষণাটি প্রচার করা হলো কালুরঘাট রেডিও স্টেশন থেকে। ৩০ মার্চ দ্বিতীয় ঘোষণাটি প্রচার করা হলো রাজনৈতিক নেতাদের অনুরোধক্রমে। এই ডায়েরি অনুযায়ী মেজর জিয়া মোটামুটি ঘোষণা প্রচার করে। ২৭ মার্চ প্রচারিত প্রথম ঘোষণায় তিনি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব নিয়েছে বলে উল্লেখ করেন। অথচ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র গ্রন্থে বেলাল মোহাম্মদ প্রদত্ত বিবরণেও তার উল্লেখ নাই। বরং বলা হয় তার পরামর্শ অনুযায়ী মেজর জিয়া নিজের নামের শেষে তীর চিহ্ন দিয়ে লিখেছিলেন : অন বিহাফ অব আওয়ার গ্রেট ন্যাশনাল লিডার শেখ মুজিবুর রহমান। এম এ হান্নান, আবুল কাসেম খান, অধ্যাপক আজিজুর রহমান মল্লিক, এম আর সিদ্দিকী, মেজর সুবিদ আলী ভূঁইয়া ও মেজর রফিকুল ইসলাম তাদের লিখিত বক্তব্যে দাবি করেন, মেজর জিয়া তার প্রথম দিনের ভাষণে নিজেকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান বলে ঘোষণা করেন, রাজনৈতিক নেতাদের চাপে মেজর জিয়া তার উক্তি সংশোধন করে মহান জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছ বলে ঘোষণা করে। তারা বলেন- সংশোধিত ঘোষণা ২৮ মার্চ প্রচার করা হয় কিন্তু জিয়ার ডায়েরীতে রাজনৈতিক নেতাদের অনুরোধের কথা উল্লেখ করার কথা বলা হয়। দ্বিতীয় ঘোষণাটি ৩০ মার্চ প্রচার করা হয়।

১৯৮১ সালের ২১ জুলাই এক সাক্ষাৎকারে মীর শওকাত আলী বলেন- ১৫ মার্চের দিকে যখন অসহযোগ আন্দোলন খুব জোরদার হচ্ছিল এবং ইতোপূর্বে ৭ মার্চ, '৭১-এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দিলেন, তখন থেকেই আমরা বাঙালি সৈন্যরা চিন্তা করছিলাম যে একটা গণ্ডগোল বাঁধার এবং দেশের স্বাধীনতার জন্যে আমাদের সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ২৫ মার্চ রাতে হত্যাকাণ্ড শুরু হয় তখন স্বাভাবতই আমি বাঙালি হিসেবে আমার যা কর্তব্য আমি তাই করেছি। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে জেনারেল শওকত বলেন-"যখন থেকে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির স্বাধীনতার ব্যাপারে বলতে শুরু করলেন এবং ৬ দফা দিলেন, তখন থেকেই আমরা খুব খুশি যে শেষ পর্যন্ত আমরা বাঙালিকে একটি জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারবো।

আরো একটি প্রশ্নের উত্তরে জেনারেল শওকত আলী বলেন-২৭ মার্চ, ৭১ সালে জেনারেল জিয়া বুঝতে শুরু করেন যে বেতারে একটা ঘোষণা প্রচার করা দরকার। ওই তারিখেই সন্ধ্যায় কালুরঘাট ট্রান্সমিটার থেকে এটা করলেন তিনি।

২৭ মার্চ, ৭১ সন্ধ্যার পর থেকে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হলো মেজর জিয়ার ভাষণ। (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়, আব্দুল মতিন, পৃ. ৩৪-৩৮)।

১৯৭১ সালের ১লা মার্চ সারা বাঙলাব্যাপী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এই অসহযোগ আন্দোলন কেবলমাত্র বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এ আন্দোলনে সেনাবাহিনীতে চাকুরীরত সাধারণ বাঙালি সৈনিকদের মধ্যেও বেশ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। তারাও আস্তে আস্তে স্বাধীনতার মোহমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হতে থাকেন। তবে অফিসারদের মধ্যে যারা ছিলেন তাদের অনেকেরই এ ব্যাপারে যথেষ্ট দ্বিধা সংকোচ ছিল। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মেজর জিয়া। তার বিধবা পত্নী বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯১ সালের ১৯ মার্চ দেশের প্রধানমন্ত্রী হবার পর তার যে জীবন বৃত্তান্ত সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে, তা থেকেই এই উক্তির সারবত্তা মিলে।

এই জীবনের বৃত্তান্তে বলা হয়েছে যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যখন মেজর জিয়া বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন, তখন বেগম খালেদা জিয়া প্রথমে চট্টগ্রাম পরে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানি সামরিক অফিসারদের হাতে বন্দি ছিলেন। এই তথ্যই প্রমাণ করে যে, মেজর জিয়া কোনো পূর্বপরিকল্পনা মতো স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করেননি। হঠাৎ করেই তাকে যুদ্ধে অংশ নিতে হয়েছে। এবং এই হঠাৎ করে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করাতে মেজর জিয়া তার পত্নীকেও বলে যেতে পারেননি। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে তাকে তার অন্যতম সহকর্মী মেজর রফিক যে জোর করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে নিয়ে গেছেন, এটা দিবালোকের মতোই সত্য। তা না হলে মেজর জিয়া যদি পূর্বপরিকল্পনা মতো মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতেন তাহলে তিনি তার তৎকালীন তরুনী পত্নী বেগম খালেদা জিয়া ও শিশু পুত্র তারেককে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের ভিতরের বাসায় রেখে যেতেন না। আগেই তাদের সরিয়ে দিতেন। বেগম খালেদা জিয়াকেও এই নয় মাস হানাদার বাহিনীর অফিসারদের হাতে বন্দী জীবনযাপনকালে এতো নির্যাতন ভোগ করতে হতো না। মেজর জিয়ার অন্যান্য সহকর্মী ও সেক্টর কমান্ডারগণ যেমন মেজর কে এম সফিউল্লাহ, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, মেজর জয়নাল আবেদীন ও মেজর কাজী নূরুজ্জামান প্রমূখ পূর্বপরিকল্পনা মতো স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করেছেন এবং এবং সেই মোতাবেক তাদের পরিবার পরিজন স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের আগেই ক্যান্টনমেন্টের বাহিরে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের কারো স্ত্রী পুত্র কন্যাদের পাক হানাদারদের হাতে বন্দী থাকতে হয়নি।

বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে সাবেক জাসদ ও গণফোরাম এবং বর্তমানে বিএনপি নেতা জনাব শাজাহান সিরাজ বলেছেন-২৫ মার্চ রাত এগারটায় বঙ্গবন্ধু ই পি আর ওয়্যারলেস মারফত enemy had stard us, hit them back. বার্তাটি বাংলাদেশের প্রতিটি থানায় প্রেরণ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ইতিহাস, একটি অনুসন্ধান, মোহাম্মদ হান্নান, পৃ. ৪৮)।

সাবেক জাসদ ও গণফোরাম নেতা এবং বর্তমান বিএপি নেতা জনাব শাজাহান সিরাজ বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলেন- শেখ মুজিব একটি নাম নয়, শেখ মুজিব একটি দর্শন। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মুক্তিকামী মানুষের যে সংগ্রাম যা আজ বিশ্বের ইতিহাসে নতুন দিগন্তের উন্মেচন করতে চলছে তা শুধু শেখ মুজিবকে কেন্দ্র করেই নয় বরং শেখ মুজিবের দর্শন ভিত্তি করে এগিয়ে চলছে। অসহযোগ ও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সংসদীয় পদ্ধতি ও সশস্ত্র বিপ্লব এ দুয়ের সংমিশ্রণে গড়ে উঠা মুক্তি সংগ্রামের এক নতুন পথ। এক নতুন দর্শন, মুক্তিকামী মানুষের কাছে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন, কিভাবে সংসদীয় পদ্ধতি ব্যর্থ হলে সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হয় এবং সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য যে জন সমর্থনের প্রয়োজন তা অসহযোগ ও সংসদীয় পদ্ধতিতে সৃষ্টি করে বিপ্লবী সংগঠনের মাধ্যমে শত্রুকে চরমভাবে আঘাত হানা যায়, সে আন্দোলনে শেখ মুজিব এক নতুন অধ্যায়। তাই পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের কাছে এই মহান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বাধীন বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একজন মুক্তির দিশারী হয়ে নতুন করে নতুন পথের সন্ধান দিচ্ছেন।

জনাব শাজাহান সিরাজ লেখেন-"বঙ্গবন্ধু শোষিত, বঞ্চিত মানুষের অতিপ্রিয় নেতা, যার মধ্যে খুঁজে পেয়েছে শত বছরের পরাধীন একজাতি, এক নতুন সূর্যের সন্ধান। এবং যার প্রত্যাশায় এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষ শত বুলেট, বেয়নেট, ট্যাংক, কামান আর মেশিনগানকে উপেক্ষা করে।

জনাব সিরাজ বলেন-এমনি এক মহান নেতার আশীর্বাদ ও পরিচর্যায় গড়ে উঠা প্রতিষ্ঠান ছাত্রলীগ তার জন্মলগ্ন হতে পাকিস্তান উপনিবেশবাদ কলুষমুক্ত শোষণহীন বাংলাদেশ গঠনের সংগ্রাম করে আসছে। বহু ঘাত-প্রতিঘাত তুচ্ছ করে বাংলাদেশের জনগণের কাছে বিজয় নিশানকে উর্ধ্বে তুলে ধরে বেরিয়ে এসেছে ৫২,৬২,৬৬ ও ৬৯-এর রক্তঝরা ইতিহাস। শত শহীদের রক্তে পবিত্র মুক্তি শপথে বলীয়ান হয়ে এগিয়ে এসেছে প্রতিটি কর্মী, যারা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে নেতৃত্ব দিয়েছেন, বাংলাদেশের মাটিতে গড়ে উঠেছে এক একটি গণজোয়ার তারাইতো জয় বাংলার দর্শনকে সামনে রেখে অর্জন করেছে '৭০-এর ঐতিহাসিক গণবিজয়।

জনাব শাজাহান সিরাজ আরো লিখেছেন-বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ছাত্রলীগ পল্টনে ঘোষণা করে দিল বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া স্বাধীনতাকে। শুরু হয়ে গেল প্রত্যক্ষ স্বাধীনতার সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধু আহ্বান জানালেন অসহযোগের, সাড়া দিলো লক্ষ কোটি জনতা সে ডাকে।

জনাব সিরাজ লিখেছেন-এরপর বাংলাদেশ চলতে শুরু করল আমাদের প্রিয় নেতার নিদের্শে। সরকারি বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠান মেনে চলছে সেই নির্দেশকে, বাংদেশে সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল বঙ্গবন্ধুর সরকার। ৬ তারিখে ইয়াহিয়ার ভাষণের জবাবে ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্সে ময়দানে স্মরণকালের বৃহত্তম জনসমুদ্রের সামনে বঙ্গবন্ধু উপস্থিত করলেন তার ঐতিহাসিক ঘোষণা। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

জনাব শাজাহান সিরাজ অরো লিখেছেন-বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের নেতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনেক কথাই বলে ফেলেছি, কিন্তু নেতার সত্যিকারের একটা ছবি যে, আঁকতে পারিনি এটা সত্য। কেননা শেখ মুজিবকে কোনো একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা উক্তির মাধ্যে বোঝা বড়ই কঠিন। তাকে বুঝতে হলে তাই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে বাংলাদেশের এই মুক্তি আন্দোলনের স্তরে স্তরে। কিন্তু আমাদের অনেক বন্ধুই সেটাকে না করে তার একটা বিচ্ছিন্ন উক্তিকে নিয়ে তাত্ত্বিক বিশ্লেসণে মেতে প্রকৃত মানুষটিকে না দেখে একটি বিকৃত মানুষের সন্ধান করে ফেলেন। সেখানেই বন্ধুরা ভুল করে বসেন। তাকে বুঝতে হলে দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনে আবদ্ধ এমন একটি জাতীয় ইতিহাসে ফিরে যেতে হবে সেখানে তাকে দেখতে পাওয়া যাবে মুক্তি আন্দোলনের প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে। কেননা মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে শেখ মুজিব একটি নতুন দিগন্ত। তাই সর্বশেষ আমি আবার সেই কথাই বলব, শেখ মুজিব একটি নাম নয়, শেখ মুজিব একটি দর্শন । (কৃত্তিবাস ওঝা, আমি মুজিব বলছি, পৃ. ৫-৮)।

স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জনাব শাজাহান সিরাজ বলেন, বঙ্গবন্ধুই স্বাধীনতার স্থপতি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি ঘোষণা দানের জন্য সরকারের নিকট দাবি জানান। জনাব শাজাহান সিরাজ আরো বলেন- যতোদিন পৃথিবী থাকবে শেখ মুজিবের নাম থাকবে। যতোদিন ইতিহাস থাকবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থাকবে। জনাব সিরাজ আরো বলেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ছিল অভিন্ন এবং এ মুক্তিযুদ্ধের মহান নেতা ও স্বাধীন বাংলার স্থপতি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি আরো বলেন-আমরা শেখ মজিবকে অস্বীকার করি না। '৭১-এর অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে কোনো চক্রান্ত হলে আমরা সবাই মিলে তা প্রতিহত করবো। (বাংলার বাণী, ৪-৩-৯০, প্রথম পৃষ্ঠায়, ৪র্থ কলাম)।

১৯৭৬ সালের ২৬ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত মেজর জিয়ার বাণীর উদ্ধৃতি, আমি মেজর জিয়া বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর অস্থায়ী সেনাপতি শেখ মুজিবের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। আমি আরো ঘোষণা করছি যে, আমরা ইতোমধ্যেই শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীনে একটি সার্বভৌম আইনানুগ সরকার গঠন করেছি যা সংবিধান ও আইন অনুযায়ী কাজ চালাতে প্রতিশ্রুত। সুতরাং আমরা বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক ও শান্তিকামী দেশের প্রতি আইনসঙ্গত ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের প্রতি স্বীকৃতি প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি। (১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষিত)।

১৯৯১ সালের ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটোর সময় বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক প্রচারিত স্মৃতিচারণমূলক এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে মেজর জিয়ার ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং বেগম জিয়ার মন্ত্রী পরিষদের প্রভাবশালী সদস্য কর্নেল অলি আহমদ বীর বিক্রম বলেন- মেজর জিয়া ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করেন।

পোর্ট্রেইট অব এ্যা 'ফ্রিডম ফাইটার'

রাখাল চন্দ্র মিত্র

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান অর্থাৎ পাকিস্তানের জন্মের দিন থেকেই নয়া পাকি ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালির স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আদায়ের তথা মুক্তি সংগ্রামের সূচনা। আটচল্লিশের 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' আন্দোলন (বায়ান্নর চূড়ান্ত বিজয়) থেকে শুরু হয়ে চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, আটান্ন-আটষট্টির দশকের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের সাধারণ নির্বাচন মুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের এক একটি মাইলফলক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম ও ইতিহাস দুটি কালপর্বে বিভক্ত। প্রথমটি সাতচল্লিশ থেকে সত্তর যা রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রামের পর্ব। দ্বিতীয়টি একাত্তর পর্ব (২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত) যা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পর্ব।

কথিত এবং স্বীকৃত এমন একজন মক্তিযোদ্ধার গল্প বয়ান করব যার অস্তিত্ব এবং উপস্থিতি সমগ্র মুক্তি সংগ্রাম পর্বের (৪৭ থেকে ৭০) কোথাও আবিষ্কার করা যাবে না। এমনকি ৭ মার্চ মুক্তি ও স্বাধীনতাযুদ্ধের ডাক, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, ২৫ মার্চ অপারেশন সার্চলাইট নামক গণহত্যা শুরু পর্যন্ত যিনি ছিলেন অদৃশ্যমান। অবশ্য সমগ্র জাতি যখন যার যার অবস্থান থেকে প্রতিরোধ যুদ্ধে লিপ্ত তখন এই ভদ্রলোককে দেখা যাবে পাকিস্তান সেনা গোয়েন্দা (আইএসআই) অফিসার হিসেবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জাহাজ এমভি সোয়াত থেকে গণহত্যায় ব্যবহারযোগ্য অস্ত্র খালাসের উপলক্ষে চট্টগ্রাম বন্দরের দিকে অগ্রসর হতে। পথিমধ্যে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের ব্যারিকেডের মুখে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে 'We Revolt'-এর ঘোষণা দেন যা ছিল তাঁর আত্মরক্ষার বাহানা মাত্র। ঐ রাতের পরের ঘটনা আরও রহস্যজনক ও মর্মান্তিক। এদিকে ক্যাপ্টেন (পরে মেজর) রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে ইপিআর বাহিনী প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করেছেন। অন্যদিকে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের বাঙালি সৈনিকরা সদলবলে বিদ্রোহ করার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন। এই সময় রাত ১টা থেকে ১.৩০ মিনিটের মধ্যে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লে.ক. জানজুয়া তার অধস্তন টুআইসি মেজরকে যে কোন কৌশলে বাঙালি সৈনিকদের বিদ্রোহ দমনের

নির্দেশ দেন। বসের নির্দেশ পেয়ে পাক সেনা গোয়েন্দা দফতরের বিশ্বস্ত ও চৌকস অফিসার সেই মেজর সাহেব তাঁর অধীন সৈনিকদের অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দেন এবং বলেন, বিদ্রোহের সময় এখনও আসেনি। সময় এবং প্রয়োজন হলে তাঁর নেতৃত্বেই বিদ্রোহ হবে। সুতরাং আপনারা অবিলম্বে অস্ত্র সমর্পন করে বিশ্রামে যান। সৈনিকরা তাঁর কথায় বিশ্বাস করে অস্ত্র সংবরণ করে ঘুমাতে যান। পরে রাত ২টা থেকে ২.৩০টার মধ্যে নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত ১৮০০ বাঙালি সৈন্যের উপর বালুচ ও পাঞ্জাবী সৈন্য অতর্কিতে আক্রমণ চালায় এবং সর্বমোট ১২০০ এর অধিক সৈনিক তাঁদের পরিবার ও শিশুসহ নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। আর মেজর সাহেব কতিপয় বিশ্বস্ত সৈনিক নিয়ে ঐ রাতে চট্টগ্রাম রণাঙ্গন থেকে পালায়ন করেন। এ যেন পলাশীর সেই ট্রাজেডির পুনরাবৃত্তি। যেখানে মীর মদন-মোহনলালরা প্রচণ্ড বিক্রমে ইংরেজ সেনাদের (ক্লাইভ বাহিনী) বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ঠিক সেই সময় নবাবের সেনাপতি মীর জাফর আলী খাঁ একইভাবে বিশ্রামের অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিয়ে সৈন্যদের ব্যারাক পাঠান। সেই সুযোগে ক্লাইভ বাহিনী গভীর রাতে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে বিশ্রামরত ও ঘুমন্ত নবাব বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে একজন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায়ও তিনি প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। যুদ্ধকালীন রাজনৈতিক ও বেসামরিক নেতৃত্ব ধ্বংস করার লক্ষ্যে মুজিব নগর সরকারকে উৎখাত করে তদস্থলে ওসমানী ও তার নেতৃত্বে 'War Council' গঠনের মাধ্যমে সামরিক ক্যু করে মুক্তিযুদ্ধের সামরিকীকরণের ষড়যন্ত্র করেছিলেন। কিন্তু ওসমানীর অনীহা এবং খালেদ মোশাররফসহ অন্য সেক্টর কমান্ডারদের প্রবল বিরোধিতার কারণে সেই ষড়যন্ত্র ভেসে যায়। তবে পরবর্তীকালে '৭৫-এর আগস্টে তিনি তাঁর সেই ষড়যন্ত্র বাস্তাবায়ন করতে সক্ষম হন।

যে কোন যুদ্ধে পঞ্চম বাহিনীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। পৌরাণিক যুদ্ধ থেকে বিশ্বযুদ্ধ সর্বক্ষেত্রেই এদের দেখা মেলে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষপর্ব ডিসেম্বরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কতিপয় বাঙালি অফিসার 'পঞ্চম বাহিনী' হিসেবে যোগ দেন। ফারুক-রশিদ-ডালিমসহ এই অফিসাররা কথিত ঐ মেজর মুক্তিযোদ্ধার শেলটারে অবস্থান করে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের নামে নানা রকম ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে। এ সব ঘটনা প্রমাণ করে তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রেবেশকারী সকল পাকি গুপ্তচর। মুক্তিযুদ্ধকে সাবোটাজ করর জন্য তার চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকারকে চ্যালেঞ্জ করায় কথিত মুক্তিযোদ্ধা মেজরও একই অপরাধে অপরাধী। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তাজউদ্দীন আহমদ সাহেবের এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর বদান্যতায় তিনি অবধারিত কোর্টমার্শালের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। আর স্বাধীনতা ঘোষণা? বঙ্গবন্ধুর নাম ব্যতীত স্বাধীনতা ঘোষণা এমনকি ঘোষণাপত্র পাঠের

পরিণাম হতো সেনা শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও সেনা বিদ্রোহের অপরাধে অবধারিত কোর্টমার্শাল।

শুধু মুক্তিযুদ্ধের সময় কেন, যুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর কর্মকান্ডে পাকি গুপ্তচর বৃত্তির সাক্ষ্য মিলবে। এ সাক্ষ্যের একটি পটভূমি জেনে নেয়া যাক। ১৬ ডিসেম্বর পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ কালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সদম্ভ ঘোষণা করেছিলেন যে পূর্ব রণাঙ্গানে কৌশলগত কারণে পশ্চাদপসরণ করা হলেও পশ্চিম রণাঙ্গনে পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে। একপর্যায়ে পঁচাত্তর সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর একদল বিভ্রান্ত জুনিয়র সেনা অফিসারদের দ্বারা সেনা অভ্যুত্তান ঘটিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। উদ্দেশ্য একটাই, পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধারের পাক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন। সামনে বিশ্বাসঘাতক খন্দকার মোশতাক এবং কতিপয় মেজর থাকলেও পেছনের ষড়যন্ত্রকারী মদদদাতা ছিলেন গল্পের নায়ক সেই মুক্তিযোদ্ধা। বঙ্গবন্ধুর খুনী কর্নেল ফরুক-রশিদের সাক্ষাতকার ও জবানবন্দী থেকে জানা যায়, তিনি প্ল্যান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন এবং বলেছিলেন 'গো এ্যাহেড।' সফল হলে তিনি তণাদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। দায়মুক্তির অধ্যাদেশ জারি করে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনীদের বিচারের প্রক্রিয়া থেকে রেহাই দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দানকারী দল আওয়ামী লীগকে মোকাবেলা করার জন্য বিএপি নামক দলটি গঠন করা হয়। 'আইএসআই'-এর নেপথ্য প্রয়োজনায় পাকিস্তানপন্থী মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামী, মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক জামায়াতে ইসলামী, পাক হানাদার বাহিনীর সহযোগী রাজাকার, আলবদর, চীনা ঘরানার উগ্র বামপন্থী সর্বহারা গোষ্ঠী, পাকিস্তানী ধ্যানধারণায় আচ্ছন্ন কিছু বিভ্রান্ত মুক্তিযোদ্ধা যাঁরা পাকি গুপ্তচর (পঞ্চম বাহিনী) হিসাবে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলে- এই দলটির ব্যানারে সংঘবদ্ধ হয়। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষা বাংলাদেশকে দ্বিজাতিতত্ত্বের সাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালিত হয়।

মহান মুক্তিযুদ্ধের অমর শহীদ
অধ্যাপক ডা: শামসুদ্দীন আহমেদ ও কিছু কথা

ডা: জিয়াউদ্দীন আহমেদ

বাংলাদেশের নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের কাহিনী আমাদের গর্বের ইতিহাস আমাদের ঐতিহ্যের সাক্ষর। আমাদের দুঃখের সীমানা ছাড়িয়ে চোখের জলে সিক্ত। সবকিছু লিপিবদ্ধ করার প্রচেষ্ঠা আমাদের সাধ্যের বাইরে। অনেক ইতিহাস অজানাই থেকে যাবে, তবু তাদের সম্মিলিত জীবনের মূল্যেই পেয়েছিলাম আমাদের পরম স্বাধীনতা। কিছু কিছু মানুষ আর তাদের কাহিনী আমাদের পথ দেখায়। শহীদ অধ্যাপক ডা: শামসুদ্দীন আহমেদ তাদের মধ্যে একজন। অবিভক্ত ভারতে সিলেটের করিমগঞ্জের বদরপুরে (বর্তমানে ভারতে) তার জন্ম। গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের পর সিলেট সরকারি বালক বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাশ করে মুরারিচাদ কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করেন। ছোটবেলা থেকেই মানুষ ও সমাজ সেবা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। স্কুলে ও কলেজে থাকা কালীন স্কাউটিং থেকে শুরু করে হাজী কাম্পে ভলান্টিয়ারসহ বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম এবং পরাধীন ভারতের মুক্তির জন্য ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। তিনি হয়ে ছিলেন তখন আসাম মুসলিম ছাত্র সংগঠনের সভাপতি। মেধা তালিকায় কোলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন এবং তার সাথে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ও বিভিন্ন সমাজ সেবায় নিয়োজিত হন। উল্লেখযোগ্য যে তাঁর ডাক্তারি ফাইনাল পরীক্ষার ৪ মাস আগে বন্ধুদের সতর্কতা না মেনে তিনি আসামের ভয়াবহ বন্যার ত্রাণ কার্যে মৌলানা ভাসানীর সাথে আত্মনিয়োগ করেন। ততকালীন ভারত বর্ষের রাজনীতির পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের সাথেও সংযুক্ত হন। সেই সময় ভয়াবহ হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার সময় নিজ প্রাণের ভয় তুচ্ছ করে দিনভর ত্রাণ কার্যে ব্যস্ত থাকেন। ১৯৪৬ সালে এম.বি.বি.এস পাশ করেন। সেই সময় সিলেট নিয়ে বিতর্ক হওয়ায় সিলেটে রেফারেনডাম বা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটাভুটির মাধ্যমে পাকিস্তানে সংযুক্ত হয়, তবে তাঁর বাড়িসহ সিলেটের এক বড় অংশ ভারতে রয়ে যায়। নতুন মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানকে গড়ে তোলার জন্য নিজ প্রচুর জমিসহ বাসভিটা পরিত্যাগ করে এবং কোলকাতা মেডিকেল কলেজের স্বনামধন্য অধ্যাপকের স্নেহধন্য চাকরির মায়া

কাটিয়ে স্বাধীন পাকিস্তানে চলে আসেন। স্বাস্থ্য বিভাগের করুন অবস্থার কারণে নতুন সরকারের অনুরোধে সরকারি চাকরিতে অনুপ্রবেশ করেন এবং শুরু করেন দেশ গড়ার আরেক অধ্যায়। প্রথমে কুমিল্লা হাসপাতালের কর্ণধার, তারপর ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতাল, তারপর নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালের প্রধান, তারপর ঢাকা মেডিকেল কলেজের রেসিডেন্ট সার্জন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সে সময় তিনি পূর্বপাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েসন এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হন এবং এসোসিয়েসনের কার্যক্রম সমস্ত দেশে ছড়িয়ে দেবার প্রক্রিয়া শুরু করেন। সেই সময় দেশে বিরাট বন্যা হয় এবং তিনি পাকিস্তান অম্বুলেন্স কোর নামক দেশের প্রথম রিলিফ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। একজন তরুন রেসিডেন্ট সার্জন হিসেবে এই সংস্থার সভাপতি হয়ে জাতীয় পর্যায়ে সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানে তিনি সরকারের পক্ষে ত্রাণ কার্য দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন। সেই সময় তিনি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈমাত্রীয় মনোভাব লক্ষ্য করেন এবং তার প্রকাশ্যে সমালোচনা করেন। সে সময় তাকে সরকারিভাবে হুশিয়ারী প্রধান করা হয়। কেন্দ্রের কোপানলে পড়ে তাঁর উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত যাওয়া রহিত হয় এবং তারপর তাকে ঢাকা থেকে প্রথমে নারায়ণগঞ্জ ও পরে চট্টগ্রামে বদলি করা হয়। নারায়ণগঞ্জে থাকার সময় এক জটিল পোস্ট মর্টেমের তার রিপোর্ট উর্দু ভাষী পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যায় এবং এক হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ অহেতুক হয়রানি হতে রেয়াই পান। যখন যেখানেই তিনি গিয়েছেন সেখানেই তিনি হাসপাতালের ও রোগীর সেবার মান উন্নত করতে পেরেছেন ও সাধারণ মানুষের অধিকারের অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এলাকার সকল ধরনের মানুষকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের কাজ করতে পেরেছেন। পশ্চিমাদের বহু বাধা ডিঙ্গিয়ে ১৯৫৮ সালে তিনি সার্জারিতে উচ্চ শিক্ষা (এফ, আর, সি, এস) নেয়ার জন্য তিনি বিলাত গমন করেন। বিলাত থেকে এসে তিনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজে সার্জারির সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন।

সদ্য বিলাত ফেরত জ্ঞান নিয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের আধুনিক শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রণয়নে ভূমিকা রাখেন এবং ছাত্রদের চিকিৎসা ক্ষেত্রের বাইরেও সমাজ উন্নয়নে ভূমিকার জন্য উৎসাহীত করেন। ১৯৬৪ সালে স্ত্রী ও সন্তানদের কাছে থাকার জন্য তিনি সিলেটে সিভিল সার্জন হিসাবে পোস্টিং নিয়ে আসেন। উল্লেখযোগ্য যে তার স্ত্রী হোসনে আরা আহমেদ তখন সিলেট মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা ছিলেন। ১৯৫০ সালে বৃটিশ আমলের সিলেট সরকারি মহিলা কলেজ পাকিস্তান সরকার বন্ধ করে দেয় তাই সিলেটের শিক্ষানুরাগিরা নতুন দেশে মুসলিম নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বেসরকারি ভাবে তা আবার চালু করেন। হোসনে আরা আহমেদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৬ সালে এম, এ পাশ করে ১৯৫০ সালে ঢাকায় স্বামী ও দুই সন্তান নিয়ে বসবাস করছিলেন। সিলেটের শিক্ষানুরাগিদের অনুরোধে নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য তার স্বামীর প্রেরণায় তিনি ওই সময় আড়াই বছর ও ৫ মাসের দুই সন্তান নিয়ে সিলেটে স্থায়ী ভাবে এসে

মহিলা কলেজের হাল ধরেন এবং ৩৫ বছরে গুটি কতক ছাত্রী ও ভাড়া করা বাড়ি থেকে কলেজকে সব দিকের উন্নতির শিখরে নিয়ে হাজার ছাত্রী ও বার বিঘা জমি ও ভবন নির্মাণ করে ১৯৮২ তে সরকারি কলেজে পরিণত করেন। এটুকু অনায়াসে বলা যায় যে সিলেটের নারী শিক্ষার জন্য অধ্যক্ষা হোসনে আরা আহমেদ ও শহীদ ডা: শামসুদ্দীন আহমেদ তাদের নিজের জীবনের সুখকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। সিলেটে এসে তিনি পূর্ণ উদ্যমে সমাজকে উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মকান্ডে নিয়োজিত হন। সেই সময় সিলেটে মেডিকেল এসোসিয়েসনকে প্রাণ সঞ্চার করে ও এর কেন্দ্রীয় সম্মেলন সংগঠন করেন, সরকারি টিবি ক্লিনিককে তিনি বিলাত প্রবাসীদের অর্থায়নে পূর্ণ টিবি হাসপাতালে পরিণত করেন, জালালাবাদ অন্ধ কল্যান সমিতি প্রতিষ্ঠা করে শত শত রোগীর বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন করান, মেয়েদের জন্য হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা, নাগরিকদের নিয়ে সমাজ কল্যাণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প ইত্যাদি নেয়ার মাধ্যমে সবার মধ্যে দেশের জন্য দায়িত্ববোধ ও ভালবাসা জাগানোর প্রচেষ্ঠা ছিল অন্যতম।

১৯৬৮ সালে আবার তাকে রাজশাহী বদলি করা হয় এবং সেখানেও তার কর্ম উদ্দীপনা অব্যাহত থাকে। রাজশাহী মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভাপতি হিসাবে চিকিৎসকদের সংগঠিত করেন। ঠিক তখন দেশব্যাপী ১৯৬৯ এর গণ জাগরণ শুরু হয়। পাকিস্তানি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে শুরু হয় আন্দোলন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও ঝাপিয়ে পড়ে আন্দোলনে। সেই উত্তাল মুহূর্তে ছাত্রদের রক্ষা করতে গেলে বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড: শামসুজ্জহাকে কাছ থেকে গুলি করে ও বেয়োনেট নিয়ে খুচিয়ে হত্যা করে। রাজশাহী মেডিকেল কলেজে এসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ভয় দেখিয়ে পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে মিথ্যা রিপোর্ট দেবার দাবি করে। অধ্যাপক শামসুদ্দিন তাদের রক্ত চক্ষু অগ্রাহ্য করে সেদিন শুধু সত্যি রিপোর্টি দেননি তিনি সভাপতি হয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে তাঁর জন্য প্রথম প্রতিবাদ সভা করেছিলেন। সরকারি চাকুরি করে মার্শাল ল সরকারের বিরুদ্ধে তা ছিল একটি বিরাট সাহসী পদক্ষেপ। তার রিপোর্ট সংবাদ পত্রে প্রকাশের সাথে সাথে আন্দোলনর এক দুর্বার গতি ধারণ করে, ফলে সরকার মামলা বাতিল করে শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এর পর অবশ্য আইউব সরকারের পতন ঘটে। জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক প্রধানের দায়িত্ব নেয় এবং নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। ১৯৬৯ সালের শেষ দিকে অধ্যাপক শামসুদ্দীন সিলেট মেডিকেল কলেজে সার্জারির প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে নিরঙ্কুশ বিজয়ী হয় এবং বাঙালির স্বাধীকার অর্জনের প্রত্যয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। কিন্তু জেনারেল ইয়াহিয়া খান বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা দিতে গড়িমসি শুরু করে এবং মার্চের ৩ তারিখে সংসদ বাতিল করায় সারা দেশে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে উঠে।

সিলেট মেডিকেল কলেজের সার্জারি বিভাগের প্রধান আমার বাবা ডা. শামসুদ্দীন আহমেদ ১৯৭১-এর মার্চের প্রথম দিকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠির মনোভাব স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তখনই সিলেট মেডিকেল কলেজে একটি Blood bank I Emergency squad গঠন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ২৫ মার্চের গণহত্যা শুরু হওয়ার পর হাসপাতালে অনবরত আগত আহতদের চিকিৎসা তিনি অন্য চিকিৎসকদের নিয়ে সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকেন। তিনি পরিষ্কারভাবে ছাত্রদের বলেন, 'এই রকম হিংসাত্মক কার্যক্রম ও গণহত্যার একমাত্র সমাধান- বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং তার জন্য প্রয়োজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধ।' ঐ সময়ে একদিন পাঞ্জাবি সৈন্যরা তাঁদের সঙ্গে চাকরিরত বাঙালি ডা. লে. মঈন ও ক্যাপ্টেন মাহবুবকে গুলি করে হাসপাতালে দিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন মাহবুব মৃত্যুবরণ করেন কিন্তু ডা. লে. মঈনকে বাবা অপারেশন করে সুস্থাবস্থায় হাসপাতাল থেকে সরিয়ে দেন। তখন ডা: মঈন তাকে সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন আমি তাদের ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও আমাকে গুলি করেছে আপনাকে তারা মারবে নিঃসন্দেহে। তবু তিনি মৃদু হেঁসে বলেছিলেন আমাকে এখানেই থাকতে হবে। সিলেট শহরে আটকে পড়া মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক দেওয়ান ফরিদ গাজী এমপিসহ অনেককে অ্যাম্বুলেন্সের সাহায্যে দূরে সরিয়ে দেন। আমার মুক্তিযুদ্ধে যোগদানে বাবা শঙ্কিত না হয়ে আমার মাকে সান্ত্বনা দিয়ে দেশের জন্য দায়িত্ব পালনে তরুণসমাজকে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। হানাদারদের গণহত্যায় আতঙ্কিত সিলেটে মেডিকেল কলেজের ছাত্র-শিক্ষক-ডাক্তাররা শহরতলিতে আশ্রয় নিতে শুরু করলে এক পর্যায়ে হাসপাতাল প্রায় ডাক্তারশূন্য হয়ে পড়ে। সমস্ত হাসপাতালে আহতদের সেবার জন্য ডা. শামসুদ্দীনের সাথে থেকে যান ডা. শ্যামল কান্তি লালা, অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার কোরবান আলী ও নার্স মাহমুদুর রহমানসহ আরো কয়েকজন। ডা. শামসুদ্দীন মহিলা নার্সদের হাসপাতাল ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। তাঁর নিজের মা ও সদ্য বিবাহিতা বড় মেয়ে ও তাঁর জামাই, বড় ছেলে ও ছোট দুই মেয়েকে গ্রামে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ আমার মা সিলেট মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা হোসনে আরা আহমেদ স্বামীকে সাহায্য করার প্রয়াসে শহরে থেকে যান। মা হাসপাতালে রোগীদের খাবার সরবরাহ ও প্রয়োজনে নার্সের কাজ করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ডা. শামসুদ্দীন অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও পরিচিত সবাইকে এই ভয়ঙ্কর ক্ষেত্র থেকে সরে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। তাঁকে তাঁর চাচা প্রধান শিক্ষক মৌলভী মঈনউদ্দিন হোসেন হাসপাতালে না যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলে তিনি শান্ত হাসি হেসে বলেন, 'এখনই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। তাছাড়া জেনেভা কনভেনশনের শর্ত অনুযায়ী হাসপাতালে যুদ্ধ বা রক্তক্ষয় হওয়ার কথা নয়।'

মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের কয়েকদিন পর আমার বাবা অধ্যাপক ডা. শামসুদ্দীন আহমেদকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নৃশংসভাবে হত্যা করে। এ সংবাদ ২ মাস

পরে আমি জানতে পারি মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে অবস্থান করে। উল্লেখ্য ১৯৭১ সালের ৭ এপ্রিল হানাদাররা সিলেটে ভারি অস্ত্রসহ হামলা চালালে মুক্তিযোদ্ধারা শহর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। ৯ এপ্রিল হানাদার বাহিনী হাসপাতালে প্রবেশ করে এবং চিকিৎসা সেবাদানরত ডা. শামসুদ্দীন, তাঁর একনিষ্ঠ সহযোগী ডা. শ্যামল কান্তি লালা, অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার কোরবান আলী, নার্স মাহমুদুর রহমান, পিয়ন মো. মহিবুর রহমান, মকলিসুর রহমানসহ মোট সাতজনকে গুলি করে হত্যা করে। কয়েকদিনের কারফিউ শেষ হওয়ার পর ১৩ বা ১৪ এপ্রিল তাঁর চাচা মৌলভী মঈনউদ্দিন হোসেন লাশ খুঁজে বের করেন। তারপর তিনি ডা. মোবারক আলী, ভায়রা সৈয়দ আবদুন নবী ও অন্যদের উপস্থিতিতে (পুরাতন) সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল অঙ্গণে ডা. শামসুদ্দীনসহ অন্য শহীদদের কবরস্থ করেন। সেই জায়গায় আজ গড়ে উঠেছে স্মৃতিসৌধ। পরবর্তীকালে তার পাশেই গড়ে উঠেছে শহীদ মিনার। শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন অগণিত মানুষ।

বাবার এই নির্মম হত্যা কাণ্ড আমাকে সশস্ত্র লাড়াইয়ের জন্য আরো ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে। আমি তখন শপথ নেই পাকিস্তানিদের পরাজিত করে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই বাবা হত্যার প্রতিশোধ নিব। সেই সাথে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে আমার বাবার স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে। কারণ আমার বাবা প্রতিটি মুহূর্তে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন। এজন্য তিনি আমাদেরও স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখাতেন। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আমার বাবা অধ্যাপক ডা: শামসুদ্দীন আহমেদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। এটাই আমার অহংকার, এটাই আমার গৌরব।

একজন মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদের সন্তান হিসাবে শহীদ অধ্যাপক শামসুদ্দীনের নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচার বাংলাদেশের কোন মানবাধিকার সংস্থার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আদালতে উপস্থাপিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। এ বিষয়ে সব ধরনের সহযোগিতার জন্য তাঁর পরিবার ও সিলেটের সব সচেতন নাগরিক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই মহান শহীদদের কবর ও সমাধিস্থল ১৯৯১ পর্যন্ত অবহেলায় পড়ে থাকে। ১৯৯২ সালে পরিবারের আর্থিক সহায়তায় কবরস্থানকে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ কাজে জড়িত থাকতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করেছি। অবশ্য এটাকে আমি আমার দায়িত্ব মনে করি। কারণ একজন দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সন্তান হিসাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ বাস্তবায়ন করা নৈতিক দায়িত্ব। সেই দায়িত্ববোধ থেকেই প্রতিষ্ঠা করেছি 'শামসুদ্দীন আহমেদ ফাউণ্ডেশন এবং এডুকেশন ট্রাস্ট'। যার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনার বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন জনকল্যাণ ও কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যাচ্ছি। এ মহৎ কর্মযজ্ঞে সার্বিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করছেন আমার বড় ভাই ইঞ্জিনিয়ার সালাউদ্দিন আহমদ, বড়বোন ফরহাদ জামান, ছোট বোন নাজু ও মণি।

বর্তমানে বুদ্ধিজীবীদের কবরস্থান হিসেবে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে সিলেটবাসী এই স্থানে পুষ্পস্তবক অর্পন করে। কিন্তু এরপর বছরের অন্য সময় আর কোনো কর্মকাণ্ড চোখে পড়ে না। এই স্থানটি রক্ষণাবেক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই। কোনো বাতি নেই। সিলেট শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই স্মৃতিসৌধটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এখনো সিটি করপোরেশন বা অন্য কোনো সংস্থা নেয়নি। এটি খুব দুঃখজনক। বর্তমান স্মৃতি রক্ষার্থে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে সরকারি উদ্যোগে শহীদ অধ্যাপক শামসুদ্দীনসহ অন্যান্য স্মৃতিসৌধ এলাকা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পণ করার জন্যও আমি বর্তমান সরকারের কাছে আবেদন করছি।

যুক্তিকে অবশ্যই যুক্তিসংগত হতে হবে

ওয়াহিদ নবী

বাংলাদেশের একজন বন্ধুর সঙ্গে ফোনে কথা হলো। তিনি বললেন যে গত ৩০ মার্চ একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বেগম খালেদা জিয়ার পাসপোর্ট নব্যকরণের দরখাস্তের একটি পৃষ্ঠা। তার স্বাক্ষর করা কাগজটি। তার যে জন্ম তারিখ লেখা আছে সেখানে সেটা ১৫ আগস্ট নয়। কেউ কেউ বলবেন যে তার একটা ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। আবার কেউ কেউ বলবেন যে প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের ব্যক্তিগত বলে কিছু নেই যেমন বলা হয়েছিল বিলেতের একজন রাজনৈতিক নেতা সম্বন্ধে। বেগম জিয়ার জন্মদিনের বিষয়টি অবশ্য বহুল আলোচিত। বহুল আলোচিত এই জন্য যে, তার পাঁচটি ভিন্ন জন্মদিন রয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। কতটা সত্য আর কতোটা রটনা তা জানি না। এতে হয়তো বিষয়টি এতোটা আলোচিত হতো না। আলোচিত হয়েছে এই জন্য যে তার অন্যতম জন্মদিন ১৫ আগস্ট। দিনটির কথা আমরা জানি। এই দিন বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। ১৫ আগস্ট অবশ্যই অনেকের জন্মদিবস হতে পারে এবং তাদের অধিকার আছে জন্মদিন পালন করবার। কিন্তু বেগম জিয়া প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলের নেত্রী। এই শোকের দিনে হৈ-হুল্লোড় করে তার সমর্থকরা তার জন্মদিন পালন করবে এটা দৃষ্টিকটু। কিছু পালন করবার সময় প্রাপ্তবয়স্ক মানুষরা একে অন্যকে কেক খাওয়ান মুখে কেক গুঁজে দিয়ে এটা অবশ্যই দৃষ্টিনন্দন নয়। ১৫ আগস্ট অবশ্যই একটি শোকের দিন। এইদিন উৎসবমুখর পরিবেশে তার জন্মদিন পালন করাটা শোভন নয়। যদি কেউ এমনটা করেন সেটাকে অনেকেই একগুঁয়েমি বলে গণ্য করবেন।

তার ৫টি জন্মদিন রয়েছে এবং বিষয়টি বহুল আলোচিত এবং সমালোচিত। কারো কারো কাছে নিন্দিত। এই অবস্থায় তিনি পাসপোর্ট নবায়ন করবেন ১৫ আগস্ট নয় অন্য একটি দিন উল্লেখ করে এতোটা অমনোযোগী তিনি হবেন এটা আশা করা যায় না। তাই বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম অন্য কেউ তাকে ছোট করবার জন্য এই কাজটি করেনি তো! বন্ধু উত্তরে বললেন যে তিনি বা তার পক্ষ থেকে কেউ প্রতিবাদ করেনি। এতে করে মনে করা স্বাভাবিক যে দরখাস্তটি তার। মনে হয় জন্মদিনের বিষয়ই নিয়ে বেগম জিয়ার শোভন একটা কিছু করা উচিত। খামোকা একটা নিন্দার শিকার হয়ে কি লাভ?

তার সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা হয়। সেটি হচ্ছে যে তিনি স্বেচ্ছায় পাকসেনাদের ক্যান্টনমেন্টে আশ্রয় নিয়েছিলেন। রটনা এমন যে তার স্বামী তাকে নিয়ে যাবার জন্য লোক পাঠালে তিনি আসতে অস্বীকার করেন। এইসব রটনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরো অনেক কথা। মুক্তিযুদ্ধে অসংখ্য মানুষ তাদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন। স্বেচ্ছায় পাকিস্তানিদের পক্ষ নেয়ার ব্যাপারটা কেউ পছন্দ করবেন না। বেগম জিয়ার সমর্থকরা হয়তো বলবেন যে এসব রটনা সত্ত্বেও তো তিনি জনপ্রিয় এবং নির্বাচনে জিতেছেন্ কথাটা ঠিক সন্দেহ নেই কিন্তু দৃশ্য বদলে যেতে পারে। কাজেই ভুল বুঝাবুঝি দূর করাই ভালো।

বেগম জিয়া এবং তারেক রহমান দুজনেই দাবি করেছেন যে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি। এ নিয়ে বহুল আলোচনা চলছে। পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথা বলা হয়েছে পক্ষের যুক্তিগুলোকে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করতে হিমশিম খাচ্ছেন জিয়া পরিবারের সমর্থকরা। একজন রাষ্ট্রপতি হতে গেলে একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজন। দরকার হয় একটি সরকারের। জিয়াউর রহমানের এসব ছিল না। তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের একজন কর্মচারী ছিলেন। তার পদটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রপতি পদে থাকলে তাকে তো পদত্যাগ করতে হতো সরকারের অধীনে একটি পদ নেয়ার জন্য। এসব কিছুই ঘটেনি। তিনি যদি প্রথম রাষ্ট্রপতি হবেন তবে বহু বছর ধরে দলের ওয়েবসাইটে তাকে সপ্তম রাষ্ট্রপতি বলে উল্লেখ করা হলো কেন? এইসব যুক্তিহীন বিতর্কের মাঝখানে দলের ওয়েবসাইট অদৃশ্য করে কোনো কিছুকে যুক্তিসম্মত করা যাবে কি?

এটা যুক্তির কথা অবশ্য বলা যেতে পারে রাষ্ট্রপতি দাবির সমর্থনে। সেটা হচ্ছে যে বহু বছর ধরে চেষ্টা করেও জিয়াউর রহমানকে 'স্বাধীনতার ঘোষক' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি। তাই নতুন কিছু একটা করবার চেষ্টা। বিএনপি একটি বড় দল। কিন্তু তাদের সমস্যা হচ্ছে যে দলের প্রতিষ্ঠাতার ব্যক্তিগত সম্মান জনগণের কাছে বঙ্গবন্ধুর সমান নয়। তাই দলটি চেষ্টা করছে জিয়াউর রহমানকে বঙ্গবন্ধুর সমান করতে। কিন্তু যা সম্ভব নয় সেটা করবার চেষ্টা করে তারা নিজেদের কাজকে কঠিন করে তুলছে। কি দরকার জিয়াউর রহমান যা তার চেয়ে তাকে বড় প্রমাণ করবার। আর এতোদিন পর এইসব দাবি করা হচ্ছে যে লোকে মনে করবে যে এরা খুব ধীরগতিতে চিন্তা করেন।

দলের ভবিষ্যৎ নেতা হিসেবে যাকে প্রজেক্ট করা হচ্ছে তার বিদেশে দীর্ঘ অবস্থানের বিষয়টি জনগণের সামনে পরিষ্কার করা উচিত। বলা হচ্ছে তিনি অসুস্থতার জন্য চিকিৎসা নিচ্ছেন। কিন্তু তিনি সব করছেন সুস্থ মানুষদের মতো। জনগণের বিশ্বাসযোগ্যতা এতে করে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন তুলেছেন তারেক রহমানের সমালোচকরা। তারা বলছেন বিলেতে পরিবার নিয়ে এতোদিন থাকবার অর্থ কোথা থেকে আসছে। দুরকমের কথা বলে থাকেন তারেক রহমানের সমর্থকরা। প্রথম যে কথাটি তারা

বলেন তা হচ্ছে যে তার বাবা রাষ্ট্রপতি ছিলেন এবং ছিলেন দুবারের প্রধানমন্ত্রী। যুক্তিটা খুব একটা যুক্তিসঙ্গত নয়। জিয়াউর রহমানের ছেঁড়া গেঞ্জি ও ভাঙা বাক্সের কথা সবাই জানেন। তিনি কোনো টাকা রেখে যেতে পারেননি। প্রধানমন্ত্রীর ন্যায্য আয় ভীষণ কিছু হবার কথা নয়। কাজেই এসব যুক্তি দিয়ে সবাই কালো টাকা সাদা করা ও একশটি সুটকেসের কথা মনে করবে। দ্বিতীয় যে যুক্তিটি দেয়া হয় তা হচ্ছে যে, দেশে-বিদেশে তারেক রহমানের যতো সমর্থক রয়েছেন তাদের পক্ষে তারেক রহমানের খরচের টাকা জোগাড় করা কিছুই নয়। হতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে হিসাবপত্র ঠিক রাখা বাঞ্ছনীয়।

সাধারণভাবে বলতে হয় যে আমরা নিজের পক্ষে যে যুক্তিগুলো দেই সেগুলো যেন যুক্তিসঙ্গত হয়। যুক্তিসঙ্গত কথা সবার কাছে গ্রহণ্যযোগ্য। যুক্তিহীন মুখরোচক কথা বাজার গরম করে তুলতে পারে তবে তা হবে স্বল্পস্থায়ী।

দৈনিক ভোরের কাগজ
৪ এপ্রিল ২০১৪

জাতির জনক ও ত্রিশ লাখ মানুষের রক্তের ঋণ

নিতাই চন্দ্র রায়

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শুক্রবার। একটু দেরি করে ঘুম থেকে উঠেছি। রেডিওটা অন করে শুনি-এক বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের কণ্ঠস্বর। মেজর ডালিম বলছি-স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করা হয়েছে। শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। কি বলছে এ সব। বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। কান্না সংবরণ করতে পারলাম না। অলক্ষে চোখ দিয়ে দুফোঁটা লোনা জল গড়িয়ে পড়ল। সকালের নাস্তা না খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় বের হয়ে দেখি থমথমে পরিবেশ। মানুষের চোখে-মুখে অজানা আতঙ্কের ছাপ। কয়টি অসহায় কুকুর যেন কান্নার শব্দে জানাচ্ছে বাঙালি জাতির সর্বনাশের খবর। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দলবদ্ধ কুকুরের এ ধরনের কান্না শুনে তখনো আঁতকে উঠত মানুষ। মানুষ বলে, কুকুর কাঁদলে অমঙ্গল হয় দেশের।

ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের কজন নেতার সঙ্গে দেখা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কি যেন ভাবছেন তারা। মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ভাই বলছেন-এখন কি হবে? আবার কি অস্ত্র ধরতে হবে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে? এ সব প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। আমি আনন্দ মোহন কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির চাত্র। রাজনীতি খুব একটা বুঝি না। বুঝি-বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ, স্বাধীনতা ও শেখ মুজব এক সুতায় গাঁথা। বুঝি, বঙ্গবন্ধুর হাতের ইশারায়ই চলে বাংলাদেশ। তাঁর হাতের তালুতে আঁকা প্রিয় মাতৃভূমির ছবি।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ শুনেছি পরেরদিন সকালে। কাব্যের ভাষায়, নিপুন শব্দ চয়নে তিনি বলেছেন, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। রক্ত যখন দিয়েছি আরো দেব এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।...মরতে যখন শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না। তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। তখন থেকে আমি বঙ্গবন্ধুর ভীষণ ভক্ত। ইত্তেফাকে তাঁর সব খবর পড়ি। টেলিভিশনে ছবি দেখি। কেউ তাঁর খারাপ সমালোচনা করলে কষ্ট পাই। প্রতিবাদ করি।

কত আশা ছিল। দেশ স্বাধীন হলে বঙ্গবন্ধু তাঁর দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবেন। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। স্বপ্নের সোনার

বাংলা গড়ে তুলবেন। শোষণমুক্ত সমাজ গড়বেন। তাই জাতির জনকের এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডকে সহজে মেনে নিতে পারিনি আমরা। ভাবলাম, যদি কোনো প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কর্মসূচি আসে, আংশগ্রহণ করব। মুক্তিযুদ্ধের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে মানুষ। এই প্রত্যাশায় আমি ও আমার বাল্যবন্ধু মোকছেদ আলী দুই মাইল পথ হেঁটে এমপি সাহেবের বাড়ি যাই। এমপি সাহেব বাড়ি নেই। ঢাকায় আছেন। বাড়িতে বহু নেতাকর্মীর ভিড়। সবার মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ। কেউ কেউ বলছেন রক্ষীবাহিনী কি করছে? স্বাধীনতার স্বপক্ষের সৈন্যরা চুপ করে বসে আছেন কেন? ভারতের ভূমিকা কি। প্রতিরোধের ডাক আসছে না কেন? নেতারা কোথায়? তা হলে কি বাংলাদেশ আবার পাকিস্তান হয়ে যাবে? পাঞ্জাবিদের পায়ের তলায় পিষ্ট হবে বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন লাল সবুজের পতাকা? নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে মানুষের মনে।

ছাত্রলীগ নেতা ফজলু ভাই কাঁদছে। মনে হলো তাঁর অশান্ত অশ্রুর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে বাংলাদেশ। ভেসে যাচ্ছে বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য। স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরত্বেগাথা। লাখ লাখ মানুষের আত্মত্যাগের ইতিহাস! রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও সুকান্তের শব্দ সংগ্রাম। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতি।

কিছুদিন আগের কথা। ময়মনসিংহের এক জনসভায় এসেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সে সময় ফুলবাড়িয়া উপজেলায় ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে শত শত বাড়িঘর মাটির সঙ্গে মিশে যায়। প্রবল বাতাসে পুকুরের মাছ রাস্তায় উঠে মারা যায়। বাঁশ বাগান, গাছপালা উপরে পড়ে। গাছের ডালে ঝুলে থাকে ঘরের চালের টিন। বহু মানুষ ও গবাদিপশু আহত হয় মাঠের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। বেশ কয়েকটি গ্রাম লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় প্রকৃতির পাগলামিতে। বঙ্গবন্ধু এ খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গত মানুষের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য ছুটে যান উপদ্রুত এলকায়। আমরা তখন ত্রাণ বিতরণ কাজে ওখানেই ছিলাম। বেলা ১১টার দিকে হঠাৎ দেখি একটি হেলিকপ্টার থেকে বঙ্গবন্ধু নামছেন। তাঁর পাশে হাতেগোনা কজন পুলিশ। তাদের হাতে সাধারণ রাইফেল। একজন রাষ্ট্র প্রধানের নিরাপত্তার জন্য, যা মোটেও যথেষ্ট নয়। অথচ কি সাহস। কি নির্ভীক তিনি। বাংলার মানুষের প্রতি কি অগাধ বিশ্বাস। নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে মানুষের সঙ্গে হাত মিলালেন তাদের প্রিয় নেতা। সমবেদনা জানালেন। স্বচক্ষে দেখলেন ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকার দৃশ্য। অথচ নিজের জীবনের নিরাপত্তার কথা একটুও ভাবলেন না। তিনিতো জানতেন, মহাত্মা গান্ধীর করুণ মৃত্যুর কথা। জন এফ কেনেডির কথা। মার্টির লুথার কিংয়ের কথা। চিলির আলেন্দর কথা। মৃত্যুর কোনো ভয় তাঁর ছিল না। আদর্শের সঙ্গে আপস ছিল না। এ দেশের মাটি, মানুষ ও মাতৃভাষার প্রতি, বাংলার গাছ-পালা, আকাশ-বাতাস, লতাগুল্মের প্রতি, পশু-পাখি, নদী-নালা, প্রকৃতির প্রতি এবং শিল্প সাহিত্যে ছিল তাঁর সুগভীর ভালোবাসা। অন্তরের আকর্ষণ। তাই তিনি বাংলার প্রখ্যাত নেতাদের পেছনে ফেলে হতে পেরে ছিলেন বঙ্গবন্ধু, জাতির জনক এবং হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি।

এক বিদেশি সাংবাদিক বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনার সবচেয়ে বড় গুণ কোনটি, উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আমি আমার দেশের মানুষকে ভালোবাসি। আপনার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা কি? আমি আমার দেশের মানুষকে খুব বেশি ভালোবাসি। এই ভালোবাসাই কাল হয়েছিল জাতির জনকের জীবনে। নিরাপত্তার কারণে বঙ্গবন্ধুকে বহুবার বত্রিশ নম্বর ছেড়ে বঙ্গভবনে যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তিনি সেই কথায় কর্ণপাত করেননি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে বাঙালি জাতির জন্য তিনি সারা জীবন জেল খেটেছেন। যাদের ভালোবাসার টানে তিনি পাকিস্তানের ফাঁসির মঞ্চ থেকে ফিরে এসেছেন। স্বজন হারানোর বেদনায় হাউমাউ করে কেঁদেছেন। বীরাঙ্গনাদের নিজের সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, সেই বাঙালিরা তাঁকে হত্যা করতে পারে না।

ফুলবাড়িয়ায় ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকায় খুব কাছে থেকে বঙ্গবন্ধুকে প্রত্যক্ষ করেছি আমি। তাঁর প্রশস্ত লালাট, কালো ফ্রেমের চশমা, বলিষ্ঠ বাহু, শাল প্রাংশু দেহ, দীপ্তিমান চক্ষুদ্বয় দেখে আমার মনে হয়েছে কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর কথা-আমি হিমালয় দেখেনি; কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব এবং সাহসিকতায় তিনিই হিমালয়। আমার কাছে মনে হয়েছে তারচেয়েও বেশি। এর আগে ময়মনসিংহের সার্কিট হাউস এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মহান নেতাকে আমি দেখেছি। কি কারুকাজ আছে তাঁর কথায়? জাদু আছে বক্তৃতায়। চুম্বকীয় আকর্ষণ আছে তাঁর চাহনীতে? এক পলক তাকালেই বিনম্র শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে মানুষের। তখন কে জানত শেখ মুজিব এভাবে চলে যাবেন না ফেরার দেশে। জনসভায় কোনোদিন শোনা যাবে না তাঁর প্রিয় সম্ভাষণ-ভাইয়েরা আমার। যে মহান নেতা বাঙালি জাতিকে একটা মানচিত্র দিল। পতাকা দিল। পরিচয় দিল বিশ্ব দরবারে । তাঁকেই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে প্রতিশোধ নিল পরাজিত শত্রুরা। প্রতিশোধ নিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাঁর এ দেশের দোসররা। সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী সৈনিক। যার সঙ্গে যুক্ত ছিল কিছু অসৎ আমলা ও আওয়ামী লীগের একটি কুচক্রীমহল, যারা বঙ্গবন্ধুকে কোনো সময় সহ্য করতে পারত না।

শেখ মুজিব ছাত্র জীবন থেকেই রাজনীতি করতেন। পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীতে মহাত্ম গান্ধী, হোসন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, নেতাজি সুভাষ বসু, এ কে ফজলুল হকের চিন্তা-চেতনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনীতিতে প্রভাবিত করেছিল প্রবলভাবে। চীনের মহান নেতা মাওসেতুংয়ের প্রতিও তিনি ছিলেন খুব অনুরক্ত। সিপাহি বিপ্লব, ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, টংক বিদ্রোহ, ক্ষুদিরামের ফাঁসি, তীতুমীরের বাঁশের কেল্লা, প্রীতিলতা ও সূর্য সেনের আত্মত্যাগ থেকেও তিনি অনুভব করতে পেছিলেন বাঙালির প্রত্যাশা, চাওয়া-পাওয়া অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে। তাঁর পরিকল্পনায় কোনো ভুল ছিল না। তিনি বাঙালির শত বছরের বঞ্চনার অবসানেই ১৯৬৬ সালে জাতির সামনে তুলে ধরেন ছয় দফার মুক্তি সদন। প্রকৃত প্রাস্তাবে ছয় দফাতেই ছিল স্বাধীনতা বৃক্ষের অঙ্কুরিত চারা। ছয় দফার মূল উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেল ধরনের রাষ্ট্র এবং প্রতিটি অঙ্গ রাজ্যের থাকবে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। পৃথক মুদ্রা ব্যয়ের হিসাব, কর আদায়ের ক্ষমতা। শুধু পররাষ্ট্র ও বৈদেশিক নীতি ছাড়া সব কাজের কর্তৃত্ব থাকবে

আঞ্চলিক সরকারের হাতে। পাঞ্জাবিদের পছন্দ না হলেও ছয় দফা সারা দেশের মানুষের কাছে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং তার ঢেউ লাগে বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে।

বঙ্গবন্ধু অল্প বয়সে বিয়ে করেও সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো ঘুরেছেন সারা দেশ। গড়ে তুলেছেন ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের মতো দুটি শক্তিশালী সংগঠন। জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে তিনি সব পেশা ও শ্রেণির মানুষকে একত্রিত করেছিলেন ছয় দফা ও এগার দফার দাবির ভিত্তিতে। এখানেই তাঁর বড় কৃতিত্ব।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে নয় মাস যুদ্ধ করে আমারা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। সব মানুষের মৌলিক চাহিদা, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করা। কলকারখানায় উৎপাদন বাড়িয়ে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা। দেশ থেকে দুর্নীতি দূর করা। স্বাধীনতার সুফল সবার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন আজো পূরণ হয়নি। আমারা যদি জাতির জনকের স্বপ্ন পূরণ করতে চাই, তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই, যদি ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ গড়তে চাই, যদি ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, তবে আমাদের সংকীর্ণ স্বার্থ ভুলে ধ্বংসের রাজনীতি ত্যাগ করতে হবে। জ্বালাও-পোড়াও বন্ধ করতে হবে। স্বশাসিত গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার গঠন করে সব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জনগণকে চীন, ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো যুক্ত করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে। পরিকল্পিত ও পরিবেশবান্ধব নগর গঠনের জন্য এখন থেকেই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি নগরে একরূপ নগর সরকার ও নগরী কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। গ্রাম আদালতগুলোকে আরো কার্যকর করতে হবে। প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। নির্দিষ্ট এলাকায় পরিবেশবান্ধব পরিকল্পিত সবুজ শিল্প নগরী গড়ে তুলতে হবে। কৃষি জমি সুরক্ষা করতে হবে। সব প্রকার জলাশয় ভরাট এবং নদী দখল ও দূষণ কঠোরহস্তে বন্ধ করতে হবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। গণতন্ত্রকে টেকসই করতে হবে চোরাচালান ও মাদক ব্যবসা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে বন্ধ করতে হবে। প্রত্যেক অফিস-আদালত থেকে ঘুষ-দুর্নীতি জনহয়রানি বন্ধ করতে হবে। আমলা, রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের আচরণের পরিবর্তন করতে হবে। খাদ্যে ভেজাল দেয়া বন্ধ করতে হবে। ব্যাংকসহ সব আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির মূলোৎপাটন করতে হবে। বিদেশি বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমলা ও রাজনীতিবিদরা জনগণের সেবক এবং জনগণই রাষ্ট্রের মালিক জনগণের ক্ষমতায়নের জন্যই রাজনীতি করেছেন। নিজের জীবন দিয়ে ত্রিশ লাখ মানুষের রক্তের ঋণ শোধ করে গেছেন।

দৈনিক ভোরের কাগজ
৩০ আগস্ট ২০১৫

স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ও কলাকৌশলীদের বক্তব্য

তপন কুমার দে

১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ সকালের পর মেজর জিয়া চট্টগ্রামে ছিলেন না। ২৭ মার্চ তাকে পটিয়া থেকে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে আনা হয়। বেলাল মোহাম্মদ লিখেছেন টেলিফোনে চন্দনপুরার তাহের সোবহান একজন মেজরের হদিস দিয়েছিলেন। যিনি বন্দরে নোঙ্গর করা পাকিস্তানি যুদ্ধ জাহাজ বাবর ও সোয়াত থেকে অস্ত্র খালাসের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন এবং ঢাকায় পাকিস্তানিদের কর্তৃক হামলার খবর শুনে সে সেই রাতেই অর্থাৎ ২৬ মার্চ সঙ্গী জোয়ানদের নিয়ে পটিয়ায় অবস্থান নিয়েছিলেন। জনাব বেলাল মোহাম্মদ লিখেছেন মাহমুদ হোসেন ও আমি যখন পটিয়া পাহাড়ে পৌঁছালাম তখন দ্বিপ্রহর। ঘটনাচক্রে পটিয়া থানার ওসি হিসাবে আমার পূর্বপরিচিত মানিক মিঞাকে পেয়েছিলাম। তার মুখেই মেজর জিয়ার নাম জানতে পেরেছিলাম।

জিয়া আগের দিন অর্থাৎ ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় ৭:৪০ মিঃ এ এবং রাত ১০টায় প্রচারিত বেতারের দুটো অধিবেশনই শুনেছিলেন। আমার যাওয়া মাত্রই তার ভাসমান ছাউনি পটিয়া থেকে কালুরঘাট প্রচার ভবনে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ২৬ মার্চ, '৭১-এর বিকেল বেলায় কালুরঘাট সাব ট্রান্সমিটারকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নাম দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা, শব্দ সৈনিক জনাব বেলাল মোহাম্মদ লিখেছেন-২৭ মার্চ সন্ধ্যায় অধিবেশনে মেজর জিয়ার প্রথম ঘোষণাটি অবশ্যই বঙ্গবন্ধুর পক্ষে প্রচারিত হয়েছিল। শেষতম উচ্চারণ ছিল খোদা হাফেজ, জয় বাংলা। প্রচার ভবনে আমার প্রস্তাবে মেজর জিয়া তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আর ঘোষণার মূল ইংরেজি লিপি রচনা ও বাংলা অনুবাদ লিপি তৈরিতে সহযোগিতা করেছিলাম আমরা তিনজন ক্যাপ্টেন মোহম্মদ, অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমদ ও আমি। বেলাল মোহাম্মদ আরো লেখেন-কারণ একাত্তরের সেই চরম মুহূর্তে শেখ মুজিব ছাড়া অপর কোনো জননায়কেরই রাষ্ট্র বা দেশপ্রধান হবার পটভূমি ছিল না। একজন অজ্ঞাতনামা সামরিক অফিসার তো নয়ই। বাংলাদেশের অপর কোনো রাজনৈতিক নেতার ক্ষেত্রে অনুরূপ দাবি তখন প্রাযোজ্য ছিল না। পাকিস্তানের সামরিক

সরকার গণরায়ের অনুকূলে ক্ষমতা হস্তান্তর করলে তো শেখ মুজিবের কাছেই তা করতেন। মুজব যেমন বঙালি জাতির তিল তিল ভালোবাসা পেয়ে হয়েছেন মহানায়ক তেমনি বাঙলা ও বাঙালি-প্রিয়-মুজিবের জীবন উৎসর্গকারী মহাসংগ্রামের ফসল স্বাধীন বাংলাদেশ। আর তাই শ্রেষ্ঠতম বাঙালি সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্মৃতিসৌধের নাম বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রামের শেষধাপে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ জাতিকে জানিয়ে দিলেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" এবং ২৬ মার্চ, '৭১-এর প্রথম প্রহরের শুরুতে বাঙলাকে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ বলে চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়ে বাঙালি জাতির যার কাছে যা আছে তাই নিয়ে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানালেন। সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলার আপামর জনতা যার হাতে যে অস্ত্র ছিল তাই নিয়ে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালি জাতির স্বাধীনতার ঘোষক, মুক্তিযুদ্ধের মূল মন্ত্রক। বাংলাদেশকে স্বাধীন বলে ঘোষণার পর মুহূর্তে হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যরা বঙ্গবন্ধুকে বন্দী করে নিয়ে যায় পাকিস্তানি কারাগারে। তাই সেই মহা পরীক্ষার দিনে আর কেউ নন, কেবল মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালি জাতির মাথার মণি হিসেবে, বাঙলি জাতির প্রতীক হিসেবে দেশ-বিদেশের স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণের কাছে গৃহীত হন। (স্বাধীনতার ঘোষক কে, ইমন সরকার, পৃ. ৬০-৬৪)

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রধান অনুষ্ঠান সংগঠনক শামসুল হুদা তার একাত্তরের রণাঙ্গন গ্রন্থে উল্লেখ করেন- ইতোপূর্বে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামীলীগ সম্পাদক জনাব এম এ হান্নান বেলা প্রায় দুটার সময় চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ বেতার কেন্দ্র থেকে আনুমানিক পাঁচ মিনিটের এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ রেখেছিলেন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার বাণীর আলোকেই ছিল জনাব এম এ হান্নানের এই ভাষণ। স্পষ্টতই চট্টগ্রাম বেতারের কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে সংগঠিত বিপ্লবী স্বাধীন বাঙলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম অনুষ্ঠান শুনতে পেয়েছিলেন ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ সন্ধ্যা ৭:৪০ মিনিটের সময়ে। এই বেতারের প্রথম সন্ধ্যা অধিবেশনেই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বাংলা অনুবাদটি উপস্থাপন করেন আবুল কাশেম সন্দ্বীপ। পরদিন অর্থাৎ ২৭ মার্চ, ৭১-এর সন্ধ্যা অধিবেশনে সদ্য গঠিত স্বাধীন বাংলা বেতারে পুনরায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচার করেন মেজর জিয়া। এরপর মেজর জিয়া আরো দুদিন স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন ২৮ ও ৩০ মার্চ, '৭১। (একাত্তরের রণাঙ্গন, শামসুল হুদা চৌধুরী (৩০/৩২/৩৩ পৃ.)।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক বেলাল মোহাম্মদ উল্লেখ করেন যে, ২৬ মার্চ সন্ধ্যাবেলায় কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবনে ড. আনোয়ার আলী, কাজী হোসেনেরা, আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ও অন্যান্যদের উপস্থিতিতে ঘোষণা লিপি

তৈরি করতে বসে এক টুকরা কাগজে তিনি লিখলেন "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র"। আবুল কাসেম সন্দ্বীপ বললেন, বেলাল ভাই বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র বললে ভাল হতো না। বেশ তো স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র এবার বেলাল মোহাম্মদ লেখার মাঝখানে তীর চিহ্ন দিয়ে বিপ্লবী শব্দটি লেখেন। অবশ্য দু'দিন পরেই ২৮ মার্চ কেন্দ্রের নাম থেকে বিপ্লবী শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছিল। বিপ্লবী শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছিল মেজর জিয়াউর রহমানের বরাত দিয়ে লে. শমশেরের প্রস্তাবক্রমে। (স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, বেলাল মোহাম্মদ, পৃ. ৪৬-৪৭)।

বেলাল মোহাম্মদ লেখেন, ২৭ মার্চ পটিয়ায় গিয়ে স্থানীয় থানার ওসি মানিক মিয়ার সহায়তায় তিনি মেজর জিয়ার সাথে দেখা করেন। ২৬ মার্চ জিয়া তাদের সন্ধ্যে ৭টা ৩০ মিনিট এবং রাত ১০টার অনুষ্ঠান শুনেছিলেন। কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবনটি পাহারা দেয়ার জন্য বেলাল মোহাম্মদ মেজর জিয়াকে অনুরোধ করেন। তাঁর অনুরোধে মেজর জিয়া বিকেল পাঁচটার পর ট্রান্সমিটিং কেন্দ্রে পৌঁছায়। অফিস কক্ষে তখন শুধু আমরা দুজন। আমি ও মেজর জিয়াউর রহমান। আমি মেজর জিয়ার কণ্ঠে কিছু প্রচার করার প্রস্তাব করি। কথাটি রসিকতা করে বললেও তিনি এর গুরুত্ব দেন। মেজর জিয়া কিছু বলার জন্য রাজী হন এবং নিজের পকেট থেকে কলম ও বেলাল মোহাম্মদের কাছ থেকে একপাতা কাগজ নিয়ে লেখেন, আমি মেজর জিয়া এতদ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। এরপর আমি মেজর জিয়াকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে বলার প্রস্তাব করি। তখন তিনি নিজের নামের শেষে তীর চিহ্ন দিয়ে লেখেন- আমাদের মহান জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে।

২৭ মার্চ সন্ধ্যা অধিবেশনে মেজর জিয়ার কণ্ঠে ঘোষণা প্রচারের পর তার অনুবাদ অন্যান্যদের কণ্ঠে বারবার প্রচারিত হয়। ঘোষণাটি ক্যাপ্টেন অলী আহমদের উপস্থিতিতে প্রধানত বেলাল মোহাম্মদের সাথে আলোচনা করে রচিত হয়। অনুবাদের সময় অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহম্মদ তাকে সাহায্য করেন। ঘোষণার মর্মবাণী ছিল মেজর জিয়া মহান জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে বেলাল মোহাম্মদ উল্লেখ করেন, আনোয়ার আলী আমার হাতে একটি সাইক্লোস্টাইল করা হ্যান্ডবিল এগিয়ে দিয়েছিলেন। শিরোনাম জরুরি ঘোষণা। নীচে স্বাক্ষর শেখ মুজিবুর রহমান। বিষয়বস্তু ছিল আজ রাত বারটা পাক আর্মিরা ঢাকার পিলখানা, রাজরবাগ পুলিশ লাইন-এ আক্রমণ চালিয়েছে। লক্ষ লক্ষ বাঙালি শহীদ হয়েছে। যুদ্ধ চলছে আমি এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। এবং বিশ্বের সমস্ত স্বাধীনতাকামী দেশগুলির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছি। তিনি আরো উল্লেখ করেন, অধিবেশন চলাকালে আমি স্টুডিওতে অবস্থান করেছিলাম। এমন সময় একজন আমাকে ইশারায় বাইরে ডেকে নিয়েছে। স্টুডিওর বাইরে দাঁড়ানো দু-জন আগন্তুক একজন আমাদের পূর্ব পরিচিত ডা. আবু জাফর অন্যজন এম এ হান্নান বলেছিলেন-

আপনারা মাইকে আমার নাম ঘোষণা করুন। আমি বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী প্রচার করবো। এরপর বেলাল মোহাম্মদ বলেন, আপনার নাম প্রচার করা যাবে না। আপনি নিজের কণ্ঠে শুধু এটি পাঠ করবেন। এ সময় এম এ হান্নান বলেন, কেন দুপুর বেলায় আমিতো নামসহ এটি প্রচার করেছিলাম। এখন অবশ্য বক্তব্যটি একটু বড় করা হয়েছে। এবার বেলাল মোহাম্মদ বলেন, দুপুর বেলায় আপনি চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেছিলেন। এখন তো তা নয়। এখন থেকে এ হচ্ছে একটি গুপ্ত বেতার কেন্দ্র। এম এ হান্নান মেনে নিয়ে দ্বিতীয়বার বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার নিজের কণ্ঠে করেন। স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে বেলাল মোহাম্মদ বলেন, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র সংবাদ আকারে পাঠ করেন আবুল কাসেম সন্দ্বীপ। সাইক্লোস্টাইল করা বার্তাটি ডা. আনোয়ার আলী আমাকে দিয়েছিলেন। সাইক্লোস্টাইল বার্তাটি ছিল একটি ঘোষণাপত্র। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন শেখ সাহেব। নীচে শেখের দস্তখত। শেষের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রটি বারবার প্রচার করা হলো। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রচার করা হয়; একটি জাতি একটি দিগন্তে এসে মিশেছে। সেই দিগন্ত শেখ মুজিব। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি এক হয়েছে এক কেন্দ্রবিন্দুতে। এই কেন্দ্রবিন্দু শেখ মুজিব। প্রচার করা হয় আজকে বিশ্ব ইতিহাস জানে একটি মাত্র নামে পরিচিত সাথে সাত কোটি মানুষের একটি জাতি, একটি মাত্র শব্দে বাংলার আকাশ বাতাস উষ্ণ অধীর- সেই শব্দ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

২৬ মার্চ রাতে হঠাৎ চট্টগ্রাম বেতারের মিটারে ঘোষণা করা হয় স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্টের সাথে যে আলাপ আলোচনা করেন তা ব্যর্থ হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের হটকারিতার ফলে এই ব্যর্থতা এবং বিশেষ করে গত রাতে বাংলাদেশের সব ক্যান্টনমেন্টে বাঙালি সৈন্যদের হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া সর্বত্রই নিরীহ জনসাধারণের ওপর অতর্কিতে হামলা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।

ভায়া সৈনিক জনাব গাজীউল হক তার বাংলাদেশ আনচেঞ্জ গ্রন্থের শেষাংশে "অ্যাজন্ডা এ ফ্রাগোলোজি অব মেইইভেন্টস" পর্যায়ে মার্চ,'৭১-এর ঘরে লেখা হয়েছে। টেন ফ্রিডম ফাইটার্স অকুপাইড চিটাগাং রেডিও স্টেশন, টিক্কা খান ব্রেডকাস্ট ওয়াজ স্টপড। শেখ মুজিবুর ডিক্লারেশন ওয়াজ ব্রডকাস্ট অন দি টুয়েন্টি সিক্সথ অব মার্চ বেলাল মোহাম্মদ অকুপাইড রেডিও স্টেশন চিটাগাং। ব্রডকাস্ট অব জেনারেল টিক্কাস স্পিচ ওয়াজ উই হেল্ড। দি রিসিভিচ অ্যান্ড ট্রান্সমিশন সেন্টার এ্যাট কালুরঘাট এ্যান্ড ব্রডকাস্ট্রিং সেন্টার এ্যাট আগ্রাবাদ নাইন মাইলস অ্যাওয়ে ওয়্যার আন্ডার কন্ট্রোল অব মুক্তিফৌজ। স্বাধীন বাংলা বেতার স্ট্যার্টেড ফাংশনিং অ্যাট ওয়ান পি এম অন দি সেম ডে। দি ডাইরেকটিভস অব শেখ মুজিব ব্রডকাস্টেড ওভার অ্যান্ড এগেন'।

বেলাল মোহাম্মদ মন্তব্য করেন-সমগ্র মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমরা স্বাধীনতা বলতে বুঝতাম বঙ্গবন্ধু আর বঙ্গবন্ধু বলতে বুঝতাম স্বাধীনতা।

জনাব বেলাল মোহাম্মদকে প্রশ্ন করা হয় স্বাধীনতার ঘোষক কে- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মেজর জিয়া, না এম এ হান্নান? উত্তরে জনাব বেলাল মোহাম্মদ বলেন-ঘোষক এম এ হান্নান এবং দ্বিতীয় ঘোষকও তিনিই। মেজর জিয়ার ঘোষণাটি ছিল তৃতীয়। এছাড়াও সবক্ষেত্রেই এসব ঘোষণা বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ও কথায় মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। অন্য সবাই ছিলাম আমরা কর্মী।

এক প্রশ্নের জবাবে বেলাল মোহাম্মদ বলেন-১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর প্রভাবেই। পরবর্তী সময়ে সেই চেতনাকে সম্বল করেই আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন ভূমিকায় ব্রতী হয়েছিলাম। মেজর জিয়ার চট্টগ্রামের ঘোষণা না হলে দেশ স্বাধীন হতো না? এ প্রশ্নের উত্তরে জনাব বেলাল মোহাম্মদ বলেন, মেজর জিয়ার ঘোষণা এইটুকুই যে একজন সামরিক অফিসারের কণ্ঠে ঘোষণা শুনতে পেয়ে জনগণের মধ্যে মনোবল সঞ্চারিত হয়েছিল। এছাড়া এ ঘোষণা না হলেও স্বাধীনতা যুদ্ধ ঠিকই চলত-দেশও স্বাধীন হতো।

স্বাধীনতা যুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে আপনি কিভাবে দেখেছেন? এ প্রশ্নের জবাবে জনাব বেলাল মোহাম্মদ বলেন-এ প্রশ্নের উত্তরে একটি কথাই বলব, সমগ্র স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমরা স্বাধীনতা বলতে বুঝতাম বঙ্গবন্ধু আর বঙ্গবন্ধু বলতে বুঝতাম স্বাধীনতা। প্রশাসক মুজিবের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন যেভাবেই হউক মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভাবমূর্তির নিরিখে সত্যের খাতিরে বলতেই হয় ১৯৭১ সালের প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধাই ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সন্তান।

১৯৭১ সালের সলিমপুর কোস্টাল স্টেশন ইঞ্জিনিয়ার; সুপারভাইজার শফিকুল ইসলাম স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে বলেন- স্বাধীনতার ঘোষণাটি প্রাক্তন মন্ত্রী মরহুম জহুর আহমদ চৌধুরীর স্ত্রী মরহুমা ডা. নুরুন্নাহার জহুর ওয়্যারলেস স্টেশনে পাঠান টেলিফোনে। তিনি ফোন করেন তৎকালীন সহকারী প্রকৌশলী হাকিম সাহেবের সাথে কথা বলার জন্য। কিন্তু হাকিম সাহেব উপস্থিত না থাকায় তৎকালীন টিটি আর জালাল ভাই ফোন রিসিভ করলে ডা. নুরুন্নাহার জহুর স্বাধীনতার ঘোষণার কথা জানান এবং হাকিম সাহেবকে আসলে তার সাথে যোগাাযোগ করতে বলেন। তারা এটা অন্য কোথাও প্রচার করেছেন কিনা আমি জানি না। আমাদের এখানে অর্থাৎ সলিমপুর স্টেশনে পাঠানো হয় সকালে ডা. নুরুন্নাহার জহুর থেকে টেলিফোনে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি গ্রহণ ছাড়াও পরে ছোট একটা কাগজও পাঠানো হয়েছিল যা জালালের কাছে ছিল।

আবুল ফজল ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পাহাড়তলীস্থ টিএন্ডটি ওয়্যারলেস বিভাগের অফিসে ক্যাশিয়ার পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ৭ মার্চের রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানানোর পরই আমরা ধরে

নিয়েছিলাম যে দেশে মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য। শুধু সময়ের অপেক্ষা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশের প্রেক্ষিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাথে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। একমাত্র ওয়্যারলেস শিপিং চ্যানেলের মাধ্যমে জাহাজগুলির সাথে যোগাযোগ ছিল।

জনাব আবুল ফজল আরো বলেন, ২৫ মার্চ সকালে সার্বিক অবস্থা জানার জন্য বাহির হয়ে দেখি স্থানীয় কিছু রাজনৈতিক নেতা কর্মী ও ছাত্রদের একটি দল কি যেন পরামর্শ করছে। পরিচিত দু'একজনের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে তাদের হাতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার কপি রয়েছে। যাতে বাঙালিদের ওপর পাঞ্জাবিরা গণহত্যা চালাচ্ছে বলে উল্লেখ রয়েছে এবং সর্বত্র জানানোর জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। তারা এটা কিভাবে বহির্বিশ্বে জানানো যায় এ ব্যাপারে চিন্তিত ছিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে এই সংবাদ বহির্বিশ্বে পৌছানোর ব্যাপারে নিজের আগ্রহ প্রকাশ করি। কিন্তু কিভাবে একাজ করবেন সে ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলাম। কারণ ম্যাসেজটি ব্রডকাস্ট করতে হবে সলিমপুর ওয়্যারলেস স্টেশন থেকে। পাহাড়তলী থেকে ট্রান্সমিটার করলেই তা পাঠানো যাবে। অপরদিকে আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলাম। কিন্তু আমি বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দেওয়াকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করলাম। এই অবস্থায় আমি সলিমপুর ওয়্যারলেস স্টেশনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব আব্দুল হাকিমের কাছে ফোন করলাম। ফোন ধরলেন সেখানকার টি টি আর জালাল আহম্মেদ। তাকে একটি বাণীর কথা বলতেই তিনি জানালেন যে অনুরূপ একটি বাণী তিনিও পেয়েছেন ভোরে আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমদ চৌধুরীর স্ত্রী ডা. নুরুন্নাহার চৌধুরীর কাছ থেকে। এটি প্রচারের জন্য জালাল আহম্মদ আমাদের ট্রান্সমিটিং স্টেশনের টিটিআর আবুল কাসেম ও আমকে হন্য হয়ে খুঁজেছেন। বললেন হাকিম সাহেব এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। আমাকে লাইনে রেখে অপর ফোনে হাকিম সাহেবের সঙ্গে কথা বলে আমাকেও তার সাথে কথা বলতে বলেন। হাকিম সাহেব আমাকে বলেন ভাই ফজল তুমি যেভাবেই পার টিটি আর কাসেমকে খোঁজ করে অফিসে এসে ট্রান্সমিটার অন করার ব্যবস্থা করো এবং জালাল আহমদ, জুলহাস উদ্দিন, শফিকুল ইসলাম এদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করো। এছাড়া তিনি আমরা যে যেখানে থাকি না কেন তার সাথে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দিলেন। আমি কালবিলম্ব না করে কাসেমকে খোঁজ করে তাকে সব বলাতে সেও একমত হলেন। আমরা উভয়েই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাহাড়তলী ওয়্যারলেস কম্পাউন্ডের কাঁটাতারে বেড়ার পাশ ঘেষে ট্রান্সমিটিং হলে প্রবেশ করে সলিমপুরস্থ ওয়ারলেস স্টেশনে ফোন করি সেখানে জালাল সাহেব তখনো আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমি জালাল সাহেবের সাথে মেসেজ পাঠানোর বিষয়ে কথাবার্তা বলার একপর্যায়ে কাসেম সাহেব কথা বললেন টেকনিক্যাল বিষয়ে। তারপর তিনি ট্রান্সমিটার অন করলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই মেসেজ পাঠানোর সংকেত দেখেই আমরা ক্ষণিকের জন্য আনন্দে উদ্বেলিত হই। আমরা কিছুক্ষণ

অপেক্ষা করি ম্যাসেজ কোন বন্দর বা জাহাজ গ্রহণ করলো তা জানার জন্য। মেসেজটি পাঠানো শেষ হলে জানতে পারলাম, যে প্রথমেই কলকাতা বন্দর এবং একই সাথে গভীর সমুদ্রে জাপানী এবং গ্রীক জাহাজ উক্ত ম্যাসেজ গ্রহণ করেছে এবং তারা আশ্বাস দিয়েছে যে এটা তারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রচারের ব্যবস্থা নিবেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ চট্টগ্রামের সলিমপুরস্থ ভি এইচ এফ স্টেশনের ওয়্যারলেস কর্মচারী ছিলেন আলী। তিনি বলেন ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ঢাকায় নিরীহ বাঙালিদের ওপর পাক বাহিনী যে নিমর্ম হত্যাকাণ্ড শুরু করে তার কিছু কথাবার্তা ভি এইচ এফ বেতার মারফতে ফৌজদারহাটস্থ ভি এইচ এফ বেতারে ধরা পড়ে। সেখানে কর্মরত আব্দুল কাদের নামে একজন টিটিআর ঘটনাটি মাহফুজ আলীকে জানায়। সলিমপুর ভি এইচ এফ টারমিনাল ষ্টেশনটি ঢাকার মগবাজার ভি এইচ এফ টারমিনাল ষ্টেশনের সাথে যুক্ত। মাঝখানে কোন শট গ্রহণ করে আরো শক্তিশালী করে পাঠানোর জন্য কয়েকটি রিপিটারে ষ্টেশন রয়েছে। এগুলি হচ্ছে চট্টগ্রামের মিরসরাই, চাঁদপুর এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ।

জনাব মাহফুজ আলী আরো বলেন- ২৫ মার্চ সকাল সাড়ে ৬টায় ঢাকার মগবাজার ভি এইচ এফ ওয়্যারলেস কেন্দ্রের সুপারভাইজার মেজবাউদ্দিনের কণ্ঠে ভেসে এলো মোবাইল বেইজের মাধ্যমে সলিপুর ভি এইচ এফ ষ্টেশনে। মেজবা উদ্দিন বলেন মাসেজটি লিখে নিন এবং চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দসহ নিকটস্থ মেরিন কোস্টাল বেইজ সেখানে যেভাবে পারেন ম্যাসেজটির কথা অবহিত করুন। ম্যাসেজটি রিসিভ করেন মাহফুজ আলীর বক্তব্য অনুযায়ী। একটা বিষয় স্পষ্ট যে, যে কোনোভাবে হোক বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী ঢাকার মগবাজার ভি এইচ এফ ওয়্যারলেস ষ্টেশনে পাঠানো হয়েছিল। সেখানকার কর্মচারীরা তা ঢাকার বাইরে পাঠানোর চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। যার একপর্যায়ে ২৫ মার্চ সকালে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে বাণীটি পৌঁছানো সম্ভব হয়।

জনাব মাহফুজ আলী আরো বলেন, জাতির পিতার বার্তাটি ভি এইচ মোবাইল বেইজের মাধ্যমে গ্রহণ করার সময় চট্টগ্রাম-এর পাকিস্তানি নেভি ওয়্যারলেস টেকনিক্যাল ট্রাবল দিয়েছিল। কিন্তু ২৫ মার্চ রাত প্রায় ১১:৩০ মিঃ হতে উক্ত ভিএইচএফ মাধ্যম ছাড়া ঢাকার সাথে অন্য কোনো যোগাযোগ ছিল না। তাই অতিকষ্টে বাণীটি গ্রহণের পর এটি দেশ বিদেশে প্রচার করা নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করে বাণীটি চট্টগ্রাম বহির বন্দরে অবস্থানরত কয়েকটি বিদেশি জাহাজে প্রেরণ করি, ভি এইচ এফ মোবাইল বেইজের হুচপ্লেক চ্যানেলের মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুর বার্তাটি প্রেরণের সময়ও চট্টগ্রাম সদর নৌ দপ্তরে অন্য কোনো যোগাযোগ ছিল না। বঙ্গবন্ধুর বার্তাটি প্রেরণের সময়ও চট্টগ্রাম সদর নৌ দপ্তরে থেকে চ্যানেলে টেকনিক্যাল ট্রাবল সৃষ্টি করা হয় এবং আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। তারা রকেট বোমা দিয়ে সলিমপুর বেতার কেন্দ্র উড়িয়ে দেয়া এবং আমাকে মেরে ফেলার হুমকি প্রদান করে। আমি দেশ- প্রেমে উদ্বুদ্ধ

হয়ে শত্রুর হুমকিকে অগ্রাহ্য করে বার্তাটি বহির্নোঙ্গরে অবস্থানরত দুটি বিদেশি জাহাজে প্রেরণ করি। এ ছাড়া ২৫ মার্চ সকালেও টেলিফোনের মাধ্যমে বার্তাটির ব্যাপারে আওয়ামী লীগ নেতা মরহুম এম আর সিদ্দিকী এবং জহুর আহম্মদ চৌধুরীসহ জানাশোনা গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও অফিসারবর্গকে অবহিত করি।

সলিমপুর ওয়ারলেস স্টেশনের তৎকালীন সহকারী প্রকৌশলী এ কে এস এমএ হাকিম বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি বহির্বিশ্বে প্রেরণের বিষয়টি টেলিগ্রাফ টেলিফোন বিভাগের তৎকালীন হাই কমান্ডের অবগতির জন্য একটি নোট পাঠান। উক্ত নোটের বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ : ২৭ মার্চ কালুরঘাট থেকে মেজর জিয়ার বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বেতার ঘোষণার আগেই ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে ও ২৬ মার্চ সূচনা লগ্নে মাঝরাতে টিএন্ডটি কর্মচারীরা স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের কাছে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার কথা শুনেছেন। ২৬ মার্চ ভোরে ডা. নুরুন্নাহার জহুরের স্বাধীনতা ঘোষণাটি পাওয়ার পর সকালে পুনঃ যোগাযোগ করে এ সম্পর্কে তারা নিশ্চিত হন। পরে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জোগাড় করে ওই দিনই বার্তাটি সলিমপুর আন্তর্জাতিক মেরিটাইম ওয়্যারলেস যোগে নিকট কলকাতা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে সরাসরি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এবং সমুদ্রগামী অন্যান্য বিদেশি জাহাজে প্রেরণ করা হয়। সহকারী প্রকৌশলী হাকিমের ব্যবস্থাপনায়। বার্তাটি প্রেরণ করেন জালাল আহমদ। অপর যে ৪ জন সহকারী ছিলেন তারা হচ্ছেন : ইঞ্জিনিয়ারিং সুপারভাইজার জুলহাস উদ্দিন ও মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম টি টি আর আব্দুল কাসেম খান এবং ক্যাশিয়ার আবুল ফজল। কতিপয় আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী তাদেরকে বার্তাটি প্রেরণ উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। (স্বাধীনতার ঘোষক বঙ্গবন্ধু প্রামাণ্য দলিল, মুহাম্মদ শামসুল হক, পৃ. ৩২-৪৫)।

স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে শুল্ক বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী কালেক্টর এম এ হালিম লেখেন-১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে চট্টগ্রামে আনুমানিক ২টা থেকে ৩টার মধ্যে মাইক যোগে প্রচার করা হয় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। বঙ্গবন্ধু ঘোষিত নির্দেশাবলী টেলিগ্রাম আকারে ২৬ মার্চ সকালবেলা থেকে জনসাধারণের মাঝে বিতরণ করা হয়। সকাল প্রায় ৮টার সময় বরিশালের বন্ধু আবদুল মালেক আগ্রাবাদ কলোনির রেশনসপের মালিককে নিয়ে আগ্রাবাদ জিসিএম কলোনিতে এসে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার একটি কপি হালিম সাহেবকে দিয়ে যান। এর বংলা অনুবাদ করেন তৎকালীন আগ্রাবাদ সরকারি কলোনির সেক্রেটারি সফিউদ্দিন আহমদ। আগ্রাবাদ সরকারি কলোনির মসজিদের মাইক দিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাণী প্রচার করা হয়। টেলিগ্রামের মর্মকথা ছিল রাজারবাগ ও পিলখানায় শত সহস্র বাঙালি পুলিশ ও আর্মির লোকজনকে পাকিস্তানিরা হত্যা করেছে। এই অবস্থায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। তোমাদের কাছে যার যা আছে তাই নিয়েই শত্রুর মোকাবিলা করো। এবং শত্রুদের হাত থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করো। জয় বাংলা।

কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীর সাথে আলোচনার পর হালিম সাহেব বেবী ট্যাক্সি করে মাইকযোগে আগ্রাবাদ, ফকিরহাট ও দেওয়ানবাগ হাটে বঙ্গবন্ধুর

স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেন। তার সাথে ছিলেন চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের ট্রেজারি সেকশনের ফজলুল হক ও মোহাম্মদ আলম নামক আরো একজন সহযোগী। বেলা প্রায় ১০টার সময় চট্টগ্রাম জিপিওর সামনে হান্নান সাহেবের সাথে হালিম সাহেবের দেখা হয়। তার প্রস্তাব অনুযায়ী ঘোষণাটি আগ্রাবাদ বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করতে রাজি হন। হান্নান সাহেব বলেন, তুমি তাড়াতাড়ি বেতার কেন্দ্রে যাও এবং কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে সব ঠিক করো। আমি এক ঘন্টার মধ্যে বেতার কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছব। রেডিও অফিসে কর্মকর্তাদের না পেয়ে হালিম সাহেব রেডিও স্টেশনের বিভাগীয় প্রকৌশনী মির্জা নাসিরুদ্দীন সাহেবের বাসায় যান। নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়ার পর মির্জা সাহেব রেডিও স্টেশনে যান। যাওয়ার পথে রেডিও প্রকৌশলী আবদুস সোবহানকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যান। ইতোমধ্যে হান্নান সাহেব রেডিও স্টেশনে গিয়ে পৌঁছেন। মির্জা সাহেব বলেন, আগ্রাবাদ কেন্দ্র থেকে প্রচারের চেয়ে কালুরঘাট থেকে প্রচার করা সহজ হবে। সোবহান সাহেব বলেন এখান থেকে প্রচার করা হলে সবাই ধরা পড়ে যেতে পারে। অতএব তাড়াতাড়ি করে সবাই কালুঘাটের দিকে রওনা হন। যাওয়ার পথে রেডিও প্রকৌশলী দেলোয়ার হোসেনকে গাড়িতে তুলে নেয়া হয়। তারা যখন কালুরঘাট রেডিও স্টেশনে পৌঁছান তখন সেখানে কোনো লোকজন ছিল না। শুধু রহমান নামে একজন পাহারাদার ছিল। সে সবাইকে গেট খুলে দিল।

হান্নান সাহেবের অনুরোধে প্রকৌশলীরা কাজে লেগে যায়। সেদিন শুক্রবার। ইতোমধ্যে সোবহান সাহেব এসে বললেন আপনারা এখন যা বলতে চান তা বলতে পারেন। জনৈক ছাত্রকর্মী হান্নান সাহেবের নির্দেশে ঘোষণা করেন- এখনই চট্টলার বীর হান্নান সাহেব স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র হতে আপনাদের সামনে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বেতার ভাষণ দিবেন। তখন বেলা প্রায় ২টা ১০ মিনিট। হান্নান সাহেব প্রথমবারের মতো বাংলার স্বাধীনতার ঘোষণা করে বাংলার মানুষকে জাগ্রত করেন। ঘোষণা মর্মকথা ছিল-আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে ও তার নামে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। আপনারা যারা এই গোপন রেডিও হতে আমার এই ঘোষণা শুনেছেন, তারা অন্যদের নিকট এই বাণী প্রচার করবেন। আর যার নিকট যা কিছু আছে, তা নিয়েই শত্রুর মোকাবিলা করুন এবং দেশকে মুক্ত করুন। পরের দিন ২৭ মার্চ কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা ও বেলাল মোহাম্মদের একান্ত সহযোগিতায় মেজর জিয়া পটিয়া হতে এসে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ২৮ মার্চ মেজর জিয়া সংশোধিত আকারে পুনরায় বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়, আব্দুল মতিন, পৃ. ২৮, ২৯)।

যুক্তরাষ্ট্রের গোপন নথি
স্বাধীনতা ঘোষণা করেন শেখ মুজিব

কাগজ ডেস্ক

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা হিসেবেই নথিভুক্ত রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরে। এতে উল্লেখ রয়েছে, ২৬ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। যুক্তরাষ্ট্রের গোপন নথিতে জানা যায়, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তারিখেই ওয়াশিংটনে স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের এক জরুরি বৈঠক চলছিল। ওই বৈঠকে সিআইএর পক্ষ থেকে অংশ নিচ্ছিলেন রিচার্ড হেমস। সভাপতিত্ব করছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার। বৈঠকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেপ্তার হওয়া নিয়ে দীর্ঘআলোচনা ও তথ্য তুলে ধরা হয়। সেই বৈঠকেই রিচার্ড হেমস বলেন, অজ্ঞাত স্থান থেকে রেডিও বার্তায় বলা হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। খবর বাংলা নিউজের।

স্থানীয় সময় বিকাল ৩টায় শুরু হওয়া ওই বৈঠকের বিষয় ছিল 'পাকিস্তান'। স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের চেয়ারম্যান হিসেবে বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার। এছাড়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন অপর দুই কর্মকর্তা ইউ আলেক্সিস জনসন ও ক্রিস্টফার ভ্যান হলেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন ডেভিড প্যাকার্ড ও জেমস এইচ নয়েস। সিআইএর প্রতিনিধিত্ব করেন রিচার্ড হেমস ও ডেভিড বি, জেসির পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল মেলভিন জায়েস ও ফ্রাঙ্ক ডব্লিউ রি, এনএসসির পক্ষে কর্নেল রিচার্ড টি কেনেডি, হ্যারল্ড এইচ সন্ডার, স্যাম হকিন্সন ও কিথ গাথরি।

বৈঠকে রিচার্ড হেমস বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আপডেট জানাচ্ছিলেন। বিভিন্ন প্রশ্ন করে হেনরি কিসিঞ্জার জেনে নিচ্ছিলেন প্রয়োজনীয় তথ্য। পরে এই বৈঠকের কথোপকথন নোট আকারে পররাষ্ট্র দপ্তরের গোপন নথিতে স্থান পায়। গত ৩১ মার্চ ২০১৪ তারিখে পররাষ্ট্র দপ্তর এসব গোপন নথি প্রকাশ করে। তাতেই নির্দিষ্ট তথ্য মেলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সেই সময়ের অবস্থান সম্পর্কে।

স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপ ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা হিসেবেই চিহ্নিত করে। রিচার্ড হেমস তার বর্ণনায়

তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের কনস্যুলেট অফিসের পরিস্থিতি বৈঠকে অবহিত করছিলেন। রিচার্ডের বক্তব্যের প্রথম লাইনটি অবশ্য এখনো গোপনই রাখা হয়েছে। তবে ৩১ মার্চ যেটুকু বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে তাতে রিচার্ড হেমস বলছিলেন-কনস্যুলেট জেনারেলের এলাকা খুবই শান্ত। কিন্তু শহরের পুরনো অংশে (পুরান ঢাকা) ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে আগুন জ্বলছে। কিছু গুলি বা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। সন্ধ্যা ৬টা ৩০ পর্যন্ত কেবলমাত্র দুজন কনস্যুলেট কর্মকর্তা কনস্যুলেট ভবনে ঢুকতে পেরেছেন। (হেমসের বক্তব্যের এর পরের লাইনটিও গোপন রাখা হয়েছে)।

প্রকাশিত বক্তব্য তিনি আরো বলেন, দুপুর ১টায় সামরিক শাসক কর্তৃপক্ষ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে তাদের হেফাজতে নিয়েছে। গ্রেপ্তারের সময় তার দুই সমর্থক নিহত হয়েছেন। (এ পর্যায়ে মূল বক্তব্যের আরো দুটি লাইন অপ্রকাশিত রয়েছে)।

প্রকাশিত বক্তব্যের পরের অনুচ্ছেদে দেড় লাইন অপ্রকাশিত রেখে রিচার্ড হেমসের ভাষায় আরো বলা হয় তারা বলছে শুক্রবার রাতে ইয়াহিয়া তার ভাষণে মুজিবুর রহমানের ওপর বর্ণনা দিতে গিয়ে যে বিষ ছড়িয়েছেন তার প্রশংসা করতে বক্তব্যটি শুনতে হবে। ইসলামাদ নিশ্চিত করেছে মুজিবুর রহমানকে সফলভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে আলোচনা কি কারণে ভণ্ডুল হলো তা অস্পষ্ট।

এ সময় কিসিঞ্জারের একটি বক্তব্য রয়েছে প্রকাশিত নথিতে। তিনি বলছিলেন, গতকালও তো অবস্থা দৃশ্যে মনে হচ্ছিল একটা চুক্তি হয়ে যেতে পারে।

আর রিচার্ড হেমস এর উত্তরে আবার বললেন, ২৪ মার্চেও পরিস্থিতি একটি চুক্তির কাছাকাছি পর্যায়ে ছিল। তবে পরে মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে অবিলম্বে সামরিক আইন তুলে নেয়ার দাবির কারণেই তা ভণ্ডুল হয়েছে। হেমস আরো বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন অজ্ঞাত স্থান থেকে এমন একটি রেডিও বার্তা প্রচার করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে ২০ হাজার পশ্চিম পাকিস্তানি বিশ্বস্ত সেনা অবস্থান করছে। এছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের নিয়মিত ৫ হাজার এবং পূর্ব পাকিস্তানের ১৩ হাজার আধাসামরিক সেনা রয়েছে, তবে তারা কতোটা বিশ্বস্ত থাকবে সেট সন্দেহজনক। ভারতের সংবাদপত্রগুলো রিপোর্ট করছে বিপুল সংখ্যক পাকিস্তানি সেনা জাহাজযোগে পৌঁছে গেছে, তবে আমরা তা নিশ্চিত করতে পারিনি।

২৬ মার্চ তারিখটির কথা উল্লেখ করে হেমস আরো বলেন, আজই সৈন্য বোঝাই ছয়টি সি-১৩০ করাচি থেকে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করছে। এই সেনাদের যেহেতু সিলন হয়ে যেতে হবে সে কারণে তাদের পৌঁছতে দীর্ঘ সময় লেগে যাবে। হেমস আরো বলেন, সরিয়ে নেয়ার মতো ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের ৭০০ জন এবং চট্রগ্রামে ৬০ অথবা ৭০ জন রয়েছে। তবে সরিয়ে নেয়ার জন্য এখনো কোন অনুরোধ আসেনি।

দৈনিক ভোরের কাগজ
৫ এপ্রিল ২০১৪

জিয়া প্রথম রাষ্ট্রপতি
তারেকের মন্তব্যে ব্রিটিশ মন্ত্রীর বিস্ময়

স্টাফ রিপোর্টার

জিয়াউর রহমানকে প্রথম রাষ্ট্রপতি বলে দাবি করে তারেক রহমানের মন্তব্যের বিষয়ে বিস্ময়' প্রকাশ করেছেন ঢাকা সফররত ব্রিটিশ প্রতিমন্ত্রী এ্যালান ডানকান। মঙ্গবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আন্তর্জাতিক উন্নয়নবিষয়ক ব্রিটিশ প্রতিমন্ত্রী এ্যালেন ডানকানের সঙ্গে বৈঠক শেষে পরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। অপরদিকে পোশাক খাতের শ্রমমান অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ব্রিটিশ প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম সাংবাদিকদের বলেন, বৈঠকে আমি তারেক রহমানের দেয়া বক্তব্যের প্রসঙ্গ তুলে এ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছিলাম। এ প্রসঙ্গে এ্যালান ডানকান জানান, 'একটি রাজনৈতিক দল এত বছর পরে কেন এমন বিকৃত তথ্য উপস্থাপন করছে তার কোন ব্যাখ্যা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। আমরা বিস্মিত হয়েছি। বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক জিয়ার গ্রেফতারের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শাহরিয়ার আলম বলেম, এ মুহূর্তে সরকারের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে কোন গ্রেফতারি পরোয়ানা নেই। গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হলে আমরা পদক্ষেপ নেব। শাহরিয়ার আলম বলেন, জাতীয় নির্বাচনের পরে জনজীবনে এবং ব্যবসায় স্থিতি এসেছে, এতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এ্যালান। বিরোধীদলীয় নেতা রওশন এরশাদের সঙ্গেও এ্যালানের বৈঠক করার কথা রয়েছে। নির্বাচন নিয়ে তাদের কোন সংশয় নেই, এটাই তার প্রামাণ।

এ্যালান ডানকান সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) পূরণে বাংলাদেশ সরকারের নেয়া পদক্ষেপে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এছাড়া ২০১৫ সাল পরবর্তী সময় টেকসই উন্নয়নে তিনি আরও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানান মন্ত্রী।

শাহরিয়ার বলেন, ডানকানের সঙ্গে মিয়ানমার ইস্যুতেও আলোচনা হয়েছে। এ্যালান জানান, রাখাইন অঙ্গরাজ্যের সমস্যা সমাধানে ব্রিটিশ সরকার জাজ করে যাচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি এর সমাধান হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

ক্রিমিয়া ইস্যুতে জাতিসংঘে ভোট না দেয়ার ঘটনায় বাংলাদেশের অবস্থান জানতে চাইলে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, কোন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে, পক্ষ অবলম্বন না করাই বাংলাদেশের নীতি। এখানে না ভোট দেয়ার সুযোগ ছিল। বাংলাদেশ তাই না ভোট দিয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২ এপ্রিল ২০১৪
